কথা কল্পনা কাহিনী

(পঞ্চম স্তবক)

গজেন্দ্রকুমার মিত্র

মিত্র ও ঘোষ পাব্লিশার্স
প্রা ই ভে ট লি মি টে ড
১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা ১২

উৎসর্গ

আমার প্রাণের মানুষ, রবীন্দ্র সঙ্গীতের জাদুকর শিল্পী

শ্রীহেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের

করকমলে

সূচীপত্র

চিত্ত ও চিত্র

ঐতিহাসিক

অলৌকিক

প্রসন্ন মধুর

এই গল্প-গ্রন্থমালায় প্রথম স্তবকে তেত্রিশটি, দ্বিতীয় স্তবকে আটত্রিশটি, তৃতীয় স্তবকে সাঁইত্রিশটি, এবং চতুর্থ স্তবকে পঁয়ত্রিশটি ক'রে বিভিন্ন রসের গল্প সংকলিত হয়েছে। প্রথম স্তবক ২২৲, দ্বিতীয় স্তবক ২০৲৷০, তৃতীয় স্তবক ২২৲ ও চতুর্থ স্তবকের মূল্য ২৪৲ টাকা।

অভিজাত

সে অনেক দিনের কথা হয়ে গেল। অন্তত ছেচল্লিশ বছর আগের কথা, ঠিক বছরটা আজ আর মনে ক'রে বলতে পারব না। তখন স্কুলে স্কুলে ঘুরে বেড়াই, পাঠ্যবই ধরানোর কাজ, মানে যাতে হেডমাস্টার মশাইরা পাঠ্য তালিকায় আমার কোম্পানির কোন কোন বইয়ের নাম ছেপে দেন এই আশায়; আর অপাঠ্য বই বিক্রীর ধান্দায়—লাইব্রেরী আছে, প্রাইজ আছে। এটা মাইনের বাইরে—যদি কেউ একটু আনুকূল্য করেন মোট বই বিক্রীর ওপর কিছু কমিশন পাই। সে আর কতই বা, রাহাখরচ খাইখরচ সবই আমার, ঐ কমিশন থেকে বাদ যাবে।

সে এক অবিশ্বাস্য যুগ ছিল। আপনারা এখন চেষ্টা করলেও বুঝবেন না। মফস্বলের বেশ নাম-করা স্কুলেরও লাইব্রেরী খাতে বরাদ্দ ছিল বছরে ষাট টাকা অর্থাৎ মাসে পাঁচ টাকা। তার মধ্যে পুরনো বই বাঁধাতেই মাসিক দু' টাকার মতো খরচ হয়ে যেত। প্রাইজের বরাদ্দ কোথাও একশো, কোথাও আশি, কোথাও বা পঞ্চাশ। এবং বলা বাহুল্য, আমি একমাত্র ক্যানভাসার নই। অন্যরাও কিছু বই বেচে বৈকি।

তবে আয়ও যেমন কম ছিল, ব্যয়ও তেমনি; এত অশান্তি ছিল না এখনকার মতো। সে যাক গে, আমার আসল কথায় ফিরে আসি।

বছরটাও যেমন মনে নেই, ঠিক জায়গাটাও না। প্রায় পঞ্চাশ বছর আগের কথা, স্মৃতি আর তেমন মজবুত নেই আগের মতো। মোটামুটি অবস্থানটা মনে আছে, মুর্শিদাবাদ জেলার সুতী-আওরঙ্গাবাদ অঞ্চল, একটা রেল স্টেশন থেকে অনেক দূরে একটি গ্রাম।

না, সেখানে স্কুলের কোন কাজে যাই নি। তবে ব্যাপারটা স্কুলেরই বটে। নিমতিতা স্কুলের হেডমাস্টার মশাই আমাকে বড় স্নেহ করতেন। দশাসই মানুষ ছিলেন, যেমন লম্বা তেমনি স্বাস্থ্যবান, রঙটা শ্যামলা কিন্তু মুখ চোখ কাটা-কাটা। অত বড় চোখ পুরুষের খুব কমই দেখা যায়। তাঁকে দেখলেই মহাদেবের কথা মনে আসত, তাই নামটা ভাববার চেষ্টা করলে মহাদেববাবু

বলেই মনে হয়। কিন্তু তা যে নয়, এটা মনে আছে। তবে, নামটা না হয় মহাদেববাবুই ধরা যাক না। এখনও এমন অনেক লোক আছেন যাঁরা তাঁকে চিনতেন, এ কাহিনী তাঁদের কারও চোখে পড়লে দয়া করে নামটা জানিয়ে দেবেন। পদবীটা মিশ্র এটা মনে আছে।

স্বাস্থ্যবান তা আগেই বলেছি কিন্তু হঠাৎ একবার গিয়ে লক্ষ্য করলুম বড্ড যেন শুকিয়ে গেছেন। কারণ জানতে চাইলে বললেন—'কি জানি, ক'মাস ধরে এক্‌জিমায় বড় কষ্ট পাচ্ছি, দু' পায়েই ছেয়ে গেছে একেবারে।'

বললুম, 'এক্‌জিমার জন্যে শরীর খারাপ, না শরীর খারাপ বলে এক্‌জিমা? শুনেছি জীবনীশক্তি অর্থাৎ ভাইটালিটি কমে এলে এ সব অসুখ হয়।'

উনি তেমনি শুকনো মুখে উত্তর দিলেন, 'তা তো জানি না, ডাক্তারও তো দেখাচ্ছি, কোন ফলই তো হচ্ছে না।'

আমি আর কি বলব, শুধু বলে এলাম, 'বরং আপনি কলকাতায় গিয়ে কোন ডাক্তার দেখিয়ে আসুন।'

'আমারও তাই ইচ্ছে আছে,' বললেন মহাদেববাবু, 'ইউনিভার্সিটির খাতা নিতে যাব ম্যাট্রিকের, ভাবছি সেই সময়ই কাউকে—'

তারপর এই আসা আমার।

স্কুলে পৌঁছে শুনলাম মহাদেববাবু নেই, তিনি দেশে গেছেন। খুব অসুস্থ, ব্লাড সুগার খুব বেশি পরীক্ষায় ধরা পড়েছে, তাতেই প্রায় শয্যাশায়ী হয়ে আছেন গত মাস দুই। আরও শুনলুম, তিনি নাকি আমার খুব নাম করেন। দেশে যাবার দিনেও মাস্টারমশাইদের বলে গেছেন, 'উনি এলেন না, আসবার কথা ছিল, ভেবেছিলুম দেখা হবে, অনেক দিন দেখি নি ভদ্রলোককে, খুব দেখতে ইচ্ছে করে। ওঁর কথাতেই বড় ডাক্তার দেখিয়েছিলুম, নইলে এ সব ধরা পড়ত না।' শুনে মনটা খারাপ হয়ে গেল। কে জানে, আর ফিরবেন কি না, কখনও দেখা হবে কি না আবার। যা পাজী রোগ।

বেশ খানিকক্ষণ প্রশ্নটা মনে মনে তোলাপাড়া করে শেষ পর্যন্ত মন স্থির করেই ফেললাম। যা থাকে কপালে, দেশটা ঘুরেই যাই একবার। থার্ড মাস্টারমশাই ওঁর গ্রামের কাছাকাছি থাকেন। তিনি অভয় দিলেন, 'একটু পরেই যে ট্রেনটা খুল্যেন যাবে, তাড়াতাড়ি খাওয়াদাওয়া সেরে যদি ধরতে

পারেন, বেলা চারটে নাগাদ ওদিকের স্টেশনে নামতে পারবেন। দেখবেন সামনেই সার সার গো-গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। ওঁদের বাড়ি পর্যন্ত এক টাকা ভাড়া, রেট বাঁধাই আছে, স্রেফ উঠে পড়লেই হল। ঘণ্টা তিনেক লাগার কথা ওঁর বাড়ি পৌঁছতে, না হয় চার ঘণ্টাই হল। এখন গরমের দিন, বেলা বড়, ঝিকিমিকি বেলা থাকতে থাকতে পৌঁছে যাবেন। রাত হলেও কোন চিন্তা নেই, আকাশ পরিষ্কার, ওদের পথ দেখতে কোন অসুবিধা হবে না। আর যখনই যান, মহাদেববাবু তো আজ রাতে ছাড়বেন না আপনাকে। রাতটা থেকে কাল সকাল সকাল চাটটি ডাল-ভাত খেয়ে রওনা দেবেন, ট্রেন ঐ সেই বেলা চারটেয়। ঐখানেই আপ-ডাউন ক্রস করে।

সেই মতোই দুর্গা বলে রওনা দিলুম। সেইখানে নামলুমও সময় মতো, গো-গাড়ি মিলতেও কোন অসুবিধে হ'ল না। গাড়োয়ান যুধিষ্ঠির ঘোষ লোক ভাল, একটা সিগারেট দিতে গলেই গেল একেবারে। সুখ দুঃখের গল্প করতে করতে মনের সুখে বলদের ল্যাজ মোচড়াতে লাগল। গাড়িও চলতে লাগল হু-হু করে, অবিশ্যি বলদের পক্ষে যতটা জোরে যাওয়া সম্ভব।

তবে থার্ড মাস্টারের সেই ঝিকিমিকি বেলা থাকতেথাকতে পৌঁছানো গেল না। গোগাড়ি যত জোরেই যাক আর গাড়োয়ান যতই চেঁচাক 'হেই-হেই শালায় গরুরে!' বলদের পক্ষে ইঞ্জিন কেন, সাইকেলের বেগেও দৌড়নো সম্ভব নয়। পথও দেখলাম অনেকটা। ফলে আধরাস্তার কিছু বেশি (যেটা পরের দিন বুঝেছিলাম) যেতেই বেশ অন্ধকার হয়ে এলো চারিদিক। বেশির ভাগই মাঠ ধরে যাওয়া, তবু নজর চলার অবস্থাও আর রইল না। আন্দাজে আন্দাজে যাওয়া, আর তাই যেতে গিয়েই পথের ধারে একটা গর্তে পড়ে গাড়ির একটা চাকা ভেঙে গেল। সেদিকের বলদটাও জখম হ'ল বেশ খানিকটা। আমিও চোট খেলাম,, তবে সে বেশি কিছু নয়। আসলে পথের ধারে দুটো কি গাছ হয়েছিল, সেই দিনই বোধ হয় কেউ কেটে নিয়ে গেছে, গোড়াটা কাটতে পারে নি, তাতেই চাকা আটকে ধাক্কা খেয়েছিল, সে বেগ গরু সামলাতে পারে নি। গর্তটাও মনে হল নতুন, বড় মাপের। আলোতে দেখে বুঝলুম পরের দিন কেউ এই রাস্তায় গর্ত বোজাতেই ঐখান থেকে মাটি কেটে নিয়েছে।

তা তো হ'ল, এখন উপায় ?

তখন অত টর্চ নেওয়ার রেওয়াজ ছিল না। পকেটে একটা দেশলাই ছিল, হাতে সেদিনের খবরের কাগজ, তাই জ্বেলেই যেটুকু দেখা গেল, চাকা মেরামত করতে গেলে ভাল মিস্ত্রী চাই। গরুটাকে টানাটানি করে যুধিষ্ঠিরই তুলল, হয়তো সে ঘণ্টাকতক পরে আবার চলতে পারবে, কিন্তু চাকা ?

'এ কোথায় এলুম বলতে পারো যুধিষ্ঠির, কাছাকাছি গ্রাম আছে, যেখানে মিস্ত্রী মিলবে ? মহাদেববাবুর বাড়িই বা কত দূর আর ?'

'আজ্ঞে সি এখনও ধরুন তিন কোশ হবে। তবে গেরাম একটা আছে। হুই একটা বাতি লজরে পড়ছে না ? চেরাগ জ্বলছে, লয় তো কেউ রসুই করছে। মনে লিচ্ছেন আজ্ঞে উটা রুদ্দ্‌রপুর। তা যদি হয় ওখানে এক নবাবসাহেব আছেন, বড়মিয়া বললে এ অঞ্চলের সবাই চিনবে, এক ডাকে। তুমি বরং এখানে থাক একটু, আমি একটুন দেখে আসি। যদি তাই হয় আতটার মতো আচ্ছয় একটা মিলবেন। ঢালা হুকুম বড়মিয়ার, এ দিগরে যেখানেই অতিথ ফকির আসুক না কেন ওঁর ঘরে নিয়ে যেতে হবে।'

'তা বেশ তো, চল আমিও তোমার সঙ্গে যাই, এখেনে অন্ধকারে একলা বসে থেকে আর লাভ কি!'

'আজ্ঞা, তা লয়। গোরু দুটো একলা থাকবেন, সেই ভয়, এ অঞ্চলে গো-বাঘার উপদ্দরব খুব।'

· 'তাই আমাকে বাঘের মুখে ফেলে চলে যেতে চাইছ! যায় আমার ওপর দিয়ে যাবে, গরু দুটো বাঁচবে তোমার! বেশ ভাই, বেশ!' আমি একটু তিরস্কারের সুরেই বলি।

'আজ্ঞা, তা নয়। ই তুমি কী বলছেন। গোবাঘা কি মানুষ খেতে পারে! মানুষ দেখলে ভয়ে পালাবেন তেনারা। তা চলেন আজ্ঞা, আমার সঙ্গেই চলেন, ও শালার গরুর কপালে যা আছেন তাই হবে। একটু দেখে পা ফেলতে পারে না বেইমান গরু!'

চেরাগ বা চুলো যাই হোক আলোটা যত কাছে মনে হচ্ছিল হাঁটতে শুরু করে দেখা গেল তত কাছে নয়। বেশ খানিকটা দূর, যুধিষ্ঠিরের ভাষায় একপো, আমার হিসেবে পাক্কা দু-মাইল।

তবু সব পথেরই শেষ হয় একসময়। পৌঁছে গেলাম। যুধিষ্ঠির ছুটে আগে খবর দিতে গেল কলকাতা থেকে অতিথ এয়েছেন। কিন্তু নবাবের প্রাসাদের দিকে চেয়ে দমে গেলাম আমি। পুরনো হলেও একটা পাকা বাড়ি দেখব আশা করেছিলাম। যে নবাবের দ্বার সর্বদা অগণন অতিথ-ফকিরের জন্যে অবারিত, তাঁর বাড়ির এ কি হাল!

পাকা বাড়ি তো নয়ই, এ অঞ্চলে যেমন মাটির দোতলা হয় তেমনি, কিন্তু তার অবস্থাও শোচনীয়। একটা কেরোসিনের কুপি জ্বলছে আর একটা চিমনি-ভাঙা হ্যারিকেন—আলো বলতে এই, তবু সেই সামান্য আলোতেই ওপরদিকে চেয়ে দেখলাম চালে বিশেষ কিছু আর নেই, খড় পচে গলে পড়ে গেছে, অনেক জায়গায় বাঁশ-বাঁখারির চালাটা পর্যন্ত বেরিয়ে পড়েছে।

নবাব সাহেব বেরিয়ে এসেছিলেন একটা ছেঁড়া লুঙ্গী আর শতছিন্ন গেঞ্জি পরে—এখন ফর্সা জামা-কাপড় পরা মেহ্‌মান আসতে দেখে তাড়াতাড়ি বাঁশের আলনা থেকে একটা পাঞ্জাবি টেনে গায়ে দিলেন। পাঞ্জাবিটা অপেক্ষাকৃত ফরসা, কিন্তু তার পিঠের দিকে যে বড় তালিটা—সেটা বোধ হয় পুরনো ময়লা কাপড় কেটে দেওয়া হয়েছে, তাতে দাঁড়িয়েছে হরগৌরী অবস্থা।

তা হোক, তিনি দাওয়া থেকে নেমে এসে বেশ আভূমিনত হয়ে তসলীম জানিয়ে দু'হাত ধরে নিয়ে গিয়ে দাওয়ায় বসালেন। চাটাই একটা পাতা ছিল, তার ওপর তৈলাক্ত বালিশ, বোধ হয় ওখানেই বৃদ্ধ নবাব সাহেব গড়াচ্ছিলেন। তবে সেখানে আমাকে বসাতে ভরসা হ'ল না, নড়বড়ে কাঠের চেয়ার একখানা ছিল একপাশে, নিজের লুঙ্গি দিয়ে সেটা ঝেড়ে এগিয়ে দিলেন।—'দয়া ক'রে এর ওপরই কোনমতে তশরীফ রাখুন, গরিবের ঘরে খুব তকলিফ হবে আপনার। আপনাদের বাবুভাইদের যোগ্য সমাদর করব খোদা সে অবস্থা রাখেন নি। কি আর করা যাবে, তাঁর মেহেরবানি, যেমন রাখবেন তেমনি থাকতে হবে তো। নবাব বটে, নামে নই আসল নবাব, তবে আজ দশজনকে খেতে দেবারও সামর্থ্য নেই!' বলে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন।

ভাল ক'রে চেয়ে দেখলাম এবার। খুবই বৃদ্ধ হয়ে পড়েছেন, অন্তত তাই দেখাচ্ছে। তবে এককালে যে সুপুরুষ ছিলেন তাতে কোন সন্দেহ নেই। বেশ লম্বা গঠন, হয়তো সেইজন্যেই সামনের দিকে একটু ঝুঁকে পড়েছেন। কাঁধ

দেখে মনে হয় শুধু লম্বা নয়, চওড়াতেও যথেষ্ট বড় ছিলেন। শুভ্র পাকা দাড়ি, চুল মায় ভুরু পর্যন্ত পাকা। কিন্তু ভাবে ভঙ্গীতে কথায় চলনে, নবাবের আদল বুঝতে অসুবিধা হয় না।

প্রশ্ন করলুম, 'আপনারা কোথাকার নবাব ছিলেন ?'

'কোথাকার কি, সুবে বাংলা বিহার উড়িষ্যা, সবই আমাদের ছিল এককালে। আমরা মুর্শিদকুলি খাঁর বংশধর। তাঁর বৈমাত্র ভাই থেকে সিধা নবম পুরুষ আমি।' এই বলে বৃদ্ধ বুক ফুলিয়ে সোজা হলেন একবার।

আমি তৎক্ষণাৎ চেয়ার থেকে নেমে চাটাইয়ের ওপর তাঁর পাশে বসে বললাম, 'আপনি নিচে বসে আছেন, আমি কুরসিতে বসব, এত আস্পদ্দা আমার নেই। গোস্তাকী প্রকাশ পায় এতে।'

জবাব দিতে গিয়ে গলাটা কেঁপে গেল নবাব সাহেবের, আবারও দুটো হাত চেপে ধরে বললেন, 'আপনি বাবুসাহেব বড় ঘরের ছেলে, তাই কথাটা বললেন, মানীর মান রাখতে হ'লে নিজেরও মানী হওয়া দরকার।'

অন্তঃপুরে ফিস্‌ফাস্‌, কিছু চাঞ্চল্য এসে পর্যন্তই শুনছিলাম। একজন কিষাণ একটা বাটি হাতে ক'রে কোথায় দৌড়ল তাও লক্ষ্য করেছি। আমার এই অনভিপ্রেত আগমনই যে এ চাঞ্চল্যের কারণ তা পরিবেশের এই দৈন্য দেখে বুঝতে বাকী ছিল না। সেজন্য লজ্জাও বোধ করছিলাম একটু। কিন্তু উপায়ই বা কি। এঁকে টাকা দেব বলাও ধৃষ্টতা!

কিছু পরে একটা ভাঙা ডিশে দুটো গ্রাম্য রসগোল্লা আর কলাইয়ের কাপে চা এসে পৌঁছল। একটি শ্যামাঙ্গী কিশোরী মেয়ে এসে নীরবে সামনে নামিয়ে রেখে চলে যাচ্ছিল, নবাব সাহেব প্রচণ্ড এক ধমক দিয়ে উঠলেন। নিজেই ছুটে গিয়ে ঘর থেকে একখানা রুমাল এনে পেতে দিলেন চাটাইয়ের ওপর— তার ওপর চা মিষ্টি রেখে অব্যাহতি পেল মেয়েটি। নবাব সাহেব বললেন, 'আমার নাতনী, রৌশন আখতার—বড্ড বুনো হয়ে যাচ্ছে দিন দিন, খানদানী ঘরের আদব কায়দা শেখাতে পারছি না কিছুতে। আর শিখবেই বা কোথা থেকে, কোথাও তো তেমন ঘরে যাওয়া আসা নেই।...নিন, একটু গোসল ক'রে নিন দয়া ক'রে।'

চেয়ে দেখি তত্‌ক্ষণে সেই কিষাণটি এক গাড়ু জল আর একখানা ছেঁড়া (তবে ফরসা) তোয়ালে এনে দাঁড়িয়েছে।...

নবাব সাহেব হাঁকডাক করে লোক পাঠিয়ে একজন মিস্ত্রীও আনালেন। সে সব শুনে কথা দিল—খুব ভোরে গিয়ে সে চাকা মেরামত করে দেবে, আমাদের কোন চিন্তা নেই। নবাব সাহেব যখন হুকুম করেছেন তখন আমরা যেন ধরেই নিই, কাজ শুরু হয়ে গেছে।...

রাত্রে আহারের ব্যবস্থাও হয়ে গেল। ওঁরা খুঁৎ খুঁৎ করতে লাগলেন, কিন্তু আমার কোন অসুবিধা লাগে নি। মুগের দাল, পিঁয়াজের ডালনা, শাক ভাজা, একটু অম্বল। যুধিষ্ঠির খাওয়া সেরে তার বলদ আগলাতে ফিরে গেল। একটু তেল আর পিদীম চেয়ে নিয়ে গেল এবার। যদিও মাঠের মধ্যে বাতাসে কেমন ক'রে পিদীম জ্বালাবে ভেবে পেলাম না।

রাত্রে সেই অদ্বিতীয় চাটাইয়ের ওপরই শোবার ব্যবস্থা। বোধ হয় পাতার মতো তেমন ফর্সা চাদর কি জাজিম নেই, রৌশন একখানা দামী শাল পেতে দিয়ে গেল। পুরনো শাল, কিন্তু তখনও কলকাতার বাজারে নিয়ে গেলে মোটা দাম মিলত।

আমি কোন প্রতিবাদ করলুম না, অনর্থক জেনে। সেই বালিশটির ওপরে একখানা তোয়ালে পেতে দিয়ে গিয়েছিল রৌশন, সে চলে যেতে আমি সন্তর্পণে শালটা সরিয়ে দুর্গা বলে চাটাইতেই শুয়ে পড়লাম। গায়ে গেঞ্জি আছে, তেল ময়লা ধুলো নিয়ে মাথা ঘামাবার প্রয়োজন নেই।

•

ভোরে আবার সেই রসগোল্লা আর চা।

সম্ভবত গত রাত্রে সেই কাঁসার বাটিটি কোথাও বাঁধা দিয়েই এ সব ব্যবস্থা করতে হয়েছে। অবস্থা ভেবে রসগোল্লা যেন গলায় আটকাচ্ছিল, কিন্তু উপায় কি। এদের এই নিয়ম।

বিদায় দিতে বৃদ্ধ বেশ কিছুদূর পর্যন্ত সঙ্গে এলেন। সঙ্গে রৌশন। নবাব বাহাদুর বললেন, 'বাবুজী, কিছু মনে করবেন না, মেহ্‌মানকে গাড়ি পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে আসাই দস্তুর, কিন্তু এদান্তে হাঁটুর ব্যথা বড্ড বেড়েছে, উঁচু-নিচু জমিন কি আলের ওপর দিয়ে হাঁটতে পারি নে। আমার নাতনী সঙ্গে যাচ্ছে, ও-ই তুলে

দিয়ে আসবে।'

আমি হাঁ-হাঁ ক'রে উঠি, 'না না, কোন দরকার নেই। ঐ তো দূরে গাছটা দেখা যাচ্ছে, সিধে পথ বেশ চলে যেতে পারব। ও ছেলেমানুষ—'

'না মেহেরবান, দরকার আমাদের। আমাদের নিয়ম মানতেই হবে, অন্তত যত দিন আমি আছি। আর দেরি নেই, বংশ শেষ হয়ে গেল, তিন মাসের মধ্যে দুই বেটা, এক ভাতিজাকে টেনে নিলেন আল্লা, বংশ বলতে এই নাতনী। বাড়িতে লোক যা দেখলেন কতকগুলো বিধবা শুধু আর নৌকর। চাষ আবাদের কাজ পর্যন্ত এই মেয়েটাকেই দেখতে হয়।…যাক আপনার সঙ্গে, আপনি বাধা দেবেন না, তাতে ওরও দুঃখ হবে। আর রাস্তা যত সিধে দেখছেন তত সিধে নয়। এ সব মাঠে দিক ঠিক পাওয়া শক্ত।'

তিনি আবারও যতটা সম্ভব নত হয়ে তসলিমাৎ জানিয়ে বিদায় নিলেন, ঝুঁকে পড়ে নিজের হাঁটু দুটো দু'হাতে ধরে খোঁড়াতে খোঁড়াতে ফিরে গেলেন। রৌশন আমাদের আগে আগে যাচ্ছিল নীরবে, সে দাঁড়ালও না ফিরেও চাইল না, তেমনি চলতে লাগল।

আমি এতক্ষণ সাহস সঞ্চয় করছিলাম, এবার একটু দ্রুত এগিয়ে মেয়েটার কাছে এসে বললাম, 'আমার একটা কথা রাখবে রৌশান?'

'বলুন।' সংক্ষেপে উত্তর দিল নবাবজাদী।

দাঁড়াল না, তবে গতিটা কমিয়ে দিল একটু।

'তো-তোমাকে মানে মিষ্টি খাবার জন্যে যদি পাঁচটা টাকা দিই, আমার গোস্তাকী ভাববে না তো?'

'ভাবব বৈকি!' বেশ প্রশান্ত কণ্ঠেই উত্তর দিল তারপর কেমন এক রকম সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে, মনে হ'ল যে দাঁড়াবার ভঙ্গীতে অনেকটা উঁচু হয়ে গেল—বললে, 'আমাদের দেবার কথা শুধু সাহেব, নেবার কথা নয়। আমাদের বংশে কারও কাছ থেকে হাত পেতে কিছু নিতে নেই। তাতে বাপ-দাদার ইজ্জৎ নষ্ট হয়। গুনাহ্ হয় আমাদের।'

আমি অপরাধীর ভঙ্গীতে মাথা নীচু করে বলি, 'তা এটাকে কেন নজরানা বলে ভাবো না।'

'নজরানা তো আমার নেবার কথা নয় হুজুর, নজরানা দিতে হ'লে নবাব

সাহেবকে দিতে হবে। আর কারও নেবার অধিকার নেই।'

'তা এখানে তো তিনি নেই, তাঁর হয়ে—'

'না, তা হবার জো নেই। তাঁকেই দিতে হবে। আমরা কেউ তাঁর হয়ে নিতে পারব না।'

হাতের পাশা আর মুখের ভাষা, একবার পড়ে গেলে আর ফেরানো যায় না। অগত্যা বলতে হল, 'তাহলে চল যাই, তাঁকেই দিয়ে আসি।'

তাতেও কোন বাধা দিল না মেয়েটি, আপত্তি জানাল না। নিঃশব্দেই ফিরে দাঁড়িয়ে আবার বাড়ির পথ ধরল।

যেতে যেতে প্রশ্ন করলাম, 'তা তোমার বিয়ের কথা হচ্ছে না! এত বয়সে তো তোমাদের বিয়ে হয়ে যাবার কথা।'

'আমার শাদী হওয়া শক্ত বাবুজী, যে ঘরে আমাদের শাদী হতে পারে, তেমনি ঘরে কাছাকাছি কোন ভাল ছেলে নেই। বেশির ভাগই লেখাপড়া শেখে নি, অল্প বয়সে তাড়ি গাঁজা খেতে শিখেছে। নানা বলে, তাদের হাতে দেবার আগে নিজের হাতে ওকে কেটে ফেলব। আর নবাব বাদশাদের ঘরে আইবুড়ো থাকায় কোন নিন্দে নেই। বাদশাজাদীদেরও তো অনেকের বিয়ে হয় নি, কেতাবে পড়েছি।'

'তুমি বই-টই পড় ?'

'যা পাই দু-চারখানা', এবার যেন একটু নরম স্বাভাবিক হয়ে এলো মেয়েটা, বললে, 'আমার বাপজানের খুব শখ ছিল, অনেক বই যোগাড় ক'রে এনেছিলেন, সেইগুলোই নাড়াচাড়া করি, এ গাঁয়ে আর বই পাব কোথায় ?'

ততক্ষণে আমরা আবার 'প্রাসাদে' পৌঁছে গেছি।

মেয়েটা বাড়ির ভেতরে ঢোকার আগে চুপিচুপি বলে দিল, 'টাকা মানে নজরানা যা দেবার একটা রুমালে রেখে নানার সামনে ধরবেন, হাতে হাতে দেবার দস্তুর নেই।'

তারপর ভেতরে ঢুকে বলল, 'বড়মিয়াজান, এ হুজুর আপনার নজরানা দিতে ভুলে গিয়েছিলেন, তাই আবার ফিরে এলেন—'

'আরে, আরে, আবার এ তকলীফ ওঠাতে গেলেন কেন ?' বলতে বলতে সাগ্রহেই দাওয়া থেকে নেমে এলেন। আমিও আমার ধূলিমলিন রুমালখানা

খুলে সেই পাঁচ টাকার নোটখানি রেখে দু'হাতে মেলে ধরলাম। এর বেশি দেবার সাধ্য ছিল না, এতেই যথেষ্ট কষ্ট হবে ফিরতে, বহু কষ্টের উপার্জন। তবু এটা সদ্ব্যয়ে যাচ্ছে—এই যা সান্ত্বনা।

বৃদ্ধ দু'হাত তুলে যেন দোয়া মাগার ভঙ্গী করলেন একটা, তারপর নোট-খানি তুলে নিয়ে একটু সস্নেহ মৃদু তিরস্কারই করলেন, 'আপনি ছেলেমানুষ বাবুজী, কিছুই জানেন না, তাই দোষ নিলাম না। তবে শিখে রাখুন, নজরানা দিতে হয় আগেই, শেষে দেয় বকশিশ।'

তারপর হঠাৎই কেঁদে ফেললেন একেবারে, 'কিন্তু বাবুসাহেব, কি লজ্জায় যে ফেললেন। আমারও কিছু খেলাৎ দেওয়ার কথা, কিন্তু বাড়িতে এক টুকরো নতুন কাপড় কি একটা আস্ত রুমাল পর্যন্ত নেই। এই যা দিলেন, দু'মন চাল হবে, এক মাস খেয়ে বাঁচবে বেওয়াগুলো।'

রৌশন আমার জামার হাতায় মৃদু টান দিয়ে বলল, 'চলুন বাবুজী, দেরি হয়ে যাচ্ছে।'

সত্যোপলব্ধি

আমাদের লোকনাথবাবু এক পুরুষেই পয়সা করেছেন। প্রথম যখন চেয়ে চিন্তে ধার ক'রে এই ছোট্ট কারখানাটি করেন তখন কেউ ভাবে নি যে এটা কোন-দিন দাঁড়াবে। কিন্তু লোকনাথবাবু অক্লান্ত পরিশ্রম করে শুধু যে কারখানাটা দাঁড় করালেন তাই নয়, ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে চার গুণ করে ফেললেন বছর কুড়ির মধ্যে।

আমার সঙ্গে অনেক দিনের আলাপ। উনি যখন দিন-রাত পরিশ্রম করছেন, তখন আমিও ঘুরছি এটা-ওটা ব্যবসার ধান্দায়। এখন আমি সে সব মতলব ছেড়ে একটা ইস্কুল করে থিতু হয়েছি—ওঁরও শ্রীবৃদ্ধি হবার ফলে মনে প্রশান্তি এসেছে। তাই এখনও মধ্যে মধ্যে—ছুটিছাটা পেলে ওঁর ওখানে যাই আড্ডা দিতে, এখন নিজস্ব বসবার ঘর হয়েছে, তার মেঝেয় কার্পেট পাতা, কলিং বেল বাজিয়ে চ-খাবার ফরমাশ করেন—এবং ঘোরানো চেয়ারে এদিক ওদিক ঘুরতে ঘুরতে নানাবিধ বাণী দেন।

একটা কথা উনি প্রায়ই বলতেন, 'না মশাই, যতই বলুন—নিজে যেমনই হই—বে করার সময় লেখাপড়া জানা মেয়ে নেওয়া দরকার। আমি যা বে করেছি—অবিশ্যি তখন আমার ভাত রাঁধার লোকেরই দরকার ছিল—লেখা জানে না, পড়া জানে না, বিজনেসের কিছু বোঝে না, কারও সঙ্গে দুটো সমানে সমানে কথা বলতে পারে না, জানে শুধু প্যান প্যান ক'রে কাঁদতে। ছোঃ!—আমার স্ত্রী যদি একটু লেখাপড়া-জানা স্মার্ট মেয়ে হ'ত, তাহলে আমায় পায় কে আজ।'

লোকনাথবাবুর অনেক সাফল্যের মধ্যে এই একটি অভাববোধও আর রইল না। ভগবান যেন স্থানে থেকে কানে শুনলেন ওঁর খেদোক্তিতাটা।

অবিশ্যি সবটা আমার দেখা ঘটনা নয়—বেশির ভাগই শোনা—তবে অনেকে এই রকমই বলেছে, তাতে ধরে নিতে পারি এর অনেকখানিই সত্যি।

নিজেই এসেছিল মেয়েটি। হঠাৎই একদিন দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকে পড়েছিল। সুশ্রী তরুণী, চলাফেরা কথাবার্তায় সত্যিই স্মার্ট। হাতে দু'গাছি মাত্র চুড়ি, সাধারণ একটা তাঁতের শাড়ি পরনে—তবু যখন সে কাউকে কিছু না বলে সটান (বোধ হয় আন্দাজেই) বড়সাহেবের ঘরের দরজা ঠেলে ভিতরে ঢুকল—তখন কেউ বাধা দিতে, এমন কি 'কী দরকার' জিজ্ঞাসা করতেও সাহস করল না।

কাজ চায় অসীমা, বি. এ. পাস, মা বাপ নেই। কখনও দাদা, কখনও দিদির বাড়ি থাকে, বিয়ে হবার কোন সম্ভাবনা নেই। কারণ তার নিজস্ব কিছু টাকা নেই কোথাও, সুতরাং নিজের একটা জীবিকা নিজেকেই ক'রে নিতে হবে।

অল্প দু-চার কথায় খুব স্পষ্ট ভাষায় নিজের কথা বলে একটা চিঠির কাগজের প্যাড টেনে নিয়ে খস খস ক'রে একটা চাকরির দরখাস্ত লিখল—বলল, 'এটা লিখলুম হাতের লেখা দেখাব বলে। বাংলাও ভাল লিখি। চিঠি-পত্র সব লিখতে পারব—যাকে করেসপনডেন্স বলে—। টাইপ এককালে শিখে-ছিলুম, অনেক দিন অভ্যাস নেই, তবে আবার দু-চার দিন প্র্যাকটিস করলেই স্পীড এসে যাবে।'

লোকনাথবাবু তো অভিভূত। তখনই সেই মুহূর্তে চাকরিতে বহাল

করলেন অসীমাকে। মাইনে স্থির করলেন একেবারেই আড়াইশো টাকা, নিজের ঘরের এক কোণেই একটা চেয়ার আর ছোট ডেস্ক দেবার ব্যবস্থা করলেন। অসীমা অতঃপর সেক্রেটারীরূপে অধিষ্ঠিত হ'ল। বলা বাহুল্য এ ফার্মে সেক্রেটারী রাখার কল্পনা আগের দিনও লোকনাথবাবু করতে পারেন নি।

বেশ কিছুদিন, মানে মাস দুই কাজ করার পর—তার উপস্থিতিতে অভ্যস্ত হয়ে গেছেন লোকনাথবাবু, একটু নেশাও লেগেছে—হঠাৎ পুরো দুটো দিন অসীমা এলো না।

দুশ্চিন্তায় প্রায় পাগল হতে বসেছেন লোকনাথবাবু, অকস্মাৎই, একেবারে উল্কার মতো এসে আবির্ভূত হ'ল আবার। কিন্তু তার অবস্থাও কতকটা লোকনাথবাবুর মতোই, যেন ঝড়ে-পড়ে-যাওয়া ফুলগাছ একটি (লোকনাথবাবুর অন্তত তাই মনে হ'ল—উপমাটা মনে মনে নিজেই তারিফ করলেন খুব)।

'এসো এসো, কী ব্যাপার? অসুখ করেছিল বুঝি? এ কী অবস্থা—খাও নি বুঝি কাল, ওরে এই জনার্দন, যা যা, তাড়াতাড়ি গোটা চারেক সিঙাড়া আর দুটো রাজভোগ নিয়ে আয়—'

উদ্বেগে ও উত্তেজনায় লোকনাথবাবু চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন একেবারে, অসীমা যে তাঁরই কর্মচারী তাও মনে রইল না।

আর বাস্তবিক, ব্যস্ত তো হতেই পারেন। চুল রুক্ষ, অবিন্যস্ত—চক্ষু কোটরগত, সেদিন যে শাড়ি পরা ছিল আজও তা ছাড়া হয় নি, আধ-ময়লা নয়—ময়লাই হয়ে উঠেছে বেশ।

শ্রান্ত অবসন্ন অসীমা বসে পড়ে যা বলল তার নির্গলিতার্থ এই, দাদার কাছে থাকা তার অসম্ভব হয়ে উঠেছিল, কারণ সে যে স্বাধীনভাবে ভদ্র জীবন যাপন করে, সেটা বৌদির পছন্দ নয়। তিনি চেয়েছিলেন ওকে ভাড়া খাটাতে। আত্মরক্ষার জন্যেই প্রায় এক কাপড়ে বেরিয়ে দিদির বাড়ি এসে উঠেছিল। কিন্তু গোড়ায় অত বোঝে নি—এখন দেখছে, ডাঙায় বাঘ জলে কুমীর। জামাইবাবুর আপিসের মালিক দুপুর বেলা ক'রে দিদির কাছে আসেন।

দিদি জামাইবাবুর এ হীন প্রবৃত্তি আর ওর সহ্য হচ্ছে না। সে তাই দুদিন এখানে না এসে পাগলের মতো একটা ঘর খুঁজে বেড়াচ্ছে। কিন্তু মুশকিল

হয়েছে এই—একা যুবতী মেয়েছেলে, কোন বাড়িওলাই ঘর দিতে চাইছেন না। হাতে পায়ে ধরে, বেশি ভাড়া কবুল ক'রেও কাউকে রাজী করাতে পারে নি সে। লোকনাথবাবু কি একটু সাহায্য করতে পারেন না এ ব্যাপারে? নইলে আর কোথাও ঠাঁই না পেলে সে মা গঙ্গার জঠরে ঠাঁই নেবে, তবু ঐ বাড়িতে ঐ জামাইবাবুর সংসর্গে সে আর থাকবে না।

তাকে চা-জলখাবার খাইয়ে লোকনাথবাবু তাঁর অস্টিন গাড়ি বার ক'রে অসীমাকে নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন ঘরের সন্ধানে। অসীমা যে সব ঘর দেখেছিল তার একটাও লোকনাথবাবুর পছন্দ হল না। শেষে ওঁর এক মক্কেলের এক ফ্ল্যাটবাড়ির কোণের একটি এক-কামরা ফ্ল্যাট ঠিক করলেন, ভাড়াও ওঁর জন্যেই নামমাত্র নিতে রাজী হলেন তাঁরা—মাসে সওয়া শো।

অসীমা ব্যাকুল হয়ে বলল, 'কিন্তু এত ভাড়া আমি দেব কোথা থেকে—মাসে একশো পঁচিশ টাকা বেরিয়ে গেলে আমার খাওয়া পরা চলবে কি ক'রে?'

লোকনাথবাবু সস্নেহে হেসে ওর হাতের পিছনে মৃদু একটি চাপড় মেরে বললেন, 'সে হবে হবে, তুমি ব্যস্ত হচ্ছ কেন। আমি যখন এ ভাড়ায় রাজী হয়েছি তখন কি আর কথাটা ভেবে দেখি নি।'

তখনই পকেট থেকে আগাম এক মাসের ভাড়া ও ডিপজিট—মোট আড়াই শো টাকা বার করে দিয়ে বললেন, 'আমি আজ থেকেই পজেশান নিলাম—।'

এবার অসীমার মালপত্র আনার কথা। কিন্তু সে প্রস্তাবের উত্তরে অসীমা যা বলল, তার জন্য লোকনাথবাবুও প্রস্তুত ছিলেন না। সে বলল, 'মালপত্র আর কি আনব। কিছুই তো আমার নয়—বিছানাটি ছাড়া সবই তো দিদির। দুটো কাপড় জামা শুধু—তার জন্যে আমি ও নরককুণ্ডে আর যেতে রাজী নই। আপনি যান, আমি একটা শাড়ি আর একখানা গামছা একটু সাবানটাবান কিনে আনি। আর কিছু লাগবে না, আমি মেঝেতেই বেশ শুতে পারব—'

অসীমা যত সহজে বলল, লোকনাথবাবু কিন্তু তত সহজে একটা অল্প-বয়সী মেয়েকে অমন ভাসিয়ে দিতে পারেন না। অগত্যা তখনই বাজার দোকান কাঠের গোলা প্রভৃতি ঘুরে, একটা চৌকী, একপ্রস্থ বিছানা, একটা চেয়ার, ছোট টেবিল, আলনা, কাপড় জামা, প্রসাধন দ্রব্য, রান্নার সরঞ্জাম—

হাঁড়ি বাসন উনুন চাল ডাল তেল মশলা কিনে মোটামুটি ঘর সাজিয়ে দিলেন।

অতঃপর অসীমা যে সুখে ও শান্তিতে সুপ্রতিষ্ঠিত হ'ল, তা বলাই বাহুল্য। মাইনে ছ' মাসেই বাড়ানো যায় না, তাহলে অন্য কর্মচারীরা ঝাঁ-ঝাঁ করে উঠবে, সকলেই বেশি মাইনের ধুয়ো তুলবে—সুতরাং লোকনাথবাবু নিজের পকেট থেকেই সম্পূর্ণ খরচা টানতে লাগলেন। আর, একটা অল্পবয়সী মেয়ে একা থাকে—অভিভাবকহীন অবস্থায়—একটু দেখাশুনো করা দরকার বৈ কি, সে কাজটাও লোকনাথবাবুকে করতে হয়। আসা-যাওয়াটা সময় থেকে অসময়ে পৌঁছবে এও স্বাভাবিক, বিশেষ আপিসের পর সন্ধ্যায় যে খবর নিতে আসেন তার অবস্থানকাল দীর্ঘতর হতে থাকে ক্রমশ, সেটা উনি লক্ষ্য না করলেও অপরে করে। অসীমা তো করেই।

সুতরাং এই ব্যাপার নিয়ে 'নিন্দুকে'র রসনা কর্মব্যস্ত হয়ে উঠবে—এতেও বিস্মিত হবার কিছু নেই। নানা জনে নানা কথা বলে, কর্মচারীরা তো বলবেই। তাদের বলার আরও সুবিধা, ইদানীং অসীমার আপিসে আসার কোন নির্দিষ্ট সময় থাকে না, প্রতিদিন নিয়মিত আসেও না। অথচ তার মাইনে কাটা হয় না এক পয়সাও।

এসব কানাঘুষো লোকনাথবাবুর কানেও যে না পৌঁছেছিল তা নয়। অথচ এই নিভৃত সাহচর্যটা তাঁকে নেশার মতো পেয়ে বসেছে, যাওয়া আসা বন্ধ করতেও পারেন না। কিন্তু শেষ পর্যন্ত একই দিনে ছুদিক থেকে ছুটি আঘাত এল—ছুরকমের। সকালে লেখাপড়া-না-জানা প্রথমা স্ত্রী প্রমীলা খুব আস্তে বললেন, 'ছাখো, ব্যাপারটা বড় দৃষ্টিকটু হয়ে উঠেছে, আমি আর কান পাততে পারছি না।'

লোকনাথবাবু বিবর্ণ মুখে শুকনো ঠোঁটে জিভ্ বুলিয়ে নিয়ে বললেন, 'আমি—মানে—তুমি কি বলছ ঠিক—'

সে কথার কোন উত্তর না দিয়ে—যেন এই গ্যাকামিকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা ক'রেই প্রমীলা তেমনি শান্ত কণ্ঠে বলে চললেন, 'ছেলেমেয়েরা বড় হচ্ছে—তাদের কানেও এসব কথা উঠছে তো, বড় ছোট হয়ে যাচ্ছ তুমি সকলের কাছে। তার চেয়ে ওকে বিয়ে ক'রে ফ্যালো—কেউ কিছু বলতে পারবে না।'

'কিন্তু এখন তো—ছুটো বিয়ে, মানে—' তুতিয়ে তুতিয়ে বললেন লোকনাথবাবু।

প্রমীলা বললেন, 'হিন্দুমতে পুরুত ডেকে বিয়ে করো—তাহলে আর আইনের প্রশ্ন উঠবে না। আর মামলা করবে কে, আমি তো—? আমি তোমাকে কথা দিচ্ছি, এই পা ছুঁয়ে বলছি আমি এ নিয়ে কোন বাধা দেব না, কি কোন অশান্তি করব না।

লোকনাথ সেদিন আর তখনই কারখানায় গেলেন না, বাড়ি থেকে বেরিয়ে অসীমার ফ্ল্যাটেই গেলেন আগে। দোরে বেল টিপতে অসীমাই দরজা খুলে দিল কিন্তু তার অবস্থা দেখে একেবারে চমকে উঠলেন লোকনাথবাবু। বেশভূষা আলুথালু, চোখে মুখে কান্নার চিহ্ন, বোধহয় মেঝেতে মাথাও কুটেছে, কেন না কপালের ঠিক মাঝখানে খানিকটা জায়গায় ধুলো লেগে।

'এ কী ব্যাপার! য়্যাঁ—?' লোকনাথবাবু নিরতিশয় উদ্বিগ্ন হয়ে প্রশ্ন করলেন।

'আমি নাকি খারাপ মেয়ে। আমার সঙ্গে আপনার সম্পর্কটা নাকি নোংরা। এ কথা শুনতে শুনতে তো আমার ছুই কান পচে গেছে—আপনার কারখানায় কোন লোক বাদ নেই আমাকে ঐ ধরনের কুকথা শোনাতে। আজ বাড়িউলী বলে গেলেন, আমি যদি আটচল্লিশ ঘন্টার মধ্যে ফ্ল্যাট না ছাড়ি—তিনি পুলিসে জানাবেন যে আমি এখানে বসে বেআইনী নোংরা ব্যাপার চালাচ্ছি।'

বলেই আবার আছড়ে পড়ল সে।

এর পর আর বিয়ে না করার কোন উপায় রইল না। অবশ্য কারণও ছিল না, ইচ্ছা তো ছিলই। প্রমীলাই তো সুবিধা ক'রে দিয়েছে।

পুরোহিতও একজন প্রমীলাই ঠিক ক'রে দিল, যোগাড়যন্ত্রের লোকেরও অভাব হ'ল না। ছুজন পুরনো কর্মচারী স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে এসে সে ভার নিল, তাদের মেয়েরা এসে এয়োর কাজ সারল।

এর পরে ছুটো সংসার পুরোপুরি ঘাড়ে এসে পড়ল লোকনাথবাবুর। অবশ্য অসীমার খরচ তো টানতে হচ্ছিলই কিন্তু স্ত্রী হবার পর সে স্ত্রীর পূর্ণ মর্যাদা দাবী করবে এ তো জানা কথাই। খাট আলমারী কার্পেট ড্রেসিং টেবিল, তার সঙ্গে রাত-দিনের একটি ঝিও। ফলে লোকনাথবাবুকে নিজের শখ-সৌখীনতা

অনেক কমাতে হয়। কারখানার নতুন বাড়ির কাজও ঢিলে পড়ে—কারণ ওঁর যা কারখানা তাতে এত টাকা হয় না। ব্যাঙ্ক থেকে টাকা ধার করবেন—যতটা টাকা ওঁর দরকার—ব্যাঙ্ক ততটা দিতে রাজী হয় না, ওঁর নাকি য়্যাসেট সে পরিমাণ নেই।

শুধু তাই নয়—কোথায় কতক্ষণ কাটাচ্ছেন, মান-অভিমান জবাবদিহি—আজকাল প্রায় নিত্যকারের অশান্তি হয়ে উঠেছে। প্রমীলা তত নয়—যত অসীমা। প্রমীলা গোড়ার দিকে একবার বলেছিল শুধু, 'ওখানে কি রাতটা রোজ না কাটালেই নয়? ছেলেমেয়েরা বড় হচ্ছে, ওরা জিজ্ঞেস করে বাবা কোথায় গিছলেন মা কাল?—আমি কোন জবাব দিতে পারি না।'

আবার এদিকে—অসীমা অত ধৈর্যের সঙ্গে মিষ্টি ক'রে বলার মেয়ে নয়। সে রণরঙ্গিনী মূর্তি ধরেই আছে। বলে, 'কেন, কিসের জন্যে আমি দাসী-বাঁদীর মতো একা পড়ে থাকব। আমাকে সঙ্গে নিয়ে আত্মীয়-স্বজনের বাড়ি যেতে হবে, বন্ধু-বান্ধবদের নেমন্তন্নে সঙ্গে নিতে হবে—এই সাফ বলে দিলুম। নইলে তুলকালাম কাণ্ড করব।'

লোকনাথবাবু দুঃখের কথা জানাতে গিয়ে দস্তুরমতো ঘেমে ওঠেন—পাখার নিচে বসেও। বলেন, 'ওঃ, দুটো বিয়ে করার কি ঝকমারি। না মিত্তির-বাবু, আপনাকে সাবধান করছি, আমাকে দেখে শিখুন। কোনদিন এ পথে পা বাড়াবেন না। পয়সা যতই হোক, শ্যাল-কুকুরের বে দিয়ে খরচ করবেন সেও ভাল—নিজে কখনও দুটো সংসার ফাঁদতে যাবেন না।'

রাখীকে আনল প্রমীলাই। বলল, 'তোমার খুব শখ আপিসে মেয়েছেলে রাখার—এই মেয়েটিকে রাখবে? এ আমার দূর সম্পর্কের বোন, মানে বাবার মামাতো ভাইয়ের ভাগ্নী। এরা নাগপুরে থাকত, মা মারা গেছেন, বাবার পক্ষাঘাত হয়েছে, একটা ছেলেমানুষ ভাই, সে পুরো সংসার টানতে পারছে না। আর তেমন কেউ নেই, কোথায় যাবে—তোমার নাম শুনে এখানে এসেছে, যদি কিছু হিল্লে হয়।'

মেয়েটিকে দেখলেন লোকনাথবাবু, সুন্দরী নয়—তবে শ্রীময়ী। এমন চমৎকার একটি লাবণ্য আছে—যাতে ওর দিকে চোখ পড়ে আর রূপের কথা

মনেই আসে না। চোখ জুড়িয়ে গেল ঠিকই, এ মেয়ে কাছে থাকলে মনটা খুশী থাকবে তাতেও সন্দেহ নেই। তবু, একবার অসীমার কথাটা মনে পড়ে শিউরেও ওঠেন। নিচু গলায় বলেন, 'আবার! একবারে তোমার শিক্ষা হ'ল না? আবার যদি এই ফাঁদে জড়িয়ে পড়ি।'

প্রমীলা বলে, 'কেন, একবারে শিক্ষা হয় নি? ন্যাড়া বেলতলায় ক'বার যায়? তোমার কাছে আর এ ভয় নেই বলেই ওকে দিতে চাইছি। টিকে নিলে আর কলেরা বসন্ত হয় না—আমি তো ভেবেছি অসীমাকে দিয়েই তোমার টিকের কাজ হয়ে গেছে।'

'তা ও কতদূর লেখাপড়া করেছে?' লোকনাথ প্রশ্ন করেন।

'সে এমন কিছু নয়। ওখানের ইস্কুলের পড়া শেষ করেছে—কলেজে পড়া হয়ে ওঠে নি, তার আগেই নাকি ওর বাবার পক্ষাঘাত হয়েছিল। ওখানে—মানে ওরা থাকে শহরের বাইরে একটু গাঁয়ের দিকে, টাইপ করাটরাও কিছু শিখতে পারে নি। ও বলে ও কারখানায় কাজ শিখবে।'

'ঐ রাজ্যের পুরুষ-মিস্ত্রীর সঙ্গে? সে কি ভাল হবে?'

'সে কথা তো বলছি। রাখী বলে তোমার কোন ভাবনা নেই, আমি নিজেকে ঠিক বাঁচাতে পারব। তোমাদের কোন হাঙ্গামা হবে না, দেখে নিও।...'

লোকনাথবাবু রাজী হয়ে গেলেন—পরের দিন কারখানায় নিয়ে গিয়ে হেডমিস্তিরী—উনি বলেন ফোরম্যান—পরাশর সাধুর্খাঁর জিম্মা ক'রে দিয়ে বললেন, 'এ আমার আত্মীয়, ওর খুব ইচ্ছে কারখানায় কাজ শেখে।...তুমি ছাড়া কেউ পারবে না, একটু যত্ন ক'রে শিখিও, আর—কাঁচা বয়েস বুঝতেই পারছ—একটু নজরও রেখো।'

এই আত্মীয় বলাটাই ভুল হ'ল বোধ হয়। কারখানার সাতাশ আটাশ জন শ্রমিক বা মজতুর—সঙ্গে সঙ্গে বিদ্বিষ্ট হয়ে উঠল। সকলেরই এক কথা, 'বাবু আমাদের বিশ্বাস করেন না—গোয়েন্দা বসিয়েছেন নজর রাখার জন্যে।' এমন মেয়ে এই মিস্ত্রীর কাজ শিখতে আসবে কেউই বিশ্বাস করল না।

শেষে এমন অবস্থা দাঁড়াল যে, কারখানায় আর রাখা গেল না। অথচ এই মিষ্টি মেয়েটিকে তাড়িয়ে দিতেও কষ্ট বোধ হ'ল তাঁর। তিনি অসীমার

চেয়ার টেবিল ওকে দিয়ে নিজের ঘরেই বসালেন।

বাংলা হাতের লেখা খারাপ, ইংরেজীটা চলনসই—দু-একটা চিঠিপত্র নকল করা ছাড়া কোন কাজ নেই। তবু বসেই থাকে সে। লোকনাথবাবু প্রমীলার কাছে উচ্চাঙ্গের হাস্য করেন, 'হয়েছে ভাল। এও এক রকম ফার্নিচার আর কি, আপিস সাজানো। বলি সেক্রেটারী—কিন্তু কেউ যদি সত্যি সত্যিই তাই মনে ক'রে কথা কইতে যায়, তা হলেই ব্যাভ্রমের শেষ থাকবে না।'

কথাটা অসীমার কানেও উঠল। তুলল কারখানার লোকরাই গিয়ে। বৌদিদি সম্বন্ধে যথেষ্ট আত্মীয়তা প্রকাশ ক'রে, তাঁর স্বাস্থ্যের জন্য উৎকণ্ঠা দেখিয়ে—শেষে এই খবরটি দিল।

অসীমা একেবারে দপ ক'রে জ্বলে উঠল। রাগারাগি ঝগড়াঝাঁটি, মাথা খোঁড়াখুঁড়ি—যত রকম 'সীন' করার কথা জানা আছে কোনটাই বাদ গেল না।

শেষে বলল, 'ওকে আজই তাড়াও—যদি ভাল চাও তো।'

লোকনাথবাবু অনেকদিন ধরেই উত্যক্ত হয়ে উঠেছিলেন, শিক্ষিতা স্মার্ট মেয়েতে তাঁর অরুচি হয়ে গেছে বহুদিনই, প্রমীলা তবু সেবাযত্নের ত্রুটি করে না —এ তো একেবারেই রাঙা মুলো। বিশেষ এর এই কলহতিক্ত মুখের পাশে রাখীর মিষ্টি মুখখানা কল্পনা ক'রে তিনি মন স্থির ক'রে ফেললেন। মুখ গোঁজ ক'রে বললেন, 'আমার আপিসে কাকে রাখব না রাখব সে আমি বুঝব— তোমার কথা শুনে আমি ব্যবসা চালাব না।'

অসীমা বললে, 'ছাখো ভাল হবে না বলে দিলুম।'

'খারাপটাই হোক দেখি। ভাল তো অনেক দেখলুম।' লোকনাথবাবু বেরিয়ে এলেন।

প্রথম মনে হয়েছিল অসীমা বোধ হয় আত্মহত্যাই করবে। কিন্তু সে ধার দিয়েই সে গেল না। যা করল তা হচ্ছে পরের দিন সকালে মাথায় ঘোমটা টেনে গিয়ে কারখানার দোরের কাছাকাছি একটা গলির মোড়ে দাঁড়িয়ে রইল। একটু পরেই বাবুর সঙ্গে বাবুর গাড়িতেই এসে নামল রাখী।

অসীমা ভাল ক'রে দেখে নিয়ে নিঃসন্দেহ হল—তারপর বীর দর্পে কর্তার আপিসের ঠেলা-দোর ঠেলে ভেতরে ঢুকে বলল, 'অ, ইনিই বুঝি তোমার নতুন

সেক্রেটারী, তোমার প্রথম পক্ষের আত্মীয়া ? তা বেশ, তবে এও শুনে রাখো, এই ঠাকরুনটিকে বইখাতা হাতে নিয়ে কলেজ-গার্ল এই ঠাটে খদ্দের ধরবার জন্যে লিণ্ডসে স্ট্রীট অঞ্চলে রাত্রে ঘুরে বেড়াতে দেখেছি। হয় না হয় ওকেই জিজ্ঞাসা করো—আমার সামনে না বলুক, সাধ্যি থাকে তো।'

'শাট আপ!' লোকনাথবাবু গর্জন করে উঠলেন, 'তোমাকে এখানে আসতে কে বলেছে! এটা আমার আপিস, হিংসের কাদা ছিটিয়ে ডার্টি ঝগড়া করার জায়গা এটা নয়। তুমি বেরিয়ে যাও এখুনি বলছি, নইলে আমি চূড়ান্ত অপমান করতে বাধ্য হবো।'

'করো না—ক্ষমতা থাকে তো। দেখি কার ঘাড়ে কটা মাথা আছে আমার গায়ে হাত দেয়।' সদম্ভে উত্তর দেয় অসীমা, গলাটা আর এক পর্দা চড়িয়ে, 'বলি কী গো—ঠাকরুন, বলো না, তোমাকে ঠিক চিনেছি কিনা।'

এবার লোকনাথবাবুকে স্তম্ভিত হতভম্ব ক'রে দিয়ে রাখী প্রশান্ত কণ্ঠে উত্তর দেয়, 'কেন চিনবে না, দুজনেই ঐ পাড়ায় ঘুরেছি কত দিন, রাত দশটা এগারোটা পর্যন্ত—চেনার তো কোনো অসুবিধে নেই। এই প্যাঁচটা তোমার মাথায় আসতে যা দু-তিন বছরের ছাড়াছাড়ি। তাতে কি আর এতদিনের চেনা-মুখ ভুল হয়ে যাবে! বুদ্ধি যে তোমার খুব তা মানতেই হবে। আর ওরই মধ্যে একটু ইংরিজী জানো তাতেই মিথ্যে ঠাট্টা বজায় দেওয়া সোজা হয়েছে—'

অনাবশ্যক বোধেই কথাটা শেষ করে না রাখী। লোকনাথবাবুর দিকে ফিরে বলে, 'নমস্কার! দিদিকে বলবেন, তাঁর কাজ আমি হাসিল করে দিয়েছি। একদিন ধীরে সুস্থে গিয়ে বাকী টাকাটা নিয়ে আসব।'

ধাক্কাটা একটু একটু ক'রে সামলে উঠলেন বৈকি। চরম আঘাত বোকা প্রতিপন্ন হবারই। অসীমা কাপড় গয়না নিয়ে, কিছু আসবাব বেচে সরে পড়েছে, ভালই হয়েছে। এত সহজে ঘাড় থেকে নামবে লোকনাথবাবু ভাবেন নি। এজন্যে তিনি প্রমীলার কাছে কৃতজ্ঞ। কেবল রাখী মেয়েটার জন্যে এখনও তাঁর মন-কেমন করে। অত মিষ্টি যার মুখ সে এত বদ হতে পারে না। নেহাৎ বোধ হয় নিরুপায় হয়েই—সংসার চালাবার জন্যেই—হয়ত অনেক ভাইবোন। কে জানে!

এখন দেখা হলে একটাই বাণী দেন লোকনাথবাবু। 'মেয়েছেলে জাতটাই ছ্যাঁচড়া—যা বলব মিত্তিরবাবু। ও সব সমান, আগে ভাবতুম পাড়াগেঁয়ে অশিক্ষিত মেয়েরা বুঝি বোকাসোকা, ভাল মানুষ। বাপ্‌স্‌! শহরের মেয়েরা যদি যায় ডালে ডালে ওরা যায় পাতায় পাতায়। বে করাটাই বোকামি। যারা করে না, তাদের আমি নমস্কার করি।'

মণি-মামীমা

মণি-মামীমাকে নিশ্চয়ই চেনেন? অন্তত তাঁকে দেখেছেন অনেকবারই, একটু বর্ণনা দিলেই চিনতে পারবেন। শ্যামবর্ণ, মোটাসোটা, জাঁদরেল গেছের চেহারা —বেশ শক্ত-সমর্থ—এককালে হয়তো সুশ্রীই ছিলেন, এখন যাঁকে দেখলেই মনে হয় যে আর সামান্য একটু ঢ্যাঙা হ'লে কিংবা মেদটা কিছু কম থাকলে এখনও সুশ্রী ব'লে চালানো যেত; ভাল ভাল দেশী তাঁতের শাড়ি পরনে (রঙ্গীন ডুরেতেও আপত্তি নেই); গলায়, কানে ও হাতে অতি আধুনিক ডিজাইনের গহনা (প্যাটার্ন ঘন ঘন পাল্টে আধুনিকতা বজায় রাখা হয়)— আর কোথাও গহনা পরেন না তিনি, তাতে নাকি জবরজং দেখায়; ঘাড়ের উপর এলো খোঁপাটি এলিয়েই থাকে সর্বদা, মুখটি থাকে তাম্বুল-রসসিক্ত— দেখেছেন বৈকি, বহুবারই দেখেছেন।

কোথায় দেখেছেন?

কোথায় দেখেন নি জিজ্ঞাসা করলে বোধ হয় বলা সহজ হ'ত। তাঁকে দেখেছেন, ধরুন মণ্টুদার গানের আসরে, কলেজ স্কোয়ারের পাঠ-মন্দিরে, মাঘোৎসবের প্রার্থনা সভায়, বাগবাজারী কীর্তন দলের পিছু পিছু, ভবানীপুর সাহিত্য-সম্মেলনে, বামপন্থী ফেডারেশনের কার্যকরী সমিতির অধিবেশনে, বিলিতি কোন কোম্পানির অফিসের রবীন্দ্র-জয়ন্তী অনুষ্ঠানে—এ ছাড়া যে-কোন নামকরা লোকের বাড়ি, বিবাহ থেকে শ্রাদ্ধ—যে কোন ক্রিয়াকলাপে!

কেমন ক'রে সর্বত্রই তিনি নিমন্ত্রণ সংগ্রহ করতেন—এ রহস্য আজও অনাবিষ্কৃত রয়ে গেল। অথচ গত কুড়ি বছর ধরে তো একই রকম দেখে আসছি।

কে আছে তাঁর?

কেউই নাকি নেই। অবশ্য তাঁর বাঁ হাতে লোহা এবং সিঁথিতে সিঁদুর আছে। যদিচ তাঁর স্বামীকে তিনি ছাড়া কেউই দেখে নি বহুকাল। কিন্তু সে প্রসঙ্গ যদি তোলেন, তাহ'লে আর রক্ষা নেই। কেমন ক'রে তের বছর বয়সে তাঁর সঙ্গে আটাশ বছর বয়সের এক জোয়ানের বিয়ে হয়েছিল, তাও সে ছিল বেশ্যাসক্ত; তিনি ঐ বয়সেই কেমন তেজস্বী মেয়ে ছিলেন, তিনি করেছিলেন স্বামীর আচরণের প্রতিবাদ; ফলে স্বামী আর বিধবা ননদ তাঁর ওপর কি পৈশাচিক নির্যাতন করেছিল (বলতে বলতেই তিনি বাম বাহুমূল খুলে একটা পোড়া-সাদা দাগ দেখিয়ে দেবেন); তারপর কেমন ক'রে তিনি পালিয়ে আসেন; মা মারা গেলে বোনের বাড়ি আশ্রয় নিয়ে কী ভাবে উদয়াস্ত ক্রীত-দাসীর মতো খেটে তাদের খুশী রাখতে চেষ্টা করেছিলেন—তবু তাদের মন পান নি, উল্‌টে ভগ্নিপতি সহানুভূতিশীল ছিলেন ব'লে ঈর্ষিত হয়ে তাঁর বোন কী ভাবে সারাদিন একটা আলমারির মধ্যে পুরে রেখে মারতে বসেছিল; সেখান থেকে বেরিয়ে কেমন ক'রে নিজের চেষ্টায় তিনি লেখাপড়া শিখেছিলেন, এবং এখনও আত্মসম্মান বজায় রেখে কেমন ক'রে তিনি জীবিকা-নির্বাহ করছেন—(সঙ্গে সঙ্গে দীর্ঘ নিঃশ্বাসের সঙ্গে জানাবেন, ওরই-মধ্যে-একটু-সুশ্রী মেয়ের কী কষ্ট একা একা সম্ভ্রম বজায় রেখে চলা!) এর দীর্ঘ এবং ক্লান্তিকর কাহিনী আপনাকে শুনতে হবে বসে বসে।

যদি প্রশ্ন ক'রে বসেন, এখন আপনার চলে কিসে—তো দেখবেন তাঁর ঈশ্বর-বিশ্বাসও কারুর চেয়ে কম নেই। তিনি অর্ধ-নিমীলিত চোখের দৃষ্টি আর একটু চোখের পাতার মধ্যে ঢেকে বলবেন—'উনি চালান। আমাদের আর কতটুকু ক্ষমতা বলো ভাই!'

এরপর আর কোন প্রশ্নই করা চলে না। ভবানীপুরের কোন বিখ্যাত বড় রাস্তার ওপর এক বিরাট বাড়িতে তিন তলার ফ্ল্যাটে থাকেন তিনি, ঝি আছে; ঠাকুর আছে—বেশভূষা তো আপনারা দেখছেনই—সুতরাং 'চলে কিসে' এটা বড় প্রশ্ন। হয়ত বার বার আপনার গলার কাছে নানা প্রশ্ন ঠেলে উঠবেও, তবু সঙ্কোচে আপনি আর কথাটা তুলতে পারবেন না।

মানব-মনের—বিশেষতঃ শিক্ষিত ভদ্র মনের এই রহস্যটা মণি-মামীমাও জানেন, তাই তিনি অত নিশ্চিন্ত।

মণি-মামীমা প্রায়ই আমাদের বাড়ি আসেন। এমনি আরও অনেক বাড়িতেই। কিছু কিছু চাঁদা তুলতে আসেন, সেই সঙ্গে আসেন মেয়েদের হাতের কাজ বেচতে। পাড়ার অনেক বিধবা এবং অনাথা স্ত্রীলোকের নাকি তিনি অভিভাবিকা। ক্রুশে বোনা খুঞ্চেপোশই বেশির ভাগ—এ ছাড়া ফুল-তোলা অথবা নামের আদ্যক্ষর লেখা রুমাল, এই ধরনের নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর জিনিস বাজারের তিন গুণ দামে বেচে যান তিনি। কিনতেই হয়, নইলে সম্ভ্রম থাকে না। তিনি তো আর যে-সে বাড়িতে যান না, বিশিষ্ট ভদ্রলোকদের বাড়িতেই আসেন। বিশেষতঃ যখনই আসেন, হয় কারুর বাড়ির গাড়ি ধার ক'রে, নয়ত ট্যাক্সিতে। তারপর আর তাঁকে ফিরিয়ে দেওয়া যায় না।

নানা রকম গল্প করেন মণি-মামীমা তার সবগুলিরই মূল সুর—সাধারণের উপকার ক'রে ক'রে তিনি ক্লান্ত। অথচ কী যে পোড়া দেশের লোক তাঁকে পেয়ে বসেছে! তিনি ছাড়া যেন মানুষ নেই দেশে।

একদিন আমার দিদিমা প্রশ্ন করেছিলেন, 'হাঁ বৌমা, তা আমাদের ছেলেকে দেখ নি কতকাল? এখনও তো নোয়া-সিঁদুর খোল নি দেখছি।'

'না মা—এই তো দশ বছর আগেও। ঐ এক-একদিন হঠাৎ খুঁজে খুঁজে এসে হাজির হন। খেতে পাচ্ছি না, চিকিৎসা হচ্ছে না, ছেলেমেয়ের অসুখ—অমুক তমুক—খুব খানিকটা নাকে কাঁদবেন—আসল কথা টাকা চাই কিছু। যা থাকে হাতে সব বাগিয়ে নিয়ে চলে যান। না—উপকার আর কিছুই নেই। ঐ যা মাছ-ভাতটা খাচ্ছি—'

কিন্তু সে-ও অনেকদিনের কথা। মণি-মামীমা ধরে রেখেছেন—ভদ্রলোকের এক কথা। যখনই প্রশ্ন করবেন শুনবেন—দশ বছর আগে একবার স্বামী এসে-ছিলেন তাঁর। তবে ঐ একটা সুবিধা, বর্তমান যুগের শিক্ষিত মানুষ অনেকেই অশোভন বা অস্বস্তিকর কৌতূহল মনে চেপে রাখতে পারে।

তবে দিদিমা সেকেলে লোক, তাছাড়া তিনি ওঁর শ্বশুরববাড়ির সবাইকেই একসময় চিনতেন। কী নাকি একটা কুটুম্বিতাও ছিল। সেই সুবাদেই আমাদের মামীমা—এখন তো এপাড়া সুদ্ধ সকলকারই। দিদিমা বলতেন, 'সোয়ামীটা ওর লেখাপড়া জানা নয় বটে, কিন্তু ও রকম বদও নয়। ঐ

সব্বনেশে বোয়ের জ্বালাতেই তো ওরা দেশান্তরী হয়েছে। কার সঙ্গে কী করে যেন ও বেরিয়ে এসেছিল, সেই ঘেন্নাতে তারা এখানকার বাস উঠিয়ে পশ্চিমে চলে যায় সেখানে আবার বিয়ে-থাও নাকি করেছিল কিন্তু শুনেছি তো সে প্লেগে মারা গিয়েছে।··সে ভূত হয়ে এখনও ওর কাছে টাকা নিতে আসে নাকি?···মুখে আগুন অমন মেয়েছেলের। ওর ছায়া মাড়ালে পাপ হয়··· তোদেরও যেমন, ঐ নষ্ট মেয়েমানুষটাকে আবার চা পান খেতে দিয়ে গল্প করিস। তোদের ঠকিয়ে রাশ রাশ টাকা নিয়ে যায়, তোরা বুঝতে পারিস না!···'

আমরা জানতুম মণি-মামীমার কেউ নেই, হঠাৎ একদিন আমার মায়ের সঙ্গে গল্প করতে করতে বললেন, 'ছেলেটা এবার ওদের ক্লাসে ফার্স্ট হয়ে উঠেছে ভাই। এমনি বরাবর চালাতে পারে তবে তো বুঝি!'

ছেলে? সে আবার কি?···ছেলে আছে নাকি ওর?···কে যেন সোজাসুজি প্রশ্নই করল।

মুখে একটা পান পুরতে পুরতে সহজ কণ্ঠে বললেন, 'না, আমার বোনের ছেলে। তা ওর মা তো ওকে প্রসব করেই চোখ বুজল, সেই এক দিনের ছেলে থেকেই মানুষ করছি। ও আমার ছেলেরও বাড়া।'

মাসিমা প্রশ্ন করেছিলেন, 'কোন্ বোন আপনার? আপনার তো ঐ এক বোনই শুনেছি, সে-ই আপনাকে আলমারিতে পুরে—?'

'না না। হ্যাঁ, আমার আপনার বোন একটিই বটে। এ বলছি আমার মাসতুতো বোনের কথা। আমার নিজের মাসতুতো বোন।'

মণি-মামীমা চলে গেলে—আড়াল থেকে শুনলুম—দিদিমা মুখ বাঁকিয়ে বললেন, 'মুখে আগুন মুখপোড়া মাগীর। মরণও হয় না। দিন রাত ঝুড়ি ঝুড়ি মিছে কথা।···ওর যারা আপনার লোক আছে তারা কেউ ওর মুখ দেখে নাকি? যার সঙ্গে বেরিয়ে এসেছিল সে যখন ফেলে চলে গেল, রোগে রোগে আধমরা, খেতে পাচ্ছে না দেখে ওর দিদি নিয়ে গিয়ে বাড়িতে পুরলে। ওমা একটু যেমন ভাল হয়ে উঠল, তারই কপালে নুড়ো জ্বাললে।···মারতে যাবে না তো কী। বেশ করেছিল আলমারিতে পুরে রেখেছিল।'

মাসিমা প্রশ্ন করলেন, 'এ তবে কার ছেলে?'

'কার ছেলে বুঝে ছাখ তোরা। হঠাৎ একদিন শুনলুম ওর কোন্ বোনের অসুখ, তার খেজমত করতে যাচ্ছে। তিন মাস পরে ফিরে এল ঐ ছেলে নিয়ে। কী সমাচার, না—বোন পোয়াতি অবস্থায় রোগে ভুগছিল, প্রসব ক'রেই মারা গেছে। সেখানে দেখবার কেউ নেই ব'লে ও নিয়ে এসেছে।...তা তো এলি, তা তোর অমন পোড়ার দশা কেন? রোগা, সাদা হয়ে গেছ্‌ল একেবারে, চুলটুল উঠে—মড়ার আকার! ..আর যদি তার বাপই থাকবে—কই সে তো একবারও দেখতে এল না!'

মুখখানা বিকৃত করেন দিদিমা।

ইদানীং আরও একটা কানা-ঘুষো শুনছিলাম।

কতকগুলি মেয়েও নাকি ওঁর আছে, পুষ্যি মেয়ে। তাদের সব ইতিহাসও তৈরী। কার সমস্ত আত্মীয় স্বজন একদিনে কলেরাতে মারা গিয়েছিল, কাকে শিয়ালদা ইস্টিশানে কুড়িয়ে পেয়েছেন, কোন্ বাপ-মা-মরা মেয়ের মামা তাকে কোন বিহারী মুদীর কাছে সওয়া-শ' টাকায় বেচতে যাচ্ছিল, পাড়ার ছেলেরা উদ্ধার ক'রে তাঁর হাতে দিয়েছে—এমনি সব বিচিত্র চমকপ্রদ বিবরণ। পাঁচ-ছয় থেকে শুরু ক'রে আট দশ বছরের মেয়ে প্রায় গুটি ছয়েক এসে জড়ো হয়েছিল নাকি তাঁর কাছে। তারা এখন সকলেই প্রায় তরুণী।

তাদের জন্য ওঁকে করতেও হয়েছে অনেক। শহরতলি অঞ্চলে একটি স্বতন্ত্র বাড়ি ভাড়া করতে হয়েছে, শিক্ষয়িত্রী রাখতে হয়েছে একজন, লেখাপড়া ছাড়া কিছু কিছু শিল্প-শিক্ষার ব্যবস্থাও করেছেন। ছুটি মেয়ে নাকি প্রাইভেটে ম্যাট্রিকও দিয়েছে—এখন কলেজের পড়া পড়ছে। না—মেয়েদের উনি ইস্কুলে দেবার পক্ষপাতী নন। তাতে—মাপ করবেন আপনারা, আপনাদের কথা আলাদা, আপনারা মেয়েদের ওপর কড়া নজর রাখেন—কিন্তু তিনি তো একা মানুষ, নানান তালে ঘুরে বেড়াতে হয়—এ অবস্থায় ওদের ইস্কুলে দেওয়া মানে স্বভাব-চরিত্রটি বিগড়ে দেওয়া, সর্বনাশের পথেই ঠেলে দেওয়া ব'লে ধরে নিতে পারেন। তা তিনি পারবেন না—ভগবান অতগুলি অনাথা মেয়েকে যখন তাঁর হাতেই এনে ফেলে দিয়েছেন, তিনি সাধ্যানুযায়ী তাদের কল্যাণই দেখবেন। আর লাভই বা কি বলুন, সেই বিয়েই যখন দিতে হবে, পাসকরা মেয়ে ব'লে

খরচা কিছু কম হবে? উল্‌টে তখন উপযুক্ত জামাইয়ের খোঁজে আরও বেশী টাকা লাগবে। তার চেয়ে মোটামুটি সাংসারিক কাজ-কর্ম. কিছু কিছু লেখাপড়া —এই তো ঢের। যাদের শক্তি বা রুচি আছে, তারা প্রাইভেটেই পড়ুক না কেন।

চাকরী-বাকরী। না—মেয়েদের চাকরী করাটাকে তিনি সমর্থন করেন না। যার যা। সবাই যদি অফিসে গিয়ে বসে কলম পেষে তো ঘরসংসার দেখে কে? লাভও কিছু হয় না বিশেষ, দুটো ঝি-চাকর বেশি রাখতেই একজনের আয় চলে যায়।...

এদের জন্য ইদানীং মণি-মামীমার কাজ ঢের বেড়ে গিয়েছিল। চাঁদা তুলতে হ'ত বেশি ক'রে। ছ-সাতটা পেট চালানো তো বড় সহজ কথা নয়। রান্নাবান্না সব ওরা নিজেরাই ক'রে নেয় অবশ্য—কিন্তু ঝি একটা রাখতে হয়। শিক্ষকও একজন আছেন। খরচা কি কম?

তাছাড়া ওদের বিয়ের ভাবনা আছে। ইদানীং মণি-মামীমা একটা মোটা চাঁদার খাতা করেছিলেন। মাসিক চাঁদা ব্যবস্থা সব,—বলেন, 'এই থেকেই একটা বিয়ের ভাণ্ড খুলেছি, যা ওঠে তার অর্ধেক চুল চিরে বিয়ের জন্য তুলে রেখে দিই। বাকী টাকাতে দুঃখু-ধান্দা ক'রে চালাই কোনমতে। বিয়ে তো দিতেই হবে।'

তা মণি-মামীমার বাহাদুরী আছে। চাঁদার খাতায় নামের লিস্ট দেখলে আপনার মনে সম্ভ্রম উদ্রিক্ত না হয়ে যায় না। সমস্ত বড় বড় লোক—মেয়র, ডেপুটি পুলিস কমিশনার, হাইকোর্টের বিচারপতি—নেই কে? অথচ ওঁর কোন রসিদ বই নেই। মণিমামীমা বলেন, 'রসিদ করতে গেলেই একটা নাম দিতে হবে,—সে পুলিস-ফুলিস অনেক হাঙ্গামা। তার চেয়ে ধরুন—এরা আমারই মেয়ে। নিজের ক্ষমতায় কুলোয় না, ভিক্ষে ক'রে মেয়েদের মানুষ করি। এর আবার রসিদ কি? যার মন হবে সে দেবে—নইলে দেবে না। জোর তো নেই। আমাকে বিশ্বাস না হয় যদি, রসিদ বইতে একটা নাম ছাপা দেখলেই বিশ্বাস হবে? কেন—এই সব আশ্রমের নামে চুরি জুচ্চুরি কারবার কি কখনও চলে নি আমাদের দেশে?'

এসব কথার পরে আর রসিদ চাওয়া যায় না। বরং এমন পরিষ্কার

কথাবার্তার পর শ্রদ্ধাই হয় মনে মনে।

তবু একদিন দেখলুম আমার মা একটু রূঢ় ভাষাতেই ওঁকে জানিয়ে দিলেন যে, চাঁদা আর তিনি দিতে পারবেন না। মা বললেন, 'আমাদের পয়সা ঠিক আপনার মতো সস্তা নয় বৌদি যে, আপনার একটা মোটা রোজগারের চেহারাটা ঢাকতে নিজেদের কষ্টের পয়সা খরচা ক'রে আর একটা রোজগারের ব্যবস্থা ক'রে দেব। আপনি অতিরিক্ত চালাক, কিন্তু বোকাদেরও একসময় চোখ ফোটে!'

মণি-মামীমা কিছুমাত্র বিচলিত হলেন না। তাঁর মুখও লাল হ'ল না। তিনি বরং ধীরে সুস্থে নিজের ডিবে খুলে কয়েকটা পান বার ক'রে মুখে পুরে বললেন, 'সে আপনার মর্জি ভাই, কি বলব বলুন। তবে যা শুনেছেন তা হয়তো সত্যি না-ও হ'তে পারে। আমাদের দেশে এই ধরনের আশ্রম দেখলেই লোকে বদনাম দেয়!'

'যা শুনেছি তা সব আর নাই বললুম বৌদি কিন্তু আপনার ছেলে এম.এ. পড়ে, প্রত্যহ প্রাইভেট গাড়িতে চড়ে কলেজ যায়। বন্ধুবান্ধব নিয়ে সিনেমা দেখে, রেস্তরাঁয় খেতে তার একদিনে নাকি একশ' টাকা খরচা হয়। আপনারও মাসে সাত-আটশ' টাকা সংসার খরচ। গাড়িখানা আপনারই হেপাজতে থাকে—এসব আসে কোথা থেকে সেটা বুঝিয়ে বলতে পারেন—সকলকার সামনে?'

'তোমাদের কাছ থেকেই আসে। চাঁদা কি আর কম ওঠে। আমি দিনরাত পরোপকার ক'রে বেড়াব—সে কি না-খেয়ে? না ভাই, অত নিঃস্বার্থ পরোপকারী আমি নই!'

'চাঁদার খাতাটা খুলে একটু যোগ দিয়ে দেখুন না বৌদি—ক' হাজার টাকা চাঁদা ওঠে?'

মামীমা উঠে দাঁড়ালেন। বললেন, 'ভিক্ষে দেবার কথা ভাই, খুশী হয় দেবে, না হয় দেবে না। অত কৈফিয়তে আমার দরকার কি? আচ্ছা আসি—'

এর পর শুনলুম আমাদের পাড়ার অনেক বাড়িতেই তাঁর চাঁদা বন্ধ হয়েছে। ক্রমে তিনি আমাদের পাড়া একেবারেই ছেড়ে দিলেন। তাঁর প্রতি

এই বীতরাগের কারণটা কি পরিষ্কার ক'রে কেউ বলে নি বটে কিন্তু সেটুকু অনুমান ক'রে নেবার মতো বয়স আমাদের হয়েছিল। আমরা মনে মনে বরং মণি-মামীমাকে বাহাদুরীই দিলুম। একা মেয়েছেলে এই দুঃসাহসিক ব্যবসা করা এবং সঙ্গে সঙ্গে তার 'কামুফ্লেজে'র ব্যবস্থা করা—বাহাদুরী আছে বৈকি!

এর পর ক্রমে ক্রমে ভুলেই গিয়েছিলুম মণি-মামীমাকে—হঠাৎ একদিন খবর পেলুম মণি-মামীমা গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করেছেন।

আবারও একটা কুৎসার তরঙ্গ উঠল চারিদিকে। আবারও কিছুদিন ধরে চলল আলোচনা। অনেক কথাই শুনলুম আবার। বিস্তর পাঁক ঘুলিয়ে উঠল। তারপর আবার সব শান্ত হয়ে গেল, মণি-মামীমাকে সবাই ভুলে গেলুম।

আলোচনা এবং অনুমান যতই হোক না কেন, মণি-মামীমার আত্মহত্যার কারণটা রহস্যই রয়ে যেত যদি না ওঁর বহুদিনের পুরনো ঝি সোহাগী বছর খানেক পরে আমাদের বাড়িতে কাজ করতে আসত। আবার পুরনো স্মৃতিতে জোয়ার জাগল, জিজ্ঞাসাবাদ—কিছু বলা, কিছু না বলা—তারই মধ্য দিয়ে আস্তে আস্তে প্রকাশ পেল সম্পূর্ণ কাহিনীটি।...

মণি-মামীমা বেপরোয়া ছিলেন, জীবনে কখনও কোন সংস্কার তাঁকে বিচলিত করতে পারে নি—কিন্তু কাল হ'ল ওঁর সন্তান-কামনা। যুগ যুগ ধরে যে পিপাসা নারীকে পাগল করেছে সেই পিপাসা এমন কি মণি-মামীমাকেও দুর্বল ক'রে তুলল। তিনি সন্তান গর্ভে ধারণ করলেন এবং যথাসময়ে প্রসবও করলেন।

ছেলে যখন হয়েছিল তখন অতটা ভাবেন নি। ছেলে বড় হয়ে বাড়িতে, বিশেষতঃ মার ঘরে মাঝে মাঝে নূতন আগন্তুক দেখে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চাইতে লাগল। আর একটু বড় হ'তে নানা প্রশ্ন শুরু করল। মণি-মামীমারও এবার লজ্জা বোধ হ'ল। তা ছাড়া বয়স অনেকটাই হয়ে গিয়েছিল—উপার্জন এমনিতেও কমে আসছিল। তিনি বাড়িতে লোক আসা বন্ধ করলেন।

কিন্তু টাকা তো চাই। সস্তায় হাতের কাজ কিনে চড়া দামে বিক্রী করা, নানা অজুহাতে চাঁদা তোলা, য়্যামেচার থিয়েটার—উপার্জনের সব পথই তিনি চেষ্টা ক'রে দেখলেন। তাতে কোনমতে পেট চলে হয়ত। কিন্তু কোনমতে

চালাতে তো তিনি চান না। তাঁর যে ছেলেকে মানুষ করতে হবে—যেমন তেমন ক'রে করলে চলবে না। ধনীর সন্তানের মতো আদরে স্বাচ্ছন্দ্যে সে বড় হবে, বন্ধুসমাজে নেতৃস্থানীয় হয়ে থাকবে—ভবিষ্যৎ জীবনে হবে দেশের নেতা, শাসক। মণি-মামীমার আশা যে অনেক—

সুতরাং টাকা চাই। অনেক টাকা।

অগত্যা মেয়েদের কুড়িয়ে পেতে শুরু করলেন।

শুধু মেয়েদেরই কুড়িয়ে পান—ছেলেদের নয়। কখনই কি অনাথ ছেলেরা তাঁর চোখে পড়ে না! এ প্রশ্নও কেউ কেউ করেছিল বৈকি। তিনি অনায়াসে উত্তর দিতেন, 'হ্যাঁ, অভাব কি! কিন্তু মেয়েদের একটা এস্টাব্লিশমেন্ট করেছি, আবার ছেলেদের জন্যে একটা—অত পয়সা কই? একসঙ্গে তো রাখা যায় না। আমরা সেকেলে মানুষ—'

সুতরাং প্রশ্নটা ঐখানেই থেমে যেত।

মণি-মামীমার বুদ্ধির অভাব ছিল না। এ ধরনের ব্যবসাতে কোন্ কোন্ দিক থেকে বিপদ আসে তা তিনি জানতেন। সে জন্যে খুব সাবধানে এগিয়েছিলেন তিনি। সত্যিই খুব ছোট মেয়ে এনে তাঁর 'আশ্রমে' বেশ কিছুদিন খাইয়েদাইয়ে মানুষ করেছিলেন। প্রথম প্রথম দু-একজনকে সেখানে নিয়েও গেছেন। উপার্জনের কোন প্রশ্ন সেদিন কারুর সুদূর কল্পনাতেও যায় নি। তারপর তাদেরই নাম ক'রে যখন চাঁদা তুলতে শুরু করলেন তখন আরও নিরাপদ হয়ে গেল আবরণটা। পরে কে এল—বা কত বয়স তা নিয়ে কে মাথা ঘামাবে?

মণি-মামীমার পয়সার অভাব রইল না।

এই সমস্ত মিথ্যাচার, ছলনা—যদি পাপ বলেন তো পাপও—একে কিন্তু অনায়াসে তপস্যাও বলা চলবে। কারণ এ সবই দরকার হয়েছিল তাঁর ছেলের জন্যে। ছেলেকে যেন পুজো করতেন তিনি। ছেলে তাঁকে অভিভূত, আচ্ছন্ন ক'রে রেখেছিল। দিলীপের সামান্যতম সুখ-সুবিধার জন্যে যে-কোন মানুষের যে-কোন সর্বনাশ করতেও বোধ হয় বাধত না তাঁর।

দিলীপকে তিনি ভয়ও করতেন সেই জন্যে। তার চোখে যদি তিনি কোন-

দিন নেমে যান, কোনদিন যদি ঘুণাক্ষরেও সে টের পায় তাঁর আয়ের উৎস—অতীত বা বর্তমান—তাহ'লে আর কোনদিন যে তিনি তার সামনে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারবেন না! অথচ ছেলের ভালবাসার সঙ্গে শ্রদ্ধাও যদি না পেলেন তবে এ জীবনে আর পাবার রইল কি!

দিলীপ কি মাঝে মাঝে দু-একটা অতিশয় সরল প্রশ্নে তাঁকে বিব্রত ক'রে তুলত না? নিশ্চয়ই তুলত। আর সেই সব মুহূর্তগুলি জীবনের সংকটতম মুহূর্ত। অজস্র মিথ্যা বলতে হ'ত, উপন্যাসই রচনা করতে হ'ত মুখে মুখে। প্রয়োজনই যেন শক্তি জোগাত তাঁকে। প্রাণপণে বিশ্বাসযোগ্য মিথ্যার জাল রচনা ক'রে যেতেন।

দিলীপ বড় হ'ল। লেখাপড়া সে শিখল সত্যিই। সাধারণ সংজ্ঞায় যাকে বকে-যাওয়া বলে, তা সে গেল না, সসম্মানে এম.এ. পাস করল—আইনের ক্লাসেও ভর্তি হ'ল। মণি-মামীমা বললেন, আই-এ-এস দে। দিলীপ রাজি হ'ল না। সে বললে, 'ব্যবসা করব। ভয় নেই, মূলধন চাইব না। এমনিই ব্যবসা করব। আইনটা জানা থাক, তার সঙ্গে হিসেবের কাজগুলোও শিখে রাখব মনে করছি—দ্যাখো না, একটা ম্যাজিস্ট্রেটের চেয়ে ঢের বেশী রোজগার ক'রে তোমার পায়ের তলায় ঢেলে দেব।'

আশায়, বিশ্বাসে মণি-মামীমার চোখ দুটি জ্বলতে থাকত।...

কিন্তু মণি-মামীমার হিসেবে ঐ একটি ভুল হয়ে গিয়েছিল। ছেলেকে তিনি শুধু মানুষ করতে চান নি, বড়লোকের ছেলের মতো মানুষ করতে চেয়েছিলেন। আর সেই হ'ল সর্বনাশের মূল। দিলীপ পথেঘাটে ঘোরাফেরা করত, কলেজে যেত—সর্বদা ওর পকেটে থাকত চার-পাঁচশ' টাকা। সুতরাং এতকাল যে তার তেমন মোসাহেব জোটে নি এই আশ্চর্য।

এবার জুটল, এবং—।

দিলীপ একদিন বললে, 'মা এ গাড়িটা বেচে একটা নতুন ছোট গাড়ি কিনব। বেশি নয় হাজার পাঁচেক টাকা হলেই হবে। নিজে চালাতে শিখেছি, পুরনো গাড়ি আর ভাল লাগে না।'

মণি-মামীমা দিনকতকের মধ্যে টাকাটা জোগাড় ক'রে দিলেন। আরও সুবিধা হ'ল দিলীপের পরভৃৎ বন্ধুদের।

ক্রমে দিলীপের ফিরতে রাত হ'তে লাগল। আগে আগে অতটা গ্রাহ্য করেন নি মণি-মামীমা। কিন্তু ক্রমশঃ ঘড়ির কাঁটা বারোটার কাছাকাছি যেতে একটু বকাবকি শুরু করলেন। নানা কৈফিয়ৎ দিতে লাগল দিলীপ। মিথ্যা তার রক্তে আছে, জন্মটাই মিথ্যায়—সুতরাং মার চেয়ে কম গেল না সে।

ক্রমে নানা কানাঘুষোও শুনতে লাগলেন। দিলীপ কলেজে যায় না বহুকাল। কোন ভদ্রসমাজেও যায় না। একদিন নিজের চোখেই দেখলেন, কলেজে না গিয়ে চৌরঙ্গীর এক রেস্তরাঁয় বসে হল্লা করছে।

ভীষণ চেঁচামেচি করলেন। কিন্তু দিলীপ তখন বেপরোয়া। সে প্রচণ্ড আঘাত দিলে তাঁকে, 'তুমি যদি আপনার মা হ'তে তাহ'লে এতটা শাসন মানাত। মাসী আবার মা হয় কবে?'

নিজের মিথ্যার কাছে নিজেকেই নাকে খৎ দিয়ে ফিরে আসতে হ'ল। কিছুতেই মুখ ফুটে বলতে পারলেন না যে আগের কথাটা সত্যি নয়। কিন্তু তাই ব'লে তিনি অত সহজে হাল ছাড়লেন না। দিলীপ জীবনে প্রতিষ্ঠিত হবে দিলীপ দশের একজন হবে, এই জন্যেই তো তাঁর এত নোংরামি, এত কদাচার, সেই দিলীপই যদি যায় তাহ'লে এ সব কোন কিছুরই যে অর্থ থাকবে না।

শুরু হ'ল মায়ে-পোয়ে লড়াই।

দিলীপের মুখে মদের গন্ধও দু-একদিন পাওয়া গেল বৈকি!

মণিমামীমা মাথা খুঁড়ে রক্তারক্তি করলেন। মার রক্ত দেখে যেন দিলীপের চমক ভাঙল। সে অনুতপ্ত হয়ে প্রতিজ্ঞা করল যে আজ থেকে ওসব ছেড়ে দেবে সে। দু-একদিন বাইরেও গেল না। কিন্তু যে বাঘ 'ম্যান্-ইটার' হয়েছে, সে আর কদিন থাকে! আবারও বেরোতে হ'ল তাকে।

মণি-মামীমা টাকা দেওয়া বন্ধ করলেন। সব টাকা ব্যাঙ্কে থাকে। সংসার খরচের মতো দশ-কুড়ি আনেন আর খরচ করেন। দিলীপ বিপদে পড়ল কিন্তু হাল ছাড়ল না। দেদার ধার করতে লাগল। তারপর গাড়ি বেচলে। তবে সে টাকাই বা কদিন?

এরই মধ্যে বন্ধু নরেশ এসে খবর দিলে, টালিগঞ্জের দিকে 'ফ্রেশ' মাল আছে। কলেজের মেয়ে। কিছু মোটামুটি চাই।

দিলীপের মুখ শুকিয়ে উঠল, শুকনো ঠোঁটের ওপর জিভটা বুলিয়ে বলল,

'হোপলেস। তোকে তা বললুম, মা একেবারে হাত গুটিয়েছে।'

'কিন্তু এ জিনিস কি তোর জন্যে বসে থাকবে রে?...দেখবি? চল্ আলাপ করিয়ে দিই তোকে—'

গঙ্গার ওপর 'বুফে'তে দেখাও করিয়ে দিলে নরেশ।

না, নরেশটা ঠিকই বলেছিল। মনে মনে দিলীপকে স্বীকার করতেই হ'ল। কিন্তু উপায় কি? টাকা আর কোনমতে কোথাও থেকে পাবার উপায় নেই।

দিলীপ জোর ক'রেই দু-একদিন উদাসীন হয়ে রইল কিন্তু রক্তে তার আগুন ধরেছে—সে কি স্থির থাকতে পারে? তার ওপর সে আগুনে নরেশ প্রাণপণে ইন্ধন জুগিয়ে যাচ্ছে।

অবশেষে একদিন দুপুরে এসে খবর দিলে নরেশ, 'মার একটা গয়না হাতা না—আমি রাজী করিয়েছি, নগদ না হোক in kind দিলেও চলবে। একটা গয়না নিয়ে চ ভারী দেখে!'

দিলীপের লুব্ধ দৃষ্টি উৎসুক, ব্যগ্র হয়ে উঠল।

সুযোগও মিলল, জড়োয়া নেকলেশটার কোড়া কেটে গেছে বলে মা খুলে ড্রয়ারে রেখেছিলেন। বেশ মনের মতো জিনিস।

মণি মামীমা তিন-চারদিন অন্তর তাঁর 'আশ্রমে' গিয়ে হিসাব বুঝে নিতেন। যা কিছু আসবে নগদে ও জিনিসে, সব তাঁর কাছে জমা দিতে হবে, এই নিয়ম। তিনি তাদের কোন অভাব রাখেন নি, তাছাড়া তিনি অবিবেচক নন, তাদের ভবিষ্যতের কথাও চিন্তা করেছেন, প্রত্যেকেরই মোটা টাকার জীবনবীমা করিয়ে দিয়েছেন, তার প্রিমিয়াম তিনি দেন। সুতরাং উপার্জনের প্রত্যেকটি পয়সা যদি তিনি বুঝে নেন তো দোষ দেওয়া যায় কি?

সেদিনও সেই হিসাব বুঝে নিতে বসেছিলেন। আশ্রমের 'শিক্ষিকা' বা 'সম্পাদিকা' মিসেস রায় টাকাকড়ি বুঝিয়ে দিয়ে শেষ পর্যন্ত বার করলেন একটি নেকলেশ—জড়োয়া নেকলেশ, হালফ্যাসনের। তাঁর আশ্রমের সেরা রত্ন বি.এ. ক্লাসের ছাত্রী রত্না এটি পেয়েছে।...ওর কিন্তু বড্ড লোভ পড়েছে এটায়। ওকে দেওয়া সম্ভব হবে কি?

অনেকক্ষণ সেটা হাতে নিয়ে স্তম্ভিত হয়ে বসে রইলেন মণি-মামীমা

পাথরের মতো। মিসেস রায়ের শেষ কথাগুলো তাঁর কানেই যায় নি। অবশেষে কোনমতে অস্ফুট কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন, 'রত্না পেয়েছে? কে দিয়েছে ওকে এটা?'

'ঐ নরেশ বলে এক ছোক্‌রা আসে এখানে, তারই কে বন্ধু। দিলীপ না কি নাম বললে যেন। বেশ ছেলেটি। রত্নাকে নাকি বিয়ে করার কথাও বলেছে, প্রথম দিনের আলাপেই।'

মিসেস রায় হাসলেন। অর্থপূর্ণ হাসি। বোকামি উপভোগের হাসি।

হিসাবপত্র বুঝে নিয়ে উঠে দাঁড়ালেন মণিমামীমা। গহনাটা মিসেস রায়কে ফিরিয়ে দিয়ে বললেন, 'এটা রত্নাকেই দেবেন। বিয়ে যদি করতে পারে তো করুক। আমার আশীর্বাদ রইল। হ্যাঁ, মিসেস রায়, একটা কথা।...কদিন ধরেই ভাবছি আপনাকে বলব—'

মিসেস রায় উৎসুক হয়ে তাকিয়েই থাকেন।

'আমার শরীর আর বইছে না। ভাবছি এ সব ছেড়ে দেব। যদি পারেন তো আপনি চালান। নইলে এদের বিয়ে-থা দিয়ে সংসারী করতে পারেন তো সেই চেষ্টাই দেখুন। আপনারও যা আছে, বাকী জীবনটা চলেই যাবে।'

মিসেস রায় স্তম্ভিত হয়ে চেয়ে রইলেন ওঁর দিকে। এ ধরনের কথা আর যার কাছেই হোক্‌—,মণি-মামীমার কাছে শোনবার আশা করেন নি তিনি।

অবশ্য তাঁর উত্তর শোনবার জন্য মণি-মামীমা অপেক্ষাও করেন নি। তখনই বাড়ি চলে এসেছিলেন।...

এর পরের ইতিহাস নিতান্তই সংক্ষিপ্ত। সেই রাত্রিতেই আত্মহত্যা করলেন মণি-মামীমা, নিজেরই একটা শাড়ি গলায় ফাঁস লাগিয়ে—।

আশঙ্কা

চিঠিখানা কেন যে সতী খুলল না শেষ পর্যন্তও, সেটা সকলের কাছেই একটা দুর্জ্ঞেয় রহস্য হয়ে রইল। এত বড় একটা সাংঘাতিক সঙ্কল্প নেবার আগে অন্তত একবার চক্ষু-কর্ণের বিবাদটা ভঞ্জন ক'রে নেওয়া উচিত ছিল, তার—এই কথাটাই বার বার সকলের মনে হ'তে লাগল, শুধু এই অত্যন্ত সহজ কথাটা।

সতীরই মনে পড়ল না,—আশ্চর্য !

অথচ খামখানা হাতে ক'রে বসে ছিল সে অনেকক্ষণ, বোধ হয় ঘণ্টা-খানেকেরও বেশি। একে প্রবাসী স্বামীর পত্র—যে স্বামী আজ চার বছরেরও ওপর বহুদূর প্রবাসে বাস করছে—তায় দীর্ঘকাল পরে খামে-আঁটা ভারী চিঠি—অবিলম্বে খোলবার এবং পড়ে দেখবার আগ্রহটাই তো স্বাভাবিক। ন'মাসে ছ'মাসে চিঠি আসত ইদানীং—হয় কোন ছবিওলা কার্ডের পিছনে এক ছত্র, নয়তো বড়জোর 'এয়ার-লেটারে' বড় বড় হরফে নিতান্ত দায়-ঠেলা চার-পাঁচ ছত্র চিঠি, এই-ই তো এসেছে গত দু'বছর। হঠাৎ এতদিন পরে এত বড় দীর্ঘ চিঠি : না জানি কি সংবাদ বহন ক'রে এনেছে, উদ্ঘাটিত করেছে অজানা কি রহস্য, অথবা বিবৃত করেছে কোন কলঙ্কিত ইতিহাস, যে-কোন মেয়ের পক্ষেই তো সেটা জানতে চাইবার প্রবল ঔৎসুক্য জাগা উচিত। শুধু সতীরই তা জাগল না।

কেন ? কেন ?

এই প্রশ্নই তো সকলে করছে। ওর শোকার্ত মা, ভাই, বোন—এমন কি শ্বশুরবাড়ির সকলেও।

সবটা না জেনে না বুঝে কেন এমন সাংঘাতিক কাজ করতে গেল সতী, এ ওকে কী ভূতে পেয়েছিল।

ব্যাকুল ভাবে পরস্পরকে শুধু এই প্রশ্নই করেছেন ওঁরা, জবাব পান নি।

কিন্তু সত্যিই কি কিছু করেছিল সতী ?

করা যাকে বলে ?

তাও তো করে নি। কিছুই করে নি সে। যা ঘটেছে আপনি ঘটেছে।

সত্যিই কি শুধু মানসিক ইচ্ছাতে মরা যায় ?

শোকে বিহ্বল বা উদ্ভ্রান্ত না হ'লে এই স্থূল কথাটা ওঁদের মাথাতেও যেত।

ওঁরা অনুমান মাত্র করছেন,—এই ঘটনায় সতীরও সক্রিয় অংশ ছিল। কিন্তু ঠিক কি তাই ?

আসলে সতী ভয় পেয়েছিল।

যে দৃঢ় স্বভাবের সবল ইচ্ছার মেয়ে বলে সতীকে সবাই জানত, সেটা সতীর ছদ্মবেশ মাত্র। আসলে সে অত্যন্ত ভীতু মানুষ। তার স্নায়ুগুলো সাধারণ মানুষের চেয়ে ঢের বেশী দুর্বল।

কী সংবাদ বহন করে এনেছে চিঠিটা, সম্ভবত কি দুঃসংবাদ, সেইটে জানবার মতো, সম্ভাব্য দুর্ভাগ্যের মুখোমুখি দাঁড়াবার মতো সাহস সে সঞ্চয় করতে পারে নি শেষ পর্যন্ত।

চেষ্টা যে করেছে তার প্রমাণ ঐ এক ঘণ্টা স্থির হয়ে বসে থাকা।

নিজের ভীতু স্বভাবের সঙ্গে, দুর্বল স্নায়ুর সঙ্গে, অনেক যুঝেছে সে, বুকের অকারণ কম্পনকে দমন করবার প্রাণপণ চেষ্টা করেছে। তারপর সোজাসুজি আত্মসমর্পণ করেছে সে তারই কাছে—গত দীর্ঘকাল সব কিছু ভাল-মন্দ আশা-আকাঙ্ক্ষায় যার ওপর সে নির্বিচারে নির্ভর ক'রে এসেছে।

তার স্বামী বিভূতির কাছে।

সে নেই—বহু হাজার মাইল দূরে সে—তাই তার ছবিখানার কাছে এসেই দাঁড়িয়েছিল। হয়ত তাকেই প্রশ্ন করেছিল, 'তুমিই বলে দাও, কি করব। খুলব, না খুলব না।'

সাধারণ স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক নয় যে তাদের।

সুদীর্ঘকালের সম্বন্ধ। সুদীর্ঘকালের বন্ধন।

হ্যাঁ, তাদেরও ভালবাসার বিয়ে, কিন্তু 'লভ-ম্যারেজ' বলতে যা বোঝায় তা নয়। দেহের প্রতি দেহের সহজ আকর্ষণ—যা আজকাল প্রেম বলে চলছে, তার প্রতি অবজ্ঞার অন্ত ছিল না সতীর। আর হয়ত সেদিন বিভূতিরও। অনেকদিন ধরে, একটু একটু ক'রে ওদের আত্মায়-আত্মায় জড়িয়ে গেছে, হৃদয়ের সব কটি তন্ত্রীই গিঁঠ বেঁধেছে পরস্পরের সঙ্গে। ওরা বহুকাল থেকে একাত্ম হয়ে গেছে।

সে তো কমদিনের কথাও নয়।

বিভূতি তখন সেকেণ্ড ক্লাসে পড়ে, সতী একতটুকু মেয়ে। বিভূতির তখনই দীর্ঘ স্বচ্ছন্দ দেহ, সাহেবদের মতো গৌর কান্তি, মিষ্ট স্বভাব। খেলাধুলো এবং পাঠে সমান অনুরক্তি। আর সতীর শ্যামবর্ণ, ঈষৎ মেদল থস্‌থসে দেহ। বিষম

ডানপিটে, পড়াশুনোয় বিন্দুমাত্র আগ্রহ নেই, সব সময়ই গাছকোমর বেঁধে পাড়ার অন্য মেয়েদের ওপর সর্দারী ক'রে ঘুরে বেড়ায়।

শহরতলীর এই অঞ্চলটার স্থায়ী বাসিন্দা ওরা। বিভূতির বাবা বদলী হয়ে আসবার পর বছরখানেকের জন্যে এইখানে বাসা করেছিলেন।

দৈবের নির্বন্ধ বলেই বোধ হয় খুঁজে খুঁজে সতীদের পাশের বাড়িটিই ভাড়া নিয়েছিলেন ওঁরা।

সে-ই ওদের দেখা।

শান্তস্বভাবের ছেলেদের বুঝি ডানপিটে দুর্দান্ত স্বভাবের মেয়েদের প্রতি একটা সহজাত আকর্ষণ থাকে—অথবা এটা ছেলে-মেয়ে সকলের পক্ষেই প্রযোজ্য। বিভূতিও সতীর প্রতি আকৃষ্ট হ'ল। কিন্তু তবু সেটাকে প্রণয় বলা চলে না কোন মতেই। নেহাৎই আকর্ষণ মাত্র। আর সেই আকর্ষণ বা স্নেহের সুযোগ নিয়েই একদিন সতীর মা বলে বসলেন, 'মেয়েটা কিছুতে লেখাপড়া করতে চায় না বাবা, কি করি বলো তো? ঐ তো রূপের ছিরি, পয়সার বলও তেমন নেই—এর পর পার করব কি ক'রে! আজকালকার দিনে একটু লেখা-পড়া না হ'লে চলে?'

বিভূতিরও কি ঝোঁক হ'ল—সে বললে, 'কিচ্ছু ভাববেন না মাসীমা, আমি ওকে পড়াব এবার থেকে।'

'তুমি কি পারবে বাবা, কত বাধা-বাঘা মাস্টার রাখলুম, সবাই হার মেনে গেল। একে গবেট তায় এতটুকু চেষ্টা নেই।'

'দেখি না।' সংক্ষেপে বলেছিল বিভূতি, 'চেষ্টা করতে দোষ কি!'

কিন্তু মুখে বলবার সময় যতটা সহজ মনে হয়েছিল—কার্যক্ষেত্রে তত সহজ তো রইলই না, বরং বিষম কঠিন হয়ে দাঁড়াল ব্যাপারটা। সতী যৎপরোনাস্তি জেদী এবং প্রবলা। তাকে বাগ মানানো বিভূতির অসাধ্য হয়ে উঠল প্রায়। বিস্তর দুর্বাক্য, মুখনাড়া—এমন কি আড়ালে-আবডালে কিল-ঘুষি চড়-চাপড়ও খেতে হ'ল বিভূতিকে। কিন্তু তবু বিভূতি হার মানল না। অবশ্য গোড়া থেকেই সে একটু নতুন পথে গিয়েছিল। শাসন করে বশ মানাতে যায় নি, খোশামোদে বশ করতে চেষ্টা করেছিল। তার ফলে শেষ পর্যন্ত একসময় খানিকটা বাগে আনতে পারলও সতীকে।

কিন্তু দুর্বাক্য ও মুখনাড়া শুধু এখানে নয়, অন্যত্রও খেতে হ'ল বিভূতিকে।

হোক্ এতটুকু একরত্তি মেয়ে—তবু মেয়ে তো! তার সঙ্গে এত মাখামাখির কি দরকার? বিশেষ তোমারও যখন সামনে 'পাসের পড়া' আসছে। এতখানি ক'রে সময় নষ্ট করা কি উচিত?

বিভূতিকে খুবই শান্ত স্বভাবের ছেলে মনে করত সবাই, কিন্তু কার্যকালে দেখা গেল জিদ তারও কম নয়। ওর বাবা-মা অনেক চেষ্টা করলেন কিন্তু তবু এই বিনা মাইনের টিউশানী বন্ধ করতে পারলেন না। তখন ওঁরা বাড়ি দেখে অন্য পাড়ায় চলে গেলেন। ভাবলেন দূরে গেলেই এ আপদ দূর হবে।

কিন্তু তা হ'ল না। ফার্স্ট ক্লাসে উঠে ইস্কুল বদল করা গেল না। এ পাড়াতেই আসতে হ'ত পড়তে। ইস্কুলের ছুটির পরও খেলার নাম ক'রে রয়ে যেত সে কিন্তু খেলাটা আর হ'ত না—সোজা এসে উঠত সতীদের বাড়ি। এত দিনে অবশ্য সতীরও লেখাপড়ায় মন বসেছে,—হয়ত সুদর্শন কিশোর শিক্ষকটির জন্যেই—তবে সত্যিই ওর মাথাটা ছিল মোটা, তাই পড়াটা মাথায় ঢোকাতে রীতিমত পরিশ্রম করতে হ'ত বিভূতিকে। কিন্তু সেটা সে হাসি-মুখেই করত, একদিনও ক্লান্তি বা বিরক্তি প্রকাশ করে নি, হাল ছাড়ে নি।

যথা সময়ে ম্যাট্রিক পাস ক'রে কলেজে ঢুকল বিভূতি; কিন্তু ইচ্ছে করেই এই অঞ্চলের কলেজ বেছে নিলে সে, যাতে সতীকে পড়ানো না বন্ধ করতে হয়।

এত দিনে বাড়িতেও খবরটা জানাজানি হয়ে গিয়েছিল বইকি!

কিন্তু বিভূতির বাবা-মাও এত দিনে ছেলের প্রকৃতিটা জেনেছিলেন, তাই বৃথা একটা অপ্রীতির সৃষ্টি করতে চান নি। বিশেষ ক'রে, এই অকারণ সময় নষ্ট করা সত্ত্বেও যে ছেলে স্কলারশিপ পেয়ে পাস করতে পারে, সে ছেলে সম্বন্ধে একটা সমীহর ভাবও মনে আসা স্বাভাবিক।

আই. এস্. সি.তেও স্কলারশিপ পেল বিভূতি। ওর বাবা ওকে শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে ভর্তি করে দিলেন এবং পড়াশুনোর অসুবিধা হবে এই অজুহাতে হোস্টেলে থাকার ব্যবস্থা ক'রে দিলেন। কিন্তু তাতে দৈনিক পড়াতে আসাটা বন্ধ হ'ল বটে—শনি-রবিবারে আসাটা অব্যাহত রইল। ততদিনে

সতীও ম্যাট্রিক ক্লাসে উঠেছে—রোজ রোজ পড়াবার আর প্রয়োজনও ছিল না। তাছাড়া শনিবার সন্ধ্যায় ও রবিবার তুপুরে অনেকখানি সময় দিয়ে বিভূতি অন্য দিনের ক্ষতিটা পুষিয়েও দিত।

সতী ম্যাট্রিক পাস করার পরই ওর বাবাকে রিটায়ার করতে হ'ল। সংসারে টানাটানি, তিনি ঐখানেই মেয়ের পড়ায় পূর্ণচ্ছেদ টানতে চাইলেন। কিন্তু বিভূতি কিছুতেই তা হ'তে দিল না। সে নিজেই চেষ্টা-চরিত্র ক'রে সতীকে একটা অল্প বেতনের ও অল্প দায়িত্বের টিউশানী যোগাড় ক'রে দিলে। তাতে ওর কলেজের মাইনেটা হ'ল—বাকী খরচ, বই খাতা ইত্যাদি বিভূতিই প্রাণ-পণে যোগাতে লাগল,—নিজের স্কলারশিপের (ততদিনে ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজে বৃত্তি পেতে শুরু করেছে) টাকা জমিয়ে, হাত খরচের টাকা জমিয়ে—প্রয়োজন হ'লে বন্ধু-বান্ধবদের কাছে ধার ক'রেও।

•

বিভূতি ইঞ্জিনীয়ারিং পরীক্ষায় প্রথম হয়ে বেরোল। ফলে সরকারী চাকরি ও বিদেশ যাবার বৃত্তি—তুই-ই ওর দিকে এগিয়ে এল সাগ্রহে। ওর বাবা-মা বললেন, 'চাকরি নাও।' সতী বলল, 'বিলেত যাও, কত আশা তোমার। আর কত সম্ভাবনা! এখন থেকে চাকরিতে ঢুকে পড়বে কেন? চাকরি মানেই তো সব আশা-আকাঙ্ক্ষার সমাধি।'

'কিন্তু তুমি?' জিজ্ঞাসা করে বিভূতি, 'তোমার কি হবে?'

'আমি ঠিক চালিয়ে নেব। তা যদি না-ই পারব তো এত কাল কি গুরু-গিরি করলে?—আমি কি তোমার উপযুক্ত শিষ্যা হ'তে পারি নি ভাবছ?—আমি পড়েই যাবো—তোমার মাথা হেঁট করব না। তুমি নিশ্চিন্ত থাকো।'

বিভূতি নিশ্চিন্ত হয়ে বিলেত যাবারই তোড়জোড় করতে লাগল। ও জানত সবে যুদ্ধ থেমেছে, ওখানে এখন বিস্তর লোকের দরকার—বৃত্তিতে না কুলোলে ও কিছু উপার্জনও ক'রে নিতে পারবে। তাই বাবার প্রবল অনিচ্ছাও গায়ে মাখল না।

তখন মা বললেন, 'তাহলে আগে বিয়ে দেব তোর, বিলেত যেতে হয় বিয়ে করে যা।'

'বিয়ে!' চমকে উঠল বটে বিভূতি কিন্তু তারপর চুপ ক'রে রইল অনেকক্ষণ,

প্রবল প্রতিবাদ করল না।

এতদিনে ওদের মনের কথাটা পরস্পরের কাছে আর অবিদিত নেই, দু'জনের অন্তরের চেহারাটা দু'জনেই দেখতে পেয়েছে স্পষ্ট।

সতী আর বিভূতি—পরস্পরের জন্মেই তৈরী হয়েছে ওরা।

বিভূতি অনেকক্ষণ চুপ ক'রে থেকে জানালে বিয়ে সে করতে পারে—কিন্তু সে কেবলমাত্র তার মনোমত ও মনোনীত পাত্রীকেই—অর্থাৎ সতীকে।

আবার একটা ঝড় উঠল, প্রচণ্ড, প্রবল।

কান্নাকাটি, মান-অভিমান,—শাপ-শাপান্ত, গালাগালি।

অবশেষে বিচক্ষণ আত্মীয়রা এসে বিভূতির বাবা-মাকে বোঝাল : 'ছেলেকে তো চেনো, যা ধরেছে তা ও করবেই। ঐ মেয়েটা যে এই আট ন' বছর ধ'রে ঘাড়ে চেপে আছে ওর—নামাতে পেরেছ ? মিছিমিছি আর কেলেঙ্কারী বাড়িও না। অমন ছেলে, বিলেত থেকেই মোটা মাইনের চাকরি নিয়ে আসবে নিশ্চয়। তখন যদি ঐ কেলুটি ধুমসীকে বিয়ে ক'রে শ্বশুরবাড়িতে গিয়ে ঢোকে—সেটা কি ভাল হবে ? ঐখানেই সব টাকা ঢালবে তো তখন ?'

ক্রমশ এঁরাও সেটা বুঝলেন।

বিলাত যাত্রার আগে বেশ ঘটা ক'রেই বিয়েটা হয়ে গেল ওদের। কিন্তু স্ত্রীকে নিজেদের বাড়িতে রেখে যেতে সাহস করল না বিভূতি। এঁদের বিদ্বেষ এবং বিরুদ্ধ মনোভাব যে কাটে নি তা সে জানত। সতীর তেজী ও জেদী স্বভাবের কথাও ওর অজানা নয়। সুতরাং পড়াশুনোর অজুহাতে স্ত্রীকে তার বাপের বাড়িতেই রাখবার বন্দোবস্ত ক'রে নিশ্চিন্ত হয়ে বিলেত রওনা হয়ে গেল সে।

তারপর এই দীর্ঘ সাড়ে চার বছর কেটে গিয়েছে।

কথা ছিল বিভূতি দু'বছরের মধ্যে চলে আসিবে। কিন্তু দু'বছর পরে সে জানাল যে, খুব বড় একটা প্রতিষ্ঠানে সে মোটা মাইনের কাজ পেয়েছে। সেখানে ভারতীয়দের চাকরি পাওয়াই রীতিমতো সৌভাগ্যের কথা। সুতরাং এখন আর সে দেশে ফিরবে না। কিছুদিন কাজ করার পর ছুটি পাওনা হলেই সে ওখানে একটা বাসা ঠিক ক'রে একেবারে এসে স্ত্রী ও কন্যাকে নিয়ে যাবে।

মেয়েকে সে দেখে নি। সতীর চিঠিতে মেয়ে বেশ মোটাসোটা হয়েছে শুনে নাম রেখেছিল 'হাবলী'। লিখত যে, সতীর চেয়েও—এখন তার না-দেখা মেয়ের ওপর টান বেশী, মেয়ের জন্যেই মন ছটফট করে। সতী লিখত, 'বেশ বেশ, এসে মেয়েকেই নিয়ে যেও। আমি যাব না।' কিন্তু সে যে খুশীই হ'ত—সেটা ঐ কৃত্রিম কোপে ঢাকা পড়ত না।

কিন্তু চাকরি শুরু করার এক বছর পরেও বিভূতি এল না।

চিঠিপত্রও কমে এল ক্রমশ। ওখানে গিয়ে আগে আগে প্রতি সপ্তাহে চিঠি দিত সে—নিয়মিত। যাবার আগে বলেছিল, 'রোজ চিঠি দেব ' সতী বলেছিল, 'তাহলে পড়াশুনো কাজকর্ম করবে কখন? রোজ দেবার দরকার নেই—হপ্তায় একখানা দিলেই বাঁচি।'

প্রথম বছর সপ্তাহে একখানা ক'রে দিত। দ্বিতীয় বছর সেটা দাঁড়াল পনেরো দিন অন্তর। অজুহাত লিখত—'কাজ বড্ড বেড়ে গিয়েছে, দিনে-রাতে একটু বিশ্রামের অবকাশ নেই। তুমি কিন্তু লিখো ঠিক!'

চাকরি পাবার পর আরও কমে এল। এক মাস, শেষে দু' মাস অন্তর। ক্রমে তাও আর আসত না।

সতীও চিঠি কমিয়ে দিলে। কারণ লিখতে গেলেই তার ভাষা তীব্র হয়ে উঠত। নিজের কলমকে সংযত করতে পারত না। চিরকালই তেজ তার একটু বেশি। মা বলতেন, 'মেজাজ; ওর মেজাজের জন্যে কোথাও কারও ঘর করতে পারবে না!' বার বার বলতেন, 'মেয়েছেলের অত তেজ ভাল নয়।' তার সেই চির-উদ্ধত মাথা আজ হেঁট হ'তে বসেছে স্বামীর অবহেলা-উপেক্ষায়। বাপের বাড়ির লোকেরা করুণার চোখে দেখে, শ্বশুরবাড়ির লোকেরা প্রকাশ্যে বিদ্রূপ করে। দুটোই সমান অসহ্য। সুতরাং বিভূতিকে চিঠি লিখতে গেলে শুধু জ্বালাই উদ্‌গীরিত হয় সে চিঠির ছত্রে ছত্রে।

চিঠি না দিক, চাকরি পাবার পর বিভূতি ওকে টাকা পাঠাত নিয়মিত। ক্রমশ তারও প্রেরণ-কালের ব্যবধানে বাড়তে বাড়তে ও অঙ্কের পরিমাণ কমতে কমতে একেবারে বন্ধ হয়ে এল। এমন কি প্রথম দু'বছর নিজের অবসর সময়ের সামান্য উপার্জন থেকেও মধ্যে মধ্যে যা পাঠাত, এখন সেটুকু পরিমাণও আর আসত না।

অবশ্য টাকার কথা ওকে লেখেও নি সতী কোন দিন। সে এম.এ. পড়তে পড়তে বিশ্ববিদ্যালয় ছেড়ে দিয়েছিল। বাপের বাড়ির অবস্থা খারাপ, শ্বশুরের কাছে হাত পাততে তার আত্মসম্মানে বাধত। অগত্যা সে একটা চাকরিই যোগাড় ক'রে নিয়েছিল। সামান্য আয় হ'লেও নিজের উপার্জন—বাপ-মাকে দিতেও ওর সঙ্কোচ হ'ত না, তাঁদেরও হাত পেতে সেটা নিতে খুব বেশি কুণ্ঠার কারণ থাকত না।

অবশ্য অভিমানিনী সতী এ কথাও জানায় নি স্বামীকে।

ক্রমশ একটু একটু ক'রে নানা কানাঘুষো কানে পৌঁছতে লাগল।

হিতাকাঙ্ক্ষী বন্ধুর অভাব কারুরই হয় না—কোন দেশে, কোন কালে—যারা পয়সা খরচ ক'রে বা ক্লেশ স্বীকার ক'রে এসে দুঃসংবাদ পৌঁছে দিয়ে যায়। সতীরও এমন বন্ধু বা আত্মীয়ের অভাব ছিল না। আর বিলেত তো আজকাল এঘর-ওঘর। বিভূতি অবশ্য লণ্ডনে থাকত না। ওখান থেকে অনেক দূরে স্কটল্যাণ্ডের একটা শিল্প-নগরীতে সে চাকরি করত—সেখানেই থাকতে হ'ত, কিন্তু লণ্ডনে 'উইক্-এণ্ড' করতে আসত সে প্রায় প্রত্যেক সপ্তাহেই। সুতরাং বহু চেনাশুনো লোকের সঙ্গেই দেখা হ'ত ওর। তাছাড়া—ওর কর্মক্ষেত্রেও বিস্তর ভারতীয় লোক ছিল। গুজব ছড়াবার লোকের অভাব হ'ত না।

অসংখ্য গুজব। মুখরোচক কাহিনী। কেচ্ছা বলাই উচিত বরং।

আগে যেখানে ছিল বিভূতি, সেখানে নাকি একটি পোশাকের দোকানের Mannequin-এর সঙ্গে ওর ঘনিষ্ঠতা হয় প্রথমে। তাকে নিয়ে সিনেমায় যেত, নাইট ক্লাবে যেত, পিক্‌নিক করতে যেত। কিন্তু তাতে খরচ ছিল কম। তাই স্বল্প আয় থেকেও এখানে পাঠাতে পারত কিছু। তারপর ওরই কারখানার একটি সহকর্মীর সঙ্গে খুব বেশী রকম বাড়াবাড়ি শুরু হয়। সে লীলা নাকি সঙ্কটে পরিণত হ'ত—কোনমতে টাকাকড়ি দিয়ে মিটিয়ে ফেলেছিল। সেই সময়েই বিস্তর দেনা হয়ে যায় ওর।

এ সবই কিন্তু এই চাকরি পাবার আগের কথা।

সব প্রাক্তন সম্পর্ক ছেড়ে দিয়ে নতুন জায়গায় নতুন আবহাওয়ায় একেবারে নতুন নির্মল জীবন আরম্ভ করবার সংকল্প নিয়েই হয়ত গিয়েছিল বিভূতি।

কিন্তু সেখানেও যে সতীর দুর্ভাগ্য ওৎ পেতে ছিল—তা কেউ জানত না।

যে কারখানায় কাজ নিয়েছিল বিভূতি, সেইখানকার অন্যতম ডিরেক্টরের একমাত্র মেয়ের সঙ্গে পরিচয় হয়ে গেল। এক নিমন্ত্রণ-বাড়িতে অভ্যাগত বহু তরুণের মধ্যে বিভূতিকেই চোখে লাগল তার। সহস্র শ্বেতাঙ্গের মধ্যে ভারতীয় বিভূতিকে কেন চোখে লাগল তা সেই প্রণয়ের দেবতাটি ছাড়া আর কেউ বোধ হয় বলতে পারবে না। বাপের আদরিণী একমাত্র কন্যা। চিরকাল ইচ্ছামাত্র বাসনা পুরণ হ'তে অভ্যস্ত সে। তাই সমস্ত বাধা অতিক্রম ক'রে বিভূতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা ক'রে ফেলল। বিভূতিও অভিভূত হয়ে পড়ল। তার ওদিকে প্রবণতা তো ছিলই—গত সমস্ত ইতিহাসই সে প্রবণতার সাক্ষ্য দেয়—তার উপর মেয়েটি অপূর্ব সুন্দরী, শিক্ষিতা এবং রুচিসম্পন্না। তার পোশাক ও প্রসাধনের খ্যাতি সারা ব্রিটেনে গল্পের বস্তু।

এর আগের দুটি ঘটনা নিতান্তই সাময়িক মোহ, নিতান্ত জৈব আকর্ষণ। তাতে দেহের প্রয়োজন মেটে মাত্র, মনের তৃষ্ণা তৃপ্ত হয় না, আত্মা সঙ্গিনী পায় না। কিন্তু এটা দাঁড়াল রীতিমত প্রণয়ে।

মেয়েটির নাম স্টেলা।

স্টেলার বাবা প্রথমটা বিচলিত হন নি। হেসে উড়িয়ে দিয়েছিলেন সবটাই —দু'দিনের খেয়াল মনে ক'রে। এত ভাল ভাল সুপাত্র যার প্রসাদাকাঙ্ক্ষায় লালায়িত হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে সে যে ঐ 'কালা' ছোকরাকে দীর্ঘস্থায়ী কোন প্রশ্রয় দেবে—তা ছিল ওঁর কল্পনারও অতীত। পরে যখন দেখলেন যে ব্যাপারটা গভীরতর পরিণতির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে তখন প্রাণপণেই বাধা দিতে গেলেন। তবে সমস্ত জিনিসটাই তখন তাঁর সাধ্যের বাইরে চলে গেছে—সে বাধায় কোন ফল হ'ল না।

চিরকাল মুখের কথা খসা মাত্র মেয়ের সমস্ত আবদার পুরণ করেছেন—এখন শাসন করতে গেলে ফল বিপরীত হওয়ার সম্ভাবনাই তো বেশি। আত্মীয়-স্বজনরা ধিক্কারে মুখর হয়ে উঠল, সমাজে মুখ দেখানো ভার হয়ে উঠল স্টেলার বাবার—কিন্তু স্টেলা নির্বিকার।

বিভূতিও ততদিনে একেবারে ডুবেছে।

বিলাসিনী ধনীকন্যার সঙ্গে প্রণয়লীলার তাল রাখতে গিয়ে সে প্রায়

সর্বস্বান্ত হয়ে উঠল, কিন্তু নেশা তার কমল না, বরং বেড়েই চলল। মনে হ'ল এ-ই ওর যথার্থ জীবনসঙ্গিনী। এরই জন্মে এতকাল ওর সমস্ত অন্তর উন্মুখ, তৃষার্ত হয়ে ছিল।

অবশেষে স্টেলার বাবা মেয়ের খেয়ালের কাছেই আত্মসমর্পণ করলেন। অথবা করতে বাধ্য হলেন।

ছেলেটি 'কালা'—এই একমাত্র দোষ। নইলে আর সব দিক দিয়েই ভাল, এটা তিনিও স্বীকার করেন। তবে কিনা ঐ সামান্য দোষটুকু তাঁদের সমাজ-জীবনে অসামান্য। কিন্তু কি আর করবেন! মেয়েকে ত্যাগ করা তাঁর পক্ষে অসম্ভব। ছেলেটি লেখাপড়ায় কাজেকর্মে সবদিক দিয়েই ভাল। তিনি নিজে বিত্তশালী, এ কারখানার একজন অংশীদারও বটেন। জামাইকে উচ্চতর পদে বসাতে চাইলে কেউই বাধা দেবে না—বরং বাকী মালিকেরা সে প্রস্তাবে সাগ্রহ সম্মতি দেবে, তা-ও তিনি জানেন। এর মধ্যে বিভূতির বুদ্ধি ও কর্মপ্রতিভা স্বীকার ক'রে নিয়েছেন তাঁরা।

অতএব দু'জনের বিবাহ সম্বন্ধ ঠিক হয়ে গেল।

তবে—যদি কোন কারণে মেয়ে কোনদিন মত বদলায়, এই সুদূর এবং ক্ষীণ আশায় বিবাহের দিনটা নানা অছিলায় পিছিয়ে দিলেন স্টেলার বাবা অনেকখানি। প্রায় মাস ছয়েক। বাবা এতটা নরম হয়েছেন দেখে—এই সামান্য ব্যাপারে বেশী পীড়াপীড়ি করল না স্টেলা। তাছাড়া প্রণয়লীলার উগ্র মাদক-রসে তখন তারা ভরপুর, মশগুল। কোন কিছুতেই অকারণ বেশী জিদ করার মতো তাদের মনের অবস্থা নয়।

অভিজাতবংশীয়া, শিক্ষিতা, নৃত্যগীতনিপুণা, অপূর্ব প্রসাধনপটিয়সী, স্বর্ণ-কুন্তলা, তন্বী, আদর্শ লীলাসহচরী স্টেলার প্রখর দীপ্তির আড়ালে স্থূলদেহা, স্থূলবুদ্ধি শ্যামাঙ্গী সতী কোথায় কোন্ অবজ্ঞাত ছায়ায় মিলিয়ে যাবে—সেইটাই তো স্বাভাবিক!

সব কথাই কানে আসছিল সতীর। একটার পর একটা।

প্রথমটা বিশ্বাস করে নি। রাগ করেছে, তর্ক করেছে। বলেছে পরের কথায় স্বামীকে অবিশ্বাস করব কেন?

কিন্তু ক্রমে ক্রমে বিশ্বাস করতে হয়েছে।

দশমুখে ধর্ম। এতগুলো লোক মিথ্যা বলতে পারে না। কিন্তু তবু অভিমানে এ কথার উল্লেখ পর্যন্ত করে নি তার পত্রে কোন দিন। ঘৃণা বোধ হয়েছে তার—এই প্রসঙ্গ তুলে স্বামীর সঙ্গে বিবাদ করতে।

তারপর একদিন এই সর্বশেষ তথ্যটিও কানে এসে পৌঁছল।

বিবাহের তারিখ ঠিক হয়ে গেছে। কাগজে এন্‌গেজমেন্টের কথা ছাপা হয়েছে। ওর এক মামাশ্বশুর বিলেত থেকে সেই অংশটুকু কেটে পাঠিয়ে দিয়েছেন। সেটা এ বাড়িতে এসে পৌঁছতেও দেরি হয় নি।

শুনল যে শাশুড়ী হরির লুট দিয়েছেন খবরটা পেয়ে। ছেলে মেম বিয়ে ক'রে চিরকালের মতো প্রবাস-বাসী হয় সে-ও ভাল, তবু সতী তো জব্দ হ'ল। তার তেজ তো ভাঙল!

বহু বন্ধু বহু পরামর্শ দিলেন। আত্মীয়রা অনেকেই বাড়ি বয়ে উপদেশ দিতে এলেন—অর্থাৎ এই দুঃসংবাদটা উপভোগ করতে।

সবাই প্রায় এক কথা বললেন, 'স্টেলার বাবাকে সব কথা খুলে জানিয়ে চিঠি দাও। আর একটা বিয়ে আছে জানলে সে কখনও মেয়ের বিয়ে দেবে না ওর সঙ্গে। সে বেটিও পিছিয়ে যাবে নিশ্চয়।'

কেউ কেউ বলল, 'স্টেলাকেই চিঠি দাও। সে-ই হবে মোক্ষম কামড়।'

ওর শ্বশুর পুরুষমানুষ—ব্যক্তিগত অপমানের চেয়ে আর্থিক লোকসান তাঁর কাছে বড়। অবশেষে তিনি একদিন এলেন সব লাজলজ্জা ঘুচিয়ে—স্ত্রীকে গোপন ক'রেই অবশ্য। তিনি বললেন, 'তুমি নিজে বিলেত চলে যাও মা। আমি সব খরচা দিচ্ছি। তুমি গিয়ে পড়লেই সব ভেস্তে যাবে। নইলে শুধু চিঠি লিখে কোন কাজ হবে বলে মনে হয় না। মিছে কথা, মিথ্যা রটনা বলে উড়িয়ে দেবে ওরা।'

সতী চুপ ক'রে রইল। 'হাঁ' 'না' কোন কথাই বললে না।

এ ক'দিনই এমনি চুপ ক'রে আছে সে। সকলের সব উপদেশ শুনে গেছে, সায়ও দেয় নি, প্রতিবাদও করে নি।

আসলে ও বুঝি পাথরই হয়ে গিয়েছিল ভিতরে ভিতরে, কোন কিছু ভাল ক'রে তলিয়ে ভাববার বা বোঝবারও ক্ষমতা ছিল না ওর।

শ্বশুরের পীড়াপীড়িতে শেষ পর্যন্ত সংক্ষেপে শুধু বললে, 'আমি একটু ভেবে দেখি বাবা, আমাকে একটু সময় দিন।'

শ্বশুর এসেছিলেন সন্ধ্যার পর। তিনি চলে গেলেন যখন, তখন রাত্র হয়ে এসেছে।

সতী সেইখানেই বসে রইল—চুপ ক'রে, একভাবে। ওর মুখ-চোখের সেই ভাবলেশহীন বর্ণহীন নিশ্চলতা দেখে ওর বাবা, মা, ভাইবোন কেউ কথা কইতে সাহস করল না এমন কি খেতেও ডাকল না কেউ।

বহুক্ষণ পরে উঠে সতী স্বামীকে চিঠি লিখতে বসল। শ্বশুরের পীড়াপীড়িতে একটা জরুরী প্রশ্নের সামনে দাঁড়িয়ে সে মনের সক্রিয়তা খুঁজে পেয়েছে খানিকটা।

লিখল—

"শ্রীচরণেষু, আমি সব কথাই শুনেছি। এতদিন উল্লেখ করি নি তোমার প্রতি ঘৃণায় নয়, নিজের প্রতি ঘৃণাতেই। স্টেলার কথাও শুনেছি। তোমাদের engagement-এর সংবাদ ছাপার অক্ষরেও দেখলাম। তোমারই মেজমামা কাটিং পাঠিয়েছেন ওখান থেকে।

ঠিকই হয়েছে, তোমাকে আমি দোষ দিই না। এইটেই ভুল করেছিলে, মাঝের দুটো ঘটনাও। শেষটা ভুল নয়। স্টেলাই তোমার যথার্থ সঙ্গিনী।

তুমি জান না—চিরদিনই আমি তোমাকে মনে মনে পুজো করেছি। হয়ত তুমি যতটা বড় তার চেয়েও বড় আসনে বসিয়েছি তোমাকে – আমার মনের আসনে। তাই দু'জনের তফাৎটাও চোখে পড়েছে চিরকালই, মনে মনে লজ্জা পেয়েছি। তোমার মহত্ত্বেও অভিভূত হয়েছি।

মহত্ত্ব চিরস্থায়ী হবে অথবা ভুলের বোঝা তুমি চিরদিন বয়ে বেড়াবে, এমন আশা আমি করি না। তুমি সুখী হও, অন্তরের সঙ্গে এই কামনাই করেছি—আজও করছি। সুখী হতে গেলে নিষ্কণ্টকও হওয়া দরকার। আমাদের বিবাহটা তোমার জীবনে একটা দুশ্চিন্তা হয়ে থাকে বা চিরকাল মনের মধ্যে অস্বস্তির কারণ হয়ে থাকে, তা আমি চাই না। তাছাড়া নিজের মনের ওপরেও তেমন বিশ্বাস রাখতে পারছি কই? এর পর কোন দিন যে তোমাকে বিব্রত করতে ইচ্ছে হবে না তা কি জোর ক'রে বলতে পারি? সুতরাং আইনতঃ যদি তোমাকে

মুক্তি দেবার কোন উপায় থাকে তো জানিও। কী করতে হবে বলো, তাই করব। আমি তো কিছু জানি না। উকীলের কাছে গিয়ে পরামর্শ করার উৎসাহ বা অবসর কোনটাই নেই। তুমিই যা পরামর্শ করতে হয় করো। মেয়ের জন্য ভেবো না, যদি বেঁচে থাকি তো মানুষ করব। যদি মরে যাই—তুমি দেখো। প্রণাম নিও।

ইতি—তোমার সতী।"

পরের দিন এয়ার মেলে চিঠি পাঠিয়ে দিয়ে যেন কতকটা সহজ হয়ে উঠল সতী। অনেকদিন পরে হেসে কথা কইল সকলের সঙ্গে, ভাল ক'রে খেল। কী লিখল সে স্বামীকে, কেনই বা হঠাৎ এতটা নিশ্চিন্ত হয়ে উঠল—সে সম্বন্ধে কৌতূহল যথেষ্ট থাকলেও এঁরা কেউ ভরসা ক'রে জিজ্ঞাসা করতে পারলেন না। এইটুকু শুধু বুঝলেন ওঁরা যে, বহুদিনের অস্থিরতা ও অনিশ্চয়তার মধ্যে কিছু একটা মনস্থির করতে পেরেই খানিকটা হাল্‌কা হয়েছে সে।

সেই চিঠিরই জবাব এসেছিল আজ।

বিভূতির হাতের লেখা। খামে-আঁটা ভারী চিঠি একখানা।

ছোট ভাই প্রায় ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে ছুটতে এসে চিঠিখানা দিলে ওর হাতে।

কেমন একটা অর্ধ অবিশ্বাসের সঙ্গে, একটা আশঙ্কা-মিশ্রিত অন্যমনস্কতার সঙ্গে চিঠিখানা হাত বাড়িয়ে নিলে সে।

বেলা তিনটে বাজে তখন। তখনও কলে জল আসে নি। বাড়ির সামনের রাস্তা ইস্কুল-ফিরতি ছেলেমেয়েদের কোলাহলে মুখর হয়ে ওঠে নি। আরম্ভ হয় নি আশপাশের বাড়িতে ঝিয়েদের বাসনমাজা ও বকুনি। হেমন্তের অলস অপরাহ্ণ কেমন একটা বিষণ্ণ নিস্তব্ধতার আমেজ লাগিয়ে দিয়েছে চারিদিকে। —এখনই দিনের আলো ম্লান হয়ে এসেছে, এরই মধ্যে রোদ উঠে গেছে পাশের বাড়ির কানিশে।

মেয়েটা তার দিদিমার কাছে শুয়ে ঘুমোচ্ছে তখনও।

ক'দিন পাওনা ছুটি ভোগ করছিল সতী, নইলে এসময় সে থাকে না।

চিঠিখানা হাতে নিয়ে ঠিকানার লেখাটা দেখল সে। উল্টো দিকে প্রেরকের

নাম ঠিকানাটাও দেখে নিল। হাতে ক'রে খামখানা ঈষৎ নাচিয়ে যেন ওজনটা বোঝবার চেষ্টা করল। মনে হ'ল অনেক কিছু লিখেছে নিশ্চয়, বেশ কয়েক পাতা। চিঠিখানা আবার কোলের ওপর নামিয়ে রেখে জানলা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে বসে রইল সে।

হঠাৎ ভারী ভাল লাগছে আজ; চারিদিকের এই শান্ত নিস্তব্ধতা। এই মলিন অলস অপরাহ্ণ।

ভাগ্যিস চিঠিখানা এখন এসেছিল।

ছোট ভাইটা সামান্য একটুখানি অপেক্ষা ক'রে থেকে আবার খেলতে গেছে। দিদি ও জামাইবাবুর ব্যাপারটা সে খানিকটা জানে, আন্দাজ করে হয়ত একটু বেশি—কিন্তু সে সম্বন্ধে এত মাথাব্যথা নেই যে খেলা ফেলে দীর্ঘকাল অপেক্ষা করবে।

বাবা, মা ঘুমোচ্ছেন। বাকী সকলেই বাড়ির বাইরে।

আঃ! বেশ লাগছে এই নির্জনতা ও নিঃসঙ্গতা।

অসংখ্য কৌতূহলী চোখ ও নীরব প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয় নি ভাগ্যিস। হাজারটা কৈফিয়তের প্যাঁচে পড়তে হ'ত নইলে। চিঠিখানা ভাল ক'রে পড়াও হ'ত না।

আচ্ছা, এত কি লিখেছে বিভূতি?

কি লিখেছে অনুমান করবে সে?—নিজের এমন একটা নৈর্ব্যক্তিক নিরাসক্তিতে সতী যেন নিজেই অবাক হয়ে যায়!—মন্দ কি!

খুব উচ্ছ্বাস করেছে নিশ্চয়, বিভূতির যে কোনও দোষ ছিল না—নিতান্ত পাকেচক্রে পড়ে এই কাজ করতে হ'ল তাকে—সেইটেই প্রমাণ করতে চেয়েছে সে প্রাণপণে। এবং সেই অসংখ্য বাজে কথা ও মিছে কথার পর তার আসল কথাটি আছে। এখন পিছিয়ে গেলে এমন ভাল চাকরিটা যাবে, এত বড় বড় লোক শত্রু হয়ে উঠবে, হয়ত ক্ষতিপূরণের প্রশ্নও উঠবে; সুতরাং সব দিক বুঝে সতী যেন তার অযোগ্য ও অপদার্থ স্বামীকে ক্ষমা করে।

অথবা হয়ত সতী যা বলেছে সেই সম্বন্ধেই উপদেশ আছে খুঁটিনাটি। হয়ত ছাপা ফর্মই পাঠিয়েছে একগাদা, সেইগুলো সতীকে পূরণ করে পাঠাতে হবে।

কিংবা আছে অজস্র অযাচিত উপদেশ।

সতী এখন কি কি করতে পারে, কি করলে এখনও তার জীবন সার্থকতার পথ খুঁজে পায়—কোন্ পথে নিজেকে বিকশিত করতে পারে—সেই সম্বন্ধেই সহস্র উপদেশ ও সান্ত্বনা। হয়ত কিছু টাকা দেবার প্রস্তাবও আছে ওর মধ্যে। হয়ত বলেছে যে বিবাহ-বিচ্ছেদের পর সতী যদি আবার বিবাহ করতে চায় তো—তার জন্য বিভূতির যা করণীয় তাতে সে পিছপাও হবে না। ইত্যাদি—

কথাগুলো মনে করতে করতেই ম্লান একটু হাসল সতী।

হঠাৎ মনে পড়ে গেল ওর, এমনিই এক হেমন্তের অপরাহ্নে প্রথম ওদের বাড়িতে এসেছিল বিভূতি; হাফ্-প্যাণ্ট আর শার্ট পরা সুশ্রী কিশোর, লজ্জায় মাথাটি একটু নত, ঈষৎ রক্তিম হয়ে উঠেছে সুগোর ললাট—তার দিকে চেয়ে সেদিন সেই বয়সেই চোখ ফেরাতে পারে নি সতী।

সে কত দিনের কথা?

খুব বেশী দিন কি? বারো বছর? চোদ্দ বছর? না আরও বেশী?

ছায়াছবির মতো ঘটনাগুলো দ্রুত মনের পর্দায় পড়েই সরে সরে যেতে থাকে। তুচ্ছ তুচ্ছ ঘটনা, কবেকার বিস্মৃত দিনের ছোট ছোট কাহিনী। সেগুলো ভুলে গেছে বলেই একটা অস্পষ্ট ধারণা ছিল ওর। আশ্চর্য! প্রত্যেকটি ছবিই এখনও এমন স্পষ্ট মনে পড়তে পারে—অত দিন আগেকার সাধারণ দিনের সামান্য সব ঘটনা?

মনে পড়তে লাগল, বিভূতি কত সহ্য করেছে ওর জন্যে। কত লড়াই করতে হয়েছে তাকে তার বাপ-মা আত্মীয়-স্বজনদের সঙ্গে, প্রতিকূল ঘটনার সঙ্গে। হয়ত অদৃষ্টের সঙ্গেও।

কি বিপুল পরিশ্রম করেছে সে সতীকে লেখাপড়া শেখাতে, উপযুক্ত সঙ্গিনী ক'রে তুলতে। সময়ের কি বিপুল অপচয় করেছে সে। সে সময় নিজের পড়াশুনোর দিকে মন দিতে পারলে হয়ত আরও বড় হ'ত সে।

কত কি তুচ্ছাতিতুচ্ছ স্নেহের নিদর্শন। অথচ সতীর কাছে কত মূল্যবান সে সব।

এক-আধদিন পড়াতে পড়াতে রাগ ক'রে কিশোর বিভূতি চড়চাপড়ও মেরেছে ওকে। তখন রাগ করেছে, অভিমান করেছে, কেঁদেছে। কিন্তু পরে সেই সব স্মৃতিরই পুলকানুভূতিতে রোমাঞ্চ জেগেছে ওর সর্বদেহে। কতখানি

জোর থাকলে কতখানি আপন মনে করলে অনাত্মীয় কিশোরী মেয়ের গায়ে হাত তুলতে পারে কোন তরুণ ছেলে—সেইটে ভেবেই ওর সেই রোমাঞ্চ অনুভূতি!

আবার মারধোর করার পর ওর অভিমান ভাঙাতে যে সব মিষ্টি কথা বলত বিভূতি—পৃথিবীতে বুঝি তারও তুলনা নেই। কথা এত মিষ্টি ক'রে বিভূতির মতন আর কেউ বলতে পারে, আজও এ কথা বিশ্বাস করে না সতী।

এই বিয়ের ব্যাপারেই কম ত্যাগ স্বীকার করেছে সে, কম মনের জোর দেখিয়েছে? অমন ভাল ছেলে, রূপবান, স্বাস্থ্যবান, কৃতী, বিত্তশালী পিতার পুত্র—বাংলাদেশের যে-কোন সুন্দরী শিক্ষিতা ধনীকন্যাই তো তাকে পেলে তপস্যা সার্থক মনে করত! সে সব মেয়েকে পেলে বিভূতির নিজের জীবনেও অনেক সুযোগ-সুবিধার দ্বার খুলে যেত। কিন্তু সে সুবিধার কথা ভাবে নি। ভেবেছে সতীর কথাই।

ওঃ, কি কষ্টই পেয়েছে সে সেদিন। কি লড়াই-ই না করতে হয়েছে তাকে। সমস্ত পরিবার তো বটেই, বলতে গেলে সমস্ত আত্মীয়-সমাজই তার বিরুদ্ধে একজোট হয়েছিল। বাইরের সহস্র দ্বন্দ্বে মানুষ অবিচলিত থাকতে পারে কিন্তু ঘরের দ্বন্দ্ব-সংঘাত যে অসহ্য! খুব বেশী মনের জোর এবং নিষ্ঠা না থাকলে সে সংঘাতে কেউ মন স্থির রাখতে পারে না। ওর প্রতি সেই ঐকান্তিক প্রেম এবং প্রেমের প্রতি সেই অবিচল নিষ্ঠারই কি পরিচয় দেয় নি বিভূতি সেদিন?

তবে, সে সব কি মিথ্যা? ছলনা?

না না। তা হ'তে পারে না। সতী মনে মনে স্বীকার করে। অনুভব করে যে বিভূতির সেদিনের সে আচরণে ফাঁকি ছিল না, মিথ্যা ছিল না।

হয়ত আজকের এটাও সত্য—কিন্তু তাই বলে সেদিনের সেটাও কম সত্য নয়। দুটোই সত্য বিভূতির জীবনে।

তবে? আজ যেটুকু পেলে না, সেটুকুর জন্য একদা যা পেয়েছিল তাকে অস্বীকার করবে কেমন করে?

যা পেয়েছে তাতে তো অন্তর ভরে গেছে ওর। তবে আবার এ কাঙালপনা কেন? কেন এ সূক্ষ্ম ঈর্ষা, কেন এ বেদনা-বোধ, কেন এ জ্বালা!

না, না। ওগো তুমি সুখী হও, তুমি নিশ্চিন্ত হও। সতীর কোন দুঃখ নেই।

ওদের ঠিকে-ঝি এসেছে। কলে বসেছে বাসন নিয়ে। ঠুং-ঠাং ঘস-ঘস শব্দ শুরু হয়েছে বাসন মাজার।

এখনই মেয়েটা উঠবে। ওকে দুধ খাওয়াতে হবে, সাজাতে হবে। ছোট বোন ফিরবে কলেজ থেকে। ভাইরাও।

প্রাত্যহিক জীবন শুরু হয়ে যাবে। জীবন থেকে সরে দাঁড়িয়ে এমন ভাবে তাকে দেখবার সুযোগ বা অবসর থাকবে না আর।

সতী চিঠিখানা হাতে ক'রেই উঠে পড়ল। অন্যমনস্ক ভাবে পায়ে পায়ে এসে দাঁড়াল এ ঘরে, যেখানে জানলার পাশে বিভূতির এনলার্জ-করা ছবিটা টাঙানো আছে, সেইখানে।

অপরাহ্নের আলো ম্লান হয়ে এসেছে। কিন্তু তবু যেন জ্বলজ্বল করছে ছবি-খানা। ওর কাছে চিরদিনই ও মূর্তি এমনই উজ্জ্বল হয়ে থাকবে।

'ওগো শুনছ! তুমি সুখী হও, তুমি সুখী হও। কোন ক্ষোভ নেই তোমার সতীর, কোন দুঃখ নেই। বিশ্বাস করো। যা দিয়েছ তুমি এতদিন ধরে আমার মনের পাত্র ভরে গেছে তাতে। আজ আমি পূর্ণ, আমি তৃপ্ত। আরও চেয়ে তোমাকে বিব্রত করব না। ওগো এ আমার অভিমানের কথা নয়, তুমি বিশ্বাস করো—এ সত্যি, সত্যি!'

সতীর মনে হ'ল সত্যিই তার বড় আনন্দ হচ্ছে। কোন্ এক অনির্বচনীয় তৃপ্তিতে ভরে গেছে তার মন। এত আনন্দ যেন চেপে রাখতে পারছে না। খুশির জোয়ার ডেকেছে মনে। সমস্ত দেহ সে খুশিতে অবশ, আচ্ছন্ন হয়ে আসছে। বুকটার কাছে ব্যথা করছে? তা করুক।

'আচ্ছা! তুমি রাগ করো নি তো? এত যে কড়া কথা বলেছি এতদিন?—করো নি? আঃ! আর কোন দুঃখ নেই। সত্যি বলছি! বিশ্বাস করো তুমি, বিশ্বাস করো। আর কখনো অমন ক'রে লিখব না!'

ধীরে ধীরে, একটু একটু ক'রে যেন মেঝেতে এলিয়ে পড়ে সতী।

তাই তার পড়বার শব্দটাও কারুর কানে যায় না।

* * *

খামখানা তখন খোলা হয় নি। শোকবিহ্বল বাপ-মা শুধু সযত্নে সরিয়ে রেখেছিলেন।

দাহ করে ফিরে আসার পর সমবেত শোকার্ত আত্মীয়স্বজন যখন প্রথমে মনে মনে, পরে মুখে জিজ্ঞাসু হয়ে উঠলেন সতীর মৃত্যুর কারণ সম্বন্ধে, তখনই না চিঠিটার কথা মনে পড়ল। তবু সঙ্কোচ একটা ছিল বই কি সকলের মনে। অবশেষে সতীর ঠিক পরের বোনটিই শেষ পর্যন্ত ভরসা ক'রে খামখানা খুলে ফেলল।

হ্যাঁ, উচ্ছ্বাস ছিল বৈ কি। কিন্তু হয়ত সতী যা অনুমান করেছিল তা নয়। অনুতপ্ত হয়েছিল, ক্ষমা প্রার্থনাও করেছিল—কিন্তু এই ধরণের অনুতাপ ও ক্ষমা-প্রার্থনা অনুমান করতে পারে নি সতী।

যদি পারত!

লিখেছিল বিভূতি ঃ

"অদ্ভুত একটা মোহতন্দ্রায় যেন ডুবে গিয়েছিলাম সতী, যেন হারিয়ে ফেলেছিলাম নিজেকে। যে বিভূতিকে তুমি চিনতে, যাকে তুমি ভালবেসেছিলে, সে বিভূতি যেন ছিল না কোথাও। হঠাৎ তোমার চিঠিটা পেতেই সে তন্দ্রা গেল টুটে, সে মোহ হ'ল অপগত। আবার ফিরে পেলাম নিজেকে। ভুল ভাঙল। বুঝলাম, নিজের কি সর্বনাশ করতে যাচ্ছিলাম। না সতী, তুমি ছাড়া আমার জীবনের সঙ্গিনী কেউ হতে পারে না। তুমিই আমার আত্মার আনন্দ। আমার যেটা আসল সত্তা সেটার সঙ্গে তুমিই জড়িয়ে আছ পাকে-পাকে। কার সাধ্য সে বাঁধন খোলে! তুমি যে কত মহীয়সী, আর সকলের চেয়ে কত বড়, সেই পরিচয়ই নতুন ক'রে পেলাম তোমার চিঠিতে। ভাগ্যিস তুমি রাগ ক'রে, অভিমান ক'রে চিঠি লেখ নি সতী!

শোন, আমি চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে দিয়েছি। বিয়েও ভেঙে দিয়েছি। সামনের সপ্তাহেই ফিরে যাচ্ছি দেশে, ওখানে আমার চাকরির অভাব হবে না। এত টাকা না-ই বা পেলাম। তুমি তো থাকবে পাশে।

এখানে চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে যে চিঠি দিয়েছি, তারই নকল এবং ইতিমধ্যে ফ্রান্সের এক বিরাট কোম্পানী থেকে মোটা মাইনের চাকরির offer

দিয়ে যে চিঠি দিয়েছে সেখানা আসলই—পাঠালুম এই সঙ্গে। পড়ে দেখলেই বুঝতে পারবে, আমার সমস্ত পার্থিব উন্নতির চেয়েই তুমি বেশি, তুমি বড়।

এটাকে খুব বেশি ত্যাগ স্বীকার মনে ক'রে কোন সঙ্কোচ অনুভব ক'রো না। আমি আজ পূর্ণ, আমি তৃপ্ত। আমার কোন দুঃখ নেই, কোন ক্ষোভ নেই। সত্যি বলছি তোমাকে। বিশ্বাস করো।"

সংস্কার

রিসিভারটা যথাস্থানে নামিয়ে রেখে মুখার্জি সাহেব অন্যমনস্ক ভাবেই জানলার ধারে এসে দাঁড়ালেন। পাইপটা হাতে আছে বটে—তবে তাতে আগুন নেই, দেশলাই জ্বালিয়ে ধরাবার মতো উৎসাহও নেই তাঁর।

সংবাদটা একেবারেই অপ্রত্যাশিত বৈ কি। আর যাই হোক, এ খবরের জন্য তিনি প্রস্তুত ছিলেন না। সুদূরতম কল্পনাতেও ছিল না কথাটা। টেলিফোনে বড় সাহেবের গলা পেয়ে প্রথমটা ভেবেছিলেন অফিস-সংক্রান্ত কোন ব্যাপারেই কথা কইতে চান তিনি। মুখার্জি সাহেবের যে বাবা আছেন বা ছিলেন—এ এ সম্বন্ধেই তো কোন সচেতনতা ছিল না তাঁর। যিনি আছেন তিনিই মরতে পারেন। যিনি আছেন কি নেই—

তবু তিনি মারা গেছেন এটা ঠিক। এইমাত্র তাঁর ওপরওলা ফোন ক'রে জানালেন যে কলকাতা থেকে অফিসে ট্রাঙ্ক-কল এসেছে—মুখার্জি সাহেবের বাবা নাকি আজ দুপুরবেলা রাস্তায় চলতে চলতে অজ্ঞান হয়ে পড়ে গিয়েছিলেন, হাসপাতালে যেতে যেতে মারা গেছেন। হাসপাতাল থেকেই তাঁদের বাড়িতে খবর দিয়েছে—মুখার্জি সাহেবের স্ত্রীর কাছে। মিসেস মুখার্জি তখনই স্বামীকে কনেক্‌ট্ করবার চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু সাড়া পান নি, তাই অগত্যা শ্রীবাস্তবকেই জানাতে বাধ্য হয়েছেন। মুখার্জি যদি এখনই রওনা হ'তে পারেন তো ভাল হয়, ওঁরা কাল ভোর পর্যন্ত সৎকার স্থগিত রাখবেন।

এই পর্যন্ত সংবাদ, তারপর আর একটু মিঃ শ্রীবাস্তব যোগ ক'রে দিয়েছেন—পৌনে পাঁচটার প্লেন যদি মিঃ মুখার্জি ধরতে পারেন তো ভালই, নইলে নাইট প্লেনে যেন অবশ্যই চলে যান, অফিসের কাজের জন্য ভাবনা নেই,

শ্রীবাস্তব জরুরী কাজগুলো নিজেই দেখেশুনে চালিয়ে নেবেন।···শেষে একটু সহানুভূতিও জানিয়েছেন বড় সাহেব, সেই সঙ্গে মামুলি সান্ত্বনাও খানিকটা। আশা প্রকাশ করেছেন যে, ঈশ্বর এই শোক সামলাবার মতো শক্তি দেবেন মিঃ মুখার্জিকে। সব শেষে মিসেস মুখার্জির জন্য একটুখানি শ্রদ্ধা ও প্রীতি-মেশানো বাণী। আই-সি-এস অফিসার শ্রীবাস্তব কর্তব্য পালন করতে জানেন, আর নিখুঁতভাবেই সেটুকু করেছেন।

ছি ছি, মিনুর এতটুকু বুদ্ধি নেই। সব জেনে শুনেও সে শ্রীবাস্তবকে ফোন করতে গেল! একবার পায় নি তাঁকে, আর একবার চেষ্টা করতে পারত। এখন এই এক হাজার জবাবদিহির মধ্যে পড়তে হবে তাঁকে—আর অবাঞ্ছিত সব সহানুভূতি! কালই ওঁর অফিসের কর্মচারীদের মধ্যে প্রতিযোগিতা লেগে যাবে—কে কতখানি সহানুভূতি দেখাতে পারে মুখার্জি সাহেবের এই শোকে। শোক—! শোকই বটে!···মিনু তো সবই জানে, মিছিমিছি—। তারও কি হঠাৎ এই মৃত্যুর সামনে দাঁড়িয়ে মাথা খারাপ হয়ে গেল নাকি? সে কি সত্যিই আশা করে যে প্রবীর মুখার্জি গিয়ে 'শোকসন্তপ্ত চিত্তে' বাপের মুখাগ্নি করবেন, কাছা গলায় দেবেন এবং শেষ পর্যন্ত মাথা কামিয়ে শ্রাদ্ধ করতে বসবেন!

অবশ্য, এখন যা পরিস্থিতি হ'ল—বাহ্যিক ব্যাপারটা বজায় রাখতেই হবে। অন্ততঃ দিন কয়েকের জন্য কোথাও গিয়ে মাথাটা কামিয়ে আসতে হবে।··

মাথা কামানো—এবং সেটা ঢাকবার জন্যে সেই একটা কিম্ভূতকিমাকার টুপি পরার ব্যাপার।

কথাটা মনে পড়তেই নতুন ক'রে রাগটা বেড়ে যায় স্ত্রীর ওপর—কতকটা নিজের ওপরও বটে। আজই বা তিনি হেঁটে আসবার নাটকটা করতে গেলেন কেন!

কোনদিনই নির্দিষ্ট সময়ের আগে তিনি অফিস থেকে বেরোন না, বরং এক-একদিন দেরিই হয়। বড়বাবুদের কাজ শেষ হবার জন্য অপেক্ষা করতে হয়। আজই দুপুরবেলা কী একটা যে হ'ল—অকারণে কেমন একটা মন খারাপ—হঠাৎ—শ্রীবাস্তবকে বলে বেরিয়ে পড়লেন অফিস থেকে, সেই বেলা দেড়টার সময়। তখন ভেবেছিলেন স্ত্রী-পুত্রের বিচ্ছেদই এটার মূল কারণ—এখন মনের অবচেতনে একটা সংশয় কেবলই উঁকি মারছে; একেই কি সাইকিক্ যোগা-

যোগ বলে ?…না না, 'গস অ্যাণ্ড ননসেন্‌স্‌'।…মিনু ছেলেকে ডাক্তার দেখাতে কলকাতা গেছে, সেইটেই আসল কারণ নিশ্চয়। কিছুদিন থেকেই লিভারটা ভাল যাচ্ছে না ছেলেটার, ডাঃ চৌধুরীকে দেখানো দরকার; মোটে তিনদিন গেছে বটে কিন্তু শিশু-পুত্রের বিচ্ছেদ, তিনদিনই যথেষ্ট।…

প্রবীর টেবিলের ধারে ফিরে এসে দেশলাইটা সংগ্রহ করলেন কিন্তু জ্বালা হ'ল না তবুও। আবারও এসে দাঁড়ালেন জানলার ধারে। ছুটির সময় হয়ে গেছে--জনস্রোত চলেছে নিউ দিল্লীর রাস্তা দিয়ে—সাইকেলের মালা একেবারে; স্কুটার, টাঙ্গা, গাড়ি, ট্যাক্সি—জনবিরল পথ হঠাৎ যেন জেগে উঠেছে।

অফিসে থাকলেও হ'ত। কিংবা যদি তখনই সোজা চলে আসতেন বাড়িতে—

গাড়ি গ্যারেজে তুলে দিতে বলে দুপুরের নির্জন পথে হাঁটতে হাঁটতে গিয়েছিলেন 'ওডিয়ন', সন্ধ্যার শোর একখানা টিকিট কেটে আবার হাঁটতে হাঁটতেই বাড়ি ফিরেছেন। পথ খুব কম নয়—কিন্তু অনেকদিন পরে হাঁটলেন বলে ভালই লাগল।

এই পাগলামি যদি না চাপত মাথায়, তাহ'লে মিনুর টেলিফোনটা তিনিই প্রথম ধরতে পারতেন—আর তাহ'লে চুপি চুপি তাকে সাবধান করে দেওয়া চলত, এ সব নিয়ে অকারণ হৈ-চৈ যেন না করে।…পকেটে সিনেমার টিকিটটা খসখস ক'রে উঠল। তাড়াতাড়ি হাতঘড়িটা আলোতে মেলে ধরে দেখলেন, আর বেশি দেরি নেই। যেতে হ'লে এখনই যাওয়া উচিত।…মন খারাপ ছিল বলেই টিকিটটা কেটেছিলেন—কিন্তু, এখন আর সিনেমাতে যাওয়ার মতো মানসিক অবস্থাও নেই। দুঃখিত? আদৌ না। শোকার্ত তো নয়ই—উত্যক্ত বলাই বোধহয় ঠিক।

না। টিকিটটা নষ্টই হ'ল। আর কাউকে দিয়ে দিলে হ'ত বোধহয়। কিন্তু কাকেই বা দেবেন। সাড়ে তিন টাকার টিকিট চাকরবাকরদের দেওয়া ঠিক নয়।

.

রহমান বাবুর্চি চায়ের সরঞ্জাম নিয়ে ঘরে ঢুকল। মুখার্জি সাহেব চায়ের হুকুম করেন নি—তিনি একটু বিস্মিতই হলেন—রহমান কখন দেখে গেছে

সাহেবকে ঘরে দাঁড়িয়ে থাকতে, বুদ্ধি ক'রে একেবারে নিয়েই এসেছে। মিস্থ শাসিয়ে গেছে বারবার, সাহেবের যদি একটুকু অযত্ন হয় তো রক্ষা থাকবে না। সে ট্রেখানা টিপয়ে রেখে সবসুদ্ধ ধরে জানলার কাছেই এনে বসিয়ে একখানা চেয়ার সরিয়ে দিয়ে গেল। শেষ শীতের অপরাহ্ন, ঘরের মধ্যে ইতিমধ্যেই বেশ অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছে। কিন্তু রহমান জানে সাহেব এই সময়ের দিবালোক পছন্দ করেন—উনি ঘরে থাকলে আলো জ্বালতে দেন না কিছুতেই। তাই সে-চেষ্টাও সে করলে না।

মুখার্জি সাহেব চা দেখে অবাক হয়ে গেলেও খুশি হলেন খুব। অনেক-খানি হেঁটে এসেছেন! যেমন ক্ষিদে পেয়েছে, তেমনি তেষ্টা। বাড়ি ফিরেই চায়ের ফরমাশ করবেন ভাবতে ভাবতেই এসেছিলেন, সব গোলমাল হয়ে গেল ঐ টেলিফোনটা এসেই—

টেবিলে বসে আগেই খানিকটা চা ঢেলে নিলেন। বলতে গেলে এক নিঃশ্বাসে আধ পেয়ালা চা খেয়ে নিয়ে আহার্যের দিকে তাকালেন মুখার্জি সাহেব। ওমলেট, কেক, সন্দেশ আর টোস্ট। সবগুলিই তাঁর প্রিয় খাদ্য। ছুরি-কাঁটা ধরে প্রথমেই ওমলেট খানিকটা কেটে নিলেন—কাঁটায় বিঁধলেনও, কিন্তু কে জানে কেন, শেষ পর্যন্ত খেতে ইচ্ছা হ'ল না। কেকও খেলেন না। টোস্ট ও সন্দেশ দিয়ে চায়ের পর্ব শেষ ক'রে—চেয়ারটা একেবারে জানলার কাছে এনে পাইপ ধরিয়ে বসলেন।

বাইরে জনস্রোত ক্ষীণ হয়ে এসেছে, তবু এখনও পর্যন্ত মুখর আছে রাস্তা। দূরে কনট সার্কাসের আলোগুলো জ্বলজ্বলে হয়ে উঠল। বাইরেও বেশ অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছে।

কেন ডিমটা খেলেন না এবং ডিম দেওয়া কেক খেলেন না—এ প্রশ্নটা কিছুতেই মনে উঠতে দিলেন না মিঃ মুখার্জি। অশৌচ তিনি মানবেন না—এ ক্ষেত্রে অন্ততঃ নয়, মায়ের সময় তখন নতুন করে চিন্তা করা যাবে। তাঁর প্রশ্ন আলাদা।

বাবা?

বাবা তাঁর মারা গেছেন অনেকদিন। সত্যকিঙ্কর মুখোপাধ্যায় নামধেয় যে মানুষটি কলকাতার রাজপথে পড়ে মারা গেছে—সে ওঁর বাবা নয়।

ড়ী, মাতাল, চোর। সমাজের কলঙ্ক। ঘৃণ্য জীব সব। এ রকম কোন মানুষের মৃত্যুতে অশৌচ হয়—প্রবীর মুখার্জি তা স্বীকার করেন না। ও বাপের কাছে তাঁর কোন ঋণও নেই। ছিল হয়ত, শৈশবে কিছু স্নেহ তিনি পেয়েছেন—কিন্তু সে বহুকালের কথা। পিতারও কিছু ঋণ থাকে সন্তানের কাছে, এই পৃথিবীতে আনবার ঋণ। শৈশবে ও বাল্যে লালন করতে, প্রতিপালন করতে তিনি বাধ্য। সে কর্তব্যও পালন করেন নি সত্যকিঙ্কর। প্রবীরের যখন মোটে আট বছর বয়স, ছোট ভাইটার পাঁচ এবং বোনটির দুই—তখন থেকেই তিনি শুধু শত্রুতা ক'রে এসেছেন ওদের। হঠাৎ বড়মানুষ হওয়ার লোভে লটারীর টিকিট কিনতেন বরাবরই, ক্রমশঃ রেস খেলা ধরলেন। খেলাটা নেশায় পরিণত হতে কিছুমাত্র দেরি হয় নি। আর সেই নেশার রসদ যোগাতে অফিসের ক্যাশ ভাঙবেন—এ পথের এর চেয়ে স্বাভাবিক পরিণতি আর কি হ'তে পারে? সাহেবরা সব ক'জনই ভাল লোক ছিলেন, তাই জেলটা বাঁচল কিন্তু চাকরিটা রইল না কিছুতেই। অফিসের টাকা ভাঙবার পরও চাকরি থাকবে এটা আশা করাও যায় না।

তারপর আর চাকরি পান নি সত্যকিঙ্কর। আত্মীয়স্বজনদের কাছে (তখনও পর্যন্ত তেমন বোকা যে ক'জন ছিল) যা কিছু ধার করতে পেরেছিলেন তাই দিয়ে দু-তিনবার ব্যবসা করার চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু তার পরিণতিও তো জানা! সে সব টাকা যাওয়ার পর পৈতৃক বাড়ির অংশ, তারপর মার গহনা। টাকার শোক ও জীবনের ব্যর্থতা ভোলবার জন্যে মদ ধরলেন। সস্তা দামের দেশী মদ। পাড়ার যত পেঁচি মাতালদের সঙ্গে মেলামেশা শুরু হ'ল। শেষে বাড়ির বাসনকোসনও চুরি ক'রে বেচতে লাগলেন।

তখন মুখার্জি সাহেবের বয়স দশ বছরও পুরো হয় নি। ভাল সাহেবী ইস্কুলে ভর্তি হয়েছিলেন—সে সব ঘুচে গেল। পড়াশুনোর পাটই রইল না। খেতেই জোটে না, পড়াবে কে?

কিন্তু মিশনারী ইস্কুলের ঐ দু-তিনটি বছর ব্যর্থ হয় নি। ইতিমধ্যে শিক্ষায় সত্যকারের অনুরাগ জন্মে গিয়েছিল ঐটুকু ছেলেরই। বছরখানেক চুপ করে বাড়িতে বসে থাকবার পর একদিন নিজেই খুঁজতে খুঁজতে গিয়েছিলেন

পুরোনো ইস্কুলে এবং সাহেব রেক্টরের সঙ্গে দেখা ক'রে আনুপূর্বিক সব কথা অকপটে খুলে বলেছিলেন। তাঁর বুদ্ধিদীপ্ত মুখের আন্তরিকতা ও চোখের জল রেক্টরকে অভিভূত করেছিল। তিনি বলেছিলেন, 'বেশ, বিনা মাইনেতে পড়াবার ব্যবস্থা আমি ক'রে দিচ্ছি, বইও কিছু কিছু যোগাড় ক'রে দেব—কিন্তু তুমি কি এতটা পথ রোজ হেঁটে আসতে পারবে ? গাড়ির ব্যবস্থা তো হ'তে পারবে না।'

সাগ্রহে রাজী হয়েছিলেন প্রবীর। হাত বাড়িয়ে স্বর্গ পেয়েছিলেন যেন। সাড়ে তিন মাইল পথ, যাতায়াতে সাত মাইল, তবু ভয় পান নি তিনি। তার ভেতরও অর্ধেক দিন খাওয়া হ'ত না। সকাল থেকে চালের যোগাড় করতেই মায়ের অনেক বেলা হয়ে যেত—সেটা ছিল নিত্যকার সমস্যা। অথচ নটায় না বেরোলে সাড়ে দশটার আগে পৌঁছতে পারতেন না প্রবীর। একদিন ক্লাসের মধ্যেই মাথা ঘুরে পড়ে গিয়েছিলেন। শিক্ষকের মুখে সে খবর পেয়ে রেক্টর ডেকে পাঠিয়েছিলেন। কোন প্রশ্ন করেন নি তিনি, ওঁর নিরতিশয় শুষ্ক মুখের দিকে চেয়েই ব্যাপারটা অনুমান ক'রে নিয়েছিলেন। সেইদিন থেকে ব্যবস্থা করেছিলেন, টিফিনের সময় তাঁর ঘরে গিয়েই এক কাপ দুধ ও খানিকটা রুটি খেয়ে আসবেন প্রবীর।

এ অনুগ্রহের মর্যাদা রেখেছিলেন তিনি। প্রতি শ্রেণীতেই প্রথম হয়ে উঠেছিলেন। স্কুলের নিয়ম অনুসারে বৃত্তিও পেয়েছিলেন। প্রথম চার টাকা—তারপর ছয়, একেবারে ওপরে গিয়ে আট। কিন্তু এতেও কি শান্তিতে পড়তে পেরেছিলেন ? রাত্রে মদ খেয়ে এসে বাবা প্রতিদিনই অশান্তি করতেন। না, তাকে কোনদিন মারতে সাহস করেন নি—কিন্তু ভাই-বোনদের তো প্রতিদিনই, এমন কি মায়ের গায়েও হাত তুলতেন মধ্যে মধ্যে। ওর মা রাত জেগে ক্রুশ বুনে, অপরের জামা ওয়াড় সেলাই করে দু-চার পয়সা রোজগার ক'রে নিত্যকার অন্ন সংস্থান করতেন—সেই অন্ন খেতেন অনায়াসে, বেশ জুলুম ক'রেই। তার ওপর ছিল চুরি। পরের জামার কাপড় নিয়ে গিয়ে বেচে মদ খেতেন। সেই কাপড়ের গুণাগার দিতে বহু বিনিদ্র রজনীর পরিশ্রম যেত মায়ের। ছেলে-মেয়েদের পড়বার বই নিয়ে গিয়ে বেচে দিতেন মধ্যে মধ্যে। একদিন প্রবীর প্রতিবাদ করতে, ওঁর সব বই-খাতা ছিঁড়ে পুড়িয়ে দিয়েছিলেন

রাগ ক'রে। সে দুঃখ-দিনের তুলনা হয় না, ঐটুকু ছেলে মাথা খুড়ে মাথা রক্তাক্ত ক'রে ফেলেছিলেন মনে আছে।

ম্যাট্রিক পাস ক'রে আই. এস-সি পড়েছিলেন প্রবীর নিজের স্কলারশিপে। সেই সঙ্গে টিউশনিও করতে হয়েছিল, নইলে ভাই-বোনদের পড়ানো যেত না। বি. এস-সি পড়বার সময় দুটো টিউশনিও নিয়েছিলেন—তার ফলে ফার্স্ট ক্লাস অনার্স পান নি, কিন্তু উপায়ও ছিল না, মার শরীর একেবারে ভেঙে পড়ল, দুরারোগ্য রোগে পড়ল বোনটি, সংসারের চাল-ডাল-বাজারের ভারটা অন্ততঃ চালাতেই তো হবে!

কিন্তু সেই সময়েই একটি কাজ করেছিলেন—সত্যকিঙ্করকে ঘাড় ধরে বাড়ি থেকে বার ক'রে দিয়েছিলেন প্রবীর। এবং বলে দিয়েছিলেন যে, কোন দিন কোন কারণেই আর যেন বাড়িতে ঢোকবার চেষ্টা তিনি না করেন। সেদিন নিন্দায় মুখরিত হয়ে উঠেছিল পাড়া, পঞ্চমুখ হয়ে উঠেছিলেন আত্মীয়-সমাজ। এমন কাণ্ড কেউ কখনও শোনে নি। কিন্তু সে সব কোন সমালোচনাতেই কান দেন নি প্রবীর, গ্রাহ্য করে নি কাউকে। শুধু মনে আছে—ওঁর এক সম্পর্কীয় মাতামহ সংবাদটা পেয়ে সংক্ষেপে এক লাইন অভিনন্দন জানিয়েছিলেন, আর বাল্যের এক শিক্ষক বলেছিলেন, 'আমার হয়ত সাহসে কুলোত না বাবা, তবু তোমার সৎসাহসের প্রশংসাই করছি।'

এঁদের দু'জনকেই শ্রদ্ধা করতেন প্রবীর, সুতরাং এই দুটি সমর্থন অনেক-খানি মনের জোর জুগিয়েছিল তাঁকে।

তারপর বহুবার সত্যকিঙ্কর চেষ্টা করেছেন বাড়িতে ঢুকতে। বহু লোককে দিয়ে সুপারিশ করিয়েছেন কিন্তু এই একটা দিকে প্রবীর ছিলেন অটল। ভোর পাঁচটা থেকে রাত বারোটা অবধি পরিশ্রম করতে হয় তাঁকে—শান্তি একটু চাই-ই। তবে মাকে তিনি ব'লে দিয়েছিলেন, 'যদি তোমার ইচ্ছা হয় তুমি তোমার স্বামীকে নিয়ে ঘর করতে পারো—কিন্তু আমি অন্ততঃ সে-ঘরে থাকব না। ভাই-বোনদেরও আমি নিয়ে যাবো!' মা তাতে রাজী হন নি। স্বামীর প্রতি এতটুকু ভালবাসাও আর অবশিষ্ট থাকবার কোন কারণ ছিল না তাঁর।

পরবর্তী জীবনে—বড় সরকারী চাকরি পাওয়ার পর, ছোট ভাইয়ের অনুরোধেই, একটি কাজ তিনি করেছিলেন, একটা হোটেলে মাসিক খরচা

দিয়ে বন্দোবস্ত ক'রে দিয়েছিলেন—সেখানে ছ'বেলা খাওয়া এবং থাকার ব্যবস্থা হ'তে পারবে। এবং যদি সৎভাবে নিয়মিত থাকেন তো পরিধেয় কাপড়ও মিলবে, সেটা হোটেলওলাই দিয়ে ওঁর কাছে বিল করবে। হোটেলওলার টাকাটা তিনি দিল্লী থেকেই মনিঅর্ডার ক'রে পাঠান।

ছোট ভাইও অবশ্য মানুষ হয়ে উঠেছে, তবে তার শরীর ভাল নয়। বোনটি তো গেছেই—ভাইয়ের দেহেও বাল্যের অনশন এবং অর্ধাশন ছাপ রেখে গেছে প্রথমের। সে বেশি কিছু উপার্জন করতে পারে না। তার এবং মায়ের জন্য তিনি নিয়মিত খরচা পাঠান; মার পক্ষে রুগ্ন, দুর্বল ছেলেকে ফেলে আসা সম্ভব নয়—তা তিনি আশাও করেন না,—সেখানে একটা পুরো সংসারই চালাতে হয় বলতে গেলে। ভাই তো মোটে দুশোটি টাকা পায়, আরও আড়াই শো টাকা না হ'লে ভদ্রভাবে তাদের চলে না। সবই দেন প্রবীর, কিন্তু ঐ একটি শর্ত তাঁর—কোনদিন কোন কারণেই সত্যকিঙ্করকে সে বাড়িতেবা সে সংসারে ঢুকতে দেওয়া চলবে না। তাহ'লে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করবেন তিনি। ঐ শ্রেণীর লোককে আত্মীয় বলে স্বীকার করতে তিনি প্রস্তুত নন। বাবা বলে তো নয়ই।

অন্ধকার ঘর, কত রাত হয়েছে কিছুই টের পান নি মুখার্জি সাহেব। একেবারে চমক ভাঙল রহমানের কণ্ঠস্বরে, 'ডিনার রেডি হুয়া সাব!'

'ডিনার! কত রাত হয়েছে রহমান?'

'সাড়ে আট হো গিয়া সাব!'

সাড়ে আট! বিস্মিত প্রবীর রাস্তার দিকে তাকালেন। নিউ দিল্লীর রাস্তা জনবিরল হয়ে এসেছে। দূরে কনট সার্কাসের আলোও স্তিমিত হ'তে শুরু করেছে। অর্থাৎ দোকান-পশারের আলো নিভছে একে একে। কিছুক্ষণ আগেও সেখান থেকে টাঙ্গা ও ট্যাক্সির শব্দ এবং প্রমোদবিলাসী নরনারীর কণ্ঠস্বরের একটা মিলিত গুঞ্জন ভেসে আসছিল, কখন তাও ক্ষীণ হ'তে ক্ষীণতর হয়ে এসেছে, তা লক্ষ্যও করেন নি তিনি।

না, রাতই হয়েছে।

'ঠিক হ্যায়। তুম সার্ভ করো রহমান, ম্যয় গোসলখানা যাতা হুঁ!'

বাথরুমে গিয়ে অনেকক্ষণ ধরে স্নান করলেন প্রবীর। গরম জলে স্নান ক'রে অনেকটা যেন সুস্থ ও প্রকৃতিস্থ মনে হ'ল। অনেক কাজ তাঁর, এখনই খেতে খেতে একটা 'প্ল্যান' ছকে ফেলতে হবে। অকারণ বসে বসে স্মৃতির রোমন্থন করার মানুষ তিনি নন, ওসব তাঁর ভালও লাগে না। কলকাতায় তিনি যাবেন না—কাল ভোরেই একটা টেলিগ্রাম পাঠিয়ে দিয়ে তিনি সরে পড়বেন কোথাও। হরিদ্বার অথবা হৃষিকেশ—কিম্বা ওদিকে পুষ্কর। যেখানে বাঙালী তীর্থযাত্রী যাবে কিন্তু অফিসের লোকের সঙ্গে বিশেষ দেখা হবে না। সেইখানে দশটা দিন কাটিয়ে মাথা কামিয়ে ফিরে আসবেন তিনি। শ্রাদ্ধ? প্রতুল করতে চায় করুক, মিনুর যদি না-দেখা শ্বশুরের জন্যে এত দরদ উথলে থাকে তো সেও করতে পারে। তিনি বরং কিছু টাকা পাঠাতে রাজী আছেন কিন্তু নিজে ওসব ব্যাপারে নেই।…

মাথাটা ভাল ক'রে না আঁচড়েই কোনমতে একটা ড্রেসিং গাউন জড়িয়ে নিয়ে তাড়াতাড়ি এসে খেতে বসলেন মুখার্জি সাহেব। রহমান রাঁধে ভাল—ডিনারটা ঠাণ্ডা ক'রে লাভ নেই।

টেবিলে বসে একবার 'কোর্স'গুলোর দিকে চোখ বুলিয়ে নিলেন। সুপ, কাটলেট, ফাউল রোস্ট, পুডিং—আয়োজনে খুঁত নেই কোথাও।…তার সঙ্গে কিছু ফল, আপেল, কলা, লেবু—রসগোল্লাও কোথা থেকে যোগাড় হয়েছে দুটো।

পরিচিত এবং প্রিয় আহার্যের সুঘ্রাণ। মনটা প্রসন্ন হয়ে ওঠবারই কথা। যথেষ্ট উৎসাহ সহকারেই মুখার্জি সাহেব সুপ-প্লেটের উপর ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে নুন ও মরিচের গুঁড়ো ছড়ালেন। তারপর হাতা-মার্কা চামচে ক'রে মেশাতে লাগলেন সেটা।

কিন্তু মেশাতে মেশাতেই কেমন যেন উন্মনা অন্যমনস্ক হয়ে পড়লেন। শবটা এখনও হয়ত তাঁদের বাসাতেই পড়ে আছে। অপেক্ষা করছে তারা ওঁর জন্য। জ্যেষ্ঠ সন্তান গিয়ে মুখাগ্নি করবে! হুঁ!

আরও একবার সজোরে চামচটা ঘুরিয়ে নিলেন মুখার্জি। ওদের আর আজ খাওয়া হবে না। কাল ওঁর পৌঁছবার সময় দেখে তবে তারা শ্মশানে যাবে। ফিরতে ফিরতে অপরাহু। কালও বিশেষ কিছু খাওয়া হবে না। পরশু

শনিবার, সেদিনও হবিষ্যি হয় না।

এখনও এত মনে আছে তাঁর, আশ্চর্য!

অথচ তাঁকে সকলে পাকা সাহেব বলেই জানে।

আর কারো খাওয়া না হয়, সেজন্য ওঁর দুঃখ নেই। খোকনটাকেও উপোস করিয়ে রাখবে হয়ত। মিনু যা সেকেলে! আরও সবাইকে দেখিয়ে দেখিয়ে এ সব করবে, সে যে মেমসাহেব হয়ে যায় নি সেইটে প্রমাণ করার জন্যে।...একে ছেলেটার শরীর খারাপ—এই ক'দিনেই দেখছি আধমরা হয়ে যাবে। খোকনের জন্যই অন্ততঃ যাওয়া দরকার—

খোকনটা সুপ বড় ভালবাসে। সুপ আর রসগোল্লা—এই দুটি জিনিসই তৃপ্তি ক'রে খায়। আর কিছু দিতে এলে বলে, 'না না'—'না না।'

ছেলেবেলায় তিনিও রসগোল্লা ভালবাসতেন খুব। একেবারে যখন শিশু তখন বাবা রোজই রাত্রে তাঁর জন্যে রসগোল্লা নিয়ে আসতেন। তারপর ভাই হ'ল, বোনটি হ'ল—খাওয়ার লোক বাড়ল এবং আয় কমল, তখন আর রসগোল্লা আনতে পারতেন না, মির্জাপুর স্ট্রীটের কোথায় রসে ফেলা ক্ষুদে ক্ষুদে রসমুণ্ড করত—রসগোল্লারই 'বেবি-সাইজ'—এক পয়সায় চারটে, তাই নিয়ে আসতেন। বলতেন, 'একটু ছোট, তা তেমনি দুটো ক'রে পাচ্ছিস।'

এ কি, কার কথা ভাবছেন? বাবা কে? যে ব্যক্তি মরেছে সে নয়—সে সত্যকিঙ্কর মুখার্জি, তার সঙ্গে ওঁর কোন সম্পর্ক নেই। ওঁর বাবা, সেই শৈশবে যা কটি বছর পেয়েছিলেন তাঁকে, স্নেহময় সর্ব-উপদ্রবসহ। সে কটি বছর ফাঁক ছিল না পিতৃস্নেহে, ছিল না কোন ত্রুটি! সত্যি, আজ সব কথা মনে পড়লে—একে একে বহু টুকরো দিনের স্মৃতি ভিড় ক'রে দাঁড়াচ্ছে মনে—এইটেই মনে হয়, সেদিন ওঁর বাবাও ওঁকে এমনি ভালবাসতেন, যেমন উনি ভালবাসেন খোকনকে। শুধু যদি ঐ সর্বনেশে সাংঘাতিক নেশা না পেয়ে বসত তাঁকে—হঠাৎ বড়লোক হবার নেশাটা! মানুষটা এমনি মোটেই মন্দ ছিলেন না।

পয়সা পয়সা ক'রে ক্ষেপে উঠেছিলেন—আর ঐ এক নেশা থেকেই সব কিছু নেশা, সব বদভ্যাস।

কেবলই বলতেন মাকে, 'ভাখো না, ছেলেমেয়েগুলোকে প্রাণভরে খেতে

দিতে পারি না, ভাল ভাল জামা-কাপড় দিতে পারি না—এই কটা টাকা মাইনেতে কি হয় ? একদিনও যদি মোটামুটি কোথাও থেকে কিছু পাই ওদের আশাটা মিটিয়ে দিই।'

এই নেশার পেছনেও কি তাহ'লে ছিল তাঁদের প্রতিই স্নেহ, তাঁদের জন্যই উৎকণ্ঠা ?

সুপের প্লেটটা ঠেলে সরিয়ে দিলেন। ঠাণ্ডা হয়ে গেল ভাবতে ভাবতে। ঠাণ্ডা সুপ খাওয়া যায় না।...কাটলেটের প্লেটটা সামনে টেনে নিলেন মুখার্জি।

আইনত এখনও তাঁর অশৌচ হয় নি কিন্তু, শবদাহ না হ'লে অশৌচ শুরু হয় না। আশ্চর্য, অনেক নিয়মই এখনও তাঁর মনে আছে দেখছি!...

রক্তে আছে এ সংস্কার। পিতা মেনেছেন, পিতামহ মেনেছেন, প্রপিতামহ মেনেছেন। মাতামহ, প্রমাতামহ—সবাই। তাঁদের রক্ত বয়ে এনেছে তাঁদেরই সংস্কার, তাঁদের বিশ্বাস। পিতা, হ্যাঁ—পিতারও! রক্ত না হোক, অস্থি এবং মজ্জা এগুলোকে অস্বীকার করা যায় কি ক'রে? বাপের বীর্যেই নাকি অস্থি গঠিত হয়।...বাপের শব পড়ে আছে সেখানে—অশৌচ শুরু না হ'লেও বিধর্মী-পৃষ্ট মাংস আহার—তাঁরা কি এটা প্রসন্ন মনে মেনে নিতেন, তাঁর পূর্বপুরুষরা?

অস্থির হয়ে উঠে দাঁড়ালেন মুখার্জি সাহেব।

রহমান বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করল, 'কেয়া হুয়া সাব?'

'কুছ নেই। তুম যাও। আপনা কাম করো। তবিয়ৎ ঠিক নেহি। থোড়া দেরমে খায়েঙ্গে ডিনার!'

রহমান বহু দিনকার বাবুর্চি। বিস্ময় এবং কৌতূহল দমন করতে জানে। সে নিঃশব্দে সেলাম ক'রে চলে গেল।

আবারও জানলার ধারে এসে দাঁড়ালেন মুখার্জি।

যতই অস্বীকার করুন সত্যকিঙ্করকে, এই দেহটাকে যতক্ষণ না অস্বীকার করতে পারছেন—সম্পর্কটা একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। সমাজে বাস ক'রে তো নয়ই। মাথা তাঁকে কামাতেই হবে। তবু তো শুধু শ্রীবাস্তব জেনেছেন কথাটা। তিনি বাঙালী নন। তাঁর কোন বাঙালী সহকর্মী বা অধীনস্থ কর্মচারী জানলে, সহানুভূতি ও উপদেশ সশরীরে এখানে এসেই পৌঁছত। তখন তাদের

সামনে তাঁকে জুতোটা খুলতে হ'ত, তখন কিছুই খেতে পেতেন না। অর্থাৎ সত্যকিঙ্কর মুখোপাধ্যায়কে জীবদ্দশায় যতই অবহেলা করুন না কেন—মরে সুদসুদ্ধ পুষিয়ে নিতেন ভদ্রলোক।

না না—এসব কি ভাবছেন তিনি?

মুখার্জি সাহেব আবারও এসে টেবিলে বসলেন। কাটলেটাও অখাদ্য হয়ে গেছে। রোস্টের থালাটা টেনে নিয়ে ছুরি দিয়ে কাটতেই কেমন একটা গন্ধ এল নাকে—বিশ্রী। বোট্‌কা গন্ধ।

হঠাৎ এক-একটা কথা মনে পড়ে যায়। যখন বাবা পুরোপুরি অধঃপাতে যান নি, সবে মদ খেতে শুরু করেছেন, সেই সময় একদিন পকেটে ক'রে নিয়ে এসেছিলেন কোন এক বিখ্যাত হোটেলের (রেস্তোরাঁ বলার চলন হয় নি তখনও) চপ। ওঁকে বাইরে ডেকে নিয়ে চুপি চুপি পকেট থেকে বার ক'রে বলেছিলেন, 'খা। এখানে দাঁড়িয়ে খেয়ে নে। বেশি পয়সা ছিল না, একটার বেশি আনতে পারি নি। পতুটা আবার দেখতে পেলে বায়না ধরবে।'

স্নেহ ছিল বৈকি! নেশার ভূতে না পেলে, একেবারে পাগল হয়ে না গেলে এমন অমানুষ হয়তো হতেন না!

না, এ রোস্টটাও খাওয়া যাবে না। আজ রহমানের হল কি?

থাকগে। মুখার্জি মনে মনে বললেন, কি আর হবে একদিন মাংস না খেলে। তিনি পুডিং-এ চামচ ডুবোলেন। কিন্তু মুখে তুলতে গিয়েও তুলতে পারলেন না। অদ্ভুত একটা কথা, তাঁর পক্ষে অন্ততঃ অদ্ভুত, মনে হ'ল। যখন মাংসই খেলেন না, তখন এই ডিম দেওয়া পুডিংটাও না-ই খেলেন। মাথাও যখন কামাতে হবে, একটা বাহ্যিক 'শো' বজায় রাখতে হবে—তখন মিছিমিছি কি লাভ?

সামান্য কিছু ফল ও রসগোল্লা খেয়ে উঠে পড়লেন মুখার্জি সাহেব। আবার জানলার কাছে এসে দাঁড়ালেন।

কলকাতাতেই যাবেন নাকি শেষ পর্যন্ত? অর্থাৎ শেষের দিকে? একেবারেই যদি না যান—মার মনে হয়ত কোথাও একটা সূক্ষ্ম আঘাত লাগতে পারে। হাজার হোক তাঁর স্বামী, তাঁর সন্তানের পিতা। চিরদিনই তো লোকটা অমানুষ ছিলেন না, একসময় দু'জনের মধ্যে প্রীতির সম্পর্ক নিশ্চয় ছিল। সে

স্মৃতি কি আর মন থেকে মুছে গেছে একেবারে ? না, মাকে কষ্ট দেওয়া উচিত হবে না, মার কাছে তাঁর ঋণ ঢের। মা না থাকলে, মার কাছে উৎসাহ না পেলে, ঐ প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে মানুষ হ'তে পারতেন না কিছুতেই। তা-ছাড়া····· তাঁরা পাড়াতে, আত্মীয়স্বজনদের কাছেই বা কি জবাবদিহি করবেন ? প্রতুলটা অপ্রস্তুত হবে!

আরও একবার অস্থির হয়ে উঠে দাঁড়ালেন মুখার্জি।

যদি যেতেই হয়—আজ যেতেই বা বাধা কি ? সেইটেই বোধহয় সব দিক দিয়ে শোভন ও সঙ্গত হবে।

এখনও হয়ত নাইট প্লেনের সময় আছে। শ্রীবাস্তব তো বলেছেন অফিসের জন্যে ভাবতে হবে না।

মুখার্জি সাহেব টেলিফোনের রিসিভারটা তুলে নিলেন।

অভ্রান্ত

বিপদের আশঙ্কাটা যেদিক থেকে করা হয়েছিল—সেদিক থেকে আদৌ এল না—এল একেবারে বিপরীত দিক থেকে। শ্রীপতি ন্যায়ালঙ্কারের অব্যর্থ গণনা ফলল না—সুপ্রিয়ার বিয়েটা নির্বিঘ্নেই চুকে গেল। শুধু সামান্য একটু কাঁটা সকলের মনে বিঁধে রইল ঐ ঘটনাতেই ; যেন শ্রীপতির গণনা অন্ততঃ আংশিক সফল করবার জন্যেই তাঁর ছেলে মাধব প্রাণটা খোয়ালেন।

ঘটনাটা ঘটে গেল একেবারে আচমকা। ছাদের' আলসেতে ঠেস দিয়ে মাধব বিয়েবাড়ির রান্না তদারক করছিলেন। ছাদেরই এক দিকে রান্না হচ্ছিল—আর এক দিকে মাছ কোটা। মাছের কাছেই দাঁড়িয়ে পাহারা দিচ্ছিলেন তিনি। অকস্মাৎ পুরনো পাঁচিলের খানিকটা ধ্বসে পড়ে গেল—সেই সঙ্গে মাধবও।

হৈ-চৈ ছুটোছুটি পড়ে গেল চারিদিকে। তখনই য়্যাম্বুলেন্স ডাকা হ'ল। শ্রীপতিকেও খবর দেওয়া হয়েছিল কিন্তু তিনি তখন পূজোয় বসেছিলেন—কখনও কোন কারণেই পূজো শেষ না ক'রে তিনি ওঠেন না—স্ত্রীর মৃত্যুর সময় তাঁদের শেষ দেখা হয় নি, সে-ও ঐ এক কারণে। তাই তাঁকে জিজ্ঞাসা না

ক'রেই হাসপাতালে পাঠাতে হ'ল। পূজো শেষ ক'রে উঠে প্রায় ছুটতে ছুটতে হাসপাতালে গিয়েছিলেন শ্রীপতি।

কিন্তু সেখানে পৌঁছবার পর দেখা গেল—অতটা ব্যস্ত হবার কোন কারণ ছিল না। পাঁচিলটা ভেঙে পড়বার সময় প্রথম দফায় মাধব এসে পড়েছিলেন নিচের কল্‌কে গাছটার ডালে। তারপর অবশ্য সে ডাল ভেঙে মাটিতে এসে পড়েছিলেন বটে কিন্তু সামান্য একটু কাটাকুটি ছাড়া বিশেষ কিছু হয় নি, আর পড়বার দরুন আড়ষ্ট ব্যথা যা খানিকটা। হাড়-টাড় কোথাও ভেঙেছে বলে মনে হ'ল না—কারণ যন্ত্রণা, এমন কি কন্‌কনানিও কোথাও নেই।

তবু ডাক্তারেরা সারাদিন ওঁকে শুইয়ে রাখলেন। বিকেলের দিকে মাধব উঠে বসলেন, বেড়াতে বেড়াতে এসে বারান্দাতে দাঁড়ালেন। কাজেই শ্রীপতি যখন এসে ছেলেকে বাড়িতে নিয়ে যেতে চাইলেন এবং মাধবও খুব পীড়াপীড়ি করতে লাগলেন তখন আর ওঁকে আটকে রাখার কোন কারণ খুঁজে পেলেন না ডাক্তাররা, সাবধানে থাকবার মামুলী উপদেশ দিয়ে রিলিজ ক'রে দিলেন।

বাড়িতে এসে মাধব অবশ্য শুয়েই ছিলেন। সর্বাঙ্গে আড়ষ্ট ব্যথা একটা হয়েছে, সেটা অস্বীকার করার কোন উপায় নেই। কিন্তু সুপ্রিয়ার বিয়ের সময়টা আর শুয়ে থাকতে পারলেন না, বাবাকে বলে-কয়ে রাজী করিয়ে ছোট ভাইয়ের কাঁধে ভর দিয়ে বিয়ে-বাড়ি এসে হাজির হলেন। পাশাপাশি বাড়ি, তাছাড়া বিয়েটা হচ্ছিল নিচের উঠোনেই—সামান্য কয়েক পা হাঁটা ছাড়া আর কোন মেহনৎ নেই। সুপ্রিয়ার বাবা অপরেশবাবু তাড়াতাড়ি একটা কুশান-দেওয়া চেয়ার এনে বসিয়ে দিলেন ওঁকে—বসে-বসেই উনি বিয়েটা দেখলেন আগাগোড়া। বর-কনে বাসরে চলে যেতে উনিও ফেরার জন্য উঠে দাঁড়ালেন। সেই সময় ওঁকে একটু মিষ্টি খাবার জন্যে অনুরোধ করতে গিয়ে প্রথম অপরেশ-বাবু লক্ষ্য করলেন যে ওঁর নাক দিয়ে রক্ত গড়িয়ে পড়ছে—সামান্য সামান্য।

তখনই ওঁকে ধরাধরি করে বাড়ি নিয়ে আসা হ'ল। ছুটোছুটি ক'রে ডাক্তার ডাকাও হ'ল। তিনজন ডাক্তার এসে গেলেন দু'ঘণ্টার মধ্যে, কিন্তু কিছুতেই কিছু হ'ল না। রাত তিনটে নাগাদ মারা গেলেন মাধববাবু। ডাক্তাররা বললেন, মাথায় চোট লেগেছিল সেই সময়ই—তখন অতটা ধরা যায় নি। এখন সেই চোট থেকেই রক্তক্ষরণ হয়ে মারা গেলেন। সেরিব্রাল হেমারেজ।

যদি অতক্ষণ বসে না থাকতেন তাহ'লে হয়ত এটা হ'ত না। ইত্যাদি—

অর্থাৎ শ্রীপতি ন্যায়ালঙ্কারের গণনা ব্যুমেরাং-এর মতো তাঁর বাড়িতে এসেই সফল হ'ল।

এই সংবাদ পেয়ে সমস্ত পাড়া ভেঙে পড়ল ওঁদের বাড়ি। শহরতলার পাড়া, যুদ্ধের বাজারে মুনিয়া পাখার খাঁচার মতো জন-পরিপূর্ণ—কিন্তু দেখা গেল এই বিপুল জনতারও অধিকাংশই চিনত মাধববাবুকে। তার কারণ মাধব-বাবু উচ্চশিক্ষিত অধ্যাপক বলেই শুধু নন, অথবা প্রাচীন গুরুবংশের ছেলে বলেও নন – এই সদালাপী, সুশ্রী, বিনত ভদ্রলোকটির মতো পরোপকারী লোক এ তল্লাটে আর কেউ ছিল না। যে-কেউ যে-কোন কাজে তাঁর শরণাপন্ন হয়েছে, সে-ই পেয়েছে তাঁর কাছ থেকে সহানুভূতি ও সাহায্য। সকলেই তাই হাহাকার করতে লাগল তাঁর এই আকস্মিক অকাল-মৃত্যুতে। পাড়ার ছেলেরা নিজেদের মধ্যে চাঁদা তুলে বোম্বাই খাট নিয়ে এল, অজস্র পুষ্পসম্ভারে সেই খাট সাজিয়ে বিপুল শোভাযাত্রা ক'রে নিয়ে গেল কেওড়াতলা শ্মশানে। শ্মশান-খরচাও সেই চাঁদা থেকে চলে গেল। সেদিক দিয়ে শ্রীপতি কিছু টেরও পেলেন না।

সত্যি-সত্যিই যেন কিছুই টের পেলেন না তিনি। মাধবের মা নেই, নিজেও তিনি বিবাহ করেন নি, সুতরাং হাহাকার ক'রে কাঁদবার লোক ছিল না এটা ঠিক। একটি ছোট্ট ভাই—সে নীরবেই চোখের জল ফেলতে লাগল। তবে পাড়া-পড়শী, মাধবের সাহায্য পেতেন, এমন অনেক অনাথা স্ত্রীলোক—অনেকেই সে অভাব দূর করল। কাঁদবার লোকের অভাব হ'ল না শবযাত্রার সময়—শুধু সব চেয়ে যাঁর বেশি কাঁদবার কথা—সেই শ্রীপতি ন্যায়ালঙ্কার, অমন উপযুক্ত ছেলে হারিয়ে একটি ফোঁটাও চোখের জল ফেলতে পারলেন না। কেমন এক রকম স্তম্ভিত ভাবে বসে রইলেন, প্রায় অপলক নেত্রে তাঁর ইষ্টদেবতার বিগ্রহের দিকে চেয়ে। একটা কথাও কইলেন না, কি ক'রে কি হচ্ছে জানতে চাইলেন না—এমন কি বেরোবার সময়ও একবার এসে দাঁড়ালেন না।

কেউ কেউ বললে, 'অধিক শোকে পাথর। পাষাণ হয়ে গেছেন

ন্যায়ালঙ্কার মশাই।'

কেউ বা বললে, 'ওঁরা শাস্ত্র-পড়া মানুষ, ব্রহ্মজ্ঞ। শোককে যে ওঁরা জয় করেছেন।'

দু'একজন অশিক্ষিতা স্ত্রীলোক শুধু মন্তব্য করলে, 'কী পিচেশ বাপ গো! অমন ছেলে, ছেলের মতন ছেলে—রাজা-ছেলে চলে গেল, তা এক ফোঁটা চোখের জল নেই!'

কিন্তু কোন কথাই শ্রীপতির কানে গেল না—অথবা কানে গেলেও মনে পৌঁছল না। তিনি তেমনি ঠায় চুপ ক'রে বসে রইলেন।

কেবল অনেক বেলায়, প্রায় বিকেলের দিকে—খবর পেয়ে তাঁর মেয়ে বিষ্ণুপ্রিয়া যখন এসে বুক-ফাটা চিৎকার করতে করতে বাবার সামনে আছড়ে পড়ল, তখন তিনি যেন একবার শিউরে উঠে অস্ফুট-কণ্ঠে ইষ্ট স্মরণ করলেন— 'নারায়ণ! নারায়ণ!' তার পর উঠে এসে সস্নেহে মেয়ের মাথায় হাত দিয়ে বললেন, 'অমন ক'রে কাঁদিস নে মা! ছাখ্—আমি তো কাঁদছি না!'

এই ঘটনায় বিয়ে-বাড়িতেও যেন একটা বিষাদের ছায়া পড়ল। সানাই থামিয়ে দেওয়া হ'ল, শাঁখ বাজল প্রায় নিঃশব্দে। সর্বপ্রকার আনন্দ-কোলাহল বন্ধ হয়ে গেল। যেটুকু না করলেই নয়, সেইটুকুই শুধু করা হ'ল। গভীর শোকে থমথম করতে লাগল সারা বাড়িটা। কে বলবে যে সেখানে অতগুলো লোক কিছুক্ষণ আগেই এত চেঁচামেচি করছিল!

খবরটা পেয়ে চামেলি, মিনু, সুপ্রিয়া—ওরা সব কটা বোনই চিৎকার ক'রে কেঁদে উঠেছিল। বাকী পরিবারের অপর মহিলারা চেঁচামেচি না করলেও, কাঁদলেন অল্পবিস্তর সকলেই। অপরেশের স্ত্রী কল্যাণীর একবার ফিট্ হয়ে গেল; পুরুষরাও বিপন্ন হয়ে উঠলেন। ছেলেরা সকলেই ও-বাড়ি গিয়েছিল আগেই—তারা শোকযাত্রার সঙ্গে শ্মশানে চলে গেল, বাসি বিয়ের সময় একটি ছেলেও বলতে গেলে উপস্থিত রইল না।

তার কারণ মাধব ছিলেন এ বাড়ির আত্মীয়ের মতন। পাশাপাশি বাড়ি বলেই নয়, অথবা শ্রীপতি ন্যায়ালঙ্কার মশাই এদের গুরু বলেই নন, একটা অদ্ভুত প্রীতির সম্পর্ক ছিল এই দুই পরিবারে। অপরেশের বাবাও তরুণ

শ্রীপতির কাছে দীক্ষা নিয়েছিলেন কিন্তু তাঁরা ছিলেন দুই বন্ধুর মতোই। গুরু-শিষ্যের ব্যবধান রচিত হ'তে পারে নি তাঁদের মধ্যে কোনদিনই। অপরেশ মাধবের সহপাঠী বন্ধু। বাল্যকাল থেকে দু'জনে হরিহরাত্মা। ওঁরা স্বামী-স্ত্রী শ্রীপতির শিষ্য ছিলেন কিন্তু মাধবকে গুরুভাই ব'লে খুব সমীহ করবার অবকাশ পান নি।

অপরেশ বহু বয়স অবধি বিবাহ করেন নি, করবেন না কোনদিন এই কথাই সকলে জানত। ওঁর মায়ের কান্নাকাটিতে মাধবই অনেক কষ্টে কয়েক দিন অহরহ ওঁর পেছনে লেগে থেকে রাজী করান—এবং নিজেরই আর একটি বন্ধুর ভগ্নীর সঙ্গে বিয়ের সম্বন্ধ ক'রে বিয়েটা দিয়ে দেন। কল্যাণীর বাবা-মাও শ্রীপতি ন্যায়ালঙ্কারের শিষ্য। জানাশুনো ঘরের সুশ্রী সুলক্ষণা মেয়ে—অপরেশের মা বৌ পেয়ে খুশী হয়ে মাধবকে আশীর্বাদ ক'রে বলেছিলেন—'তুই-ই আমার জ্যেষ্ঠ সন্তান বাবা, অপু যেন সে কথা কোনদিন না ভোলে।'

কেউই ভোলে নি সে কথা। সুখে-দুঃখে আনন্দে-বিষাদে এ পরিবারের সঙ্গে জড়িয়েই গিয়েছিলেন মাধব। তাঁকে জিজ্ঞাসা না ক'রে কোন সিদ্ধান্ত নেবার কথা এ বাড়ির কেউ ভাবতেই পারত না। সুপ্রিয়ার এই সম্বন্ধ যখন আসে—তখনও প্রথমেই তাঁর অনুমোদন নেওয়া হয়। এই বিয়ের সব-কিছু বাজারও তিনিই ঘুরে ঘুরে করেছেন অপরেশের সঙ্গে। নিজেও প্রায় হাজার টাকা খরচ ক'রে একটি মনির্খচিত কণ্ঠহার দিয়েছেন সুপ্রিয়াকে—বিবাহের যৌতুক। অপরেশ একটু অনুযোগ করতে গিয়েছিলেন—কিন্তু এক কথায় মাধব থামিয়ে দিয়েছেন, 'ও কি আমারও মেয়ে নয়? ও যে আমার বড় আদরের মা-মণি!'

মা-মণি বলেই তিনি সুপ্রিয়াকে ডাকতেন চিরকাল।

সুতরাং তাঁর মৃত্যুতে এ পরিবার আত্মীয়বিয়োগ-ব্যথা অনুভব করবে, এইটেই তো স্বাভাবিক।

এই বিয়ের সূচনা হয়েছিল খুবই আনন্দ এবং সাফল্যের মধ্যে—শেষ পর্যন্তও নির্বিঘ্নে সব কাজ মিটে যাবে এইটেই আশা করেছিল সবাই। মেয়ে পছন্দ করা, দেনা-পাওনা—কোনটাতেই এতটুকু অসুবিধে হয় নি। পাত্রটি খুবই ভাল, কুটুম্বও ভদ্র। মেয়ে পছন্দ হ'তে তাঁরা দরদস্তুরের কথা তুলতেই

দেন নি। পাত্রের মা বলে পাঠিয়েছেন, 'ছেলের বিয়ে দিতেই যাচ্ছি, ছেলে বেচতে তো যাচ্ছি না। দরদাম কিসের? মেয়েকে ওঁদের যা খুশি দেবেন। নগদ টাকা নিচ্ছি না বলে অন্য দিক দিয়েও পুষিয়ে দেবার দরকার নেই। ছেলে থাকে অত দূরে, সরকারী কোয়ার্টারে—ফার্নিচার সেখানে ওদের নিয়ে যাওয়াও অসুবিধে, আর দরকারই বা কি?'

তাঁদের তরফ থেকে কোন বক্তব্যই ছিল না, কেবল একটি ছাড়া। তাঁরা এই মাসেই—অর্থাৎ এই শ্রাবণেই বিয়ে দিতে চান। সামনের তিন মাস বিয়ে নেই, অঘ্রাণ মাস ছেলের জন্মমাস, এ মাসে না হ'লে আবার সেই মাঘ মাস—মিছিমিছি পাঁচ মাস পেছিয়ে যাবে বিয়েটা।

এঁদেরও তাড়াতাড়ি করতে বিন্দুমাত্র আপত্তি ছিল না। শুভস্য শীঘ্রম্! দেনাপাওনায় যখন কড়াকড়ি নেই, টাকার যোগাড় করতে মাথায় হাত দিয়ে বসতে হবে না, তখন আর দেরি ক'রে লাভই বা কি? অপরেশের মা নিজস্ব পাঁচ হাজার টাকা এবং প্রায় ত্রিশ ভরি সোনা রেখে গেছেন—তাঁর এই বড় নাতনীর বিবাহের জন্য, সুতরাং আসল দুর্ভাবনাটাই তো নেই অপরেশের।

বিয়ের দিন ঠিক করেছিলেন মাধব। শ্রীপতি এখানে ছিলেন না, ঝুলন দেখতে বৃন্দাবন গিয়েছিলেন। বিয়ের কথাটা এত তাড়াতাড়ি উঠল এবং ঠিক হয়ে গেল যে, তাঁকে জানিয়ে মত নেবার আর অবসর রইল না। অবশ্য তাঁর উপস্থিতির এমন কোন প্রয়োজনও কেউ অনুভব ক'রে নি। বাপের মতো অত বড় শাস্ত্রজ্ঞ না হ'লেও মাধব খুব সামান্য পণ্ডিত নন। সংস্কৃতে তিনটে উপাধি—ওধারে ফিলজফিতে এম. এ., সম্প্রতি ডক্টরেট পেয়েছেন। তাছাড়া—এই পাঁজি-পুঁথির দিকটাও তাঁর কম জানা নেই। গুরুবংশের ছেলে, আবাল্য এই আবহাওয়াতেই মানুষ, এগুলো তো কতকটা তাঁর সহজাত।

বিয়ের আর দুটি দিন মাত্র যখন বাকী—শ্রীপতি ফিরে এলেন। দিন ঠিক হ'তে অপরেশ টেলিগ্রাম ক'রে সেটা গুরুকে জানিয়েছিলেন এবং অনুরোধ করেছিলেন বিয়ের আগে এসে পৌছতে। নিতান্তই গতানুগতিক এবং মামুলী অনুরোধ—তখন কেউ স্বপ্নেও ভাবে নি যে এ থেকে কোন গুরুতর পরিস্থিতির উদ্ভব হবে। শ্রীপতি যে সত্যিই আসবেন, তাও কেউ ভাবে নি—কারণ ঝুলনের পর তাঁর বন-পরিক্রমায় বেরোবার কথা। কিন্তু সেই টেলিগ্রামের জবাবে এক

জরুরী তার এল অপরেশের কাছে—'আমি রওনা দিলুম। তুমি স্টেশনে থেকো।'

সকলেই এই টেলিগ্রামে বিস্মিত হলেন। কিন্তু তবু তখনও সুপ্রিয়ার প্রতি স্নেহ ছাড়া এই হঠাৎ চলে আসার আর কোন কারণ আছে—কেউই মনে করেন নি। নানা ঝঞ্ঝাটের ভেতর আবার স্টেশনে যাওয়ার হুকুমে অপরেশ একটু বিব্রত বোধ করলেও—সে আদেশ অমান্য করার সাহস ছিল না। তিনিও মাধবের সঙ্গে হাওড়ায় গেলেন।

ট্রেন থেকে নেমেই শ্রীপতি প্রথম কথা কইলেন, 'এ বিয়ে ঐ তারিখে হ'তে পারবে না বাবা। তুমি এখনই গিয়ে দিন পেছিয়ে দাও। এমনি হয়ত যথেষ্ট দেরি হয়ে গেছে—কিন্তু আর দেরি না হয়, সেইজন্যে তোমাকে এখানে আসতে লিখেছিলুম।'

কি সর্বনাশ!

আর যাই হোক, এ কথাটার জন্য অপরেশ প্রস্তুত ছিলেন না। তিনি কিছুক্ষণ কথাই কইতে পারলেন না। অনেকক্ষণ বিমূঢ় ভাবে গুরুর মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে বললেন, 'কিন্তু বাবা, এ মাসের যে এই শেষ দিন!'

'তা হোক বাবা। না হয় অঘ্রাণেই হবে।'

'অঘ্রাণ মাস নাকি ছেলের জন্মমাস।' জড়িয়ে জড়িয়ে কোনমতে বললেন অপরেশ।

'তাহ'লে মাঘ মাসেই হবে।' প্রশান্ত কণ্ঠে উত্তর দিলেন শ্রীপতি।

মাধবও এতক্ষণ হতবাক্ হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। এবার কথা কইলেন। বললেন, 'কিন্তু দিন তো আমিই দেখে দিয়েছি বাবা। কই—কোন অসুবিধে তো বুঝি নি!'

'অসুবিধে অন্যত্র মাধু। সুপ্রিয়ার জন্মকুণ্ডলী আমার খুব ভাল ক'রে দেখা আছে, ঐ তারিখে বিয়ে হওয়া কিছুতেই উচিত নয়। আমার জ্ঞানবুদ্ধিমতো এই বললাম—এখন তোমাদের যা খুশি তাই করো।'

এ যেন বিনা-মেঘে বজ্রাঘাত।

অপরেশ তখনই ট্যাক্সি ক'রে বাড়ি ফিরে এলেন। ছোট ভাই অম্বুজেশকে

সংবাদটা দিলেন। কল্যাণীও শুনল। সকলেই মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ল কথাটা শুনে।

শ্রীপতির জ্ঞান-বুদ্ধির ওপর এদের শ্রদ্ধা সত্যিই কম নয়। নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ, চিরদিন স্বপাক খান, নিত্য হোম-পূজা করেন। এ অঞ্চলের সব চেয়ে বড় গুরুবংশ কিন্তু শ্রীপতি বহু শিষ্য ত্যাগ করেছেন—নিষ্ঠাহীন এবং অনাচারী বলে। তবে সেইটেই বড় কথা নয়। তাঁর মতো পণ্ডিত এ অঞ্চলে দুর্লভ। দিন-রাতই তিনি তাঁর পুঁথিপত্রে ডুবে থাকেন প্রায়। বিষয়-কর্ম দেখেন না—টাকাকড়ির প্রতি বিন্দুমাত্র মমতা নেই। এক বেলা স্বপাক হবিষ্য—এই তাঁর আহার। ধুতির ওপর একটা চাদর—পায়ে চটি। জামা বা অন্য জুতো কেউ তাঁকে কোনদিন পরতে দেখে নি। অথচ রাশি রাশি টাকা খরচ করেন বই বা পুঁথি সংগ্রহ করতে। বাড়িতে টোল ছিল, এখনও আছে। কিন্তু ছাত্র বেছে নেন নিজে, এবং সেকালের মতো সমস্ত খরচ দিয়ে ছাত্র প্রতিপালন করেন। সর্বশাস্ত্রেই তাঁর পারদর্শিতা—এমন কি জ্যোতিষশাস্ত্রেও। বরং বলা যায় এই শাস্ত্রে একটু বেশী দখল তাঁর—তিনি বিশেষ এ কাজ করতে চান না তাই, নইলে তাঁর গণনা নাকি অভ্রান্ত।

সুতরাং—আর যাই হোক, শ্রীপতির কথাটা উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

অথচ এধারেও যে সমূহ বিপদ!

পাত্র দিল্লীতে থাকে, সাত দিনের ছুটি নিয়ে এসেছে। বাপ নেই, অভিভাবক বলতে মা, তিনি আসেন নি। এখানে এসে উঠেছে এক পিসতুতো দাদার কাছে। সেইখান থেকেই বিয়ে সেরে দিল্লী চলে যাবে। বৌভাত ফুলশয্যা হবে সেখানে। সেখানেও নিশ্চয় সব আয়োজন প্রস্তুত। সময়ই বা কই আর?

এখানকার অভিভাবক ঐ পিসতুতো দাদা। তাঁর কাছে কথাটা পাড়তেই তিনি ভ্রূ কুঁচকে বললেন, 'সে আবার কি কথা! সব ঠিক-ঠাক, সেখানে এখানে সমস্ত নেমন্তন্ন সারা হয়ে গেছে—এখন বিয়ে বন্ধ করলে আমরা মুখ দেখাতে পারব না কাউকে। আপনারা এমন ইরেস্‌পনসিব্‌ল্ তা তো আগে বুঝি নি! আর এ এতই ফ্লিমজি গ্রাউণ্ড, এ কথা যাকে বলব সেই তো হাসবে! মামীমা রীতিমতো অপমানিত বোধ করবেন। আপনারা পাত্র দেখেছেন।

খোঁজখবরও নিয়েছেন—এখন একটা বাজে ওজর ক'রে বিয়ে ভেঙে দিতে চাইছেন, তার মানে কি ? পাত্র পছন্দ হয় নি তো এত দূর এগোলেন কেন ?'

দাদা আরও বললেন, 'পাত্রীর কিছু অভাব ছিল না আমাদের, এমন ছেলে যে পাবে সে-ই নিজেকে কৃতার্থ মনে করবে। আরও তিন-চারটে মেয়ে দেখা ছিল। আর তিনটে দিন সময় পেলেও আমরা এই তারিখেই বিয়েটা দিতে পারতুম। জানাশুনোর মধ্যে বলেই আমরা এখানে প্রেফার করেছিলুম। এখন দেখছি সেইটেই ভুল হয়েছিল!'

অর্থাৎ—তাঁর কথার ভাবে স্পষ্টই বোঝা গেল যে, এ বিয়ে এখন স্থগিত করতে চাইলে এ পাত্রটি একেবারেই হাতছাড়া করতে হবে। অথচ এমন পাত্র আদৌ সুলভ নয়, বিশেষত এত অল্প খরচায়। সুশ্রী, শিক্ষিত, চরিত্রবান ছেলে। মাত্র পঁচিশ বছর বয়স—এরই মধ্যে প্রায় আটশ টাকা মাইনে পাচ্ছে। মস্ত বড় চাকরি—দায়িত্বপূর্ণ কাজ। থাকবার মধ্যে এক মা আর দাদা। দাদাও মিলিটারীতে বড় কাজ করেন—লেফ্‌টেন্যান্ট। তিনি স্ত্রী-পুত্র নিয়ে চাকুরীস্থলে থাকেন। কোন দায় কি কোন ভার বইতে হয় না ছেলেটিকে।

এই পাত্র হাতছাড়া করতে হবে—এত তুচ্ছ কারণে ?

অম্বুজেশ বেঁকে দাঁড়াল। সে স্পষ্টই বললে, 'এ পাত্র যদি শুধু উনি বলেছেন বলে ছেড়ে দাও, তাহ'লে বুঝব তোমার বরাতে আর মেয়ের বরাতে অনেক দুঃখ আছে! সত্যিই, ওঁরা রাগ তো করতে পারেন, এ অবস্থায় আমরা পড়লেই বা কি ভাবতুম বলো তো ?'

কল্যাণীও সায় দিলে, 'আমাদেরই বা মন্দ'কি ঠাকুরপো! ছিষ্টির চিঠি ছাড়া হয়ে গেছে, কুটুম্ব-আত্মীয়ে বাড়ি ভরে গেল—এখন কী বলব তাদের ? আমরা বন্ধ করলুম, তা কি কেউ বিশ্বাস করবে ? ভাববে আমাদের কোন দোষ আছে, তাই বরপক্ষ বিয়ে ভেঙে দিলেন।'

অপরেশ বিপন্ন মুখে মাধবের মুখের দিকে তাকালেন।

মাধব একবার কল্যাণীর মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'উনি যে কেন এত জোর করছেন, তা তো জানি না। কিন্তু এমন বিয়ে ভেঙে দেওয়া সঙ্গত হবে বলে আমারও মনে হয় না।'

অগত্যা অপরেশ আবার গেলেন শ্রীপতির কাছে, তাঁকে খুলে বললেন সব কথা। সমস্ত শুনে তিনি খানিকক্ষণ স্তব্ধ হয়ে থেকে বললেন, 'তবে দাও বিয়ে। মঙ্গলময়ের মনে যা আছে, তাই হবে।'

'কিন্তু কেন আপনি বললেন এ কথাটা—জানতে পারি না বাবা?'

'তোমাকে সে কথাটা বলতে পারব না বাবা। অন্তত আজ নয়।'

এর পর স্বল্পভাষী শ্রীপতিকে আর কোন প্রশ্ন করতে সাহসে কুলোয় নি অপরেশের।

মাধবের শ্রাদ্ধ-শান্তি চুকে গেল। শ্রীপতি ন্যায়ালঙ্কার শান্ত এবং অবিচলিত ভাবে সমস্ত কাজ শেষ পর্যন্ত নিজে দাঁড়িয়ে থেকে করালেন। শাস্ত্রীয় বিধির এতটুকু এদিক ওদিক হ'ল না। এর ভেতর একবারও তাঁকে ভেঙে পড়তে বা চোখের জল ফেলতে কেউ দেখলে না। কিন্তু যারা ভাল ক'রে জানত তাঁকে—তারা সবাই চিন্তিত হয়ে উঠল। চিরদিনই কথা কম বলেন তিনি—কিন্তু এখন যেন একেবারেই তা ছেড়ে দিলেন। একেবারে স্তব্ধ হয়ে গেছেন মানুষটা।···আহারের আয়োজন করেন ঠিকই, খেতেও বসেন কিন্তু ভাত খেতে খেতে আর একদিকে চেয়ে স্তব্ধ হয়ে বসে থাকেন, অনেকক্ষণ পরে ভাত যখন হাতে এবং পাতে শুকিয়ে ওঠে তখন একেবারে উঠে পড়েন, খাওয়া হয় না। বই পড়তে বসেন কিন্তু বইয়ের পাতা ওল্‌টানো হয় না। আর-একদিকে চেয়ে চুপ ক'রে বসে থাকেন। যেন সর্বদাই কি একটা ভাবেন—সে ভাবনার যেন কূলকিনারা নেই। এ কী হ'ল তাঁর—পুত্রশোকে পাগল হয়ে যাবেন নাকি তিনি?

পাড়ার লোকেরা বলাবলি করতে লাগল, 'পাগল না হওয়াই তো আশ্চর্য! অমন ছেলে হারিয়ে—! ছেলের মতো ছেলে, বংশের গৌরব! কুল-আলো-করা সন্তান।'

এসব আলোচনা শ্রীপতির কানে যায় না। মেয়ে এবং ছোট ছেলে অনুযোগ করে—তিনি মুচকি হাসেন একটু। ম্লান গম্ভীর হাসি। আর কোন ফল হয় না সে অনুযোগে।

এরই মধ্যে একদিন কি একটা ছুটির অবসরে, এক দুপুরবেলা অপরেশ

এসে প্রণাম ক'রে সামনে বসলেন। অভ্যাস মতো সেদিনও শ্রীপতি বই খুলে বসে ছিলেন, কিন্তু চোখ যে তাঁর ঐ লেখাগুলো থেকে কোন অর্থই উদ্ধার করতে পারছে না, তা তাঁর দিকে চাইলেই বোঝা যায়। স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন তিনি। অপরেশ প্রণাম ক'রে বসতে তিনি বই থেকে চোখ তুলে সোজাসুজি প্রশ্ন করলেন, 'আমাকে কিছু বলবে বাবা ?'

অপরেশ অন্য দিকে তাকিয়ে বললেন, 'না—মানে—তেমন কিছু নয়। কথাটা বলা হয়ত এখন এ অবস্থায় ঠিক হচ্ছে না। কিন্তু ক'দিন ধরে অহোরাত্র এমনভাবেই প্রশ্নটা আমাকে খোঁচাচ্ছে—' বলতে বলতে মাঝপথেই থেমে গেলেন তিনি, কথাটা শেষ করতে পারলেন না।

শ্রীপতি স্থির দৃষ্টিতে তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে ছিলেন। ওঁকে থেমে যেতে দেখে শান্তকণ্ঠে বললেন, 'কি বলবে বলো। গুরুর কাছে সব কথা নিঃসঙ্কোচে বলা চলে।'

প্রাণপণ চেষ্টায় এবার যেন অপরেশ হঠাৎ বলে ফেলে কথাটা, 'আপনি—আপনি খুকুর বিয়েটা পেছিয়ে দিতে বলেছিলেন কেন বাবা ? এই—মানে মাধবের এই ব্যাপারটার জন্যেই কি ? আপনি কি এটা জানতেন ?'

অনেকক্ষণ চুপ ক'রে রইলেন শ্রীপতি। যেন নিজের মনের সঙ্গে প্রাণপণে যুদ্ধ করলেন একটা। তারপর তেমনি অবিচল কণ্ঠে বললেন, 'না। মাধবের কথা আমি ভাবি নি। আমি অন্য অমঙ্গল আশঙ্কা করেছিলাম। আমার গণনাতেই ভুল হয়েছিল নিশ্চয়।'

এ কী কথা আজ ওঁর মুখে! শ্রীপতি ন্যায়ালঙ্কারের গণনা ভুল ? এ যে একেবারে অবিশ্বাস্য কথা! আর এ কথা উনি নিজেই স্বচ্ছন্দে স্বীকার করছেন ? অথচ একথা কে না জানে যে এই আপাতনিরহঙ্কার মানুষটির যদি কোন গর্ব থাকে তো—সে এই একটি বিদ্যারই।

সহস্র কৌতূহল আর অজস্র প্রশ্ন মনে ঠেলাঠেলি করতে থাকে। কিন্তু কিছুই বলা হয়ে ওঠে না। গুরু আবার বইয়ের দিকে চোখ ফিরিয়েছেন—আর তাঁকে কোন তুচ্ছ প্রশ্ন করতে ভরসায় কুলোল না। আরও কিছুক্ষণ নীরবে বসে থেকে নিঃশব্দে একটি প্রণাম ক'রে চলে আসবার উপক্রম করলেন অপরেশ।

একেবারে যখন দরজার কাছে পৌঁছেছেন—শ্রীপতি আর একবার মুখ তুললেন। বললেন, 'বৌমাকে একবার সময় ক'রে আমার সঙ্গে দেখা করতে বলো তো বাবা। অনেক দিন তাঁকে দেখি নি!'

'যে আজ্ঞে। আমি এখনই পাঠিয়ে দিচ্ছি।'

অপরেশ যেন কৃতার্থ বোধ করলেন এই সামান্য স্নেহসূচক কথাটিতেই।

একটু পরেই কল্যাণী এসে পৌঁছলেন। তখনও শ্রীপতি বই পড়ছেন। বই থেকে মুখ না তুলেই বললেন, 'এসো মা, এসো। বসো।'

তারপর দীর্ঘক্ষণ তিনি তেমনিই নিস্তব্ধ হয়ে বসে রইলেন বইটার দিকে চেয়ে। প্রায় পাঁচ মিনিট পরে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বইখানা মুড়ে রেখে সোজা হয়ে বসলেন। কল্যাণীর দিকে কয়েক মুহূর্ত স্থির ভাবে চেয়ে থেকে বললেন, 'মা, একটা কথা বলব তোমাকে। সেই জন্যেই ডেকেছি।'

'বলুন বাবা!' উৎসুক হয়ে তাকান কল্যাণী। একটু যেন আশঙ্কাও বোধ করেন—অজ্ঞাত কারণেই।

'তুমি জান যে সুপ্রিয়ার বিয়ের তারিখটা আমি পেছিয়ে দিতে বলেছিলাম। কেন বলেছিলাম তা কাউকে বলি নি। ঐ দিন সুপ্রিয়ার পিতার মৃত্যুযোগ ছিল। ওর জন্মকুণ্ডলী অনেক দিন আগেই ভাল ক'রে বিচার করেছিলাম। সাধারণত এসব গণনায় আমার ভুল হয় না মা!'

কল্যাণীর মুখ বিবর্ণ হয়ে উঠল। তাঁর ললাটে ঘামের বিন্দু জমে উঠল দেখতে দেখতে। কী যেন বলবার চেষ্টা করলেন তিনি কিন্তু শেষ অবধি একটা কথাও বলতে পারলেন না।

শ্রীপতি তাঁর উত্তরের অপেক্ষা করলেন বহুক্ষণ—তেমনি শান্ত স্থির দৃষ্টিতে তাঁর মুখের দিকে চেয়ে। তারপর মাথা হেঁট ক'রে বললেন, 'মা, শাস্ত্রচর্চা আমার প্রাণ, তা তো তুমি জানো? হয়ত থাকা অন্যায়, তবু এ বিষয়ে আমার অহঙ্কারও একটু আছে। সে অহঙ্কার যদি আজ দর্পহারী ভেঙে দেন তো আমার চেয়ে সুখী আর কেউ হবে না। কিন্তু মা—আজ পুত্রশোকের চেয়েও এই প্রশ্নটাই আমাকে বেশী উদ্‌ভ্রান্ত ক'রে তুলেছে। তবে কি, আমার গণনায় এত বড় ভুল হ'ল? দিনরাত এই একটি চিন্তাই আমাকে আচ্ছন্ন ক'রে রেখেছে। তোমাকে

বিব্রত করার ইচ্ছা ছিল না, ক'দিন প্রাণপণে মনের সঙ্গে লড়াই করেছি, চেষ্টা করেছি এ চিন্তা থেকে নিবৃত্ত রাখতে—কিন্তু পারলুম না কিছুতেই। কেবলই মনে হচ্ছে তবে কি এতকাল মিথ্যার উপরই নিজের দম্ভের এই প্রাসাদ গড়ে তুলেছি? যে বিদ্যা অধিগত করেছি বলে নিজের মনে এত অহঙ্কার—সে কি তাহ'লে সব ভুয়ো?'

বলতে বলতে উত্তেজিত হয়ে উঠেছিলেন শ্রীপতি, কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে নিজেকে যেন শান্ত ক'রে নিলেন। তারপর আবারও বললেন, 'মা, আমি তোমার, তোমার স্বামীর এবং তোমার শ্বশুরেরও গুরু! তোমার মা-বাবাও আমার শিষ্য। সুপ্রিয়ার বাবা কে—আমায় সত্য ক'রে বল তো মা!'

কল্যাণীর মুখ থেকে সমস্ত রক্ত যেন নিঃশেষে কে শুষে নিয়েছে, একদম কাগজের মতো হয়ে গেছেন তিনি। তিনি এই প্রশ্নটারই আশঙ্কা করেছিলেন হয়ত এতক্ষণ ধরে। তবু প্রশ্নটা গুরুর মুখ থেকে বেরিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গেই থর-থর ক'রে কেঁপে উঠলেন—বার বার শিউরে উঠল তাঁর সর্বাঙ্গ। মনে হ'ল তিনি যেন ছুটে পালিয়ে যাবেন এই মুহূর্তে। ব্যাকুল অসহায় ভাবে একবার দরজার দিকে তাকালেনও।

অনুত্তেজিত কিন্তু কঠিন কণ্ঠে আবারও বললেন শ্রীপতি, 'আমি আদেশ করছি মা!'

ঠোঁট দুটো কাঁপল থর-থর ক'রে। উত্তর দেবার চেষ্টা করলেন কল্যাণী প্রাণপণে, কিন্তু কিছুতেই কণ্ঠ ভেদ ক'রে কোন স্বর বেরোল না। কিছুক্ষণ ধরে বৃথা চেষ্টা ক'রে আকুল কান্নায় ভেঙে পড়লেন তিনি গুরুর পায়ে।

শ্রীপতি এবার যেন শিউরে উঠলেন। বুকে দুটো হাত চেপে ধরে বলে উঠলেন, 'নারায়ণ! নারায়ণ!'

অনেকক্ষণ ধরে নিঃশব্দে কাঁদলেন কল্যাণী। শব্দ নেই—তবু মনে হচ্ছে তাঁর বুক ফেটে যাবে সেই দুঃসহ রোদনের বেগে। মাটিতে মুখ ঘষে কাঁদছেন তিনি, মাথা ঠুকছেন বার বার।

শ্রীপতি বাধা দিলেন না, নিষেধ করলেন না। স্থির হয়ে চোখ বুজে বসে রইলেন শুধু।

অবশেষে এক সময় কল্যাণী মুখ তুলল, স্খলিত বিহ্বল কণ্ঠে যেন অসংলগ্ন

ভাবে বলল, 'আমি কি করব আদেশ করুন? কী করলে এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত হবে?'

এই বার শ্রীপতি চোখ খুললেন আবার। হাসলেনও একটু—ক্লান্ত, ক্লিষ্ট হাসি। কল্যাণীর নত মস্তকে হাত রেখে বললেন, 'তুমি ঘরে ফিরে যাও মা। যদি কিছু করতে হয় আমিই করব। শিষ্য বা সন্তানের হয়ে প্রায়শ্চিত্ত করার অধিকার আমার আছে।'

সুখে থাকা

সাগরপারের গোপালপুর বা 'গোপালপুর-অন-সী' এককালে ইউরোপীয়ানদের গরবিণী প্রেয়সী ছিল। কালক্রমে তা য়্যাংলো-ইণ্ডিয়ানদের অঙ্কভাগিনী হয়ে পড়ে। কিন্তু এখন সে দিনও তার গিয়েছে। ভ্রমণবিলাসী বা ট্যুরিস্ট মহলে সে বিগতযৌবনার মতোই উপেক্ষিতা। যদি বা দামা হোটেল একটা আছে—তবে সেও কেমন চলে তা জানি না। সন্দেহ হয় চলে না। বছর বারো-চোদ্দ আর যাই নি। শুনেছি শহরটা একেবারেই মরে যায় দেখে সরকার তাঁদের কিছু কিছু আপিস ওখানে স্থানান্তরিত করেছেন। আগেকার মাঝারি হোটেল-বাড়িগুলোও তাঁরা দখল ক'রে নিয়ে বাড়িওয়ালাদের উপবাস থেকে রক্ষা করেছেন আমার একাধিকবারের আশ্রয়দাত্রী, এককালের প্রবলপ্রতাপ হোটেল-ওয়ালী মিসেস মূরও এক মেয়ে-হোস্টেলকে তাঁর বাড়ি ভাড়া দিয়ে নিঃশেস ফেলে বেঁচেছেন।

আমরা শেষবার যাই বোধহয় ঐ বছর বারো-চোদ্দ আগে। সেবার ডাঃ দাসের বাড়ি 'দ্য বিকন'-এর নিচেরতলার একাংশে ভাড়া ছিলাম। (ডাঃ দাস অধ্যাপক হুমায়ুন কবীর ও বিখ্যাত রাজনৈতিক নেতা হরিপদ চট্টোপাধ্যায়ের শ্বশুর।) সমস্ত গোপালপুরের মধ্যে ঐ বাড়িটিই বোধহয় সবচেয়ে হিসেব ক'রে তৈরী। যেদিন কোথাও হাওয়া থাকে না সেদিনও এ বাড়িতে ঝড় বয়ে যায়। এখন শুনছি সে বাড়িরও নিচেরতলা কী একটা সরকারী প্রতিষ্ঠান ভাড়া নিয়েছে। কারণ স্পষ্ট—ট্যুরিস্টের অভাব।

আমাদের পূর্ব-পরিচিত হোটেলটি "ব্লু হ্যাভেন" উঠে গেছে শুনেই আমার

এক বন্ধু আপিসের যোগাযোগে এই বাড়িটি ঠিক করেন। কিন্তু তা হোক, পূর্ব আশ্রয়দাত্রীকে ভুলি নি। গিয়ে দেখা ক'রে অভিযোগও জানিয়েছিলাম। তিনি বিচিত্র ভঙ্গীতে কাঁধ ঝাঁকানি দিয়ে বলেছেন, "হোয়াট ক্যান বি ডান মাই সন, ওনলি টু মনথ্‌স্ অফ সীজন্—য্যাণ্ড দ্য রেস্ট—ইটিং মাড্।"

ভারতের মধ্যে ট্যুরিস্টের রাজা হল গরিব বাঙালী। এঁরা এখানে বিশেষ আসতে চান না। কেন যে এঁদের পছন্দ হয় না, তাও জানি। এখানে কোন তীর্থ নেই। সেই কারণেই হরেক রকমের পণ্যদ্রব্যের বাজার বসে নি'। বাঙালীর চাই রথ দেখার সঙ্গে কলা বেচা নয়—কলা কেনা। সেদিক দিয়ে কাশী, পুরী বা হরিদ্বার আদর্শ। তীর্থ যেমনই হোক, দেবতা যেমনই থাকুন—সে পর্বটা ছু-এক টাকা প্রণামীর ওপর দিয়ে ম্যানেজ ক'রে, পাণ্ডাদের বকে, ধমকে টিটকিরি দিয়ে ঠেকিয়ে রেখে, মা-লক্ষ্মীরা লেগে যান রাশি রাশি বাজার করতে। গোপালপুরে এসব কিছু নেই। পাহাড় আছে, সমুদ্র আছে, নয়নাভিরাম ব্যাক-ওয়াটার আছে, সেই কারণেই মাছও প্রচুর। আর আছে নিবিড় শ্যাম নারিকেল বাদামের বন। পুরীর মতোই ব্রেকার, কিন্তু ভয়ঙ্কর নয়। এখানে স্নান করা অনেক নিরাপদ ও আরামদায়ক।

যাক গে ওসব কথা। গোপালপুরের প্রচার করতে এ গল্প ফাঁদি নি। আসল যা বলছিলাম, তাই বলি।

সেবারের গোপালপুর প্রবাসটা বহু দিক দিয়েই আমার কাছে স্মরণীয় হয়ে আছে। যদিও বছরটা ঠিক স্মরণ করতে পারছি না, এইটুকু শুধু মনে আছে হরিপদবাবুর ছেলে—রাষ্ট্রীয় এয়ার ফোর্সের যে তরুণ অফিসারটি দেশরক্ষার কাজ করতে করতে শহীদ হয়েছে—সেই বছরই সবে স্কুলের পালা শেষ করবে বলে তৈরী হচ্ছে। সেও তখন ওখানে। সন্ধ্যায় নিচে আসত আমার কাছে ভূতের গল্প শুনবে বলে, আর শুনতে শুনতে ভয় পেয়ে কাছে ঘেঁষে এসে আমাকে জড়িয়ে ধরত।

কিন্তু এ সবের সঙ্গেও আসল গল্পের সম্পর্ক নেই। ওখানে সেবার চন্দন রায় আর অভিনেতা-কাম-চিত্রপরিচালক মৈনাক সেনের সঙ্গে দেখা হওয়াটাই নাটকীয় ব্যাপার একটা। এমন নাটক জীবনে ঘটে দৈবাৎ, ঘটলেও অবিশ্বাস্য মনে হয়—চলচ্চিত্রে বা মঞ্চেই শোভা পায়। এদের ছু'জনকেই আগে থাকতে

চিনি, চন্দন তো আমার ছোট ভাইয়ের মতো—তাও না, ভাইপো বলাই উচিত, বয়সের যা ব্যবধান—তবে এত অন্তরঙ্গ বলেই ভাই বলে মনে হয়, বন্ধুও বলা চলে।

প্রথম দেখা চন্দনের সঙ্গেই।

আমাদের বাড়ির প্রায় সামনাসামনি জর্জ সাহেবের ছোট্ট এক হোটেল ছিল। ঘরের মধ্য থেকে সমুদ্র দেখা যেত না। পাকা বাড়ি হলেও খড়ের চাল। তবু হোটেলটি সিজন্-এ প্রায় সব সময়ই ভর্তি থাকত। অনুগ্রাহকদের মধ্যে বেশির ভাগই শিক্ষক-শিক্ষিকা। তার মধ্যেও ব্রাহ্ম বা ক্রীশ্চানই অধিকাংশ, যাঁদের পুঁজি কম অথচ একটু পরিচ্ছন্নভাবে থাকতে চান। জর্জ সাহেব আর তাঁর মেমই হোটেল চালাতেন, বাজার-সরকারী থেকে ম্যানেজারী, রান্না থেকে বাথরুম সাফ, সব। মেমই রান্না-বাড়া করতেন, বাঙালীপ্রিয় 'মাছ-ঝোল-ভাত'ও শিখে নিয়েছিলেন। একটি মাত্র ভৃত্য, সেও এই এতগুলি বোর্ডারের ফাই-ফরমাশ খেটে ওঁকে সাহায্য করার বিশেষ সময় পেত না।

যতবারই গোপালপুর গেছি, দেখেছি জর্জ সাহেব (জর্জ নাম কি পদবী তা জানি না, সবাই জর্জ সাহেবই বলে) একটা খাকী হাফ প্যাণ্টের ওপর একটা হাতকাটা গেঞ্জি বা কখনও পুরোপুরি খালি গায়েই এটা-ওটা খুটখাট কাজ ক'রে বেড়াচ্ছেন। শুনেছি খুবই ভদ্র এবং শান্ত স্বভাবের ভদ্রলোক, আর দেখেছি (সেটাই সম্ভবত ওঁদের হোটেলের জনপ্রিয়তার মুখ্য কারণ) বাজারে গিয়ে সর্বশ্রেষ্ঠ আনাজ ও সবচেয়ে ভাল ফল কিনতে। মুদির দোকানেও তাই, বেশি দাম দিয়ে ভাল চাল, ভাল ডাল, ভাল মাখন মার্মালেড ছাড়া কিনতেন না। অথচ রেটও অন্যান্য মাঝারি হোটেলের তুলনায় কমই। আমাকে বলতেনও—'আমার তো পেন্সন্ আছেই, তাতে কুলোয় না বলেই এটা করা। কোনমতে দু'জনের খাওয়া-থাকার খরচটা চলে গেলেই আমি খুশী। বেশি লাভে আমার দরকার নেই।'

তবু যে আমরা কখনও ওঁর হোটেলে যাই নি, তার কারণ ঘর থেকে সমুদ্র দেখা যায় না। সঙ্কীর্ণ বাগানের এক প্রান্তে এসে দাঁড়ালে তবেই ফেনোর্মি-চঞ্চলা সমুদ্র চোখে পড়ত—কখনও মেঘবর্ণা, কখনও রৌদ্রকরোজ্জ্বল গাঢ় নীল-বর্ণা, কখনও বা শুক্লপক্ষের সহস্রচন্দ্র প্রতিবিম্বিতা।

এই জর্জ সাহেবের হোটেলের সামনেই সেদিন চন্দনের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল।

আগের দিনই পৌঁচেছি। সেদিনটা গেছোগাছ ক'রে থিতিয়ে বসতে—এইখান দিয়েই যাতায়াত করতে হয়েছে বার বার, তবু যে-কোন কারণেই হোক, দেখা হয় নি। অবশ্য এখানে দেখা হওয়ার প্রধান জায়গাটা সমুদ্রতীর—সেদিন তো আর সমুদ্রের ধারে যাওয়া সম্ভব হয় নি।

পরের দিন একটু 'নর্ম্যাল' হয়ে নিয়ে যাচ্ছিলাম জর্জ সাহেবকেই 'গুড্ মর্ণিং' জানাতে। দেখি ওঁদের ফটকের সামনেই দাঁড়িয়ে আছে চন্দন—না, সমুদ্র নয়, সামনের বাদাম গাছটার দিকে তাকিয়ে।

চন্দন বলতে গেলে আমাদের পাড়ার ছেলে। জায়গাটা এখন কলকাতার অন্তর্ভুক্ত হয়েছে—নইলে স্বগ্রামবাসীও বলা চলত।

'আরে! চন্দন! তুমি এখানে! কবে এলে?'

কেমন যেন অন্যমনস্ক হয়েই দাঁড়িয়ে ছিল চন্দন, দুই চোখে রাজ্যের ঔদাসীন্য ও ক্লান্তি নিয়ে। এখন মনে হল মনটা বহুদূর থেকে কুড়িয়ে গুটিয়ে চোখে টেনে এনে আমাকে দেখল ও চিনতে পারল। চোখে-মুখে সবিস্ময় প্রসন্নতাও ফুটল একটু।

'মাস্টারমশাই! আপনি! ও বাঁচলুম,' বলে তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে প্রণাম করল।

এই মাস্টারমশাই সম্বোধনের একটু ইতিহাস আছে। পাড়া সম্পর্কে আমার স্ত্রীকে ও মাসীমাই বলে। কিন্তু আমার সঙ্গে অন্য একটা সম্পর্কও ছিল। ছোটবেলায় মাস আষ্টেক-নয় ওকে পড়িয়েছিলুম। তখন অতটা বলত না, কিন্তু এখন আমাকে 'মাস্টারমশাই'-ই বলে শুধু। যদিচ ওর আসল শিক্ষক বা গুরু হলেন—হলেন মানে এখন বেঁচে আছেন কিনা জানি না, কিছুদিন আগেও ছিলেন—ওর অঙ্কের মাস্টারমশাই, বঙ্কুবাবু। বঙ্কুবাবুকে ও গুরু কেন—বোধ-হয় ইষ্টের মতোই ভক্তি করত আর ভালবাসত, তাঁর কথায় প্রাণ দিতে পারত।

যদিও শুনেছি বঙ্কুবাবু কখনও ওর সে শ্রদ্ধার ওপর কোন দাবী করেন নি, জোর ক'রে নিজের মত চাপাতে চান নি। কখনও কোন কাজে বাধাও দেন নি।

আমি ঠিক আলিঙ্গন না করলেও ওর দুই কাঁধে হাত রেখে বললুম, 'তুমি

কি একা এসেছ? না আর কেউ আছেন? মা-বাবা এসেছেন নাকি? উঠেছ কোথায়?'

'এখানেই উঠেছি, এই জর্জ সাহেবের হোটেলে। এঁর কথা আমাকে এক অফিস বস্ বলে দিয়েছেন। না, মা-বাবাকে আনি নি। ভাড়া পেতুম ওঁদেরও—কিন্তু ওঁরাই আসতে চাইলেন না। মা আমার ভাই-বোনদের ছেড়ে আসতে চান না, বাবার অনিচ্ছা অন্য কারণে। সে তো আপনি জানেনও—আমার কাছে কোনমতেই ওব্‌লাইজ্‌ড থাকতে চান না।'

তারপর একটু ম্লান হেসে বলল, 'ওঁদের আনলে কি আর এখানে ওঠা যেত? মা কী রকম গোঁড়া জানেনই তো। তাঁদের আনলে পুরী যেতে হ'ত।'

তারপরই আমার কথাটা মনে পড়ল বোধহয়, 'আপনি উঠেছেন কোথায়? ও, ডাঃ দাসের বাড়ি? শুনেছি দ্য বেস্ট হাউস। মাসীমারা এসেছেন বুঝি?'

'হ্যাঁ, সবাই। ছেলে-মেয়েদের নিয়েই এসেছি। চলো না, ওখানেই চা-টা খাবে—'

'আপনি যে কী কাজে যাচ্ছিলেন?'

'না না, কাজে নয়। জাস্ট জর্জ সাহেবকে গুড মর্ণিং জানাতে। সে পরে হলেও চলবে।'

'না মাস্টারমশাই, আজ এখন থাক। এখানে কিছু বলা নেই, ব্রেকফাস্টের সময় হয়ে গেছে। এঁরা খুব দুঃখিত হন বোর্ডাররা কেউ না খেলে।...তাছাড়া আপনার সঙ্গে অনেক কথা আছে। সে একটু নিরিবিলি না বসলে চলবে না। বরং আপনি যদি একটু বেড়াতে বেড়াতে একসময় আসতেন তো বড় ভাল হত। এলে কিন্তু সময় হাতে রেখে আসবেন।'

'ঠিক আছে। একটু পরেই আসব। বাজার আমার হাতে নেই, খোকাই করবে। আমি শুধু ওদিকটা ঘুরে এসে বাড়িতে চা-খাবার খেয়ে তোমার কাছে এসে বসছি।'

তখন আর অনর্থক জর্জ সাহেবের সঙ্গে দেখা করার চেষ্টা করলুম না। একটু পরে তো আসতেই হবে। মিসেস মূরের সন্ধানে বাজারের দিকে এগিয়ে গেলুম। বাজারে আসার ওঁরও আর দরকার নেই। শুনেছি এই জর্জ সাহেবের কাছ থেকেই লাঞ্চ, ডিনার যায় ওঁর। তবু এ সময়টায় রোজ একবার ক'রে

আসা চাই-ই। এটা নাকি ওঁর প্যাসনে দাঁড়িয়ে গেছে। অনেক ঘুরে খুব সস্তা পেলে কেনেন, একছড়া কলা কিম্বা কয়েকটা বেগুনফুলি আম।

সেদিনও তার ব্যতিক্রম ঘটল না। ফলের বাজারেই দেখা হয়ে গেল মিসেস মূরের সঙ্গে। তেমনি একটা মোটা লাঠিতে ভর ক'রে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটছেন। আমাকে দেখে—বিশেষ তাঁকেই খুঁজতে এসেছি শুনে মুখ উদ্ভাসিত হয়ে উঠল তাঁর। আমি যে তাঁকে মনে রেখেছি এতদিন পরেও—স্রেফ এই আনন্দে। অনেক কুশল প্রশ্ন করলেন, বন্ধুদের খোঁজ নিলেন। আমার স্ত্রী এসেছেন শুনে একদিন অচির ভবিষ্যতে আমাদের ওখানে দেখা করতে যাবেন প্রতিশ্রুতি দিলেন। আমাদের যেতে বললেন না, সম্ভবত বসিয়ে চা খাওয়াবার জায়গাটুকুও রাখেন নি। একটি মুলিয়া ভৃত্য আছে, সে সারাদিন থাকে, রাত্রে বাড়ি চলে যায়—খাবার তো জর্জ সাহেব পাঠান। কদাচিৎ ছেলে-বৌ এলে জর্জ সাহেবের কাছেই থাকে।

বাজারে আর ঘোরার প্রয়োজন ছিল না। আমি নাকি বেহিসেবী খরচা করি। তাই ছেলে এবার সব ভার নিজের হাতে নিয়েছে। আমি নিশ্চিন্ত।

নিশ্চিন্ত হয়েই বাসার দিকে ফিরছি। হঠাৎ চোখে পড়ল একটি পরিচিত মুখ। পরিচিত—তবু মনে করতে মিনিট দুই সময় লাগল। একদা অত উজ্জ্বল মুখ এত মলিন দেখব ভাবি নি বলেই দেরি লাগল।

মৈনাক সেন।

না, আমাকে চেনার কোন কারণ নেই তাঁর। আমার সঙ্গে পরিচয় হয় নি, আমি তাঁর কোন 'ফ্যান'ও নই যে ঠিকুজি-কুলজি মুখস্থ রাখব। আমি ভিন্ন জাতের মানুষ। যদিও লিখিটিখি একটু-আধটু, কিন্তু সে লেখা তাঁদের চোখে পড়বে, তা আশা করি না। ফিল্মের জন্যে লিখিও না। ছাঁচে ফেলা লেখা আমার তেমন আসে না। যাদের আসে—তাদের যে সমূহ ক্ষতি হয়েছে লেখক হিসেবে, তাও দেখেছি। সুতরাং ও চেষ্টাও করি না। যারা ফরমাশী লেখা লিখে দু' পয়সা ক'রে খাচ্ছে তাদের ঈর্ষাও করি না। মোটা টাকা বাঙালী লেখক পায় না, মানে কলকাতায় পায় না—ঈর্ষা করব কেন? 'শুধু নহি উৎসুক'।

তবে মৈনাক সেনকে কে না দেখেছে বা না চেনে?

কিছুদিন আগে পর্যন্ত 'টক অফ দ্য টাউন' ছিলেন। বিখ্যাত অভিনেতা,

বিখ্যাত মগুপ, বিখ্যাত প্রেমিক (লম্পট শব্দটা ঠিক ওঁর বেলায় প্রযোজ্য নয়), কুখ্যাত চলচ্চিত্র পরিচালক।

কুখ্যাত বলছি ইচ্ছে ক'রেই। কারণ এই শেষেরটাই কাল হল লোকটির। অভিনেতা হিসেবে এককালে যে বিপুল খ্যাতি হয়েছিল তা কমতে দেরি লাগত। যেটুকু অবশিষ্ট থাকত তাতে আরও বেশ কিছুদিন মগুপানটা চলবার কথা। কিন্তু ওঁর হঠাৎ মনে হ'ল—পরিচালক প্রযোজকরা ওঁর প্রতি অবিচার করছে। নিজেই গেলেন ছবি পরিচালনা করতে। তার চেয়েও যেটা মূঢ়তার কাজ—নিজেকে হিরো ক'রে গল্প লেখালেন। ফরমাশী গল্প। নতুন প্রণয়িনীকে হিরোইন দিয়ে। সে ছবিতে যথাসর্বস্ব ডুবল। তাতেও চৈতন্য হল না! যেখানে যত ঘাঁটি ছিল সব জায়গা থেকে ধার ক'রে আর একবার বাঘের খেলা দেখাতে গেলেন।

এবার অন্য একজনকে 'হিরো'—তরুণ নায়ক করেছিলেন, মাঝারি রকমের নাম করা কিন্তু গল্প তৈরী করেছিলেন একপেশে, মধ্যবয়সী এক ভদ্রলোককে কেন্দ্র ক'রে, আর বলা বাহুল্য, সে ভূমিকা নিজেই নিয়েছিলেন। ফলে ভরাডুবি। আর এখন পার্টও পান না, ছবি নিজে তুলবেন সে ক্ষমতাও আর নেই। ওঁর নতুন প্রিয়াও আর নেই—স্বভাবতই যাদের খ্যাতি মধ্যগগনে তেমনি একজনকে ভর করেছেন।

এসবই আমার শোনা, তপু-দীপু— ভাইপোদের মারফত। বিশেষ তপু। কাজের কথা গুরুত্ব নির্বিশেষে ভুলে যায়—কিন্তু ফিল্ম জগতের কথা একটাও ভোলে না। তারকাদের নাড়ি-নক্ষত্র ঠিকুজি-কুল্‌জি মুখস্থ। বোম্বের কোন্ 'তারা' কখন উঠছে, কখন ডুবছে ; বিয়ে হওয়ার পর কোন্ জুটির লাক আর ফেবার করছে না ; মাদ্রাজের কোন্ অভিনেতার বাঙালী মেকাপ-ম্যান দেড় হাজার টাকা মাইনে পায় ; এখানে কার কখানা গাড়ি, কোন্ টারকি নম্বর—সব তার নখদর্পণে। সে-ই আমাকে ইদানীংকার খানকতক স্টীল ফটো এনে দেখিয়েছিল মৈনাকের, নইলে চিনতে পারতাম না। আগেকার সে দীপ্তি বা গ্ল্যামার কিছুই নেই। আমি দেখেছি ওঁর দু-একখানা প্রথম দিককার ছবি, পর্দাতে ছায়া ফেললে প্রেক্ষাগৃহ যেন জ্বলে উঠত। এখন সে উজ্জ্বল কান্তিও নেই, চোখের কোণ দুটো—অতিরিক্ত মগুপানের ফলে কিনা জানি না, ফোলা

ফোলা। ফলে অমন আশ্চর্য সুন্দর চোখেরও সে আকর্ষণ নেই। চুলটা তেমনিই আছে অবশ্য, ঢেউ খেলানো, প্রচুর—তবে অর্ধেক চুলে পাক ধরেছে এর মধ্যেই। বহু পুরাতন, এককালে মূল্যবান একটা ড্রেসিং গাউন জড়িয়ে উদাস দৃষ্টিতে বাজারে ঘুরছেন লক্ষ্যহীনভাবে।

আলাপ করার দরকার নেই। আগেই করতে চেষ্টা করি নি, তায় এখন!

দেখলাম, দুঃখও হ'ল—কিন্তু হা-হুতাশ করার মতো কিছু নয়।

বেরিয়ে এসে জর্জ সাহেবের হোটেলে ঢুকলাম আবার।

এতক্ষণে নিশ্চয় ব্রেকফাস্ট হয়ে গেছে চন্দনের।

চন্দন আমার জন্য বাইরেই অপেক্ষা করছিল, যেতেই পথ দেখিয়ে ঘরে নিয়ে বসাল। আগেকার ভাষায় 'ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠ'। সমুদ্র দেখা যায় না, তবে হাওয়া আছে। চা খাবো কিনা আর একবার জিজ্ঞাসা করল। সে অবশ্য জর্জ সাহেবও করেছিলেন। এখনও চাইলে দিতে পারবেন, আর হবে না। মেম-সাহেবের বয়স হয়েছে, লাঞ্চের জন্য তৈরী হচ্ছেন এখন থেকেই। বারবার চা করতে গেলে ভাত হবে না।

আর কিছু দরকার নেই জানিয়ে ওরই বিছানাটায় বসলুম। টুকরো-টাকরা দু-একটা কথার পর ওর কি কথা আছে জিজ্ঞাসা করতে যাবো, হঠাৎ আমারই মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল, 'এবার এখানে এক সেলিব্রিটিকে দেখলাম হে, মানে কিছু আগের সেলিব্রিটি, মৈনাক সেন। সে দীপ্তির কিছুই নেই আর। তবু বোধহয় সব সিনেমা দর্শক এখনও ভোলে নি। বাঙালা ট্যুরিস্টরা টের পেলে পুলকিত হ'ত। ভদ্রলোককে যে রকম লোন্‌লি আর মুষড়ে পড়া দেখলুম—দু'চারজন সিউডো-ভক্ত গেলেও চাঙ্গা হয়ে উঠতেন!'

'মৈনাক মানে য়্যাক্‌টর মৈনাক সেন?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, য়্যাক্‌টর ডিরেক্‌টর প্রোডিউসার—কী নন।'

'মৈনাক সেন! এখানে!'

দেখতে দেখতে মুখ-চোখের এমন পরিবর্তন ঘটল চন্দনের—ঐ কটা, আটটা অক্ষর উচ্চারণ করার যে সময়টুকু, বোধহয় দু'তিন সেকেণ্ডের বেশি হবে না, তার মধ্যেই—ওর মুখের চিরন্তন একটা কবি-কবি আর বিনম্র মিষ্টিভাবের জন্যেই

ও এত প্রিয় সকলের কাছে—সেই মুখ এমন কঠিন, দৃষ্টি এত কঠোর ও হিংস্র হয়ে উঠল যে, আমি রীতিমতো ঘাবড়ে গেলুম। কী হল—স্ট্রোক? ফিট? য়্যাপোপ্লেক্সী? বেশ লক্ষ্য করলুম কেমন এক নিমেষে ওর নীলাভ চোখের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্যন্ত একটা লাল পর্দা পড়ে গেল। রগের শিরাগুলো দড়ির মতো ফুলে উঠল। এ যেন এক নতুন চন্দন।

'কোথায় দেখলেন? কখন?'

উত্তর দিতে দেরি লাগল বৈকি!

ঠিক এ ভাবান্তরের জন্যে প্রস্তুত ছিলুম না তো। খতিয়ে খতিয়ে যেন কতকটা অপ্রস্তুতভাবে উত্তর দিলুম, 'এই তো, বাজারেই ঘুরছেন। এক্ষুণি দেখে এলুম। কেন বলো তো, চিনতে নাকি? টাকাকড়ি ধার দাও নি তো কখনও?'

এসব কথার উত্তর দিল না, আর কোন কথাই বলল না। শেষের কথাগুলো কানে গেল বলেও মনে হ'ল না। ছিলেছেঁড়া ধনুকের মতো লাফিয়ে পাগলের মতো ছুটে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। আমি যে বেকুফের মতো একা বসে রইলুম, সে কথাও মনে রইল না তার।

॥ চন্দন ॥

ছি, ছি, সকালে অমনভাবে কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞান হারানোটা একেবারেই উচিত হয় নি। মাস্টারমশাইকে ঐভাবে বসিয়ে রেখে—! একটা কথাও বলে গেলাম না, কী অসহায় আর অপ্রস্তুত বোধ করলেন উনি! শুনলুম, মিনিট পাঁচেক বসে থেকে আস্তে আস্তে বেরিয়ে চলে গেছেন। কী অপমানিতই না বোধ করলেন! আর কী জন্তুই না ভাবলেন আমাকে! ছিঃ! ওঁর কাছে মুখ দেখাবো কি ক'রে আবার—এইটেই সারাদিন ধরে ভাবছি, কী ভাষায় মাপ চাইব ওঁর কাছে!

আসলে শিক্ষা বা ভদ্রতার মার্জনা কিছুই কিছু না। কাঠের ওপরের পালিশের পাতলা পর্দা। যে-কোন আবেগের তাপ বা ব্যক্তিগত ক্ষতির আঘাত লাগলেই সেটা উঠে গিয়ে ভেতরের কর্কশ রুক্ষ কাঠটা বেরিয়ে পড়ে। মানুষের ভেতরের আসল জন্তুটা জেগে ওঠে।

মাস্টারমশাই অনেকটাই জানেন কিন্তু সবটা জানেন না যে। অথচ এই কথাটাই ওঁকে বলতে চেয়েছিলুম।…কী-ই বা হ'ল পাগলের মতো ছুটে গিয়ে। না পারলুম তাকে অপমান করতে, আর না পারলুম গালে দুটো চড় লাগিয়ে তার ন্যূনতম প্রাপ্য তাকে দিতে। তাতে চারদিকে ভিড়ই জমে যেত, আর সে জনতা নিঃসন্দেহে ওর পক্ষ নিত। এ প্রতিশোধ তোলার কোন হকই তো আমার নেই—না ন্যায়ত, না ধর্মত। বরং কথাটা বলতে গেলে আমাকেই পাগল ভাবত। 'ভিলেন অফ দি পীস' হিরো হয়ে যেত এক মিনিটে। কিছুই করতে পারলুম না, মাঝখান থেকে মাস্টারমশাইয়ের কাছে মুখ দেখানো বন্ধ হ'তে চলল।…যেতে পারি এখনই, কিন্তু ওঁর স্ত্রী, ছেলে-মেয়েদের সামনে এসব কথা বলতে পারব না। অন্য লোকের সম্মানের প্রশ্ন জড়িত—এভাবে সকলকে জানানো চলবে না।

মাপ করবেন মাস্টারমশাই, মাপ করবেন। জানি আপনি ক্ষমা করেছেন এতক্ষণে। চিরকালই প্রশ্রয় পেয়ে এসেছি আপনার কাছ থেকে। আপনি আর বন্ধুবাবু চিরদিনই প্রশ্রয় দিয়েছেন। হয়ত এত প্রশ্রয় আর স্নেহ পেয়েই এমন বাঁদর তৈরী হয়েছি।

আপনাকে এ রহস্যের অনেকটাই বলেছি, তবু অনেকটা বাকাও রয়ে গেছে। সবটা যে আমিও এতদিন জানতুম না। জানতে চাই নি বলেই সে বলে নি। নইলে মিথ্যে সে কখনও বলে না। আমার কাছে কোনদিনই কোন কথা গোপন করে নি। সেও আমাকে ভালবেসেছে, তাই কোন মিথ্যা বা গোপনতার অন্তরাল রাখতে চায় নি আমাদের মধ্যে।

আপনি জানেন, শীলা আমার অফিসের সহকর্মী। বয়সে সামান্য একটু বড়, দেখতে চলনসই, স্বভাব মিষ্টি, ভদ্র, শান্ত মেয়ে; ব্রাহ্মণ-কন্যা। কিন্তু এ ছাড়াও অনেক—অনেক কথা জানবার আছে, জানাবার আছে। আপনাকেই জানাতুম, জানিয়ে পরামর্শ নিতুম। কিন্তু তার আগেই যে ও এই কাজ ক'রে বসল।

হ্যাঁ, সুন্দরী যাকে বলে শীলা তা নয়। আমি তা মেনে নিয়েছি। সত্যটা পরিষ্কার থাকাই ভাল, নিজের কাছেও। কিন্তু যদি আমার এ চোখ দুটো দিয়ে দেখতেন! আপনিও বলতেন, এমন আশ্চর্য মেয়ে আর আপনার চোখে পড়ে নি। আর শুধু আমিই বা কেন, অমন সুন্দর অত উজ্জ্বল মানুষটাও

তো ভুলেছিল।

বিবাহই হবার কথা আমাদের। হয়েও যেত। আমি প্রস্তুত ছিলুম, বরং উৎসুক অধীর ছিলুম বলাই উচিত। কিন্তু আমার বাবা-মা প্রথম থেকেই বেঁকে বসেছিলেন। শীলারা ব্রাহ্মণ, আমরা কায়স্থ বলে নয়—মেয়ের বয়স বেশি বলেই বেশি আপত্তি তাঁদের। শীলার অত বয়স দেখাত না, সে স্বচ্ছন্দে কমিয়ে বলতে পারত, কিন্তু ঐ আগেই বলেছি—সে মিথ্যা কথা বলতে চাইত না, কোন কারণেই। বাবা বাধা দেন নি, ছেলেকে তিনি চিনতেন, কিন্তু ভেঙে পড়েছিলেন। সে কারণটাও অতি সূক্ষ্ম। তিনি নিজেও অত বুঝতেন না বোধহয়। তাঁর যা পেনসন তাতে আমাদের সংসার চলত না—ছোট ভাই-বোন তখনও স্কুলে পড়ে—যদি তাঁরা আমাদের ত্যাগ করেন—আমার আয়টাও সেই সঙ্গে যাবে—অথচ সে আশঙ্কাটা প্রকাশ করতেও তাঁর আত্ম-সম্মানে বাধত। তাতেই আরও এত মানসিক যন্ত্রণা তাঁর।

এ আশঙ্কাটাই অবশ্য অমূলক। সে হিসেব আমরা করে ফেলেছিলাম। আমরা যদি একত্র থাকতে না পারি—অন্তত আড়াইশো টাকা মার হাতে দেওয়া দরকার হবে। সেটা দিতে পারব নিজেরা বাসা-খরচ চালিয়েও। দু'জনের মাইনে জড়িয়ে তখনই আমাদের হাজার টাকার বেশি আয় ছিল। আমার বাবাকে আড়াইশো আর শীলার বাবাকে দু'শো দিলেও বাকী যা থাকত তাতেই কষ্ট ক'রে চালাতে পারতুম, না হয় টিউশনী নিতুম একটা।

কিন্তু বাধা শীলারও কিছু ছিল। ওর মার শরীর খারাপ—নার্ভাস ব্রেক-ডাউন গোছের একটা কি অসুখ, হঠাৎ দেখলে মাথা খারাপ বলেই মনে হ'ত, ওদের বাড়িতে মেয়ে বলতে ওর একটা ছোট বোন—তার তখন মোটে দশ বছর বয়েস। সংসার কে দেখে? ঝি ছিল রান্নার কিন্তু ভাড়া করা লোকের দ্বারা তো আর গৃহিণীত্ব চলে না। তাই শীলার ইচ্ছা ছিল যে, আমার বাবা-মা যদি ওকে স্বীকার করতে বা ঘরে নিতে না চান তাহলে আলাদা বাসা না ক'রে আমিই ওদের বাড়ি গিয়ে থাকি—অন্তত ওদের খুব কাছে কোথাও।

তাতে আমার আপত্তি ছিল। বাবা-মাকে ছেড়ে গেলেই তাঁদের যথেষ্ট আঘাত দেওয়া হবে। তার উপর যদি ঘর-জামাই হয়ে থাকি সে আঘাত হবে মর্মান্তিক—আঘাতের সঙ্গে অপমান যোগ করা,—অ্যাডিং ইনসাল্ট টু ইনজুরী।

তাছাড়াও ঐ মহিলার—মানে শীলার মা'র সঙ্গে প্রতিদিন সকাল-সন্ধ্যা কাটানো আমার পক্ষে অসম্ভব। আমিও পাগল হয়ে যাবো হয়ত শেষ পর্যন্ত।

এই যৌথ কারণেই ইতস্তত করছিলাম আমরা দু'জনেই ; এর মধ্যেই এই কাণ্ডটা ঘটল। আমারই দুর্মতি, সাধারণত আমরা হিন্দী বা বাংলা ছবি দেখি না, মৈনাক সেনের নাম হয়েছে বলেই—কেমন অভিনয় করে সে দেখতে একরকম জোর ক'রেই ওকে টেনে নিয়ে গেলুম।

এই ছবি দেখতে দেখতেই শীলা যেন পাগল হয়ে গেল। অমন শান্ত, ভদ্র স্বভাবের স্থিরবুদ্ধি মেয়ে যেন ভূতে পাওয়ার মতো কাণ্ড-কারখানা বাধিয়ে তুলল। মৈনাক তার কাছে ভগবান হয়ে উঠল। সেকালে অনেক ভক্ত নাকি চাইত জগন্নাথের রথ তাদের বুকের ওপর দিয়ে চলে যাক—ভগবানের রথের নিচে ভেঙে গুঁড়িয়ে গেলেও তাদের সুখ। শীলারও সেই মনোভাব কতকটা। মৈনাক যদি ওকে লাথি মারে সেও একটা স্পর্শ বুঝবে, তাতেই ওর সুখ। তার জন্যে আত্মনাশ করাই ওর জীবনের যেন চরম সার্থকতা। জানি না একেই স্যাডিস্ট মেণ্টালিটি বলে কি না, মোট কথা ওর তখন ধারণা বা স্বপ্ন যাই বলুন—মৈনাক সেনের জন্যে চরম কোন স্বার্থত্যাগ বা অপরিসীম দুঃখ বরণ না করতে পারলে ওর জীবনের কোন মূল্য নেই।

প্রথমে বিস্মিত, পরে ক্ষুব্ধ, ক্রমে ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলাম। কোন মনোভাবই তাকে বিচলিত করল না। অনেক বোঝাবারও চেষ্টা করলাম—নানা ভাবে নানা সময়ে, কিন্তু ফল তাতে বিপরীতই দাঁড়াল বলতে গেলে। আমার সঙ্গই তার কাছে বিষবৎ হয়ে উঠল। আসলে কোন যুক্তি বা কথারই কোন অর্থ তখন তার মাথায় ঢুকছিল না, সে তখন নিজের স্বপ্নে ডুবে থাকতে চায়, নিজের অত্যুগ্র বাসনার নেশা তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করতে চায়—সেইজন্যেই কানের কাছে ভিন্ন রসের কথা বিরক্তিকর বলে বোধ হচ্ছিল। একদিন স্পষ্টই বলে ফেলল, 'তোমার ও একঘেয়ে বকুনি আমার আর ভাল লাগছে না, দোহাই তোমার, একটু চুপ করো, আমাকেও চুপ ক'রে থাকতে দাও।'

আত্মসম্মানজ্ঞানের তখনও কিছু অবশিষ্ট ছিল, তাই নিজেকে শীলার কাছ থেকে সরিয়ে নিলাম। তবে বোধ করি তার প্রয়োজনও ছিল না, সে-ই সরে

গেল ক'দিন পরেই। অত রূপবান, খ্যাতিমান পুরুষ মৈনাক সেন সাধারণ মেয়ে শীলার মধ্যে কি দেখেছিল কে জানে—যার কাছে আসার জন্ম শত শত সুন্দরী মেয়ে উৎসুক, চিত্রতারকারা তার প্রসাদ পেলে ধন্ম হয়ে যায়—সে এক-দিন শীলাকে নিয়ে সংসার পাতল। কে জানে কোন বিবাহের অনুষ্ঠান বা রেজিস্ট্রি হয়েছিল কিনা—তবে শাহারজাদীতে একটা ভোজ দিয়েছিল মৈনাক সেন, আর সে কথা সিনেমা পত্রিকাগুলিতে ফলাও ক'রে ছাপাও হয়েছিল। একটু মনুষ্যত্ব ছিল বোধহয়, আমাকে কেউ নিমন্ত্রণ করার চেষ্টা করে নি। তবে —সম্ভবত আমার সঙ্গ এড়াতে অথবা অনাবশ্যকবোধে—চাকরিতে জবাব দিল শীলা, এই ঘটনার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই।

না আত্মহত্যা করি নি মাস্টারমশাই, তাহ'লে তো খবরই পেতেন। যদিচ সে কারণ যথেষ্টই ছিল। খবরের কাগজের ভাষায় 'প্রণয়িনী কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত' নয় তো, সোজাসুজি পরিত্যক্তই। ইংরেজীতে যাকে জিল্টেড বলে তাই। এর আঘাতই যথেষ্ট। কিন্তু এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে ঘরে-বাইরে যে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের তরঙ্গ উঠল সেটা আরও মর্মান্তিক। মা বোধ করি দেওয়ালগুলোকেই সম্বোধন ক'রে বলতেন, 'আজকালকার ছেলেরা মনে করে তারা মায়ের পেট থেকেই বেদব্যাস হয়ে জন্মেছে, তারা সবজান্তা, বাপ-মা সব আহাম্মুক, কিছু বোঝে না। ঐ তো—ওনার তো প্রাণ বেরিয়ে যাচ্ছিল। তেমন মেয়ে নাকি আর ভূ-ভারতে জন্মায় নি একটিও, শান্ত, ভদ্র, কত বিবেচনা, কত বুদ্ধি—এই তো ছেঁড়া জুতোর মতো ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে চলে গেল!'

এ তো সামান্য একটু নমুনামাত্র। আরও কত কথা, কতক্ষণ ধরে চলত তা আন্দাজ করতে আপনার অসুবিধে হবে না আশা করি। অহরহ দিনরাত্রিই এইরকম চলত। বাবা মধ্যে মধ্যে মাকে ধমক দিতেন কিন্তু তাতে কোন ফল হত না। এতকাল পরে এত বড় বিজয় লাভ হয়েছে—সেটা উপভোগ করবেন না? আপিসের আক্রমণটাই বরং কম, তাদের কাজ আছে, কাজের ফাঁকে ফাঁকে একটু-আধটু টিটকিরি কি তামাশা—সে তত কিছু দুঃসহ নয়। বরং কেউ কেউ বিভিন্ন কাগজে বেরুনো ওদের জীবনযাত্রার প্রাত্যহিক ইতিহাস দাগ দিয়ে দিয়ে টেবিলে রেখে যেত—সেইটেই বেশি খারাপ লাগত।

তবে এসবই একদিন কমে এল—জুড়িয়ে এল বলতে গেলে। মাও বোধ করি শ্রান্তিতেই (আমার কাছ থেকে কোন সাড়া না পেয়েই আরও) চুপ ক'রে গেলেন। কিন্তু আমার জ্বালা জুড়লো না কিছুতেই। সত্যি বলছি মাস্টারমশাই—ওকে যে এমন একান্তভাবে চেয়েছিলাম আগে ততটা বুঝি নি, বুঝলাম হারাবার পর। সমস্ত জীবনটাই যেন অর্থহীন বিস্বাদ— জীবন রাখার জন্য এই যুদ্ধটাও অকারণ হয়ে উঠল। কিন্তু এ অনুভূতিটাই চরম নয়। তখন মনে হ'ত জীবনের চরম আঘাতটাই পাওয়া হয়ে গেছে, পরে বুঝলুম যতদিন বেঁচে থাকে মানুষ কোন কষ্ট-দুঃখ-আঘাতই চরম বলে মনে করার কারণ নেই।

বছরখানেক পরেই খবর পেলুম। শীলা মৈনাক সেনের কাছে বাসি-ফুলের মালা হয়ে গিছল। তাকে জীর্ণ পাদুকার মতোই ত্যাগ ক'রে এক 'গ্ল্যামারাস' তারকার জন্যে উন্মত্ত হয়ে উঠেছে।

মনে হ'ল বুঝি এই ঘটনাটার জন্যেই অপেক্ষা করছিলাম। নির্লজ্জের মতোই উঠে-পড়ে লাগলাম তার খবরের জন্যে, তাকে খুঁজে বার করার জন্যে। না, বাবা-মার কাছে সে যায় নি, তাঁদের কোন খবরও দেয় নি। মনে হ'ল কোন চেনা লোকের কাছে যায় নি সে। আমি কোথাও খোঁজ নিতে বাকি রাখি নি—এতদিনে তার এখানের আত্মীয়-স্বজন সকলের কথাই শুনেছি তার মুখে—এমন কি হাসনাবাদে ওদের দেশের কিছু লোক এসে বাস করছে, তাদের কথাও—তাদের সকলের সঙ্গে দেখা করেছি যতদূর সম্ভব, কিন্তু কেউই কিছু বলতে পারে নি।

লাজ-লজ্জার মাথা খেয়ে ঐ মৈনাক সেনটার কাছেই গিছলাম একবার। এমনি খুব একটা অভদ্র ব্যবহার করে নি, রূপ ও খ্যাতির তুঙ্গে তখনও—অহঙ্কার তো একটু থাকবেই, সেটুকু মেনে নিলে কোন অসুবিধে নেই আর। সেদিন ওকে বরং একটু অপ্রতিভও মনে হ'ল, হাতজোড় ক'রে বলল, 'বিশ্বাস করুন, সত্যিই বলছি আমি কোন খবর জানি না। আমি হয়ত—মানে একটু যাকে বলে এদিক-ওদিক করেছিলুম, তাও সবটা সে কারণে নয়—কাজের চাপে আরও সবদিন আসতে পারতুম না। তবু আমার সংসারের সে-ই কর্ত্রী ছিল তাতে তো সন্দেহ নেই, কেন চলে গেল কে জানে। আমি আপনাদের কথা শুনেছি—আমি তো ভাবছিলুম কোন অভিমানে আপনার কাছেই

চলে গেছে—'

আর কিছু বলার ছিল না তখন। পরে শুনেছিলুম, শুধু অভিমানে নয়, দৈহিক কারণেই ঘর ছাড়তে হয়েছিল শীলাকে। একাদিক্রমে দীর্ঘদিনই আসত না মৈনাক। আর একজনকে নিয়ে স্বতন্ত্র ফ্ল্যাটে অন্য সংসার পেতেছিল, বাড়ি ভাড়া, সংসার খরচা শীলাকে চালাতে হচ্ছিল নিজের গয়না এমন কি শেষের দিকে ভাল শাড়িগুলো বেচেও। তাইতেই নিরুপায় হয়ে গৃহত্যাগ করেছে সে।

তারপর এই দীর্ঘকাল কেটেছে। মৈনাকের উত্থানও যেমন দেখলাম— পতনও। অতি অল্প সময়, মাত্র ক'বছরের মধ্যেই উচ্চতম চূড়ায় উঠল আবার অতল গভীর খাদে গড়িয়ে পড়ল। তা হোক তাতে কিছু যায়-আসে না আমার। শীলার কথাটাই আসল। এই দীর্ঘকালেও আর কোন খবরই পেলাম না তার। মনে হয়, সে মনের ঘেন্নায়ও বটে—নিরুপায় দিশাহারা হয়েও বটে —আত্মহত্যাই করেছে।

এই সম্ভাবনার কথাটা যখন ভাবি—তখনই মনে হয়, ঐ লোকটাই এর জন্যে দায়ী। অমন একটা প্রাণ অকারণে অকালে নষ্ট হয়ে গেল ঐ অপদার্থ নির্বোধ বৃথা-অহঙ্কারী লোকটার তুচ্ছ খেয়ালের খেসারত দিতে। এই কথাটা ভাবলে আর জ্ঞান থাকে না, সব যেন চোখের সামনে লাল দেখি—স্পেনের সেই বুলফাইটের ষাঁড়ের মতো—কোন জ্ঞান, কোন হিসেবই থাকে না। সেই জন্যেই আপনার সঙ্গে অমন অভদ্রতাটা করতে পারলুম মাস্টারমশাই।

॥ লেখক ॥

তুমি যে কেন সেদিন অমন পাগলের মতো কাণ্ড-কারখানা করলে চন্দন, তা কতকটা বুঝতে পারি বৈকি। তোমার মনের অবস্থা তো জানিই—সেই জন্যেই আজ তোমাকে উদ্দেশ ক'রে লিখতে বসেছি। আমি জানি—তবে আমি যে জানি সেটা তুমি জান না।

শীলা মৈনাকের কাছে যাওয়ার পর তুমি যে নিদারুণ আঘাত পেয়েছিলে সেটা আমার চোখ এড়ায় নি। তুমি বুঝতে পারতে না—ভাবতে যে, কেউ তোমার মনোভাব বুঝবে না, তুমি সহজ আছ—কিন্তু তোমার মুখের চেহারা তোমার হুকুম মানে নি। বেদনার ছায়া তোমার ক্লান্ত চাহনিতে, অপরিসীম

অবসাদে ও ললাটের অসংখ্য নবাঙ্কিত রেখায় ফুটে উঠেছিল। তোমাকে চির-দিনই স্নেহ করি। তোমার জন্যেই আরও খবর রেখেছিলাম।

অবশ্য একটা সুবিধাও জুটে গিছল খবর রাখার। দৈবই সহায় বলতে হবে। তপু, দীপুরা তো আছেই। মাসিক আনন্দ-কল্লোলের চিত্রসমালোচক—স্টুডিওতে পড়ে থাকা, নরেশ গুপ্ত আমার প্রতিবেশী হয়ে এল সেই সময়টায়। পরিচয় ছিলই, সেটা ঝালিয়ে নিল নরেশ। মধ্যে মধ্যে কোন একটা ছুটির দিন সকালে চা খেতে আসত। তার মুখেই খবর পেতাম ও-জগতের। আরও শীলার খবরের জন্যেই ধৈর্য ধরে শুনতাম, নইলে আমার খুব একটা রুচি ছিল না ওসব খবরে। আজও নেই। আবার আমি যে শুধু ঐ খবরটাই জানতে চাই তাও ওকে জানাতে পারি না—তৎক্ষণাৎ স্ক্যাণ্ডালের গন্ধ পাবে নরেশ—কাজেই বিভিন্ন সংবাদের ফাঁকে ফাঁকে টুকরো টুকরো ক'রে শীলার দুর্দশার কাহিনী সংগ্রহ করতে হয়েছে।

হ্যাঁ, দুর্দশাই। তুমি আজও শুনলে দুঃখ পাবে জানি কিন্তু উপায় নেই। নেশাতেই পেয়ে বসেছিল শীলাকে—প্রবল নেশা—তবে সে নেশা কাটতেও দেরি হয় নি। মৈনাকের কাছে ওটা খেলা—কিন্তু সমাজে স্বীকৃতি দিয়ে গ্রহণ না করলে শীলা ওর অঙ্কশায়িনী হতে রাজী হবে না বলেই আলাদা বাসা ক'রে একটা লোক-দেখানো সংসার পাততে হয়েছিল। দু'দিনের খেয়াল দু'দিনে মিটে গিয়েছিল, আর যাওয়াই তো স্বাভাবিক, অসংখ্য সুন্দরী মেয়ে যার জন্যে পাগল, সে একটা সাধারণ মিষ্টি চেহারার মেয়েকে নিয়ে তৃপ্ত থাকবে—এমনটা আশা করাই তো ভুল হয়েছিল শীলার।

সে ভুলের কঠোর শাস্তি পেতে হ'ল। সর্বনাশে মূল্য শোধ হ'ল তার। তবু, দীর্ঘদিন দাঁতে দাঁত চেপে সহ্য করেছিল সেই অনাহার আর অপমান। শেষে আর পারল না। একদিন একবস্ত্রে বেরিয়ে পড়ল। বস্ত্র বিশেষ আর ছিলও না অবশ্য, গহনা তো নয়ই। শুধু—তুমি যে তাকে অনেকদিন আগে এক জন্মদিনে একটা হাতঘড়ি উপহার দিয়েছিলে, সেটা সে সহস্র দুঃখেও বেচে নি। সেইটেই সম্বল করে সেদিন বেরিয়ে এসেছিল। অবশ্য সে না বেরোলে দু'চার দিনের মধ্যেই বাড়িওলা আদালতের পেয়াদা এনে বার করে দিত। ততদিনে দেড়

বছরের ভাড়া বাকী পড়েছিল।

বোধহয় মরতেই চেয়েছিল শীলা।

ঠিক জানি না, নিশ্চয় করে বলতে পারব না। যত বেরিয়ে এসে মুহূর্তেকের মায়া হয়েছিল জীবনটার প্রতি—অনেক ভেবে খুঁজে খুঁজে এক বাল্য-বন্ধুর বাড়ি এসে উঠেছিল। ভাববার প্রয়োজন ছিল বৈকি, এ অবস্থায় কারও সংসারে এসে ওঠা যায় না; লজ্জা তো বটেই—লাঞ্ছনার সম্ভাবনাও কম থাকত না। এ বন্ধুটি অবিবাহিতা, ভাল চাকরি করে, তার আত্মীয়রা থাকে রায়গঞ্জে, এখানে ট্যাংরায় সে একটা সরকারী সিংগ্‌ল্ রুম ফ্ল্যাট নিয়ে থাকে। ঐ পাড়ায় দীপুরা থাকে—তাদের মুখেই বিস্তৃত খবর পেয়েছি সব। এই বন্ধুটি—রচনা নাম বুঝি—সে ওর খবর রাখত। তার কাছে এসেই বাবা-মা'র খবর পেল। বাবা নানা অসুখে শয্যাশায়ী—একটা স্ট্রোকের পর আর উঠতে পারেন নি। মা তো বহুদিনই অথর্ব। ছোট ভাই একটা চাকরি পেয়েছে বটে, তবে সে নাগাল্যাণ্ডে—সেখানের খরচ চালিয়ে মাকে একশো টাকার বেশি পাঠাতে পারে না। সে টাকা আর বাবার পেনসনের টাকায় নুন ভাত যদি বা হয়—চিকিৎসা করানো চলে না।

মেয়েদের দায়িত্ব নেই, যিনি সন্তান উৎপাদন করেছেন সন্তান প্রতিপালন করার দায় তাঁর—তার বদলে তিনি সন্তানদের কাছ থেকে কিছু আশা করতে পারেন, কিন্তু দাবী করতে পারেন না।

এ সবই জানে শীলা, মৈনাকের কাছে এ ধরনের কথা সে অনেক শুনেছে—কিন্তু তার এতদিনের ধারণা এসব যুক্তি বিচার করতে পারল না। গভীর অনুতাপই বোধ করল, সেই সঙ্গে একটা প্রবল অপরাধবোধ।

বন্ধুর কাছেই আশ্রয় পেয়েছিল, কাপড়-জামাও। কিন্তু চাকরি কোথাও পেল না। সরকারী চাকরি ছেড়ে চলে এসেছে, সে আর ফিরে পাওয়ার সম্ভাবনা নেই। বয়সও নেই, নতুন ক'রে পরীক্ষা দিয়ে চাকরি পাবার। বেসরকারী প্রতিষ্ঠান ভরসা—সেখানেও সুপারিশ না থাকলে পাওয়া যায় না। শেষ অবধি এক গুজরাটি ভদ্রলোকের কাছে আশ্রয় পেল—এই শর্তে যে, তিন মাসের মধ্যে শর্টহ্যাণ্ড শিখে নিতে হবে। তাঁর পেট্রোল পাম্প থেকে কাপড়ের দোকান—অনেক ব্যবসা, কিন্তু তিনি ওকে সেক্রেটারী হিসেবে নিজের কাছেই

রাখতে চান।

এটা প্রকাশ্য শর্ত, অপ্রকাশ্য শর্তটা জানা গেল পাঁচ-ছ দিনের মধ্যেই। প্রথমটা প্রবল ঘৃণাই বোধ হয়ে ছিল কিন্তু তারপর—সারারাত ধরে ভেবে বুঝল, এছাড়া গতি নেই। এভাবে দীর্ঘকাল একজনের গলগ্রহ হয়ে থাকা সম্ভব নয়; বহুদিন ঘুরে এইটুকু কাজ পেয়েছে, মাইনে আড়াইশো টাকা খাতায়-পত্রে। (তাতেই আশ্চর্য বোধ হয়েছিল প্রথমটায়) অপ্রকাশ্য শর্ত মেনে নিলে তিনি অপ্রকাশ্যেই আরও দুশো টাকা ক'রে দিতে রাজী আছেন। এ কাজ ছাড়লে আর কোথায় কী কাজ পাবে সে?

বুঝল এবং মেনেও নিল। কিন্তু গোলমাল বাধল অন্যত্র। বাবা-মা ওর উপার্জনের টাকা হাত পেতে নিলেন তবে ওকে আর বাড়িতে আত্মীয়স্বজনের মধ্যে স্থান দিতে চাইলেন না। মৈনাক সেনের সঙ্গে বিয়েটা আইনসিদ্ধ নয়, তাছাড়া শীলারই তো অসুবিধা হবে—তাদের কাছে মাথা হেঁট ক'রে থাকতে হবে, সবাই টিটকিরি দেবে—সেটাই কি ও সইতে পারবে?

এইবার বুঝল শীলা এতবড় কলকাতা শহরে ওর আপন কেউ নেই। একজন ছাড়া অবশ্য—সে তুমি, চন্দন। কিন্তু তোমার কাছে সে আর মুখ দেখাবে কী করে?

অনেক ভেবে দেখল সে। কোন এক হোটেল বা এমনি এক ঘর ভাড়া করে থাকতে পারে, তাতে খরচ অনেক বেশি, সে সব চালিয়ে মা-বাবাকে কি দেবে? আর এখানে নিত্য চেনা লোকের সঙ্গে দেখা হয়—বাহ্য অন্তরঙ্গতা ও আত্মীয়তার আড়ালে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের দৃষ্টি তীক্ষ্ণ ও রসনা চঞ্চল হয়ে ওঠে তাদের—সকলেই 'সরল' ভাবে এ অবস্থার কারণ জিজ্ঞাসা করে, সমবেদনা দেখায়।

শেষে—আবারও বোধহয় যখন আত্মহত্যার কথাটা ভাবছে—এই আশ্রয় পেয়ে গেল। ওর মনিবেরই আপন কাকা, ষাট-বাষট্টি বছর বয়স। স্ত্রীবিয়োগ হয়েছে বহুদিন, এক ছেলে। সে কানাডায় থাকে। কেউ নেই সংসারে, ঝি-চাকর ভরসা। শরীর ভাঙছে, এ সময় একটু সেবা-শুশ্রূষার দরকার। তেমন কেউ আছে শীলার সন্ধানে—যে সঙ্গিনী, সেবিকারূপে তার কাছে থাকতে পারে, অবশ্য তাঁকে উনি গৃহিণীর মর্যাদাতেই গৃহে রাখতে রাজী আছেন।

প্রশ্নের মধ্যে ইঙ্গিতটা স্পষ্ট, না বোঝার কথা নয়। শীলাও সে ভান করল না।

তাঁর সঙ্গে একটা বড় হোটেলে চা খেতে গিয়ে কথাবার্তা পাকা ক'রে ফেলল। দশ হাজার টাকা শীলা মার নামে ব্যাঙ্কে ফিক্সড্ ডিপোজিট ক'রে দেবে, ওর নিজের নামে তিনি আরও চল্লিশ হাজার টাকা জমা করিয়ে দেবেন। থাকতে হবে ওঁর বাড়িতেই—ম্যাঙ্গালোরে। সেখানে প্রাসাদোপম বাড়ি ; অনেক কারবার ছিল, সব গুটিয়ে ফেলেছেন—তবে এখনও তিনটে পেট্রোল পাম্প আছে, ভাড়া বাড়িও আছে ক'টা। বস্ত্র অলঙ্কার কিছুরই অভাব থাকবে না, শীলা নিজের রুচিমতো মাছ মাংসও পৃথক রাঁধিয়ে খেতে পারে। সব খরচা তো তিনি বহন করবেনই, মাসে আড়াইশো টাকা হাতখরচা দেবেন।

এফ. ডি-টা করিয়ে নিল শীলা তাঁর আকস্মিক মৃত্যু হলে আবার এমনি নিরাশ্রয় হয়ে না পড়ে এই কারণে। নইলে, জাভেরীজী আশ্বাস দিয়েছেন, শীলা যদি তার কাজ ঠিকমতো করে—তিনি তাকে একটা বাড়ি এবং ঐ পেট্রোল পাম্পগুলোর স্বত্ব লিখে দেবেন। দু'বছর দেখে সে ব্যবস্থা করবেন।

শীলা বেঁচে গেল। এখান থেকে সে পালাতে পারল সেইটেই বড় লাভ। দু-তিন দিনের মধ্যেই সে চলে গেল। জাভেরীজীর সঙ্গে। সেখানেই আছে সে, তাঁর আশ্রয়ে। কোন অসুবিধা নেই। বাবাকে মাসে দুশো টাকা ক'রে পাঠায়। সুখে আছে কিনা জানি না—নিশ্চিন্ত হয়েছে সেটা বুঝতে পারি।

না চন্দন, এ কথা বলি নি তোমাকে। বলা যাবে না। তার খবর জানলে হয়ত তুমি ছুটে গিয়ে তাকে ধরে নিয়ে আসবে, হয়ত তাকে বিয়ে করবে—সেও হয়ত রাজী হয়ে যাবে। ঘরকন্না-সন্তানের মোহ মেয়েদের যায় না কোনদিনই—কিন্তু তারপর ? সে জগদ্দল শীলা তুমি বইতে পারবে ?···শুধু সংসার চালানোর কথা বলছি না—সমাজ বলে একটা জিনিস আছে, আত্মীয়-পরিচিতদের সমাজ। আজকাল কেউ ধোপা-নাপিত বন্ধ করে 'একঘরে' করতে পারে না—কিন্তু এ সব ক্ষেত্রে নিজেদেরই সঙ্কুচিত নির্বান্ধব ক'রে নিতে হয়—বাধ্য হয়ে। ধনীদের হয়ত হয় না—তোমার আমার মতো মধ্যবিত্তদের হয়।

তার চেয়ে এই ভাল। প্রেমের যে স্বর্গ নিজের মনে রচনা করেছ তাতে বেদনাও যেমন আছে, তেমনি সুখও কিছু আছে। অন্তত বাস্তবের রূঢ়তা বা গ্লানি তো নেই।

রুচি ও অরুচি

দরজা খুলে ভেতরে ঢুকে মিনিট কতক স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল শশাঙ্ক। আবারও যেন একটা ধাক্কা খেল মনে মনে।

পরিচিত বা আত্মীয় কারুর আকস্মিক মৃত্যু সংবাদ শুনলেই মানুষের আঘাত লাগে একটা। প্রতিদিন বহু লোক মরছে দেখেও নিজে বহুকাল বাঁচার আশা করে—মানুষের এই মনোভাব দেখে যুধিষ্ঠির বলেছিলেন 'কিমাশ্চর্যমতঃ-পরম্'। কিন্তু তাতে নিজের জীবনের প্রতি অন্ধ মমতা প্রকাশ পায়, সেটা এমন কিছু আশ্চর্য ব্যাপার নয়। প্রতিদিন অসংখ্য লোক মরছে দেখেও মানুষ পরিচিত কারও মৃত্যু সংবাদে বিস্মিত হয়, এইটেই সর্বাধিক আশ্চর্য।

শশাঙ্কও আজ অপরাহ্ণে প্রথম যখন রমেশবাবুর মৃত্যু সংবাদ শোনে তখনই যথেষ্ট বিস্মিত হয়েছিল। কেমন যেন প্রচণ্ড একটা আঘাত পেয়েছিল। কাল রাত্রেও লোকটার সঙ্গে দেখা হয়েছে ক্লাবে, অনিলার খোঁজ করেছেন—বলেছেন, *'কাল সকালেই দেখা করতে যাব মিসেস মুখার্জিকে বলে দেবেন।'* দুঃখ করেছেন যে অনিলার সেইদিনই আসবার কথাটা তাঁকে কেউ জানায় নি বলে। জানলে তিনিও স্টেশনে আনতে যেতেন। চল্লিশ বছর বয়সের শক্তসমর্থ সাজোয়ান মানুষটা। অকৃতদার—সেই কারণেই ফূর্তিবাজ। টাকাকড়ির ব্যাপারেও তেমনি অনাসক্ত। সরকারী হাসপাতালের ডাক্তার কিন্তু সেইটে তাঁর একমাত্র পরিচয় নয়। প্রধান পরিচয় তো নয়ই। বাংলা দেশ থেকে প্রায় দেড় হাজার মাইল দূরে মধ্যপ্রদেশের এই ছোট্ট শহরটিতে মারাঠী, গুজরাটি, মারোয়াড়ী সকল মহলেই নিজের একটা প্রতিপত্তি ক'রে নিয়েছিলেন, সকলেরই প্রিয় ছিলেন। সরকারী হাসপাতালের ডাক্তার হয়েও রোগী এবং সহকর্মী সকলের শ্রদ্ধেয় ছিলেন—এইটে বললেই বোধ করি তাঁর সম্বন্ধে যথেষ্ট বলা হয়।

সেই মানুষটা আর নেই? এই মাত্র চোদ্দ পনেরো ঘণ্টা আগেও যে সম্পূর্ণ সুস্থ ও সজীব ছিল—এখন সে অসাড় হিম স্থির। অসুখ নয় বিসুখ নয়—বর্তমান কালের শ্রেষ্ঠ যমদূত থ্রম্বসিসও নয়—লরী দুর্ঘটনায় মারা গেলেন ভদ্রলোক।

ঘটনাটা ঘটেছে অবশ্য সকাল আটটায়, রমেশবাবুর হাসপাতালে যাওয়ার পথে। সদাশিব যোশীর লরীতে চাপা পড়েছেন রমেশবাবু। শশাঙ্ক তখন ছিল না, কী একটা ইন্‌স্‌পেক্‌শ্যনে শহরের বাইরে গিয়েছিল। তিনটের সময় ফিরে এসে খবর পেয়েছে। অনিলার মুখেই শুনেছে সব।

অনিলা যা বলেছে তা এই ঃ

প্রত্যহই নাকি রমেশবাবু তাঁর বাসা থেকে বেরিয়ে সকালে যখন হাসপাতালে যান, যোশীর সঙ্গে দেখা হয় তাঁর। যোশীরও সেইটে সাইডিংএ মাল আনতে যাবার সময়। 'গান্ধী চৌরাহা'র মোড়-বরাবরই দেখা হয় তাঁদের। কোনদিন বা একটু এধারে, কোনদিন বা ঠিক মোড়ের মাথায়। বাড়ি থেকে বেরিয়ে মোড় পর্যন্ত এসে বাঁ হাতি হাসপাতালের দিকে বেঁকে যান রমেশবাবু —যোশী সোজা বেরিয়ে যায় রেলওয়ে সাইডিংয়ের দিকে। এ প্রায় নিত্যকার ঘটনা। ওঁর জন্যে যোশীকে সাবধান হ'তে হয় না কোনদিনই। সেই বিশ্বাসেই যোশী কিছুটা অসতর্ক ছিল। রমেশবাবু যে হঠাৎ বাঁ দিকে না ঘুরে ডান দিকে —অর্থাৎ শশাঙ্কদের বাসার দিকে মোড় ঘুরবেন তা সে বেচারী একবারও বুঝতে পারে নি। রমেশবাবু হঠাৎই এদিকের পথে নেমে পড়েছেন। কেউই বুঝতে পারে নি তাই সতর্ক হবার কি সতর্ক করবার অবকাশ পায় নি। মোড়ের পাহারাওলাটাও না। বোধ করি নিতান্ত রমেশবাবুর নিয়তি ঘনিয়ে এসেছিল বলেই এমনটা ঘটল। সকলেই বুঝল প্রায় একসঙ্গে—কিন্তু তখন আর কোন-পক্ষেই সাবধান হবার সময় ছিল না। যোশী তবুও প্রাণপণে ব্রেক চেপে ধরেছিল, রমেশবাবু বেরিয়ে গেলে বেরিয়ে যেতে পারতেন—কিন্তু তিনিও শেষ মুহূর্তে কেমন যেন বিভ্রান্ত হয়ে ফেরবার চেষ্টা করতে গেলেন—আর তাইতেই এমন শোচনীয় ঘটনাটা ঘটল। লরীটা ওকে পিষে দ'লে তাল-গোল পাকিয়ে দিয়ে বেরিয়ে গেল ওঁর দেহটার ওপর দিয়ে। হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া কি চিকিৎসা করার কোন প্রশ্নই রইল না আর।

'উঃ, বেচারী যোশী যা কাণ্ড করছে'—অনিলা বলল, 'কেঁদেকেটে মাথা-খুঁড়ে—তার দিকে আর চাওয়া যায় না। জনে জনে পায়ে ধরছে, বলছে—আমাকে আপনারা মেরে ফেলুন। গত বছরই ডাগ্‌ডার বাবু আমাকে মরা বাঁচালেন—আর আমি এমনি ক'রে তার শোধ নিলুম। ··কেউ তাকে বুঝিয়ে

ধরে রাখতে পারছে না।'

শশাঙ্ক তখনই সেই জীপে অনিলাকে তুলে নিয়ে হাসপাতালে গেল। রমেশবাবুর নিকটতম বাঙালী প্রতিবেশী হিসেবে ও বন্ধু হিসেবে এটা তার কর্তব্য। এ শহরে আরও যা দু-তিন ঘর বাঙালী আছেন, তাঁরা বহু দূরে থাকেন ; তাছাড়া তাঁদের কারও সঙ্গেই এতটা ঘনিষ্ঠতা ছিল না ওঁর। সুতরাং আত্মীয়ের কর্তব্য যা কিছু শশাঙ্কদেরই করতে হবে। হাসপাতালের সকলেই খুব শোকার্ত। নতুন ছোকরা ডাক্তার নিম্বলকর তো বিশেষ ক'রে। কেঁদেই ফেলল বেচারী, 'দাদা আমাদের জন্যে এত করতেন—আমরা কিছুই করতে পারলুম না! চিকিৎসা নয়, সেবা নয়—কিছু নয়। এর চেয়ে আপসোস আর কী হ'তে পারে!'

যাই হোক—নিম্বলকর আর হেডক্লার্ক দেশাইবাবু, দেখা গেল ইতিমধ্যে অনেক কিছু করেছেন। ঠিকানা হাসপাতালেই লেখা ছিল, তাই দেখে তাঁরা দিল্লীতে রমেশবাবুর দাদার কাছে ফোন করেছেন, সেখান থেকে ঠিকানা নিয়ে ভগ্নিপতি শরৎবাবুর কাছে পুনায়। তাঁরা দুজনেই অনুরোধ করেছেন শবটা রেখে দিতে। আজকের 'নাইট প্লেনে' তাঁরা নিশ্চিত রওনা হবেন, না হয়ত কাল ভোরের প্লেনে। তাঁরা এসে সৎকারের ব্যবস্থা করবেন।

সুতরাং কিছুই আর করবার ছিল না, অনিলাকে নিয়ে বাসায় ফেরা ছাড়া। কিন্তু যত গোল বাধাল ঐ দেশাই লোকটা। শেষ মুহূর্তে রমেশবাবুর চাবির গোছাটা বার ক'রে বলল, 'আপনারা যদি কেবল একটু ওঁর বাসাটা ঘুরে যান তো ভাল হয়। কেউ তো ছিল না, উনিও দুপুরবেলা ফিরবেন ভেবে বেরিয়েছেন, হয়ত জানলাটানলাগুলোও বন্ধ করা হয় নি ভাল ক'রে, যা ভুলো মানুষ, হয়ত বা পাখাগুলোই খুলে রেখে বেরিয়ে এসেছেন। টাকা পয়সা তো ছড়ানোই থাকে ওঁর চতুর্দিকে। একটু সামলেসুমলে রেখে যান, তার পর কাল ওঁর দাদা এলেই তো নিশ্চিন্ত, আমাদের দায়িত্ব শেষ।'

'কেন, ওঁর—ওঁর ঝি নেই?' আড়ষ্ট কণ্ঠে প্রশ্ন করল শশাঙ্ক। মৃতের জামা থেকে টেনে বার করা ঐ চাবিটায় হাত দিতে ওর খুব ভাল লাগছিল না, কে জানে হয়ত ওতে তাঁর দেহের রক্তই লেগে আছে খানিকটা।

'না, সেইতো হয়েছে মুশকিল। দাই কাল সকালে দুদিনের ছুটি নিয়ে চলে গেছে, তার মেয়ের নাকি অসুখ খুব, তাকে দেখতে গেছে। ডাঃ মোরের বাড়ি থেকে ওঁর খাবার আসছিল, মানে কাল দুবেলাই এসেছে। আজও নিয়ে এসেছিল সাইকেলে ক'রে—তার মুখেই খবর পেয়েছেন ডাঃ মোরে। সেই থেকেই শয্যাশায়ী একেবারে, আজ আর নাকি কারও সঙ্গে দেখা করেন নি তার পর থেকে এখনও পর্যন্ত।'

ডাঃ মোরে এখানকার প্রাইভেট ডাক্তার, সত্তরের ওপর বয়স। খুব পসার আর খুব পয়সা। লোকটি নিজের ছেলের মতো ভালবাসতেন রমেশবাবুকে। তাঁর যে কী পরিমাণ বেজেছে তা তাঁকে না দেখেও অনুমান করতে পারল শশাঙ্ক।...

অগত্যা চাবিটা নেওয়া এবং রমেশবাবুর বাংলোর দিকে রওনা হওয়া ছাড়া উপায় রইল না ওদের; এবং সেই নির্জন নিস্তব্ধ বাংলোর চাবি খুলে ঢুকতেও হ'ল এক সময়।

ঘরে ঢুকেই প্রথম যে অনুভূতিটা হ'ল ওদের, তা হ'ল রমেশবাবুর সান্নিধ্য।

যেন এইমাত্র মিনিটখানেক আগে পর্যন্ত এই ঘরেই ছিলেন ভদ্রলোক, যেন দূরে কোথাও যান নি। হয়ত বড়জোর এখনই গিয়ে বাথরুমে-টুমে ঢুকেছেন। কারণ তাঁর নিত্যব্যবহার্য এবং সদ্যব্যবহৃত জিনিসগুলো চারিদিকে ছত্রাকার ক'রে ছড়ানো। মাথা মোছা তোয়ালেটা ইজিচেয়ারের ওপর পড়ে, একটা প্রান্ত একদিকের হাতা থেকে ঝুলছে। চটি দুটো সামনেই পড়ে, তাড়াতাড়ি পা দিয়ে সরিয়ে রাখতে গিয়ে একটা পাটি উল্‌টে পড়েছিল সম্ভবত, এখনও সেই অবস্থাতেই আছে সেটা। যে মোজা পরতে গিয়েছিলেন সেটা বোধহয় পছন্দ হয় নি—আধ-ময়লা মোজা জোড়াটা শু-র‍্যাকের সামনে ছড়ানো, অপর যে জুতোর মধ্য থেকে নতুন মোজা বার ক'রে পরেছেন সে জুতোর দুটো পাটিও নিচে পড়ে আছে, এক পাটি কাৎ হয়ে আছে তার মধ্যে। বোধহয় কাল রাত্রে ফিরে বুকপকেট থেকে কিছু খুচরো পয়সা এবং ভাঁজ করা রুমাল-খানা বার ক'রে টেবিলে রেখেছিলেন, সেটা আর আজ সকালে মনে ছিল না,

তেমনিই পড়ে আছে। যা মানুষ, কে জানে হয়ত বা আজ অন্য রুমাল নিয়েও যান নি।...

এমনিই ছিলেন মানুষটি—ঠিক এমনি। এমনি অগোছালো, এমনি ছটফটে। ভাগ্যে বুড়ি দাইটা ভাল পেয়েছিলেন, সে সব টেনেটুনে গুছিয়ে-গাছিয়ে রাখে তাই, নইলে কত যে লোকসান হ'ত তার ঠিক নেই। এই তো মাত্র সেদিনকার কথা, গতমাসে কি তার আগের মাসে—মাইনের পুরো টাকাটা খামসুদ্ধ পকেট থেকে পড়ে গিয়েছিল মেঝেয়, তা দেখতেও পান নি, হুঁশও হয় নি। পরের দিন সকালে দাই দেখতে পেয়ে কুড়িয়ে তুলে রেখেছিল তাই রক্ষা। নইলে পাশের বাংলোয় য়্যাংলো-ইণ্ডিয়ান ছেলেমেয়েগুলো মাঝে মাঝে খেলা করতে ঢোকে, বিখ্যাত চোর এপাড়ার, টাকা পয়সা দেখলেই সরিয়ে নিয়ে যায়—এক-একদিন স্নান করার সময় বাইরের দরজা খুলেই চলে যান রমেশবাবু—সে অবস্থায় ওরা কেউ ঢুকলে এক পয়সাও পেতেন না।...

প্রাথমিক শক্‌টা কেটে যাওয়ার পর অনিলাই প্রথম সক্রিয় হয়ে উঠল। জুতো মোজাগুলো সরিয়ে সাজিয়ে, চটিজোড়াটা অভ্যস্ত জায়গায় ইজিচেয়ারের সামনে সোজা ক'রে রেখে, টেবিলের ওপরের কলম চশমার খাপ ঠিক ঠিক গুছিয়ে—রুমালটা ও পয়সাগুলো টানায় রেখে অনেকটা চলন-সই ক'রে নিল। ছেড়ে যাওয়া লুঙ্গি ও তোয়ালে আলনায় তুলে দিল, ভিজে লুঙ্গিটা ভেতর দিকের বারান্দায় শুকোচ্ছিল, সেটাও ভেতরে এনে রাখল। কতকটা ঝোঁকের মাথাতেই ক'রে গেল যেন অনিলা, মনে হ'ল জীবিত কোন আইবুড়ো একক আত্মীয়ের বাসায় হঠাৎ এসে পড়ে একটু গুছিয়ে রেখে যাচ্ছে—ফিরে এসে তিনি একটু স্বাচ্ছন্দ্য পাবেন বলে। যে আর কোন দিনই আসবে না—তার জন্য এ ধরনের আয়োজন একেবারেই নিরর্থক, সে কথাটা একবারও মনে হ'ল না অনিলার।

দেশাইবাবু ঠিকই বলেছিল, জানলা অনেকগুলোই খোলা, কোন কোন পাল্লা আধভেজানো হয়ে গেছে হয়ত হাওয়ায়, কিন্তু ছিটকিনি বন্ধ নেই কোনটাতেই। শার্সিও খোলা, দুপুরে ঝড়ো হাওয়ায় বাইরের শিরীষ গাছ থেকে অজস্র শুকনো পাতা উড়ে এসে পড়েছে। সবচেয়ে রান্নাঘরটা—রান্নাঘরের বাইরের দিকের দরজাটা বন্ধ হয় নি, অথচ ঘর থেকে রান্নাঘরে যাবার দরজাটা

তালা বন্ধ করা হয়েছে ভাল ক'রে।

এই নিয়ে একটু হাসাহাসিও হ'ল ওদের, আগেকার সেই থমথমে আবহাওয়াটা কাজেকর্মে এবং লোকটির ছেলেমানুষী মনের এই পরিচয়ে অনেকটাই কেটে গেল মন থেকে।

সব জানলা বন্ধ ক'রে ওদিকের সব দরজায় তালা লাগিয়ে বেরোবার মুখে, একবার—যেন শেষ বারের মতো—ঘরটার দিকে ফিরে তাকাবার জন্যে ফিরে দাঁড়াল অনিলা, আর কী মনে করে আবার একটু ফিরে গিয়ে ফ্রীজটি খুলল।

পর পর দুটি বোতল দুধ জমে আছে দুদিনের। দাই নেই, কে আর জ্বাল দেবে! তবু যে ফ্রীজে তুলে রেখেছেন হুঁশ ক'রে এই ঢের।···কবেকার দুটো রসগোল্লা পড়ে আছে একটা কাপে, গোটা তিনেক সরবতী নেবু। আর—যেটা দেখে অনিলার বিস্ফারিত দৃষ্টি আর নড়তে পারল না, স্থির নিবদ্ধ হয়ে রইল—সেটা হচ্ছে একরাশ, বোধ হয় এক কিলো কি আরও বেশি—ট্যাংরা মাছ! কে এনেছে কোথা থেকে এনেছে—এখানে দুষ্প্রাপ্য, প্রায়-দুর্লভ এই মাছ—কে জানে! কবে এনেছে তাও কেউ জানে না। এমন কৃপণের মতো জমিয়েই বা রেখেছেন কেন! এখানে মাছ সবদিন পাওয়া যায় না, তাই পেলে অনেকেই বেশি ক'রে কিনে নেয়—বাঙালীরা বিশেষ ক'রে—তিন চারদিন ধরে খায়। সেই কারণেই বাঙালীদের সংসারে ফ্রীজটা প্রায় অপরিহার্য এখানে। কিন্তু ডাক্তারবাবু তো ঠিক এ ধরনের হিসেবী সংসারী মানুষ ছিলেন না, মাছ-টাছ পেলে বেশি ক'রে কিনতেন ঠিকই—তবে তা তৎক্ষণাৎ বিলিও ক'রে দিতেন—দু-তিন বাড়ি তো বাঁধা, তার মধ্যে শশাঙ্করাই বৃহদাংশ পেত আর যেটুকু থাকত একবেলাতেই সব খেয়ে নিতেন। বলতেন, 'চোর ডাকাতের ভয়, পেটে পুরলেই হয়। রেখে দেব কার জন্যে বলো। রামচন্দ্র! রামচন্দ্র! ওবেলা যদি না-ই বাঁচি! কিছু কি লেখাপড়া আছে কদিন বাঁচব তার?'

সেই মানুষের ফ্রীজে এত মাছ কবে থেকে পড়ে আছে কে জানে!

তবে কি কালই পেয়েছেন, দাই চলে যাবার পর?

জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকাল স্বামীর দিকে অনিলা, সোজাসুজি প্রশ্নও করল।

'উঁহু।' উত্তর দিল শশাঙ্ক, 'কাল বাজারে মাছ ওঠেনি!'

এবার ফ্রীজের দোরটা বন্ধ ক'রে চলে আসাই উচিত, কিন্তু তবু যেন অনিলা

একটু ইতস্তত করে।

'চলো।' অসহিষ্ণু শশাঙ্ক তাড়া লাগায় একবার।

'হ্যাঁ—এই যে।'

বলে, কিন্তু নড়তে পারে না। ইতস্তত করে তবুও। কেন, তা সেও ঠিক বলতে পারত না তখনই—সোজাসুজি প্রশ্ন করলেও। অথচ এমন ভাবে দাঁড়িয়ে থাকাটাও যে অশোভন সেটাও বুঝতে পারে। ফলে কেমন যেন বিরক্ত হয়ে ওঠে অকারণেই। নিজের ওপরও বটে, মৃত লোকটার ওপরেও বটে।

'এধারে তো সংসারের কোন ধার ধারতেন না—কিন্তু খাওয়ার লোভটি তো দেখছি ষোল আনা ছিল। একরাশ মাছ, জমিয়ে রেখেছেন। একা লোক তিন দিন দুবেলা ধরে খেলেও ফুরোবে না।'

'ছিঃ, ওকে লোভী বলে না অনু। কী পরিমাণ মাছ বিলোতেন বলো দেখি।' মৃদু তিরস্কার করে শশাঙ্ক, 'এটা নিশ্চয়ই পড়ে আছে—পাঠাবার সময় বা লোক পান নি বলে।'

শশাঙ্কই ফ্রীজের পাল্লাটা ভেজিয়ে বন্ধ ক'রে দিল।

এর পরে আর সে ঘরে কি সে বাড়িতে থাকার কোন কারণ নেই। দরজা বন্ধ ক'রে বেরিয়ে যাওয়াই উচিত। জীপের ড্রাইভার অসহিষ্ণু হয়ে উঠছে ক্রমশ। শশাঙ্কর অফিসের জীপ, সেই কোন্ ভোরে বেরিয়েছে।

অনিলাও তা বোঝে। দরজার দিকে এগিয়েও যায় কিন্তু একেবারে ঠিক যেন তখনই বেরিয়ে যেতে পারে না। আরও একবার ফিরে দাঁড়িয়ে ঘরটার দিকে চায়। বহু পরিচিত ঘর, কতবার এসে কত হৈ-হল্লা ক'রে গেছে ওরা। অনিলা এলেই এমনি ভাবে সব গুছিয়ে গাছিয়ে দিয়ে যেত, কতদিন এসে আলমারির ভেতর থেকে ময়লা কাপড় উদ্ধার ক'রে দাইকে দিয়ে ধোবিখানায় পাঠিয়েছে সে। তার কাণ্ডকারখানায় লজ্জিতও বোধ করতেন আবার আনন্দিতও হতেন রমেশবাবু, ঠাট্টা করে বলতেন, 'গৃহলক্ষ্মী বলতে পারলেই খুশী হতুম কিন্তু শশাঙ্ক হয়ত আবার মামলা রুজু ক'রে দেবে—আমি আপনাকে গৃহ-দেবতা আখ্যা দিলুম মিসেস মুখার্জি।'

এই ঘর, হয়ত ওর পরিচিত প্রিয় এইসব আসবাব সুদ্ধই ফেলে রেখে চলে যাবেন রমেশবাবুর দাদা, এর কোন্‌গুলো রমেশবাবুর কেনা আর কোন্‌গুলো

বাড়িভাড়ার সূত্রে পাওয়া তা শশঙ্করাও জানে না।…কে জানে কোন নতুন ভাড়াটে আসবে আবার—কী প্রকৃতির লোক তারা হবে কে জানে! এই বাড়ি রমেশবাবুর বাড়ি বলেই জানত ওরা, শশাঙ্ক তো গত চার বছর ধরেই দেখছে। তারও আগে থেকে আছেন উনি, এই ঘরের এই সমস্ত আসবাবের সঙ্গেই রমেশবাবুর স্মৃতি অঙ্গাঙ্গী জড়িত—।

শশাঙ্ক একরকম অনিলাকে সরিয়ে দরজাটা বন্ধ করে। তারপর বারান্দাটা পেরিয়ে নিচে বাগানে নেমে আসে দুজনেই। কিন্তু কাঁকরঢালা রাস্তাটুকু পার হয়ে আসতে আসতে আবারও থমকে দাঁড়ায় অনিলা। আর মনের সঙ্গে প্রতারণা ক'রে লাভ নেই। এই কথাটাই এতক্ষণ ধরে ভাবছিল সে—সেটা স্বীকার করাই ভাল।

'আচ্ছা হ্যাঁগো—ও মাছগুলোর কী হবে?'

'মাছ!…তা কি জানি। যাক, ওর দাদা এসে যা হয় করবেন।'

'তাঁর তো অশৌচ, কাল তো তার মাছ খেতেও নেই! আর খেতে থাকলেই বা কি, ছোট ভাইকে পোড়াতে এসে কি আর ঐ মাছ রাঁধিয়ে সপাসপ ক'রে খেতে বসবেন! দাইটাও তো মাছ খায় না। ও নষ্টই হবে ধরে নাও। হয়ত ফ্রীজ খুলে দেখবেও না কেউ। দেখলেও ফেলে রেখে যাবে। নতুন ভাড়াটে যে আসবে সে এসে দেখে ফেলে দেবে। নাক সিঁটকোবে ঘেন্নায়, মচ্ছিখোর বাঙ্গালীর কাণ্ড দেখে। আর ততদিনে ও মাছেরই কি আর কিছু থাকবে?'

বড় বড় ডিমভরা ট্যাংরা। অন্তত ছটি টাকা দাম। তাও, এক কিলোর বেশীই আছে সম্ভবত।

কতকাল খায় নি ওরা। অনিলা সম্প্রতি বাপের বাড়ি গিয়েছিল বটে কিন্তু সেখানে তো মাছই খেতে পায় নি কদিন। কোনরকম মাছই ওদের বাজারে ওঠে নি কদিন। মাংস খেয়ে অরুচি এখানে, ওখানে গিয়েও আবার তাই খেতে হয়েছে। তবুও এখানে মুরগী পায় মধ্যে মধ্যে, ওখানে তাও সুবিধে নেই। মুরগী ওদের মা ঘরে-বাড়িতে ঢুকতে দেন না এখনও।

'তা আমরা আর কি করব বলো! তা বলে না বলে কয়ে পরের ফ্রীজ থেকে মাছ নিয়ে যাব!'

একটু যেন অকারণেই উষ্ণ শোনায় শশাঙ্কর কণ্ঠ।

আসলে সেও এই কথাগুলোই ভাবছিল ঠিক। কিন্তু স্ত্রীর কণ্ঠে সেই মনোভাবের প্রতিধ্বনিটাই কেমন যেন খারাপ শোনাল।

'তা বলব আর কাকে বলো! যার মাছ সে তো আর নেই। আর কারই বা অনুমতি দেবার অধিকার আছে! যার মাছ তিনি থাকলে আপত্তি করতেন না নিশ্চয়ই! বরং হয়ত নিজেই পাঠিয়ে দিতেন আজ বা কাল—'

'সে হয়ত ঠিক। তবু এমন একটা শোকাবহ ঘটনার পর—এক পুঁটুলি মাছ নিয়ে বাড়ি ফিরব। তাঁর বাড়ির মালপত্র গুছিয়ে রাখার জন্যে এসে না বলে তাঁর জিনিস নিয়ে যাব। কী রকম দেখাবে সেটা?'

'কে দেখবে বলো। দাইটা থাকলে তাকেই বলতুম। এমনি এমনি পড়ে নষ্ট হবে এত টাকা দামের জিনিসগুলো! কেউই খেতে পাবে না, কারুরই ভোগে হবে না!'

তারপরই মনে পড়ে যায় কথাটা অনিলার, সে বেশ জোর পায় যেন। কণ্ঠস্বরেও জোর দেয় খানিকটা। বলে, 'তাছাড়া, মৃত মানুষের প্রিয় জিনিস ব্রাহ্মণকেই তো খাওয়াতে হয়। ব্রাহ্মণ খেলেই তার খাওয়া হয়। মুখের জিনিস —খেতে পান নি—তুমি খেলেই তার খাওয়া হবে।'

'মুখের জিনিস' শব্দটা যেন কানে ধাক্কা মারে শশাঙ্কর। অজ্ঞাতসারেই শিউরে ওঠে একটু! তবুও রসিকতার চেষ্টা ক'রে বলে, 'তাহলে তুমি খাবে না তো?'

তারপরই আবার গম্ভীর হয়ে বলে, 'যাকগে। লোকটার মুখের জিনিস—তুমিই তো বলছ, কত আশার জিনিস হয়ত—কী দরকার!'

আর কিছু বলে না অনিলা। দু'জনেই গাড়িতে এসে বসে। ড্রাইভার ইন্দর সিং স্টার্ট দিয়ে গাড়ি ছাড়ার উপক্রম করে।

'কিন্তু তাও ভাবছি,' ইঙ্গিতে ইন্দর সিংকে নিরস্ত করে এবার শশাঙ্কই বলে, 'অত আশার জিনিস—শেষকালে হয়ত কে এসে আস্তাকুঁড়ে ফেলে দেবে, হয়ত বা শিয়াল কুকুরে খাবে। লোকটার আত্মা শান্তি পাবে না।'

'তাই তো আমিও বলেছিলুম গো, হাজার হোক তুমি ব্রাহ্মণ, তুমি বা আমরা খেলে তিনি তৃপ্তই হবেন।'

দু'জনেই এবার যেন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচে।

অস্বস্তিটা কেটে গেছে দু'জনকারই—পরস্পরের সমর্থন লাভ ক'রে।

সহজ ভাবেই নেমে আসে এবার, সহজ ভাবেই দোর খোলে ঘরের। অত-গুলো মাছ কিসে নেবে সে একটা সমস্যা। শশাঙ্ক রুমাল বার করেছিল পকেট থেকে কিন্তু অনিলা ঘাড় নাড়ল। এতগুলো মাছ ঐটুকু রুমালে যাবে না। শেষে সে-ই কোথা থেকে একটা রেশন ব্যাগ খুঁজে বার করল, তাতেই মাছগুলো তুলে নিল, আস্তে আস্তে সযত্নে। নিজের হাতেই তুলল সে, অনুভব ক'রে ক'রে।

না বলে কয়ে রেশন ব্যাগটা নেওয়া অন্যায় হচ্ছে কিনা, সেটা নিয়ে আর কেউ মাথা ঘামাল না এবার।

সে রাত্রে আর মাছ খাওয়া হ'ল না, বলাই বাহুল্য। খেতে ঠিক ইচ্ছাও করল না। ঠাণ্ডা আলমারিতে তুলে রেখে দিল অনিলা।

পরের দিনও মাছের হাঙ্গামা করা গেল না। রমেশবাবুর দাদা আর ভগ্নি-পতি এসে পড়লেন। তাঁদের নিয়ে হাসপাতালে যাওয়া, শ্মশানে যাওয়া—সবই করতে হ'ল শশাঙ্ককে। তাঁরা ঐ বাংলোতেই উঠলেন বটে তবে তাঁদের খাওয়া, জলখাবারের ব্যবস্থা অনিলাকেই করতে হ'ল সব। রাত্রের খাবারও—ফলমূল ছানা এবং ভগ্নিপতির জন্যে লুচি তরকারী পাঠিয়ে দিল ওখানে। ওঁরা ভোরেই আবার চলে যাবেন; কথা হ'ল দিন-সাতেক পরে রমেশবাবুর দাদা আবার আসবেন, এখানের দেনাপাওনা মেটাতে, জিনিসপত্রের ব্যবস্থা করতে—প্রভিডেন্ট ফাণ্ড ও ব্যাঙ্কের সঙ্গেও বোঝাপড়া করতে। সে সময় সোজাসুজি এসে যেন এখানেই ওঠেন, বারবার বলে দিল শশাঙ্ক।

পরের দিন শর্ষেবাটা দিয়ে বেশ জুৎ ক'রে রাঁধল অনিলা ট্যাংরা মাছগুলো। রমেশবাবুর কথা যে মনে পড়ে নি তা নয়, বেচারী অনিলার হাতের রান্না বড় ভালবাসতেন, বিশেষত এই মাছের ঝাল। তবে আজ আর ব্যথাটা খুব উগ্র নয়, দুটো দিন অনাত্মীয়—শুদ্ধমাত্র পরিচিত লোকের বিয়োগব্যথার তীব্রতা কমে আসার পক্ষে যথেষ্ট। তবু—একবার অনিলার চোখে তো রীতিমতো জলই এসে গিয়েছিল, যখন শশাঙ্ক খেতে খেতে—রমেশবাবুর ভাষাতেই ওর প্রশংসা ক'রে বসল। শেষ যেবার খেতে এসেছিলেন রমেশবাবু, ওদের বাড়ি—

এই মাস খানেক আগেই—সেবার এই শর্ষেবাটা দেওয়া মাছের ঝাল খেতে খেতেই বলেছিলেন, 'দ্রৌপদী বেঁচে থাকলে কম্পিটিশুনে হেরে যেত আপনার কাছে—স্রেফ এই মাছের ঝালেই তাকে মেরে বেরিয়ে যেতেন আপনি। সত্যি, এ আমার মন-যোগানো কথা নয় মিসেস মুখার্জি, পাঞ্চালী ঠাকরুন অন্তত এ রান্নায় আপনার কাছে দাঁড়াতে পারতেন না।'…

তবু সে দুঃখও সাময়িক। সে ভাবটা কাটতেও দেরি হ'ল না। শশাঙ্ক যখন অফিসে বেরোচ্ছে তখন কী একটা কথা নিয়ে হাসাহাসিও হয়ে গেল এক চোট।…

বেলা এগারোটা নাগাদ স্নান সেরে খেতে বসতে যাবে অনিলা, রমেশবাবুর বুড়ী দাইটা এসে হাজির হ'ল। কাঁদতে কাঁদতেই এসেছে সে, ওকে দেখে আরও হাহাকার ক'রে কেঁদে উঠল। কিছুই জানত না, আজ সকালে পৌঁছে এই খবর পেয়েছে সে। মাত্র তিনটে দিন সে ছিল না, এরই মধ্যে সব শেষ হয়ে গেল—মানুষটাকে একবার শেষ দেখাও দেখতে পেল না, এর চেয়ে আফসোসের কথা আর কী আছে।…হায় হায়! অমন মনিব আর হবে না। মানুষ নয় দেবতা ছিলেন। এই তো সে দিনও, বাড়ি যাবার সময় মেয়ের চিকিৎসার জন্যে কুড়িটা টাকা হাতে গুঁজে দিয়েছেন। কুড়িটা টাকা আর এক বোতল গুঁড়ো দুধ। এমন যে কতবার দিয়েছেন, কত রকমে যে সাহায্য করতেন তাকে—তার ইয়ত্তা নেই। কখনও বকেন নি তাকে, শত দোষ করলেও—কি একটা কড়া কথা বলেন নি।

সাধ্য-মতো ওকে সান্ত্বনা দিল অনিলা। গরম কফি ক'রে খেতে দিল, ওর কাছে থাকবার কথাও বলল কিন্তু সে প্রস্তাবে রাজী হ'ল না দাই। প্রবল বেগে ঘাড় নাড়ল। না, আর না! চাকরি আর সে করবে না। এর পর আর কারও কাছে চাকরি করতে পারবে না। মেয়ের কাছে গিয়েই থাকবে, তার কাজেকর্মে সাহায্য করবে। চাষের কাজ জানে, ফসল ফলাতে পারবে। বাকী সময় তকলীতে সুতো কাটবে, একটা পেট তার চলেই যাবে। ইত্যাদি :—

ততক্ষণে একটু সুস্থ হয়েছে। কিন্তু তাহলেও নিজের প্রসঙ্গ বা অন্য কারও কি অন্য কোন প্রসঙ্গে রুচি নেই তার—স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে। ঘুরেফিরেই সে ডাক্তারবাবুর প্রসঙ্গে ফিরে আসছে বার বার।

একথা সেকথার পর হঠাৎ একসময় বলে বসল, 'তোমাকেও খুব ভালবাসত বৌমা, বড্ড ভালবাসত। তোমরা অত টের পাও নি—কিন্তু আমি তো বুড়ো মানুষ, আমি ঠিক টের পেতুম। কত সুখ্যাতি করত তোমার, তোমার কথা উঠলে শত মুখে বলেও যেন শেষ করতে পারত না। রাত্রে খেতে বসে তো তোমার কথা উঠবেই একবার করে। বলত, যাই বলিস দাই, অমন রান্না তোরা কেউ রাঁধতে পারবি না কোনদিন। আবার বলত, শশাঙ্কবাবুর বরাতটা খুব ভাল, অমন বৌ এ শহরে আর কারও নেই।'

একটু থেমে, গলাটা অকারণেই একটু নামিয়ে বলল, 'এই ছাখো না, সেদিন কোথা থেকে একরাশ কী মাছ নিয়ে এল বুকে করে—হ্যাঁ গো বহুমা, বুকে ক'রে আনা যাকে বলে তাই। সঙ্গে থলে-ঝাড়ন তো কিছু ছিল না, হঠাৎ পেয়ে গেছে মাছটা, রুমালেও কুলোয় নি—তা গায়ের থেকে কামিজ খুলে তাইতে বেঁধে এনেছে। শুনেছ কখনও এমন ধারা কাণ্ড? বলে কি, তোমার ও বাড়ির বহুমা খুব খেতে ভালবাসে কিনা এই মাছ, পাওয়া তো যায় না, হঠাৎ দেখতে পেয়ে আর লোভ সামলাতে পারলুম না। ও বহুমা তো কালই এসে যাচ্ছে, এখন ঠাণ্ডা আলমারীতে তুলে রেখে দাও, পরশু একসময় গিয়ে দিয়ে এসো। তা আমি বললুম, মাছ তো অনেক, তা তোমাকেও দুটো রেঁধে দিই না আজ। ওমা, বলে কি—না দাই, যে মানুষটার নাম ক'রে এনেছি, সে না খেলে ও আর আমি মুখে দিতে পারব না। সে-ই বরং রেঁধে দেবে—সেই ভাল হবে। কিছুতেই খেলে না। আহা—বাছার আমার খাওয়াই হ'ল না আর। কী হ'ল মাছগুলো কে জানে! আমি তো সেদিনই চলে গেলুম—তাড়াতাড়িতে বিপদের খবর পেয়ে—আর হুঁশও ছিল না। ওরা কাল এসেছিল, হয়ত ফেলেই দিয়েছে, কিম্বা ভাঙ্গীটাঙ্গী কাউকে ডেকে দিয়ে দিয়েছে। আমি তো ছিলুম না—থাকলেও বলে কয়ে চেয়ে নিয়ে দিয়ে যেতুম। আহা।'

আবারও একবার চোখ মুছল বুড়ি।

তারপর উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'যাই। বাবুর দাদা নাকি আমাকে থাকতে বলে গিয়েছে, আমার ঘরের চাবি তো আমার কাছেই ছিল—বলেছে বুড়ি যেন এখানেই থাকে, দিন কতক পরে এসে ওর যা পাওনা আছে সব হিসেব করে চুকিয়ে যাব, আরও কিছু তাকে ধরেও দেব। ওকে খুব ভালবাসত আমার

ভাই, শুনেছি। বাবুর দাদাও ভাল লোক—না বছমা? আসলে ওদের বংশটাই ভাল—কী বলো?'

বকতে বকতেই বুড়ি চলে যায়। এক তরফাই বকে। এ পক্ষ থেকে উত্তরের অপেক্ষাও করে না—উত্তর দিল কিনা তাও লক্ষ্য করে না।

লক্ষ্য করে না তাই রক্ষা। কারণ অনিলা একটাও উত্তর দিতে পারে না ওর কথার। কথাই বলতে পারে না আর। সে যেন পাথর হয়ে গিয়েছিল। যেখানে বসে আছে সেখান থেকে উঠে দাঁড়ানো কি নড়ে বসারও যেন সাধ্য থাকে না তার।

অনেক বেলা হয়ে যায় অমনি বসে বসে। দাই সাবান কাচা শেষ ক'রে ছাদে শুকোতে দিয়ে এসে উশখুশ করে। আজ ওর এখানে খাবার কথা— অনিলাই খেতে বলেছিল। বোধ করি সে কথাও মনে থাকে না তার।

অবশেষে একটা নাগাদ আর থাকতে না পেরে ওর দাই-ই ডাকে, 'খাওয়া-দাওয়া করবে না বৌদি আজ? বেলা দুটো যে বাজে। আমাকে আবার বিকেলের কাজে বেরোতে হবে যে!'

কাজে বেরোতে হবে—? ওহো হো, মনে পড়ে যায় অনিলার। সত্যিই তো বড় অন্যায় হয়ে গেছে। ওর যে এখানে খাবার কথা।

তাড়াতাড়ি উঠে রান্নাঘরে গিয়ে দাইয়ের ভাতটা বেড়ে দেয়। ভাত মাছ সবই বেশি ক'রে দেয়। এই দাইটা মাছ খায়, মাছ ভালবাসে, তবু সে মাছের পরিমাণ দেখে চমকে ওঠে, 'ওকি, কত দিচ্ছ বৌদি, তুমি খাবে না?'

'খাব। তুই খা না। অনেক আছে এখনও।'

'তা তুমি খাবেই বা কখন?'

'এই খাচ্ছি। শরীরটা ভাল নেই রে—।' কৈফিয়তের সুরে বলে সে।...

দাই চলে যাবার পর খেতে বসেও সে। অল্প দুটি ভাত আর দুধ। আজ অনেক মাছ ছিল বলে কিছুই রাঁধে নি আর—একটু ডালভাতে দিয়েছিল শুধু। কিন্তু কে জানে কেন, এখন খেতে গিয়ে মাছটা খেতে আর রুচি হ'ল না কিছুতেই। সেই একটুখানি ডেলাপাকানো শক্ত হয়ে-যাওয়া ডালভাতে আর দু চামচ দুধ দিয়ে কয়েক গ্রাস খেয়েই উঠে পড়ল। তারপর অবশিষ্ট সব ভাত এবং মাছগুলো পিছনের দরজা খুলে আস্তাকুঁড়ে ঢেলে দিয়ে এসে যেন

কতকটা শান্ত হ'ল।

মাছগুলো একটা লোক, তার জন্য—বিশেষ ক'রে তারই জন্য—বুকে ক'রে এনেছিল—একথা শোনবার পর আর যেন কিছুতেই মুখে তুলতে পারল না অনিলা। হাসিখুশী পরোপকারী মানুষ, সবাইকেই স্নেহ করেন, সেই সকলের মধ্যে সেও একজন, এই জেনেই নিশ্চিন্ত ছিল এত কাল—কিন্তু আজ এই কয়েকটা মাছের ইতিহাস তার সব ধারণাকে যেন ওলটপালট ক'রে দিয়ে গেছে। এটা সামলাতে কয়েকদিন সময় লাগবে এখন।

দোজবরে

নলিনীর যখন বিয়ে হয়েছিল মায়া তখন খুবই ছোট, মোটে বছর দশেকের মেয়ে। তবু সে নাক সিঁটকে বলেছিল, 'নলিনীদিটা যেন কী, আমি হ'লে বরং গলায় দড়ি দিতুম—তবু এমন বিয়ে করতুম না।'

তার কারণও ছিল।

মায়ার মা তরঙ্গিণীরও কতকটা এই ধরনের মনোভাব ছিল। তিনি কথায় কথায় বলতেন, 'যাই বলো বাপু, বিয়ে মানুষের একবারই হয়, ভাবসাব হ'ল একটু একটু ক'রে,—নতুন দুটো মানুষ একটু একটু ক'রে পুরনো হ'ল দু'জনার কাছেই, দু'জনেই দু'জনকে চিনল, তারপর ধীরে ধীরে এক হয়ে গেল —অন্ততঃ মনের দিক দিয়ে—এই হ'ল বিয়ে। এই যে সব দুবার তিনবার বিয়ে করে—এসব কি আর বিয়ে? রামোঃ!'

কেউ হয়ত বললে, 'না ন'দি, তুমি একেবারে জিনিসটা উড়িয়ে দিতে পারো না, ধরো একটা লোক ছাব্বিশ বছরে বিয়ে করলে—আটাশ বছরে তার বৌ মরে গেল। সে আর বিয়ে করবে না? সারা জীবনটা তার সামনে পড়ে রইল।'

তরঙ্গিণী জবাব দিতেন, 'হ্যাঁ, তার হয়ত বিয়ে করাটা দরকার কিন্তু মেয়েদের কথা ভাব দেখি! যত কম দিনই ঘর করুক—বর কেবলই মনে মনে মিলিয়ে দেখে সেই আগের বৌয়ের সঙ্গে—আর খুঁৎ খুঁৎ করে। সে বৌয়ের

দোষগুলো তখন গুণ হয়ে ওঠে। মনে করে এ ঠিক তেমন হ'ল না। আর বৌটারও পোড়া কপাল, যত যত্ন-আত্তিই করুক না কেন বর—ভাববে সেই সতীনকেই বেশি ভালবাসত, এখনও হয়ত মনে মনে তাকেই ভালবাসে। কিছুতেই মেয়েটা স্বস্তি পায় না। না ভাই, যত কম দিনের জন্যেই হোক, আগে একটি বিয়ে করা থাকলে যেন মনের মধ্যে দেওয়াল পড়ে যায়।'

একটু থেমে হয়ত আবারও বলতেন, 'সোনার গয়নাই বলো আর রাজ-অট্টালিকাই বলো, বরই যদি নিজস্ব না হ'ল তো কী সুখ, আমার মনে হয় বড়লোকের ঘরে তেজবরে দোজবরে পড়ার চেয়ে গরীব চাষীর ঘরে পড়াও ঢের ভাল।'

এসব কথাই মায়া শুনেছে ছেলেবেলা থেকে, তাই নলিনীর বিয়েতে সে যে অমন মন্তব্যটা করবে এটাই স্বাভাবিক, ভাল ক'রে সাংসারিক জ্ঞান হবার আগেই বার বার শোনা-কথাগুলো মুখস্থ হয়ে গেছে।

তা ছাড়া নলিনীর বিয়েতে সকলেই—পাড়াসুদ্ধ ছি ছি করছিল। কাজেই ছোট মুখে বড় কথা হ'লেও খুব বেমানান শোনায় নি কথাগুলো। পাড়ার সব-চেয়ে সুন্দরী মেয়ে নলিনী, ওর রূপে নাকি অন্ধকার ঘর আলো হয়ে উঠত। ছি ছি, ওর বাবা করলে কি, অমন মেয়েটাকে শেষ অবধি দিলে কিনা দোজ-বরের হাতে!

পাড়ার লোকের এই সম্মিলিত ধিক্কার নলিনীর বাবা সতীশবাবুর কানেও উঠেছিল বৈকি! তিনি ব্যাকুল ভাবে সকলকে বোঝাতে চেষ্টা করলেন যে তাঁর যে অবস্থা তাতে হয়ত অমন সোনার প্রতিমা মেয়েকে কোন মাতাল লম্পটের হাতে দিতে হ'ত। হয়ত এমন ঘরে পড়ত যেখানে দু-বেলা দু-মুঠো পেট ভরে খেতেও পেত না। এখানে আর যাই হোক, খাওয়া পরার কোন অভাব থাকবে না, দোজবরে বটে, একটা বড় দশ বছরের মেয়ে আছে—এটাও ঠিক—কিন্তু চল্লিশ বছর বয়সটা ঠিক বুড়োর বয়স নয়, তাছাড়া অত ঐশ্বর্য—নলিনী বলতে গেলে রাজার ঘরে পড়ল। আট বছরের উমা যে বুড়ো শিবের হাতে পড়েছিলেন, তাঁর ভাগ্য কি যে কোন হিন্দু মেয়ের কাম্য নয়!

কিন্তু এসব সত্ত্বেও পাড়ায় ঢিঢিক্কার বড় কম পড়ে যায় নি। পাড়ার ছোকরার দল—সত্যি কথা বলতে কি—শেষ দু-তিন দিন ভাল ক'রে কেউ

খায় নি, তখনকার দিন ব'লে বিয়েটা নির্বিঘ্নে হতে পেরেছিল, এখনকার দিন হ'লে জামাইকে শেষ পর্যন্ত মুখ চুন ক'রে ফিরে যেতে হ'ত।

তবে সে ধিক্কার এবং পরিতাপের কথাটা মায়ার যেমন মনে আছে তেমনি আর একটি কথাও কিন্তু সে ভোলে নি।

নলিনীর ধুলোপায়ে-দিন করতে আসবার স্মৃতিটা মনের মধ্যে আজও ওর উজ্জ্বল হয়ে আছে। দিনের বেলা সে দেখে নি। সন্ধ্যেবেলা নলিনীকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে তার মা এসেছিলেন ওদের বাড়ি। সতেরো বছর মাত্র বয়স কিন্তু এখনকার অধিকাংশ মেয়ের মতো বান্‌খুরে ছিল না সে—বেশ বাড়নসা গড়নে রূপটা তার আরও উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল। আর সেই জন্যেই বোধ হয়—অলঙ্কার এবং শাড়ির ঝলমলানিটাও অত বেশি ক'রে চোখে পড়েছিল। আজও সে ছবিটা মনে আছে মায়ার—। সেকেলে ডবল-উইকের টেবিল ল্যাম্পের আলো, তবু তাতেই মাথার হীরের টায়রা এবং গলায় চুনি-পান্নার নেকলেস যেন জ্বলে উঠেছিল। শঙ্খ-কণ্ঠে মুক্তোর 'কলার'এ অমন আভা জীবনে কখনও দেখে নি সে।...তার সঙ্গে ছিল জড়োয়া ব্রেসলেট ও নতুন কাজ করা চওড়া সোনার চুড়ি। সেদিন নলিনীর দিকে চেয়ে চোখ ঝলসেই গিয়েছিল মায়ার। ঐ অল্প বয়সেই মনে হয়েছিল এই গহনা এবং এ বেনারসী শাড়ি ছাড়া এ দেহে মানাত না। আর শাড়ি গহনারও এর চেয়ে সদ্গতি আর কিছু হ'তে পারে না—এই দেহে উঠেই তারা সার্থক হয়েছে, তাদের যোগ্য মূল্য পেয়েছে তারা।

এমন কি তরঙ্গিণীও—ওরা প্রণাম ক'রে জল খেয়ে চলে যেতে—একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বলেছিলেন, 'নাঃ, ও বাড়ির বট্‌ঠাকুরের দোজবরের হাতে মেয়ে দেওয়া সার্থক হয়েছে। নিতান্ত যদি দিতেই হয় তো এই রকম—'

কিন্তু সে দীর্ঘকালের কথা।

তারপর বহু বৎসর কেটে গিয়েছে, কবে কখন সকলের অগোচরে মায়ার দেহখানি পুষ্পিত হয়ে উঠেছে নবীন কৈশোরে, কখন তাতে আরও দুটি তিনটি বসন্ত প্রথম যৌবনের ঐশ্বর্যসম্ভার এনে যোগ করেছে,—আবার কেমন ক'রে একটির পর একটি শীত গ্রীষ্ম বর্ষা এনে দিয়েছে রুক্ষতা ও কাঠিন্য—দশ

বছরের মেয়ে বাইশ বছরে এসে পড়েছে—তা বাঙালীর একান্ত নিম্ন-মধ্যবিত্ত ঘরের দুঃখ-দারিদ্র্য-বিব্রত ক'টি নরনারী লক্ষ্যও করে নি। এমন কি মায়া নিজেও না—

এর মধ্যে পরিবর্তন হয়েছে ঢের। মায়ার বাবা মারা গিয়েছেন। ওর দিদির বিয়েতে তিনি বিপুল দেনা করেছিলেন, তা প্রায় কিছুই শোধ দিয়ে যেতে পারেন নি। ওর দুটি দাদাই চাকরীতে ঢুকেছে বটে কিন্তু তাদের আর আয় কি? এরই মধ্যে ওর বড় ভায়ের বিয়ে দিতেও হয়েছে—তারও ছেলেমেয়ে হয়ে গেছে দু-তিনটি। অর্থাৎ সংসারে টানাটানি বেড়েই গেছে; কমে নি একটুও।

সুতরাং এর ভেতর মায়ার বিয়ের কথা তুলবে এমন পাগল কে আছে!

মা এক-আধদিন বড় ছেলের কাছে কথাটা পাড়বার চেষ্টা করেছিলেন—কিন্তু সাহস ক'রে বেশি দূর এগোতে পারেন নি। সে চোখ পাকিয়ে জবাব দিয়েছে: 'তুমি থামো। এক বোনের বিয়ের দেনা আগে শোধ করি, তবে তো আর এক বোনের বিয়ের কথা ভাববো! তোমার লজ্জা করে না একটু, ওকথা মুখে আনতে! আমার মাথার উপর একটি আইবুড়ো বোন আর একটি বোনের বিয়ের দেনা চাপিয়ে তিনি তো সরে পড়লেন! আমরা কার ওপর চাপাব বলো?'

তবু হয়ত অনেক সাহসে ভর ক'রে এবং উদ্গত অশ্রু সম্বরণ ক'রে মা বলতে চেষ্টা করেছেন, 'না—এখন থেকে খোঁজ-খবর করলে হ'ত। বর চাইলেই যে তখুনি পাওয়া যাবে এমন তো কোন কথা নেই।'

'কিন্তু পাবার জন্যেই তো লোকে খোঁজ-খবর করে। যদি ধরো পাওয়া যায়—ধরো কেউ ওকে পছন্দ করলে—তখন কী করব? টাকাটা আসবে কোথা থেকে? না মা, ওসব ধাষ্টোমো আমাদের দ্বারা চলবে না। আমাদের একটা আত্মসম্মান-বোধ আছে!'

অগত্যা এখানেই ইতি।

মায়া সংসারে উদয়াস্ত খাটে। প্রতিদিনের চা জলখাবার করা, বিছানা-মাদুর তোলা, যাবতীয় সেলাইয়ের কাজ, রান্নার জোগাড় দেওয়া—কখনও কখনও মা'র অসুখ করলে রান্নাবান্না করা—ভাইপো-ভাইঝিদের নাওয়ানো

খাওয়ানো,—ইত্যাদি সহস্র কাজের মধ্যে এমন ভাবে মিশে গিয়েছিল সে যে, তাকে যে কোনদিন বিয়ে দিয়ে পরের বাড়ি পাঠাতে হবে, এই বাঁধা জীবন-যাত্রায় আসবে পরিবর্তন—তা কেউ ভাবতেই পারে নি। লেখাপড়া তো ওর বাবার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই বন্ধ হয়ে গেছে, কিন্তু অর্থাভাবে ততটা নয়, যতটা সময়াভাবে। একটি ঠিকে ঝি আছে শুধু বাসন মেজে দিয়ে যায়, তার বেশি খরচ করার সামর্থ্য নেই এদের, বাকী সব কাজই নিজেদের ক'রে নিতে হয়। মা'র শরীর অপটু হয়ে আসছে দিন দিন, শুধু বসে বসে রান্নাবান্না করা ছাড়া আর কোন কাজই করতে পারেন না। বৌদির কোলে ছোট ছেলে, একটি না একটি থাকেই—সুতরাং মায়া ছাড়া গতি কি? মায়া এ সংসারেরই অঙ্গ, তার কোন স্বতন্ত্র ব্যক্তিগত অস্তিত্ব আছে—একথা কেউ কল্পনাই করতে পারে না।

আর কেউ পারে না বলেই বোধহয় কাজটা মায়াকে নিজেই করতে হয়।

একদিন সে দাদা অরুণের শ্রুতিসীমার মধ্যেই মাকে শুনিয়ে বলে, 'মা—এখানে শুনেছি নারী কর্ম-মন্দিরে দুপুর বেলা মেয়েদের নানারকম হাতের কাজ শেখানো হচ্ছে। আমি মনে করছি ভর্তি হবো। দুপুরে অতটা কাজ থাকে না,—ঘণ্টা-দুই সময় ক'রে নিতে পারা যাবে।'

মা উত্তর দেবার আগেই অরুণ কথা কইলে। সে বসে দাড়ি কামাচ্ছিল, হঠাৎ ক্ষুরটা নামিয়ে বললে, 'তার মানে?'

'যা হয় কিছু একটা করতে হবে। মা আর কদিন? চিরদিন কি আর ভাই খেতে দেবে? লেখাপড়া শিখলুম না—কিছু একটা কাজ শিখতে হবে তো।'

'ওমা, তাই ব'লে—' এবার মা-ই কথা বলেন, 'তাই ব'লে অত বড় সোমত্ত মেয়ে কোথায় কী কাজ শিখতে যাবি? আজ বাদে কাল বিয়ের সম্বন্ধ করতে হবে—শেষে কি একটা ভাংচি পড়বে?'

'আঃ! ওসব থাক্ না মা। বিয়ে যে হওয়া আমার সম্ভব নয় তা তুমিও জানো, আমিও জানি। এরপর কিছু একটা শেখারও বয়স থাকবে না। তুমি মারা গেলে ধরো যদি বৌদিদের সঙ্গে না-ই বনে—তখন বাড়ির বাইরে গিয়ে দাসীবৃত্তি করতে হবে তো?'

বৌদি ওপাশ থেকে ফিস্ ফিস্ করে অরুণকে বললে, 'হ'ল তো! কবে

থেকে বলছি যে বোনের একটা গতি করো। এবার নিজে মুখে নোটিশ দিলে তো! অত বড় বোন থাকতে মানুষ কেমন ক'রে নিশ্চিন্তি হয়ে বসে থাকে তা বুঝি না।'

অরুণ গম্ভীরভাবে বললে, 'নিশ্চিন্তি কেউই থাকে না। কিন্তু চিন্তা করা ছাড়া যে আর কিছুই করবার নেই, তা ভুলে যাচ্ছ কেন? আমাদের তো এই অবস্থা—টাকা নইলে কি আর বোন পার হবে? বাবা তো একরাশ দেনা ছাড়া আর কিছু রেখে যেতে পারেন নি—পার করব কি দিয়ে? তবু তো নিজে দুটো টিউশ্যানী করছি। ভোলাটা যদি আর কিছু বেশি দিত, তাহ'লেও এতদিনে দেনা খানিকটা হালকা হ'য়ে আসত। বাবু তো ঐ অফিসে যাওয়া আসা ছাড়া আর কিছু করবেন না—সকাল সন্ধ্যে আড্ডা আর আড্ডা।'

বৌদি বললে, 'তা বাপু এত বড় বোন থাকতে তোমার নিজের বিয়ে করা ঠিক হয় নি! জানই তো আরও জড়িয়ে পড়বে।'

'সে ঐ মাকে বলো গে। উনিই তখন সংসারে লোক না এলে চলবে না—ব'লে ক্ষেপে উঠেছিলেন একেবারে।···আমি কিছু বিয়ে-পাগলা হয়ে তোমাকে বিয়ে করতে ছুটি নি।'

দাম্পত্য বাদানুবাদটা হয়ত কলহেও পরিণত হ'তে পারত কিন্তু মায়া সে সুযোগ দিলে না। সে শান্ত কণ্ঠে মাকে বললে, 'আমি কিন্তু এখনও আমার কথার জবাব পাই নি মা।'

এবার অরুণ প্রায় খিঁচিয়ে উঠল, 'না না—ওসব কিছু করতে হবে না। বিয়ের চেষ্টাই দেখা হচ্ছে। আমি কি আর ভেতরে ভেতরে কোন খোঁজ-খবর করছি না? এধারটা একটু গুছিয়ে নিয়ে করব ভাবছিলুম ব'লেই না—তা সে দেখছি আমারই অপরাধ হয়েছিল। থাকার মধ্যে তো এই বাড়িটুকু। ভাঙা পুরোনো বাড়ি—কীই বা দাম। তবু মাথা গোঁজবার জায়গা বলেই এতকাল এদিকে তাকাই নি। তা তাই না হয় যাক্—বাবার বাড়ির বদলে তাঁর মেয়ে পার হোক্। আমাদের অদৃষ্টে যা আছে তা হবে। সত্যিই তো—আফ্‌টার অল, আমিই তো বিয়ে করেছিলুম, নিজের কোমরের জোর বুঝেই করা উচিত ছিল! ঘরের মেয়ে থাকতে পরের মেয়ে পার করতে যাওয়া ঠিক হয় নি।'

অরুণ অনেকক্ষণ ধরে গজগজ করতেই থাকে। স্ত্রী পর্যন্ত যদি তাকে ভুল

বোঝে তো সে যায় কোথায় ?

কিন্তু সে-ও কয়েক বছরের কথা হয়ে গেল বৈকি !

ইতিমধ্যে খোঁজ-খবর হয়েছে, ঘটক লাগানো হয়েছে, কলকাতার দু-দুটো বিবাহ অফিসে নাম লেখানো হয়েছে—দু-চার দল এসে দেখেও গেছেন। কিন্তু বিশেষ কোন ফল হয় নি। মায়ার রং হয়ত এককালে ফর্সাই ছিল কিন্তু আজ আর তা কল্পনা করাও কঠিন। দেহের কান্তি কমনীয়তা গঠন-পারিপাট্য—এসব কোন্ সুদূরের কথা তা ওর মারও মনে পড়ে না। রোগা হাড়-বার-করা দেহ, ফাটা পা, শির ওঠা রুক্ষ হাত এবং কেশ-বিরল মাথায় টাস্‌ল্ দেওয়া কবরী—এসব সত্বেও যদি বা কোন পুরুষ অভিভাবকের পছন্দ হয়, বাড়ির ওঁয়ারা দ্বিতীয়বার দেখতে এসে 'না' ক'রে দেন। ইদানীং তাই মায়া বেরোতে চায় না, কান্নাকাটি করে। বলে, 'কী হবে মিছিমিছি গাল বাড়িয়ে চড় খেতে গিয়ে মা ? আমার আর এ অপমান সহ্য হয় না।'

মা বলেন, 'একেবারে যে কেউ পছন্দ করছে না তাও তো নয়। এমনি ক'রেই হবে ঠিক একদিন। কী করব মা বল্, সবই তোর অদৃষ্ট, নইলে সে মানুষটাই বা এত তাড়াতাড়ি যাবে কেন বল্ ?'

সত্যিই যে একেবারে কেউ পছন্দ করে নি তা নয়। দু-তিন দল এর ভেতর এসে পছন্দ ক'রে গিয়েও ছিল। কিন্তু তারপর আর কথা এগুতে পারে নি। হয় তাদের অত্যধিক খাঁই···নয় তো এদেরই ছেলে পছন্দ হয় না। দু-দুটি পাত্রকে মেজ ভাই ভোলা নাকচ ক'রে দিয়েছে। দু-জায়গাতেই আপত্তি উঠেছে তাদের অবস্থায়। ভোলা বলেছে, 'ঐ তো আয়! বিয়ে ক'রে নিজেরাই বা কি খাবে আর ছেলেমেয়েদেরই বা কি খেতে দেবে ? না না—ওসব পাত্তর চলবে না।'

মা তবু একবার ক'রে মনে করিয়ে দেন হয়ত—'বাইরে যাই বলি না কেন —এধারে যে সাতাশ বছর বয়স হয়ে গেল সেটা হুঁশ আছে ?'

'তা বলে কি হাত-পা বেঁধে জলে ফেলে দিতে হবে নাকি ? এখন এক জ্বালা, সে যে তখন শতেক জ্বালায় জ্বলতে হবে। মাসে মাসে এসে ভায়ের বাড়িতেই হাত পাততে হবে হয়ত। মাথা গোঁজবার জায়গা নেই—ঈশ্বর না

করুন যদি অসময়ে চোখ বোজে তো ছেলেমেয়ে নিয়ে আবার এখানেই এসে উঠতে হবে, তার চেয়ে যেমন আছে তেমনি থাক। এতদিনই গেল যখন—'

সুতরাং কিছুই হয় না।

একের পর এক—দিন মাস বৎসর কেটে যায় শুধু। আরও কর্কশ হয় মায়ার গায়ের চামড়া। আরও কিছু চুল উঠে যায় শুধু। আরও এক পোঁচ কালি পড়ে দেহে।

অবশ্য একেবারে যে কিছুই হয় না তাও ঠিক বলা যায় না। ইতিমধ্যে কোথায় এক জায়গায় বরযাত্রী নিমন্ত্রণে গিয়ে ভোলা একটি বিয়ে ক'রে নিয়ে এল। মন্দ লোকে বললে সবটাই সাজানো, এত বড় আইবুড়ো বোন থাকতে বিয়ে করতে চক্ষুলজ্জায় বাধছিল তাই। কেউ বললে, জানাশুনো ভাবসাবের বিয়ে। মা কপাল চাপড়ালেন খানিকটা কিন্তু শেষ পর্যন্ত বউ বরণ ক'রে ঘরে তুলতে হ'ল। বাড়ি তারও পৈতৃক। বিয়ে করার অধিকারও তার আছে। তাছাড়া পাল্‌টি ঘরেই বিয়ে করেছে—আপত্তি করারও কিছু নেই।

মায়ার মুখ কঠিন হয়ে উঠল বটে কিন্তু তাকেও শেষ পর্যন্ত গিয়ে হাসিমুখে আলাপ করতে হ'ল। হাসি-তামাশাও করতে হ'ল।

শুধু রাত্রে ওর বৌদি অরুণকে মনে করিয়ে দিলে, 'আরও নাকে শর্ষের তেল দিয়ে ঘুমোও! যত দায় তো তোমারই। উনিও বিয়ে ক'রে এসে বসলেন, মাসে মাসে যে ষাট টাকা দেন, তার বেশি কি আর এক পয়সাও দেবেন মনে করছ? খরচাই বাড়ল, আয় বাড়ল না। এতদিনে বোনের বিয়ে দিতে পারলে না—এর পর দেবে কি ক'রে? বছর না ঘুরতে তো বাচ্চা আসবে একটি—খরচ তো বাড়তেই থাকবে দিনের পর দিন।'

অরুণ রাগ ক'রে বলে, 'টাকা যদি ভোলা না বাড়ায়, ওদের আলাদা ক'রে দেব—এই স্পষ্ট বলে দিলুম তোমায়।'

'খুব বুদ্ধির কাজ করবে। টাকাটাই কমে যাবে—তোমার খরচা কতটুকু কমবে? এখনও ছুটো ভাই পড়ছে—সে সব খরচ কি মেজ ঠাকুরপো দেবে? তোমার ঘাড়ে চাপবে।'

'তাই তো। বড় খোকাটাকে বললুম দিই অফিসে ঢুকিয়ে, তুমিই তো তখন

না করলে। কলেজে পড়ার খরচ কি কম ?'

'সে তো বাপু নিজে টিউশ্যানী ক'রেই চালাচ্ছে। অত ভাল ক'রে পাস করলে—দু-দুটো ভাই তোমরা মাথার ওপর—না পড়ালে নিন্দেয় দেশ ছেয়ে যেত যে।'

কথাটা সেইখানেই চাপা পড়ে যায়। গত কয়েক বছর ধরেই এইভাবে চাপা পড়ছে। অতএব ওরা অভ্যস্তও হয়ে গেছে এর মধ্যে।

ভোলার বিয়েটা খুব আকস্মিকভাবে হয়ে গিয়েছিল ব'লে ওর দিদি আসতে পারে নি। সে থাকে সেই শিলিগুড়িতে—আজকাল আসা-যাওয়ার হাঙ্গামাও ঢের। যাই হোক—মাস-দুই পরে সে একদিন স-পুত্র-কন্যা এসে হাজির হল।

প্রথম মিলনের কোলাহল থেমে যেতেই রান্নাঘরে নিভৃতে গিয়ে মাকে প্রশ্ন করলে মালতী, 'হ্যাঁ মা, মায়ার বিয়ের কী করছ ? আর যে চাওয়া যাচ্ছে না।'

মা বললেন, 'বেশ বলেছ মা, বড় বোনের উপযুক্ত কথাই বলেছ। মাথার ওপর বড় বড় ভাই উপযুক্ত ভগ্নিপতি থাকতে আমি বুড়ো মা পথে পথে ঘুরে জামাই খুঁজবো—না ?'

মালতী খানিকটা চুপ ক'রে থেকে একটু গলা নামিয়ে বললে, 'পাত্তর একটি আছে মা। আমারই মামাশ্বশুর হয়—খুব দূর সম্পর্কের। আমেদাবাদে চাকরী করে, ষোলশ টাকা মাইনে, ওখানে বিরাট বাড়ি আছে, গাড়ি আছে। বৌ মরেছে বছর তিনেক হ'ল। এক ছেলে, তা সেও কি কাজকর্ম শিখে দিল্লীতে চাকরী করছে, ভাল চাকরী। ভাবসাব ক'রে সে সেখানে বিয়েও করেছে একটা। তাইতেই মামা খুব ঘা খেয়েছেন। এতদিন বিয়ে করব না ব'লে বসে-ছিলেন—এখন বলছেন যে ডাগর-ডোগর মেয়ে পেলে করবেন। নইলে বুড়ো বয়সে দেখবে কে ?'

তরঙ্গিণী গালে হাত দিয়ে বললেন, 'ওমা অত বড় ছেলে বলছিস ; তার বয়স কত ?'

'বয়স একটু হয়েছে মা—তা আটচল্লিশ হবে, কিন্তু অত দেখায় না।'

'সে যে বুড়ো বর, বুড়ো বরে দেব ?'

'তোমার মেয়ের বয়সের হিসেবটা একবার করো মা। আটাশ বছরের মেয়ে—চল্লিশের কম বরের বয়স হলে তো মানাবেই না।'

তরঙ্গিণী তবু সংশয়ের সঙ্গে বললেন, 'কী জানি মা, প্রথম হ'লেও না হয় হ'ত। একে বয়স হয়েছে তায় অত বড় ছেলে—মেয়ে কি মনে করবে, এতকাল পরে এই বিয়ে দিলে ?...তবে ছাখ্—না হয় অরুণকে বল্। আমার মতামতের আর মূল্য কি ?'

মালতী তখনই অরুণের খোঁজে গেল। অরুণ আর ভোলা বড় ভগ্নিপতির সঙ্গেই বসে গল্প করছিল। কথাটা শুনে অরুণ জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে ভগ্নিপতির মুখের দিকে তাকালে। তিনি একটু চুপ ক'রে থেকে বললেন, 'না, মেজ মামার অবস্থা অবশ্য খুবই ভাল। মাইনে ছাড়াও প্রোডাক্শনের উপর জোড়া পিছু এক পয়সা ক'রে কমিশন পান। কম্‌সে কম পাক্কা দুটি লাখ টাকা জমিয়েছেন।...বয়স সত্যিই এমন কিছু দেখায় না—রোবাস্ট হেল্‌থ্ কিন্তু সে কথাটা বলেছ ওদের ?' ব'লে একটা ইঙ্গিত করেন তিনি।

মালতী মাথাটা ঈষৎ নীচু ক'রে বলে, 'না, কথাটা তো এই উঠল। এমন কিছু নয়—একটা য়্যাকসিডেণ্ট হয়েছিল, বাঁ হাতটা কেটে বাদ দিতে হয়েছে। তা কাজকর্ম তো সবই করছে। আর ধরো বিয়ের পরই যদি হ'ত তাহ'লে কী করতে ?'

এবার ভোলা ফেটে পড়ল।

'দিদি, তোমার নিজের ভাল বিয়ে হয়েছে বলেই বুঝি বোনের জন্যে এমন সম্বন্ধটা পাড়তে পারলে! তোমাকে সৎপাত্রে দিতে গিয়ে বাবা যদি সর্বস্বান্ত না হতেন তো মায়ার বিয়ে আমরা অনেকদিন আগেই দিতে পারতুম। ছোট বোনের ওপর তোমার খুব টান—বোঝা গিয়েছে, ধন্যবাদ।...দোজবরে, বুড়ো —তার ওপর হাতকাটা নুলো—বলিহারী পাত্র। অমন বরে দেওয়ার চেয়ে বোনকে দড়ি কলসী কিনে দেব, সেও ভাল।'

মালতীর চোখে জল এসে গেল। ভগ্নিপতি ঘাড় হেঁট ক'রে বসে রইলেন। তরঙ্গিণীরও লজ্জার সীমা রইল না। কিন্তু কেউ কিছু বলবার আগেই আর এক কাণ্ড ঘটে গেল। মায়া যে কাছাকাছি থাকতে পারে—এদের

কারুরই সে কথাটা মনে ছিল না। সে কাছেই ছিল। খুবই কাছে। একটু আগে রান্নাঘরের বাইরে থেকে সবই শুনেছে, এখনও এ ঘরের বাইরেই সে দাঁড়িয়েছিল। কে জানে, মালতীর এই মামাশ্বশুরের কাহিনী শুনতে শুনতে তার মন বহুদূর অতীতের এক সন্ধ্যাবেলায় চলে গিয়েছিল কি না। সেখানে হয়ত আজও ডবল-উইকের টেবিল ল্যাম্পের আলোতে দাঁড়িয়ে আছে হীরের টায়রা, মুক্তোর কলার আর চুনি-পান্নার নেকলেস পরা এক অপরূপ নারী-মূর্তি—

অকস্মাৎ সে বাইরে থেকে মাকে ডেকে স্পষ্ট ক'রেই বললে, 'মা, দিদিকে বলো ঐ সম্বন্ধ এখনই চিঠি লিখে পাকা ক'রে ফেলতে। অবিশ্যি তিনি যদি দয়া ক'রে নিতে রাজী হন। এখানে বিয়ে না হ'লে আমাকেই দড়ি-কলসী খুঁজে নিতে হবে মা। ভাইদের কত দরদ আর কত যে মুরোদ তা এই ক-বছরে বেশ বুঝে নিয়েছি।'

কঠিন মায়া

কলিকাতা হইতে প্রথম ট্রেন আসে ভোর পাঁচটায়, তাহার পর একেবারে এই অপরাহ্ণ সাড়ে চারটায়—ইহার মধ্যে আর একটি গাড়ি আছে একটা নাগাদ, সেটি কলিকাতায় যায়। কিন্তু সে গাড়িতে বেচাকেনার কোন সুবিধা নাই বলিয়া স্টেশনের ধারের দোকানগুলি এই বিকালের ট্রেনটির জন্যই বিশেষ করিয়া প্রস্তুত হয়। দোকানের সামনে খানিকটা পর্যন্ত রাস্তায় জল ছিটাইয়া, চায়ের জল চাপাইয়া, খাদ্যদ্রব্যগুলি যতটা সম্ভব সাজাইয়া ট্রেনটির অপেক্ষায় বসিয়া থাকে।

সেদিনও সকলে স্টেশনের দিকেই চাহিয়া বসিয়া ছিল, কিন্তু যাত্রী নামিল মাত্র একজন। সন্ধ্যানাগাদ আরও খান-দুই যাওয়া-আসার ট্রেন আছে বটে তবে তাহার উপর ভরসা নাই। আশা এবং ভরসা যাহার উপর ছিল তাহা এইমাত্র চলিয়া গেল।

বনমালী একটা অশ্লীল কটূক্তি করিয়া কহিল, আজ যা বেচাকেনা হবে তা তো বোঝাই গেল। একটা লোক নামল, দোকানদার তো সুরেনকে নিয়ে

ঘেটের আটটি, এখন নে ঐ ভাগ ক'রে।'

সুরেন বিড়ি পাকায়। সে মুখ তুলিয়া যাত্রীটিকে ভাল করিয়া দেখিয়া কহিল, 'ওর যা বেশভূষা, তাতে মনে হচ্ছে খদ্দের যদি হয় তো সে আমারই হবে—তোদের বরাতে আজ ঢু-ঢু। তাই বিড়ি কেনবার আধলাটা আছে কি সন্দেহ!'

লোকটি আরও কাছে আসিতে সকলেই বুঝিল সুরেন কথাটা বড় মিথ্যা বলে নাই। শীর্ণ একহারা দেহ, মাথার চুল বহুদিনের তৈলহীনতায় ও ধূলি-সংযোগে জটার আকার ধারণ করিয়াছে, গায়ে একটি জীনের কোট আছে কিন্তু সেটি কোনকালে সাদা ছিল কি না আজ তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা কঠিন; পায়ের ক্যাম্বিশের জুতাটিও জীর্ণতার প্রায় শেষ-সীমায় আসিয়া পৌঁছিয়াছে। মুখের শুষ্কতায় বয়সটা যে ঠিক কত তাহা অনুমান করা যায় না, পঁচিশ হইতে পঁয়তাল্লিশ—ইহার যে কোন অঙ্কটা ধরিয়া লওয়া যায়।

সে স্টেশনের সীমানা পার হইয়া রাস্তার মোড়টাতে আসিয়া একটু ইতস্ততঃ করিল, তাহার পর বিপ্রদাসের আধা-মনোহারী এবং আধা-খাবারের দোকানের সামনে বাঁশের বেঞ্চিতে টোল-খাওয়া টিনের স্যুট্‌কেশটা নামাইয়া রাখিয়া কহিল, 'একটু বসব নাকি হে ঘোষের পো?'

বিপ্রদাস যদিচ 'ঘোষের পো' নয়, তবুও তখন প্রতিবাদ না করিয়া কহিল, 'বসুন, বসুন। মশায়ের নিবাস?'

লোকটি একটু উচ্চাঙ্গের হাসি হাসিয়া চুপ করিয়া রহিল কিছুক্ষণ, তাহার পর কহিল, 'নিবাস বলতে নিষেধ আছে হে, গুরুর নিষেধ। নিবাস আর আমাদের নেই, আমাদের নিবাস এখন তোমার বাড়ি, গাছতলায়, যেখানে খুশি ধরে নিতে পারো।'

বলা-বাহুল্য জবাবটা চারপাশের লোক কাহারও শুনিতে অসুবিধা হয় নাই। সুরেন বিড়ির কুলা নামাইয়া রাখিয়া পাশে আসিয়া দাঁড়াইল, বনমালীও আসিল, শুধু হরিশ রসগোল্লার কড়া চাপাইয়াছিল,—সেটা নাড়িতে নাড়িতে উৎসুক হইয়া চাহিয়া রহিল।

বিপ্রদাস একটু মাথা চুলকাইয়া কহিল, 'আপনি কি তাহ'লে সন্ন্যাসী আজ্ঞে?'

লোকটি ফস্ করিয়া বিপ্রদাসের হাতের হুঁকাটা হইতে কলিকাটা তুলিয়া লইল, তাহার পর হাতের উপর বসাইয়াই দুই তিন টান দিয়া কহিল, 'সন্ন্যাসী আর হ'তে পারলুম কই বলো ভাই। মায়া যে বড় কঠিন। কিছু নেই, পথে পথে ঘুরছি তবু যেন মনে হয় সংসার বড় মিঠে। এ চক্র থেকে কি পরিত্রাণ পাবার উপায় আছে ভাই ?'

বিপ্রদাস এবার রীতিমতো সম্ভ্রমের সুরে কথা কহিল, বলিল, 'আজ কোথা থেকে আসছেন ?'

'এখন ? কলকাতা থেকে।'

সুরেন উৎসুক হইয়া কহিল, 'এখানে কোথায় যাবেন ?'

সে জবাব দিল, 'কোথায় যে যাব তা কিছুই জানি নে। এখানে বেশ ভদ্র-লোকের পাড়া-টাড়া আছে ?'

সে-কথার জবাব না দিয়া বিস্মিতকণ্ঠে সুরেন কহিল, 'আপনি কী কাজে এসেছেন তাহ'লে ?'

মিনিট দুই লোকটি মৌন হইয়া রহিল। তাহার পর কহিল, 'গুরুর কাছে সন্ন্যাস নিতেই গিয়েছিলাম। গুরু আদেশ করলেন, দীক্ষা তোকে দিলুম বেটা, কিন্তু গেরুয়া দেব না এখনও। সংসারে তোকে ঘুরতে হবে আরও অনেকদিন। আমি হাতজোড় ক'রে বললুম, কিন্তু সংসারে কি ক'রে ঘুরব বাবা, সম্বল তো কিছু নেই। তিনি তখন দুটি জিনিস দিলেন, বললেন, এই দুটো তুমি ফিরি ক'রে বেড়াওগে, এতে তোমার পেটও চলবে লোকের উপকারও হবে। এক বৎসর সংসারে থাকবার পর আবার ফিরে এস, তখন দেখব !···সেই থেকেই ভাই পথে পথে ঘুরিছ।' .

তাহার পর একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, 'আরও পাঁচটি মাস না গেলে তাঁর চরণ দর্শন পাবো না।'

বলিয়া ললাটে যুক্তকর ঠেকাইল।

সুরেনের মুখ ঈষৎ অবজ্ঞায় কুঞ্চিত হইতেছিল, কিন্তু বনমালী তখনও সম্ভ্রমের সঙ্গেই প্রশ্ন করিল, 'কি জিনিস আপনার জানতে পারি কি ?'

লোকটি একটু হাসিল। কহিল, 'ও আর জেনে কি করবে ভাই, তোমাদের ও কাজে লাগবে না ! একটা হ'ল জ্বরের ওষুধ, আর একটা স্বপ্নাদ্য মাদুলি।'

বলিতে বলিতে কিন্তু সে বাক্সটা খুলিয়া ফেলিল। বাক্সের একপাশে সত্যই গাদা করা কতকগুলি ঔষধের শিশি, আর একপাশে একটা ময়লা কাপড় ও গামছা। বোধ হয় তাহার নিচে মাহুলিও আছে, কিন্তু উপর হইতে কিছু দেখা গেল না। সুরেন ঝুঁকিয়া পড়িয়া দেখিল লেবেলের গায়ে কোথাকার কি একটা সন্ন্যাসীর নাম ও ছবি ছাপা রহিয়াছে।

বাক্সটা বন্ধ করিয়া লোকটি কহিল, 'হাটের দিন গিয়ে বসব আর কি, যা হোক দু-একটা যা বিক্রী হবে তাইতেই আমার চলে যাবে।...হাটবারটা কবে?'

বনমালী কহিল, 'পরশু।'

বিপ্রদাস এতক্ষণে কথা কহিল। বলিল, 'আপনি থাকবেন কোথায়?'

তাচ্ছিল্যের মৃদু হাসি হাসিয়া সে জবাব দিল, 'যেখানে হোক পড়ে থাকব দুদিন। এখানের হাটটা দেখে আবার এক জায়গায় ভেসে পড়ব। এই তো আমার কাজ!'

বিপ্রদাস সঙ্কুচিত হইয়া কহিল, 'আপনার নামটা জানতে পারি কি? আপনারা?'

সে কহিল, 'আমরা ব্রাহ্মণ; আমার নাম শ্রীসর্বেশ্বর মুখোপাধ্যায়।'

সুরেন আবার প্রশ্ন করিল, 'আপনার ও ওষুধের দাম কত ক'রে?'

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বনমালী কহিল, 'মাদুলিটা কিসের মশাই?'

সর্বেশ্বর জবাব দিল, 'মাদুলিটা হ'ল সঙ্কটমোচন মাদুলি, যে কোন বিপদে পড়লে ধারণ করলেই বিপদ কেটে যায়, তবে বারো মাস হাতে দিয়ে রাখতে নেই। মাদুলির দাম পাঁচ টাকা, ওষুধ এক শিশি হ'ল সাত আনা...'

সুরেন আবার নিজের দোকানে গিয়া বসিল, বনমালীও সরিয়া পড়িল; শুধু বিপ্রদাস আরও যেন কুণ্ঠিত হইয়া কহিল, 'একটা নিবেদন করব কি?'

সর্বেশ্বর কহিল, 'বিলক্ষণ! আমি তো পথের মানুষ, আমাকে আবার সঙ্কোচ কেন হে?'

বিপ্রসাদ কহিল, 'আমিও ব্রাহ্মণ, যদি আপত্তি না থাকে তো দুটো-তিনটে দিন না হয় আমার বাড়িতেই থেকে যান না—'

সর্বেশ্বর কহিল, 'বলো কি! তোমাদের সাহস তো কম নয়! চেনা নেই

শুনো নেই, বাড়িতে নিয়ে গিয়ে ঢোকাবে, তারপর যদি আমি চুরি-ডাকাতি ক'রে পালাই ?'

বিপ্রদাস ম্লান হাসি হাসিয়া কহিল, 'কি আর নেবেন বাবু, কিছু কি আর আছে ?...সম্বল এই দোকানটুকু, তা দেনায় দেনায় এও যেতে বসেছে ; এই তো জায়গা, এতগুলো দোকান কি করে চলে বলুন দেখি ?...যা জমি আছে তাতে কোনমতে ছ'মাসের চালটা হয়, বাকী ছ'মাস যে কি ক'রে চালাই তা আমিই জানি !'

সর্বেশ্বর সোজা হইয়া বসিয়া কহিল, 'তবে চলো তোমার বাড়িতেই যাই। মোদ্দা বাড়ির ওঁয়ারা গালাগাল দেবেন না তো, কোথাকার কে এক হতভাগাকে জুটিয়ে নিয়ে এলে বলে ?'

বিপ্রদাস কহিল, 'না, সে ভয় নেই।'

সর্বেশ্বর তাহার পিছনে পিছনে প্রস্থান করিতেই দোকানগুলিতে কলরব শুরু হইল। সুরেন কহিল, 'ব্যাটা ক্যান্‌ভাসার ফন্দীটা ভেঁজেছে ভাল !'

হরিশ জবাব দিল, 'বিপ্রদাসেরও দেখছি সন্নিসি দেখলেই ভক্তি উথলে ওঠে। অথচ ঐ তো অবস্থা ! ঘরে তোর সোমত্থ মেয়ে, তুই একটা ভণ্ড জোচ্চোরকে বাড়িতে নিয়ে যাস কোন্ সাহসে ?'

সুরেন কহিল, 'মরবেন যখন তখন বুঝতে পারবেন আর কি !'

বিপ্রদাসের বাড়ি দোকানের কাছেই, মাত্র আধপোয়াটাক পথ। সর্বেশ্বরকে বাহিরের ঘরে বসাইয়া সে ভিতরে গেল এবং অল্পক্ষণ পরেই বাহির হইয়া আসিয়া কহিল, 'স্নান করবেন না কি ?'

'চান ? না—চান আমি বড় একটা করি নে। মুখে হাতে একটু জল দিলেই চলবে—'

বিপ্রদাস কহিল, 'তাহ'লে আপনার মুখ-হাত ধোয়ার জল দিতেই বলি। আপনি বসে একটু বিশ্রাম করুন, আমি সন্ধ্যের গাড়িটা দেখেই চলে আসছি—'

বিপ্রদাস চলিয়া গেল। চৌকীটার উপরে একটা মাদুর পাতা ছিল, তাহারই উপর চিৎ হইয়া শুইয়া পড়িয়া সর্বেশ্বর একটা বিড়ি ধরাইল। বোধ

করি অল্পক্ষণের মধ্যেই তাহার একটু তন্দ্রাও আসিয়াছিল, সহসা নারীকণ্ঠের সম্ভাষণে তাহার চমক ভাঙিল। চাহিয়া দেখিল একটি মেয়ে, বোধ করি বিপ্রদাসেরই হইবে, তাহাকে ডাকিতেছে, 'আপনার মুখে হাতে দেবার জল বাইরে রেখেছি, মুখ হাত ধুয়ে নিন—'

সর্বেশ্বর উঠিয়া বসিয়া ভাল করিয়া মেয়েটির দিকে চাহিল। যেমন লম্বা তেমনি কালো—শ্রী বলিতে কিছু নাই। বয়স ষোল-সতের হইতে পারে, আঠার-উনিশ হইতেও বাধা নাই। অবজ্ঞায় তাহার ওষ্ঠ কুঞ্চিত হইয়া উঠিল, সেদিক হইতে মুখ ফিরাইয়া সে তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া গেল।

দাওয়ায় পরিষ্কার একটা গাড়ুতে জল ও তাহারই উপর পাট করা একখানি গামছা। দেখিয়া সর্বেশ্বরের মন অনেকদিন পরে সহসা যেন খুশী হইয়া উঠিল, সে ভাল করিয়া মাথায় ঘাড়ে জল দিয়া অপেক্ষাকৃত পরিষ্কার হইয়া লইল। তাহার পর গা-মাথা মুছিয়া ঘরের মধ্যে আসিয়া দেখিল মেয়েটি ইতিমধ্যেই চা রাখিয়া গিয়াছে—চা আর ছোট দুটি রসগোল্লা। সর্বেশ্বর চা পান শেষ করিয়া আর একটা বিড়ি ধরাইল, তারপর আরামসূচক অস্ফুট একটা শব্দ করিয়া পুনশ্চ শুইয়া পড়িল।

আরাম তাহার সত্যই বোধ হইতেছিল। বহুদিন পথে পথে ঘুরিতেছে; স্নান, আহার, নিদ্রা কোনটাই তাহার নিয়মিত হয় না। এই যত্ন দেখিয়া তাহার বহুদিন আগেকার নিজের গার্হস্থ্য জীবনের কথাই বুঝি মনে পড়িতেছিল।...

একটু পরেই বিপ্রদাস আসিল। ঘরে ঢুকিয়া কহিল, 'পুঁটি জল-টল দিয়েছিল তো ? চা পেয়েছিলেন একটু ?'

উঠিয়া বসিয়া সর্বেশ্বর কহিল, 'এই যে, ব'সো ব'সো!...হ্যাঁ, সবই পেয়েছিলুম। খুব যত্ন করেছে তোমার মেয়েটি, ঐটি বুঝি মেয়ে ?'

বিপ্রদাস একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া কহিল, 'আজ্ঞে হ্যাঁ, ঐ একটি সন্তান। বিয়ের যুগ্যি হয়েছে অনেকদিনই—কি ক'রে যে দেব তাই ভাবনা!'

সর্বেশ্বর নীরবে মিনিট খানেক বিড়ি টানিয়া কহিল, 'ছাখো একটা কথা তোমাকে বলা দরকার। তুমি আমকে ডেকে এনে আশ্রয় দিয়েছ, যত্নও ঢের করেছ, তোমাকে আমি ঠকাতে চাই নে।'

বিপ্রদাস জিজ্ঞাসুনেত্রে চাহিয়া রহিল। সর্বেশ্বর কহিল, 'একটু আগে যে সন্ন্যিসী-টন্ন্যিসী বলছিলুম ওটা বাজে কথা। আমি আসলে ক্যান্‌ভাসার। ও কথাটা বলার মানে হ'ল এই যে, কথাটা লোকের মুখে মুখে ছড়িয়ে ভাল রকম একটা বিজ্ঞাপন হয়ে রইল, পরশু যখন হাটে যাব তখন খদ্দেরের অভাব হবে না।...তুমি আমাকে সন্ন্যিসী ভেবে খাতির করছ বলে কথাটা শুনিয়ে দিলুম, এর পরেও যদি আশ্রয় দিতে চাও তো দাও, নইলে সাফ বলে দাও আমি পথ দেখি। তবে আমি শুধু হাতেও থাকতে চাই না, খরচা-পত্র সব দেবো—'

বিপ্রদাস আঘাতটা যেন কিছুক্ষণ নীরবে পরিপাক করিয়া লইল, তাহার পর কহিল, 'খরচাপত্রের কথা নয়, ব্রাহ্মণের ছেলেকে আশ্রয় দিয়েছি, এখন কি তাড়িয়ে দেব ? আপনি দয়া ক'রে থাকুন, তাই আমার ঢের।'

সে বাড়ির মধ্যে গেল এবং কিছুক্ষণ পরে তামাক সাজিয়া আনিয়া ভাল করিয়া বসিয়া প্রশ্ন করিল, 'বাড়ি আপনার কোথায় তাহ'লে ?'

সর্বেশ্বর জবাব দিল, 'বাড়ি আমার হুগলী কিন্তু সেখানে কেউ নেই। কলকাতায় থাকলে এক মেসে থাকি, আর তা নইলে পথে পথেই কাটে। এই বেশ থাকি। মাল ফুরোলে একবার গিয়ে তৈরী ক'রে মেসের ঠাকুরের জিম্মেয় রেখে আসি, ঠিকানা দিয়ে চিঠি দিলে সে-ই পার্শেল ক'রে পাঠিয়ে দেয়।'

বিস্মিত দৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বিপ্রদাস কহিল, 'সংসার-ধর্ম করেন নি কখনও ?'

সর্বেশ্বর এক মুহূর্ত কাল নীরব থাকিয়া কহিল, 'সংসার-ধর্ম ? তা-ও করেছিলুম বৈকি ! ছেলে হবার সময় ছেলে আর বৌ দু'জনেই শেষ হয়ে যায়। তারপর থেকে আর করি নি ; ও ভালও লাগে না ! নানা রকমের ঝঞ্ঝাট আর দুর্ভাবনা। তার চেয়ে এ বেশ আছি।'

কিছুক্ষণ দু'জনেই চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। তাহার পর বিপ্রদাস হুঁকাটা সর্বেশ্বরের হাতে দিয়া কুণ্ঠিত কণ্ঠে কহিল, 'ওরা সব আমাকে বকাবকি করছিল যে, ও কোনও পুরুষে সন্ন্যাসী নয়—আস্ত জোচ্চোরকে বাড়িতে নিয়ে গিয়ে ঢোকালে, টের পাবে এর পর।'

সর্বেশ্বর প্রশান্ত মুখে জবাব দিল, 'তা জানি। কিন্তু দেখে রেখো তুমি, ওরাই আবার সস্তায় মাতুলী কেনবার জন্যে আসবে—'

পরের দিন সকালে উঠিয়া সর্বেশ্বর একটা বড় পিজবোর্ড আনিয়া তাহাতে বড় বড় করিয়া সন্ন্যাসী-দত্ত মাতুলী ও ঔষধের বিজ্ঞাপন লিখিয়া তাহার পরের দিনের জন্য ঠিক করিয়া রাখিল। বিপ্রদাসকে বুঝাইয়া দিল, 'এইটি টাঙিয়ে আমি হাটের একপাশে চুপ ক'রে বসে থাকব, বুঝলে না চক্কোত্তী? যারা কেনবার ঠিক এসে জুটবে।'

সে যখন বোর্ড লিখিতেছে তখনই একফাঁকে পুঁটি তাহাকে চা ও পূর্বদিনের মতো দুইটি রসগোল্লা দিয়া গিয়াছিল। কিন্তু আরও বিস্মিত হইল সে, যখন ঘরে ঢুকিয়া দেখিল যে, তাহার কোটের পকেট হইতে যাবতীয় টাকা-পয়সা বিড়ি চিঠি-পত্র প্রভৃতি কে মাদুরের উপর রাখিয়া দিয়া কোটটি লইয়া প্রস্থান করিয়াছে। সে আশ্চর্য হইয়া ভিতরের উঠানে পা দিয়াই দেখিল যে তাহার কোট, গেঞ্জি এমন কি সুটকেশ হইতে কাপড়টা পর্যন্ত কে বাহির করিয়া কাচিয়া দড়িতে টাঙ্গাইয়া দিয়াছে।

সে মিনিটখানেক ইতস্তত করিয়া ডাকিল, 'চক্কোত্তী ফিরেছ নাকি হে?'

রান্নাঘর হইতে পুঁটি সাড়া দিল, 'বাবা একটার গাড়ি দেখে ফিরবে।'

সর্বেশ্বর কহিল, 'আমার কাপড়-জামাগুলো—'

ভিতর হইতে বেশ সুস্পষ্ট কণ্ঠেই জবাব আসিল, 'আমিই সাবান দিয়ে কেচে দিয়েছি। অত ময়লা দেখলে আমার গা ঘিন্‌ঘিন্ করে।'

ঈষৎ ক্রুদ্ধ কণ্ঠে সর্বেশ্বর কহিল, 'তা তো কেচেছ কিন্তু ও কোট নিয়ে আমি এখন কি করব, চারদিকে কুঁচকে থাকবে তো!'

এবারেও তেমনি সপ্রতিভ জবাব, 'পেছনেই পাঁচু ধোপা থাকে, তাকে একটা পয়সা দিলেই ইস্ত্রী ক'রে দেবে।'

সর্বেশ্বর গুম খাইয়া শুধু বলিল, 'হুঁ!'

পুঁটিই আবার কথা কহিল, 'চান ক'রে নিন না আপনি।'

সর্বেশ্বর ঝাঁঝের সহিত জবাব দিল, 'হাঁ, এখানকার পুকুরের জলে চান ক'রে ম্যালেরিয়া ধরিয়ে বসে থাকি আর কি!'

পুঁটি কহিল, 'জল গরম করা হয়ে গেছে, আপনি তেল মেখে নিন। ওই দাওয়াতেই তেলের বাটি আছে—'

সর্বেশ্বর কিছুক্ষণ নির্বাক হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল ; তাহার পর তেলের বাটিটা হাতে করিয়া বাহিরের দাওয়ায় আসিয়া বসিয়া তেল মাখিতে মাখিতে আপন মনেই কহিল, 'এঁচোড়ে-পাকা মেয়ে!'

বিপ্রদাস আসিয়া সব শুনিয়া একটু হাসিল। কহিল, 'বেটি আস্ত পাগল। সত্যিই ও নোংরা দেখতে পারে না।'

তাহার পর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া কহিল, 'কার হাতে যে পড়বে তা জানি না!'

পুঁটিকে ডাকিয়া ভর্ৎসনার সুরে বলিল, 'ভদ্রলোকের কাপড়-জামা নিলি, বলে নিতে নেই? টাকা পয়সা যদি ওঁর কিছু হারায় তুই দিতে পারবি?'

পুঁটি বেশ উচ্চকণ্ঠেই জবাব দিল, 'বললে কি কাচতে দিত নাকি? যা পিচেশ।'

হাট হইতে সর্বেশ্বর ফিরিল গুনগুন করিয়া গান গাহিতে গাহিতে। বিপ্রদাসকে ডাকিয়া কহিল, 'চক্কোত্তী, তোমাদের দেশটি বেশ। সাত শিশি ওষুধ আর তিনটে মাদুলী বেচেছি। তার মধ্যে দুটো পুরো দামে।'

বিপ্রদাস বিস্মিত হইয়া কহিল, 'তাই নাকি?'

সর্বেশ্বর কহিল, 'হ্যাঁ। আর ঐ তোমার বিড়িওলা সুরেন, সে-ই হাতে-পায়ে ধরে একটা মাদুলী নিয়ে গেল তিন টাকায়। বলি নি তোমাকে যে নিয়ে যাবে!'

বিপ্রদাস আরও আশ্চর্য হইয়া কহিল, 'কিন্তু আজই যে আমার কাছে কত কি বলছিল!'

সর্বেশ্বর হাসিয়া কহিল, 'হাতটা দেখো না আজ গিয়ে—কালো সুতোয় বেঁধে রাখতে বলেছি।'

আহারাদির পর বিপ্রদাসকে ডাকিয়া কহিল, দ্যাখো, 'ভাবছি আর একটা হাট দেখে যাব। এখানের বাজার ভাল বলেই মনে হচ্ছে।'

হয়ত বিপ্রদাস একটু শঙ্কিত হইল, কিন্তু মুখে কহিল, 'বেশ তো।'

সর্বেশ্বর পাঁচ টাকার একটা নোট বাহির করিয়া কহিল, 'কিন্তু পাঁচ-ছ দিন আমি এমনি থাকব না। এইটে তোমাকে নিতে হবে—'

বিপ্রদাস জিভ কাটিয়া কি বলিতে যাইতেছিল, প্রচণ্ড এক ধমক দিয়া সর্বেশ্বর কহিল, 'বেশি চালাকি ক'রো না বলে দিলুম চক্কোত্তী! একখুনি পৈতে ছিঁড়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাব। যা বলছি শোন গে—'

অগত্যা বিপ্রদাসকে টাকাটা লইতে হইল। পরক্ষণেই কিন্তু সর্বেশ্বরের কানে গেল পুঁটির গলা, 'তুমি নিতে গেলে কেন টাকা? এ কি হোটেল পেয়েছে ও?'

সর্বেশ্বর নির্জন ঘরেই মুখ ভ্যাঙ্গাইয়া কহিল, 'রাজনন্দিনীর আবার সম্মানে ঘা লেগেছে! ছুঁড়ির মুখ দেখো না!'

পরের দিন কিন্তু ব্যাপারটা আরও অনেক দূর গড়াইল, যখন পুঁটি বাহির হইতে ডাকিয়া কহিল, 'চানের জল বসানো হয়েছে, তেল মেখে নিন—'

সর্বেশ্বর শুইয়া বিড়ি টানিতেছিল, জবাব দিল, 'রোজ চান করার আমার দরকার হয় না। আমি চান করব না—'

পুঁটি তীক্ষ্ণকণ্ঠে জবাব দিল, 'ভদ্রলোকের বাড়ি থাকতে গেলে ভদ্রলোকের মতো থাকতে হয়। অত যদি চানে ভয় তো গুলির আড্ডায় গিয়ে থাকলেই হ'ত!'

রান্নাঘর হইতে পুঁটির মা তিরস্কার করিয়া উঠিলেন, 'ও কি হচ্ছে পুঁটি? মুখের লাগাম নেই!'

পুঁটি ঝঙ্কার দিয়া কহিল, 'তা নয়ত কি? চান না ক'রে গায়ে পোকা হ'লে সেই পোকা তো আমাদেরই বাড়িতে ঘুরে বেড়াবে।'

সর্বেশ্বর ঝাঁঝিয়া উঠিয়া কহিল, 'ঝকমারি হয়েছিল আমার এখানে আসা! আমার আর হাটের অপেক্ষা করা চলল না—আজই যেতে হবে দেখছি।'

কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে, সে ভালমানুষের মতো গিয়া তেলই মাখিতে বসিল।

বিপ্রদাস বাড়ি ফিরিয়া, খুব সম্ভব পুঁটির মায়ের মুখে ব্যাপারটা শুনিয়াই, ছুটিয়া আসিল। সর্বেশ্বরের হাত দুটি ধরিয়া কহিল, 'ও পাগলির কথা ধরো না ভাই, ও বদ্ধ পাগল।'

সর্বেশ্বর কহিল, 'তুমি ক্ষেপেছ চক্কোত্তী ? ঐ এককোঁটা মেয়ের কথায় রাগ ক'রে চলে যাব ? আমায় সে বান্দা পাও নি। আমি ঠিক আছি।'

কিন্তু পরের হাটবার, তাহার পরের, আরও কতকগুলি হাটবার পার হইয়া গেল, তবু সর্বেশ্বর যাইবার কোনরূপ চেষ্টা করিল না। বরং দেখা গেল যে, সে পুঁটির শাসন বেশ মানিয়াই লইয়াছে। আজকাল সে তিনদিন অন্তর দাড়ি কামায় এবং কাপড়-জামার সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া লইয়া নিয়মিত ধোপার বাড়ি কাপড় কাচায়। স্নানও—গরম জল ছাড়িয়া সে ঠাণ্ডা জলেই ধরিয়াছে।

অবশ্য আর একটা কারণও ঘটিয়াছে থাকিয়া যাইবার। ইতিমধ্যে বনমালীর একটা কঠিন মোকদ্দমা পড়ায় সে আগের দিন তিন টাকা দিয়া একটা মাদুলী লইয়া গিয়াছিল, দৈবক্রমে সে মোকদ্দমায় তাহার জয়লাভ হইয়াছে। কথাটা লোকমুখে গ্রামান্তরে পর্যন্ত ছড়াইয়া পড়াতে, তাহার মাদুলী বিক্রীর সংখ্যা বাড়িয়া গিয়াছে, ঔষধও তাহাকে আর এক চালান কলিকাতা হইতে আনাইতে হইয়াছে। সে ইতিমধ্যে বিপ্রদাসকে আরও গোটাকতক টাকা দিয়াছে, পুঁটিকে রঙ্গীন শাড়ি কিনিয়া দিবার প্রস্তাবও করিয়াছিল, কিন্তু পুঁটি ভিতর হইতে জবাব দিয়াছিল, 'কেন, আমি কি ঝি ? যে ঝি বিদেয় দেবে ?'

সুতরাং ভয়ে সর্বেশ্বর কথাটা চাপিয়া গিয়াছে।

বিপ্রদাসকে যাহারা প্রথমে এই নির্বুদ্ধিতার জন্য তিরস্কার করিয়াছিল, তাহারাই এখন ঈর্ষা করিতে শুরু করিয়াছে, তাহা বিপ্রদাস বোঝে এবং ব্যাপারটা উপভোগ করে। এবং সেই কথাটা ভাবিতে ভাবিতে তাহার মাথায় একটা চিন্তাও আসিয়াছে, কিন্তু সাহস করিয়া সে কথাটা সর্বেশ্বরের কাছে পাড়িতে পারে নাই। সেদিন দ্বিপ্রহরে ঘরে ঢুকিয়া বাড়ির ভিতর দিকের কপাটটা বন্ধ করিয়া দিয়া কহিল, 'মুখুজ্জে তামাক খাও—'

হাত বাড়াইয়া হুঁকাটা গ্রহণ করিয়া সর্বেশ্বর কহিল, 'কি ব্যাপার হে চক্কোত্তী, খেয়ে উঠে না গড়িয়ে এ ঘরে এলে যে ?'

বিপ্রদাস কহিল, 'না, ঘুমটা আসছে না। আচ্ছা মুকুজ্জে, একটা কথা জিজ্ঞেস করব ?'

সর্বেশ্বর জবাব দিল, 'ভয় ছেড়ে নির্ভয়ে কও। কি হে ?'

তবুও বিপ্রদাস তখনই কথাটা পাড়িতে পারিল না, কহিল, 'তোমার ও

মাদুলীর মধ্যে কী আছে বল দেখি? সত্যি-সত্যি ওষুধ-বিষুধ কিছু—'

সর্বেশ্বর কহিল, 'ছিঃ চক্কোত্তী, তুমি জ্ঞানী লোক হয়ে এই কথা জিজ্ঞেস করছ? ওর মধ্যে আছে শুকনো তুলসী পাতা, আর কি থাকবে। তুলসীর বড় আর কি আছে?'

বিপ্রদাস হাসিয়া কহিল, 'যাহোক বাহাদুর ছেলে বটে!'

তাহার পর কিছুক্ষণ দুইজনেই নীরবে বসিয়া রহিল। মিনিট পাঁচেক পরে বিপ্রদাস একরকম মরীয়া হইয়াই কথাটা পাড়িয়া ফেলিল, 'বলছিলুম কি, এখানে তোমার ব্যবসা তো একরকম জমেছে ভাল, তা আর এদেশ-ওদেশ না ক'রে এইখানেই গোড়া গেড়ে ফেল—'

সর্বেশ্বর তীক্ষ দৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া কহিল, 'ব্যাপার কি বলো দেখি? কী বার্তাটা তোমার তাই শুনি!'

ঢোঁক গিলিয়া বিপ্রদাস কহিল, 'বলছিলুম যে, চিরকাল তো এমন ভেসে ভেসে বেড়ানো চলবে না, তুমি আর একটি সংসার করো!'

'সংসার!' সর্বেশ্বর কহিল, 'সংসার করব কি হে, বয়স কত হ'ল তার হিসেব আছে? ওধারে চল্লিশের কাছাকাছি গিয়ে ঠেকেছে যে!'

বিপ্রদাস কহিল, 'তা হোক। ও বয়সে অনেকের প্রথম পক্ষই হয় না। তুমি আমার পুঁটিকে নিয়ে আবার সংসার পাতো। না—না—কোন কথা নয়, ওকে তোমার পায়ে রাখতেই হবে!'

বিস্ময়ের প্রথম ধাক্কাটা সামলাইয়া লইয়া সর্বেশ্বর কহিল, 'কি বলছ হে তুমি? আমাকে দেবে মেয়ে? চাল নেই, চুলো নেই, জুচ্চরি ক'রে খাই, তার ওপর বয়স প্রায় দু-কুড়ি হ'তে চলল। তোমার কি মাথা খারাপ হয়েছে? পৃথিবীতে আর পাত্তর্ পেলে না!'

বিপ্রদাস কহিল, 'পাত্তর আর পৃথিবীতে কোথায় ভাই? অনেক খুঁজেছি, একে কালো মেয়ে তার ওপর পয়সা নেই।...এ গাঁয়ে পাত্তর আছে এক ঐ বিড়িওলা সুরেনের ছোট ভাই, কলকাতায় কি একটা চাকরী করে, গোটা তিরিশ টাকা বুঝি মাইনে পায়—তা-ও চেষ্টা করেছিলুম; কিন্তু সুরেন তিনশো টাকার কমে রাজি হ'ল না।'

তাহার পর সর্বেশ্বরের হাত দুইটা ধরিয়া ফেলিয়া কহিল, 'তুমিই ওকে

নাও। মেয়ে আমার দেখতে ভাল নয় বটে, কিন্তু গুণ তো তুমি স্বচক্ষে দেখছো, তুমি আর দু-মত ক'রো না।'

সর্বেশ্বর ব্যাকুল হইয়া বলিয়া উঠিল, 'কিন্তু আমি যে সংসারে কোনদিন থাকতে পারি না চক্কোত্তী, না না, তুমি অন্য পাত্তর্ ছাখো—ও আমি পারব না!

বিপ্রদাস মাথা নাড়িয়া কহিল, 'অত তাড়াতাড়ি করতে হবে না মুখুজ্জে, এখনই আমি জবাব চাই না, তুমি ভাল ক'রে ভেবে ছাখো। তুমি ও মেয়ে নিলে কিন্তু অসুখী হবে না—'

বিপ্রদাস ঝড়ের বেগে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। সর্বেশ্বরও আর শুইয়া থাকিতে পারিল না, কিছুক্ষণ স্তম্ভিত হইয়া বসিয়া থাকিয়া রৌদ্রের মধ্যেই বাহির হইয়া পড়িল। কতক্ষণ যে মাঠে মাঠে ঘুরিয়া বেড়াইল তাহার ঠিক নাই; কিন্তু একেবারে পড়ন্ত বেলায় যখন ফিরিয়া আসিল, তখন যে প্রস্তাবটা তাহার নিকট খুব অসম্ভব ঠেকিতেছে না, ইহা ভাবিয়া সে নিজেই আশ্চর্য হইয়া গেল।

সে ভাবিয়া দেখিল যে, সত্যই এ মেয়েটি এই দেড় মাস যাবৎ যে সেবা দিয়া প্রতিনিয়ত ঘিরিয়া রহিয়াছে, তাহাতে তাহার পথে পড়িয়া থাকার অভ্যাস একেবারে নষ্ট হইয়া গিয়াছে। সে যে এতদিন নড়িতে পারে নাই সে কি শুধু টাকার লোভে, না এই মেয়েটিও তাহার অন্যতম কারণ?

সে মনে মনে কল্পনা করিতে লাগিল তাহার বিবাহিত জীবন। আবার নূতন করিয়া সংসারে বাসা বাঁধা, তাহার কর্তা সে, আর তাহার পাশে ঐ মুখরা মেয়েটি। কিন্তু কল্পনাটা যত অসহ্য লাগার কথা ছিল, ভাবিতে গিয়া তো তত অসহ্য লাগিল না।

তবু বন্ধন যে! আবার সেই স্বাধীনতার সর্বপ্রকার খর্বতা, আবার সেই সহস্র রকমের ঝঞ্ঝাট।...

বাড়িতে ফিরিয়া আসিতেই পুঁটি ঘরে ঢুকিয়া কহিল, 'কোথায় গিয়েছিলেন? এতক্ষণ চা ক'রে বসে বসে চা জুড়িয়ে গেল! সময়ের হুঁশ থাকে না বুঝি? পা-টা ধুয়ে নিন—আমি আবারও জল চড়িয়েছি।'

অন্য সময় হইলে এ শাসন অসহ্য লাগিত; কিন্তু এখন যেন আর লাগে

না। বরং যেন কেমন ভালই লাগে, মনে হয় যে তবু একটা লোকও তাহার জন্য চা তৈরী করিয়া বসিয়া ছিল, হয়ত পথের পানে উৎসুক নেত্র মেলিয়া—

পুঁটি চা লইয়া ঘরে ঢুকিয়া কহিল, 'এখনও হাত-পা ধোওয়া হয় নি? কখন বলে গেলুম?'

সর্বেশ্বর কহিল, 'পুঁটি শোন্—তোর বাবা আমার সঙ্গে তোর বিয়ে দিতে চায় যে!'

পুঁটির হাত কাঁপিয়া চা একটু চল্‌কাইয়া উঠিল, সে কহিল, 'ধ্যেৎ!'

কিন্তু কণ্ঠে তাহার কোন অসম্ভব কারণে বিরক্তির অপেক্ষা লজ্জাই ফুটিয়া উঠিল।

সর্বেশ্বর কহিল, 'হ্যাঁ রে, বলছিল।'

পুঁটি কহিল, 'ও আবার কি অসভ্য ঠাট্টা? ও আমার ভাল লাগে না।'

সর্বেশ্বর কহিল, 'মাইরি বলছি, ঠাট্টা নয়। কেন, আমাকে কি তোর পছন্দ হয় না?'

অপাঙ্গে তাহার দিকে একবার চাহিয়া পুঁটি কহিল, 'জানি না। আমি অত বাজে কথা বকতে পারি না!'

তাহার পর ঠকাস করিয়া চায়ের বাটিটা বসাইয়া রাখিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

সর্বেশ্বরের মনে হইল লজ্জার লালিমাতে পুঁটিকে সুদ্ধ ভাল দেখাইতেছিল। তবে কি পুঁটি তাহাকে অপছন্দ করে না? তবে কি—

বহুদিনের ভুলিয়া-যাওয়া একটা সুর তাহার মনের মধ্যে গুঞ্জরিয়া উঠিল। সর্বেশ্বর চায়ের কথা ভুলিয়া সুদূর মাঠের পানে চাহিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল,—তাহার মনে হইল যেন অকস্মাৎ কোন কারণে বাহিরের পৃথিবীটার রূপ বদলাইয়া গিয়াছে। তাহাকে আর চেনা যায় না!

বিপ্রদাস পরের দিনই গুরুবাড়ি গিয়া ভাল দিন দেখিয়া আসিল এবং গোপনে গোপনে বাজার হাট সারিতে লাগিল। বার বার সে সকলকে সাবধান করিয়া দিতে লাগিল, 'খবরদার, যেন কথাটা পাঁচ-কান হয় না! এমনিতেই ব্যাটারা হিংসেয় মরে যাচ্ছে, তার ওপর একথা শুনলে আর রক্ষে নেই!'

সর্বেশ্বরের প্রথম প্রথম কয়েকদিন ব্যাপারটা মন্দ লাগে নাই, এইসব আয়োজন যেন নেশার মতো পাইয়া বসিয়াছিল ; কিন্তু সহসা একদিন তাহার চমক ভাঙ্গিল বনমালীর কথায়। বনমালী ডাকিয়া কহিল, 'মুখুজ্জেদা, খবরটা চক্কোত্তীর মুখে শুনে বড় আনন্দ হ'ল। তা বন্ধন যখন হ'লই তখন ভাল ক'রেই সংসার পাত। শ্বশুরের ঘরে বারমাস থাকা তো ভাল নয়—হোকনা এক মেয়ে। আমি বলি কি, ওরই ঐ ডাঙ্গাটার ওধারে একটা ঘর তুমি নিজে তুলে নাও। কত আর খরচ হবে. বড় জোর শ'তুই—'

সর্বেশ্বর কথাটা শুনিয়া কতক্ষণ যেন উন্মনা হইয়া রহিল, তাহার পর শুধু কহিল, 'হুঁ, তাই করতে হবে!'

কিন্তু ফিরিবার পথে সে অনর্থক একটা বকুলগাছের তলায় ঘণ্টা দুই-তিন বসিয়া রহিল। আর মধ্যে মাত্র দুইদিন আছে, তাহার পর একেবারে হাত-পা গুটাইয়া জালের মধ্যে গিয়া ঢোকা। সে বন্ধনের কথা মনে হইয়া এই আসন্নকালে তাহার যেন বুক কাঁপিতে লাগিল!···

সে অনেক বেলা করিয়া সে দিন বাড়ি ফিরিল ; তখন বিপ্রদাস স্নান সারিয়া তাহার জন্য অপেক্ষা করিতেছে। সে কহিল, 'কোথায় ছিলে হে এতক্ষণ?'

অন্যমনস্কভাবে সর্বেশ্বর জবাব দিল, 'না, এমনি।'

পুঁটি তেলের বাটি দিয়া গেল। পুঁটি এখনও তাহার সামনে আসে তবে মুখ তুলিয়া চাহিতে পারে না। সর্বেশ্বর একবার ভাল করিয়া তাহার দিকে চাহিয়া দেখিল, আসন্ন বিবাহের আনন্দে যেন তাহারও গায়ে মাংস লাগিয়াছে, তাহার সহিত বিবাহেও আনন্দ, আশ্চর্য!···

সেদিন অপরাহ্ণ বেলায় কি মনে করিয়া সর্বেশ্বর সুরেনের দোকানে গিয়া বসিল। একথা সেকথার পর সুরেন বলিল, 'দাদা, তোমার মাদুলীটা পরে ইস্তক দিন আমার ভালই যাচ্ছে ; কিন্তু পয়সার সচ্ছল না হ'লে চলছে না। বামুনের ছেলে আর কতদিন বিড়ি পাকাই বল তো?'

সর্বেশ্বর কহিল, 'লটারীর টিকিট কেনো, যদি পয়সা বেশি আসে!'

সুরেন গলার সুরটা একটু নামাইয়া কহিল, 'কিনেছি দাদা, একটা রেঞ্জার্সের টিকিট ; কিন্তু তোমার গুরুদেবের এমন কোন মাদুলী নেই যাতে নির্ঘ্যাৎ লেগে যায়?'

অকস্মাৎ সর্বেশ্বরের চোখ দুটি যেন জ্বলিয়া উঠিল, সে জবাব দিল, 'আছে হে সুরেন, কিন্তু তার দাম কে দেবে? সে দাম দিতে গেলে তোমার বিড়ির দোকান বেচতে হবে যে!'

সুরেন বিড়ির কুলা ফেলিয়া তাহার হাত দুটি ধরিয়া কহিল, 'কত দাম দাদা, তোমাকে বলতেই হবে!'

সর্বেশ্বর কহিল, 'দু'শো টাকা লাগবে! দু—শো—টা—কা! যে কোন অভীষ্ট ক'রে সে মাদুলী পরলে নিশ্চয়ই অভীষ্ট সিদ্ধি হবে।'

সুরেনের মুখ বিবর্ণ হইয়া উঠিল। সে কহিল, 'অত টাকা!...আর কিছু কমে হয় না?'

সর্বেশ্বর ঘাড় নাড়িয়া কহিল, 'হবার যো নেই। সেই জন্যেই তো বলি নি তোমাকে।'

সুরেন বহুক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া রহিল, তাহার মুখ দেখিয়া সর্বেশ্বর বুঝিতে পারিল যে সে ভীষণ লোভ এবং দুশ্চিন্তার মধ্যে পড়িয়াছে। সে আর একটু সময় দিয়া এক সময়ে কহিল, 'আজ উঠি তাহ'লে সুরেন!'

সুরেন এদিক-ওদিক চাহিয়া অকস্মাৎ তাহার হাত দুইটি ধরিয়া পুনশ্চ খাটো গলায় কহিল, 'দাদা তোমার পায়ে পড়ি, শ'-দেড়েক টাকায় ওটি আমায় ক'রে দিতেই হবে।'

সর্বেশ্বর ঘাড় নাড়িয়া কহিল, 'সে বোধ হয় পারব না ভাই! তা ছাড়া কেন ও-কাজে যাচ্ছ, যদি কোন ফল না হয়? তখন তো আমাকে গালাগাল দেবে আর বুক চাপড়ে বেড়াবে?'

সুরেন প্রবল বেগে মাথা নাড়িয়া কহিল, 'সে আমার অদৃষ্টে যা আছে তাই হবে। তুমি এখন দাও।...খেলার আর মোটে সাতটি দিন বাকী আছে—'

সর্বেশ্বর কহিল, 'তাহ'লে গুরুদেবকে টাকাটা পাঠিয়ে আজই একটা চিঠি লিখতে হয়।'

সুরেন কহিল, 'তুমি চিঠি লিখে দাও, আমি সন্ধ্যের মধ্যে টাকাটা তোমাকে এনে দিচ্ছি।'

সর্বেশ্বর কহিল, 'আচ্ছা তাই হবে।'

সেদিন ভোর রাত্রে সর্বেশ্বর উঠিয়া দেখিল পুঁটি তখনই উঠিয়া উঠান নিকাইতেছে। সে ইঙ্গিতে তাহাকে ডাকিয়া কহিল, 'শোন্ একবার।'

পুঁটি একটু ইতস্তত করিল, লজ্জায় তাহার কান দুইটা গরম হইয়া উঠিল; কিন্তু শেষ পর্যন্ত ঘরের মধ্যে আসিয়া কহিল, 'কি?'

সর্বেশ্বর কহিল, 'পুঁটি তোকে দুটো কথা জিজ্ঞেস করব, সত্যি জবাব দিতে হবে। বল্—দিবি?'

পুঁটি কহিল, 'কী কথা?'

'বিড়িওয়ালা সুরেনের যে ভাইয়ের সঙ্গে তোর বিয়ের কথা হয়েছিল তাকে তুই দেখেছিস?'

পুঁটি ইঙ্গিতে জবাব দিল, 'দেখিয়াছে।'

সর্বেশ্বর কহিল, 'সে আমার চেয়ে ভাল দেখতে না খারাপ দেখতে রে?'

পুঁটি অস্ফুটস্বরে ঝঙ্কার দিয়া উঠিল, 'জানি না, যাও।'

সর্বেশ্বর খপ্ করিয়া তাহার একটা হাত ধরিয়া কহিল, 'মাইরি পুঁটি, আমার মাথা খাস্—ঠিক ক'রে বল্।'

পুঁটি বিষম বিপন্ন হইয়া কোনমতে কহিল, 'সে ভাল দেখতে।'

সর্বেশ্বর পুনশ্চ কহিল, 'কত বয়স হবে তার, তেইশ চব্বিশ, না?'

পুঁটি কহিল, 'তা জানি না।'

সর্বেশ্বর প্রশ্ন করিল, 'তার স্বভাব-চরিত্র কেমন জানিস?'

পুঁটি খানিকটা ঘাড় হেঁট করিয়া থাকিয়া কহিল, 'সে খুব ভাল ছেলে—লোকে বলে।'

সর্বেশ্বর যেন একটা আরামের নিঃশ্বাস ফেলিল। পকেট হইতে এক তাড়া নোট বাহির করিয়া পুঁটির হাতের মধ্যে গুঁজিয়া দিয়া কহিল, 'তোর বাপ উঠলে এই টাকাটা দিস পুঁটি, চারশো টাকা আছে। বলিস, এ তোর বিয়ের যৌতুক—'

ক্ষণেকের জন্য সমস্ত লজ্জা ভুলিয়া পুঁটি কহিল, 'তুমি চললে না-কি? বাবাকে—'

সর্বেশ্বর বাধা দিয়া কহিল, 'চুপ চুপ। তোর পায়ে ধরছি পুঁটি, গোল করিস নি। সত্যি সত্যি আমার সঙ্গে বিয়ে হ'লে তোর দুর্গতির শেষ থাকবে

না। তোর ভালোর জন্যেই আমি চলে যাচ্ছি। আমি কখনও সংসারে আটকে থাকতে পারব না। শেষকালে তোকে দিন-রাত চোখের জলে ভাসতে হবে।'

বলিতে বলিতে সে একরকম ছুটিয়াই বাহির হইয়া গেল। হাতে তাহার সেই টোল খাওয়া ব্যাগ, কিন্তু তাহার মধ্যে কাপড়-জামাও ভরিয়া লওয়া যায় নাই।

পুঁটি কি বলিতে গেল, বলিতে পারিল না। কি জন্য জানি না, তাহার চোখ দুইটি জলে ভরিয়া গিয়াছিল। সে শুধু খোলা দ্বারপথের দিকে চাহিয়া নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া রহিল।...

সর্বেশ্বর ছুটিতে ছুটিতে গিয়া টিকিট না করিয়াই ভোরের ট্রেনটিতে উঠিয়া পড়িল, তাহার পর স্টেশন পার হইয়া গেলে একটা দীর্ঘ-নিঃশ্বাস ফেলিয়া বেঞ্চির উপর স্থির হইয়া বসিয়া আপন মনেই কহিল, 'আর একটু হ'লেই মরেছিলুম আর কি।'

একটি মেয়ের ইতিহাস

সেই রমণীকে দেখেছিলাম আমি তিনবার। প্রথমবার দেখেছি তার রূপ, দ্বিতীয়বার তার মন, আর শেষবার তার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি।

প্রথমবারটার কথা আমার আজও স্পষ্ট মনে আছে, সেটা তার বিবাহের পূর্বে। আমি, বাসুদেব আর সুকুমার তিনজনে মেয়ে দেখতে গিয়েছিলাম। পাত্র বাসুদেব নিজে, মেয়ে দেখার ব্যাপারে তার দুর্নিবার লজ্জা, তাই সে লজ্জা নিবারণের জন্য বেচারী অনেক অনুনয় ক'রে আমাদের সঙ্গে নিয়েছিল। বাসুদেবের বাপ-মা ছিলেন না বলে অবস্থা সচ্ছল থাকা সত্ত্বেও দীর্ঘদিন তার বিয়ে হয় নি, আর সত্যি কথা বলতে কি, আমাদের মধ্যে সে ছিল সব চেয়ে ভোঁদা, সেইজন্যে তাকে কতকটা বিবাহের অনুপযুক্তই মনে করতাম। যাই হোক—এতদিন পরে কে এক দূর সম্পর্কের দিদি এই বিবাহের সম্বন্ধ এনেছেন এবং তিনিই দাঁড়িয়ে বিয়েটা দিয়ে দেবেন এমনি আশ্বাস দিয়েছেন বলে শোনা গেল। বাসুদেবেরও ইচ্ছা প্রবল, কাজেই মেয়ে দেখাটা, ইংরেজীতে যাকে

বলে for form's sake কতকটা সেই ব্যাপার। না দেখলেও বিয়ে আটকাবে না।

মেয়েটি শুনলাম অজ পাড়াগাঁয়ের—বাপ এত গরীব যে ভিক্ষে করেও রোজ পেটে ভাত যায় না। বংশটা বনেদী এই পর্যন্ত। সুতরাং কিশোরী এবং কুমারী মেয়ে দেখার জন্য অবিবাহিত যুবকদের মনে যে আগ্রহ থাকে তা আমাদের ছিল না, কারণ স্থান, পাত্র এবং পাত্রীর বিবরণ কোনটাতেই বিন্দু-মাত্র স্বপ্নের লেশ ছিল না। ছিল শুধু কাল, অর্থাৎ সময় আমাদের প্রচুর, কতকটা সেই জন্যই আমরা তার মিনতিতে টলেছিলাম।

কিন্তু আমাদের বিস্ময়ের সীমা রইল না, যখন সেই কিশোরী মেয়েটি আমাদের সামনে এসে দাঁড়াল। এই সুদূর পাড়াগাঁয়ে বিজন অরণ্যের মধ্যে আমরা এমন জিনিস যে দেখতে পাব তা কখনো কল্পনাও করি নি। সে যেন সহস্র কবির স্বপ্ন। যেন চন্দ্রের লাবণ্য, শিল্পীর রেখাকে অবলম্বন ক'রে পৃথিবীতে নেমে এসেছে। এমনি আশ্চর্য সুন্দর সে।

সে আমাদের নমস্কার ক'রে বসল। এইবার আমাদের কিছু জিজ্ঞাসা করতে হয়। কিন্তু কে করবে? আমরা স্তম্ভিত হয়ে দেখছিলাম। দীর্ঘ পক্ষ্মাচ্ছাদিত ছলোছলো আবেশময় তার চোখ দুটি, তার সত্যিকারে চাঁপার কলির মতো ছোট ছোট সুডৌল আঙুলগুলি, তার চমৎকার দেহযষ্ঠি, প্রতিমার মতো রং—যেদিকে চোখ পড়ছিল, দৃষ্টি যেন আর ফিরছিল না।...

মেয়েটি অত্যন্ত বিপন্ন বোধ করছে দেখে আমারই সম্বিৎ ফিরে এল প্রথম, প্রশ্ন করলাম, 'তোমার নামটি কি?'

অতটুকু মেয়েকে 'আপনি' বলতে সঙ্কোচে বাধল যেন।

মেয়েটি ঈষৎ ভীত, একটুখানি কান্নার সুর-জড়ানো কণ্ঠে উত্তর দিল, 'শ্রীমতী গৌরী বসু।'

এইবার লক্ষ্য করলাম তার মুখটি বড় মলিন, বেশভূষাও শোচনীয়। বাপ-মায়ের চরম দারিদ্র্যের ছাপ তার চারিদিকে ঘিরে রয়েছে, যদিও তাকে আচ্ছন্ন করতে পারে নি।

আমরা আর কোন প্রশ্নই করলাম না, কীই বা করব? আমাদের ইঙ্গিত পেয়ে গৌরীর বাবা তাকে ভেতরে পাঠিয়ে দিলেন, আমরাও উঠে বাইরে

এলাম। তিনি বহুদূর পর্যন্ত আমাদের সঙ্গে এসে হাত জোড় ক'রে বললেন, 'আমার তো জিজ্ঞাসা করতে সাহস হয় না বাবা, আশা কি আমরা রাখতে পারি ?'

আমি তাঁকে বললাম, 'আপনি বিয়ের যোগাড় করুন, এদিকে আর কিছু বলবার নেই—'

তার পর মাঠের ওপর দিয়ে আমরা নীরবে হাঁটতে লাগলাম। এর মধ্যে একবার শুধু বাসুদেব প্রশ্ন করেছিল, 'কেমন দেখলি ?'

আমি জবাব দিয়েছিলাম, 'ইডিয়েটের মতো প্রশ্ন করিস নি।'

ব্যাস্—আর কোন কথা নয়। সুকুমার একটি কথাও কয় নি, ট্রেনে উঠেই একটা কোণে মাথা রেখে সেই যে চোখ বুজল, সে চোখও একবার খোলে নি। শুধু গভীর রাত্রে, আমার মেসের তক্তাপোশটার ওপর বসে উত্তেজিত ভাবে প্রশ্ন করল, 'সোমেশ, ল্যাংড়া আম দাঁড়কাকে খাবে, আমাদের চোখের সামনে ?'

আমি জবাব দিলাম, 'কি করতে চাও তুমি ? ঈর্ষা যে আমারও হয় নি তা নয়, কিন্তু বন্ধুর জন্যে মেয়ে দেখতে গিয়ে সেই মেয়ে ছিনিয়ে নেওয়ার লজ্জাও কম নয়। তা ছাড়া আমাদের দুজনের থেকেই বাসুদেবের অবস্থা ভাল, সেটা মনে রেখো। সাংসারিক দিক থেকে দেখতে গেলে বাসুদেব আমাদের দুজনের চেয়েই ভাল পাত্র।

সে বললে, 'কিন্তু বয়স ? তা ছাড়া ও যে অনুভব পর্যন্ত করতে পারবে না ওর সৌভাগ্য !'

আমি জবাব দিলাম, 'ভিখিরীর মেয়ে ওরকম পাত্রের হাতে পড়াও অনেক সৌভাগ্যের কথা। আর কি করবে—এখন আর কোন পথ খোলা নেই।'

সুকুমার উঠে গেল, বোধ হয় কথাগুলো বুঝলও। কিন্তু বাসুদেবের বিয়েতে সে একদিনও গেল না। আমাকে আড়ালে ডেকে বললে, 'অসম্ভব। চোখের সামনে ঐ রকম মেয়ে বাসুদেবের হাতে পড়বে তা আমি সইতে পারব না।'

অগত্যা আমিই গেলাম। বিবাহবাসরে উপবাসক্লিষ্ট মুখ, পরদিনের বেদনারক্ত ক্লান্ত দৃষ্টি, ফুলশয্যার রাত্রে মণিমাণিক্যবিভূষিতা রাজেন্দ্রাণী-রূপ,

প্রত্যেকটিই যেন আমার কাছে নব নব বিস্ময়। আমি তিন দিন ধরে শুধু তার রূপই দেখলাম। যেন মনে হয় তার পরের দিনই এক ফাঁকে বাসুদেব আমার পরিচয় দিয়ে বলেছিল, 'এটি আমার বিশেষ বন্ধু, আমার সঙ্গে তোমায় প্রথম দিন দেখতে গিয়েছিল, মনে আছে তো?'

সে যেন তার উত্তরে আমার মুখের দিকে একবার চেয়েছিল। কিন্তু সে দিনের কোন কথা আমার পক্ষে ঠিক ক'রে বলা এখন শক্ত।

এরপর কিছুদিন আর বাসুদেবের কোন খবর রাখি নি। মাস-ছয়েক পরে হঠাৎ শুনলাম সে চাকরি ছেড়ে দিয়ে বৌকে নিয়ে দেশে চলে গেছে। বিস্মিত হলাম, কারণ সে ভাল মাইনেই পেত। তবে তার দেশের অবস্থাও ভাল বলে জানতাম সুতরাং চিন্তিত হলাম না। আরও কিছুদিন পরে ক্রমে ক্রমে বাসুদেব আর তার সুন্দরী স্ত্রী মনের মধ্যে একটা ঈর্ষাতুর বেদনাদায়ক স্মৃতিতে মাত্র পর্যবসিত হ'ল।

আবার তার সঙ্গে দেখা হ'ল বিয়ের ঠিক পাঁচ বৎসর পরে—

বর্ধমানের এক অত্যন্ত ক্ষুদ্র গ্রামে বিশেষ একটা কাজে গিয়েছিলাম। সেখান থেকে গরুর গাড়ি ক'রে শহরে ফিরে ট্রেন ধরবার কথা, কিন্তু খানিকটা গরুর গাড়িতে চলবার পর আমি নেমে হাঁটতে লাগলাম, গাড়িটা মন্থর গতিতে আমার পিছু পিছু আসতে লাগল।

এইভাবে চলে শহরের প্রান্তসীমায় যখন এসে পৌঁছেছি তখন সহসা একটি ছোট ছেলে ছুটতে ছুটতে এসে ডাকলে, 'মশাই, ও মশাই।'

থমকে দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করলুম, 'কি চাস রে বাপু?'

সে আঙুল দিয়ে একটা জরাজীর্ণ বাড়ি দেখিয়ে বললে, 'আপনাকে একবার যেতে হচ্ছে ঐখেনে—'

'তার মানে? খামোকা আমি ওখানে যাব কেন?'

সে বললে, 'গিন্নীমা ডাকছে, সে চেনে আপনাকে।'

বিস্ময়ের অবধি রইল না। তবু যখন চেনা মানুষ বলে দাবী করছে তখন যেতেই হ'ল। সেই উলঙ্গপ্রায় বালকটির পিছু পিছু গিয়ে যখন সামনে পৌঁছলুম তখন দেখলুম একটি কুড়ি-একুশ বছরের মেয়ে দরজা ধরে স্তব্ধ হয়ে

দাঁড়িয়ে রয়েছে। তার পরনের শাড়ি জীর্ণতার অন্তিম দশায় এসে পৌঁছেছে, দারিদ্র্যে ও মনোকষ্টে তার প্রথম যৌবন পিষ্ট, দেহ শীর্ণ, মাথার চুল রুক্ষ, কিন্তু তবু তার সেই আশ্চর্য রূপের কিছু তখনও বোধকরি অবশিষ্ট ছিল—কারণ এক নজরেই তাকে চিনতে পারলুম।

স্তম্ভিত হয়ে মুহূর্তকাল তার দিকে তাকিয়ে থেকে অস্ফুটস্বরে শুধু বললুম, 'গৌরী, তুমি?'

সে একটু হাসল। অস্তোন্মুখ দ্বিতীয়ার চাঁদের মতই তখনও তার সে হাসিতে বোধকরি পূর্বের লাবণ্য কিছু অবশিষ্ট ছিল।

হেসে সে বললে, 'অসুন না, ভেতরে।'

আমি একটুখানি ইতস্তত করে বললুম, 'কিন্তু আমার ট্রেন সাতটায় আর সময় হবে কি বসবার—'

যদিও কৌতূহল ও দুঃখ আমার মনের মধ্যে তখন প্রবল হয়ে উঠেছে।

গৌরী বললে, 'যদি জরুরী দরকার থাকে তো আটকাব না। নইলে না হয় কাল সকালেই যাবেন।'

আমি আর দ্বিধা করলুম না। গাড়িওয়ালাকে সেই নির্দেশই দিয়ে বাইরের ঘরে বসলুম। তারপর বাচ্চা চাকরটি অদৃশ্য হতেই আমি তাকে একযোগে সহস্র প্রশ্ন করলুম, 'এ সব কি ব্যাপার গৌরী, বাসুদেব কোথায়? তোমরা এখানেই বা কেন? এ রকম অবস্থাই বা হ'ল কি ক'রে?'

গৌরী নতমুখে বললে, 'উনি বাইরে গেছেন। আপনি স্থির হয়ে মুখে হাত জল দিন—সবই জানতে পারবেন।'

আমি আরও ব্যাকুল হয়ে প্রশ্ন করলুম, 'স্থির আমি হবই, তার জন্যে চিন্তা নেই। কিন্তু এ কি ক'রে সম্ভব হ'ল। এ যে আমি ভাবতেই পারছি না।'

বহুদিন আগে এই মেয়েটি যখন পরের গলায় মালা দেয় তখন যে ঈর্ষাতুর বেদনা অনুভব করেছিলাম আজ এতদিন পরে সেই ব্যথাই যেন সহস্রগুণ হয়ে কাঁটার মতো বিঁধতে লাগল। গৌরী বহুক্ষণ স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল, তারপর বললে, 'উনি বিয়ের কিছুদিন পরেই চাকরী ছেড়ে দিয়ে দেশে চলে যান কিন্তু দেশেও বেশিদিন থাকতে পারেন নি। এদেশ-ওদেশ ক'রে ঘুরে বেড়াতে বহু টাকা খরচ হ'ল, তার ওপর মদ ধরলেন।'

আমি যেন ক্রমে পাষাণ হয়ে যাচ্ছিলুম। কোনমতে প্রশ্ন করলুম, 'তার পর?'

সে বললে, 'দেশের জমি-জমা বাড়ি-ঘর সমস্তই বিক্রী হয়ে গেল; এখানে ওঁর দিদিমার কিছু জমি ছিল আর এই বাড়িটা, সেই সূত্রেই এখানে আসা—'

বহুক্ষণ দুজনেই নীরব রইলুম, তারপর আমিই আবার অত্যন্ত সঙ্কোচের সঙ্গে বললুম, 'বাসুদেবের কি মাথাতে কোন গোলমাল হ'ল, না আর কিছু?'

সন্ধ্যার আলো ভাঙাবাড়ির মধ্যে তখন নিরতিশয় ম্লান হয়ে এসেছে, তবু তারই মধ্যে দেখতে পেলাম তার সমস্ত মুখে কে যেন সিঁদুর মাখিয়ে দিলে। সে যে সুগভীর লজ্জার চিহ্ন তা আমার বুঝতে বাকী রইল না। একবার মনে হ'ল যেন সে ছুটে পালিয়ে যেতে চাইছে, কিন্তু বহু চেষ্টায় নিজেকে সামলে নিলে, খানিকটা পরে অর্ধস্ফুট স্বরে বললে, 'আমাকে উনি কোথাও রেখে স্থির হ'তে পারেন না! সেই থেকেই যত গোলমাল।'

কথাটা বুঝতে দেরি হ'ল। অবাক হয়ে তার মুখের দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, 'তার মানে? ঈর্ষা? সন্দেহ?'

সে সেই ভাবেই জবাব দিলে, 'কোন বিশেষ লোককে নয়, কিম্বা ঠিক আমাকেও নয়। ওঁর কেমন একটা ধারণা হ'ল যে আমাকে কোথাও রাখা নিরাপদ নয়—'

কী সর্বনাশ! আমি স্তব্ধ হয়ে বসে রইলুম অনেকক্ষণ। কথাটা বোঝবার চেষ্টা করলুম কিন্তু ঠিক ধারণা করতে বিলম্ব হ'ল। বুঝলুম মনের ভাবটা যাই হোক—এটা মাথা খারাপেরই লক্ষণ। সুন্দরী স্ত্রীর জন্য বাসুদেবের মাথাটা খারাপ হয়ে গেল শেষ পর্যন্ত!

কিছুক্ষণ পরে সে বললে, 'মুখে হাতে জল দিন—উঠুন।'

আমি সে কথার জবাব না দিয়ে প্রশ্ন করলুম, 'আজ সে যে বাইরে বেরিয়েছে তাহ'লে? তোমাকে একলা রেখে?'

'মদ কিনতে গেছেন—শহরে।'

আর একবার শিউরে উঠলুম। চোখের সামনে ঐ নতমুখী রূপসী মেয়েটির দিকে চেয়ে সারা মন যেন মুচড়ে উঠতে লাগল। হায় রে! তখন যদি

সুকুমারকে বাধা না দিতুম।

বললুম, 'আমাকে ডাকলে যে, এর জন্য তোমায় লাঞ্ছনা সইতে হবে না?'

সে অতিকষ্টে অপমানের অশ্রু দমন ক'রে বললে, 'তা ঠিক হবে না। হয়ত আপনাকে দেখে তিনি খুশীই হবেন। তিনি আপনার নামই প্রায় করেন।... আর তাছাড়া, হয়ত আপনাকে ডেকে অনর্থক ব্যথাই দিলুম, কিন্তু তবু কী যে হ'ল, না ডেকে যেন থাকতে পারলুম না।'

উঠে মুখে হাতে জল দিয়ে এসে চৌকীতে বসলুম। সে একটু পরে এক পেয়ালা চা তৈরী করে নিয়ে এসে ঘরে ঢুকল। আর এক হাতে একটা ঠোঙায় রসগোল্লা। একটু ম্লান হেসে বললে, 'দুধ ঘরে থাকে না, পাওয়াও গেল না, 'র' চা-ই খেতে হবে—'

ভাবছিলাম যে আমার এই সময়ে যাওয়াই বোধ হয় উচিত হবে কিন্তু তবু বাসুদেবের সঙ্গে একটা বোঝাপড়া করার চেষ্টা না ক'রেই চলে যেতে মন চাইল না।

এরপর, যে প্রশ্নটা মেয়েরা কোন অবস্থাতেই করতে ভোলে না, গৌরী সেই প্রশ্নই করলে, 'বিয়ে করলেন কবে?'

উত্তর দিলাম, 'করি নি।'

সে বিস্মিত হয়ে বললে, 'এখনও করেন নি? কেন?'

তার মুখের দিকে চেয়ে বললাম, 'সে উত্তর শুনলে তুমি হয়ত ব্যথাই পাবে। সে কথা থাক্—'

অকস্মাৎ সে যে ব্যাকুল হয়ে বলে উঠল, 'কে বলেছে ব্যথা পাব? কে বলেছে আপনাকে? না, বলতেই হবে—'

মুহূর্তমধ্যে আমারও বুকটা যেন কেঁপে উঠল। স্খলিত কণ্ঠে বললাম, 'তোমাকে দেখার পর আর কোন মেয়েকে বিয়ে করবার কথা আমি ভাবতেই পারি না গৌরী! আজও সেই প্রথম দিনটার কথা ভুলতে পারি নি যে!'

গৌরীর পাণ্ডুর মুখ যেন আরও বিবর্ণ হয়ে উঠল, তার ঠোঁট দুটি যেন নিমেষের জন্য থর্ থর্ ক'রে কেঁপে উঠল—তারপরই সে ছুটে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

বাইরের ম্লান আলোতেই একটা ছায়া অনুভব করলুম। সঙ্গে সঙ্গেই তীব্রকণ্ঠে একটা প্রশ্ন এল. 'কে, কে ভেতরে ?'

আমি উঠে দাঁড়িয়ে যতদূর সম্ভব সহজ গলাতেই প্রশ্ন করলুম, 'কে, বাসুদেব ? এতক্ষণ কোথায় ছিলে হে। এস, এস।'

বাসুদেব মুহূর্ত-কয়েক বাইরেই স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল, তারপর ভেতরে এসে ঢুকেও প্রথমটা ঠিক চিনতে পারলে না। তার মুখে অপরিচয়ের বিস্ময় লক্ষ্য ক'রে বললুম, 'কি হে, চিনতে পারলে না ?'

এইবার তার স্তিমিত চোখে পরিচয়ের জ্যোতি এল, সে খুশীই হ'ল যেন; বললে, 'আরে, সোমেশ।'

কিন্তু আমি অবাক হয়ে তার দিকে চেয়ে ছিলুম। এ কি সেই বাসুদেব ? কোথায় তার সেই গোলগাল চেহারা আর কোথায় তার সর্বাঙ্গে সেই প্রাচুর্যের প্রসন্নতা ? চেহারা শীর্ণ, চক্ষু কোটরগত—সর্বাঙ্গে অভাব, দুশ্চিন্তা ও মদ্যপানের চিহ্ন, এমন কি এই বয়সেই তার মাথার চুলগুলো অধিকাংশই পেকে সাদা হয়ে গিয়েছে। বুঝতে পারলুম যে গৌরীকে সে কষ্ট দিয়েছে বটে কিন্তু যন্ত্রণা নিজেও কম সহ্য করে নি।

বাসুদেব এগিয়ে এসে আমারই চৌকীটার ওপর বসে পড়ল। তার জীর্ণ এবং মলিন উড়ুনীটার মধ্যে ছিল মদের দুটি বোতল, সে দুটো আমার কাছে গোপন করবার চেষ্টামাত্র না ক'রে আমারই পাশে বার ক'রে রাখলে, তারপর জিজ্ঞাসুনেত্রে চেয়ে প্রশ্ন করলে, 'তারপর ? হঠাৎ—?'

বললুম, 'এখানে একটু কাজে এসেছিলুম, হঠাৎ শুনলুম তোমার নাম, এখানেই আছ শুনলুম। তাই খুঁজে খুঁজে বেড়াচ্ছিলুম, তোমার গিন্নী দেখতে পেয়ে চাকর পাঠিয়ে জানিয়ে দিলেন যে এই বাড়িই বটে। যা হয়রান হয়েছি, উনি না দয়া করলে হয়ত খুঁজেই পেতুম না—'

বাসুদেব যেন অন্যমনস্ক হয়ে বাইরের দিকে চেয়েছিল। আমিও চুপ ক'রে কথাটা পাড়বার সুযোগ চিন্তা করতে লাগলুম। অর্থাৎ কিছুক্ষণ দু'জনেই চুপচাপ।

এই সময়ে সেই ছেলেটি একটা ভাঙা হ্যারিকেন জেলে এনে ঘরের মাঝখানে বসিয়ে দিয়ে গেল। আমি আলোটা হাত দিয়ে চোখে আড়াল ক'রে বলে

ফেললুম, 'কিন্তু বাসুদেব, এ অবস্থার কারণ কি ? কি ব্যাপার ?'

বাসুদেব একটু ম্লান হেসে দাঁড়িয়ে উঠে বললে, 'হবে, হবে, যখন এতদিন পরে পেয়েছি তোমাকে, তখন সবই বলব। কিন্তু ঘরে বোধ হয় কিছুই নেই, অতিথি-সৎকারের ব্যবস্থা ক'রে আসি—একটু বোস্।'

সে ভেতরে চলে গেল। ভেতর থেকে অস্ফুট দু-একটা কথাও শুনলাম। মিনিট পনের পরে সেই ছেলেটি একটা খালি তেলের বোতল, ও একটা বাটি হাতে ক'রে আমারই সামনে দিয়ে বেরিয়ে গেল, বুঝলুম সে দোকানে গেল। তারই একটু পরে বাসুদেব ফিরে এসে আবার চৌকীতে বসল।

কিন্তু কথাটা পাড়তে তার বিলম্ব হ'তে লাগল। সঙ্কোচে আমরা কেউ কারুর দিকে চেয়ে থাকতে পারছিলুম না, দু'জনেই লণ্ঠনটার দিকে চেয়ে ছিলুম। মিনিট পাঁচেক পরে বাসুদেব বললে, 'তোর তো অজানা কিছুই নেই সোমেশ, আমার তুই সব খবরই রাখতিস। ভুল হ'ল আমার গৌরীকে বিয়ে করা। আর সেই ভুল থেকেই এই ব্যাপার চলছে—'

আমি বিস্মিতকণ্ঠে প্রশ্ন করলুম, 'কিন্তু ভুলটা কি ?'

অকস্মাৎ সে যেন উত্তেজিত হয়ে উঠল, 'ভুল নয় ? দেখেছিস তো গৌরীকে তুই ? ঐরকম রূপ এর আগে আর কোথাও নজরে পড়েছে ? বিশেষ ক'রে বাংলা দেশে ?···আর আমি ? কি আছে আমার ? তোদের মধ্যে আমিই ছিলুম সব চেয়ে dull, সেটা কি আমি বুঝতে পারতুম না মনে করিস ? ঐ মেয়েকে বিয়ে করা আমার পক্ষে কিছুতে উচিত হয় নি ; আমার কি আছে, কেন ভালবাসবে আমাকে ও ?'

আমি বাধা দিয়ে বললুম, 'কি পাগলের মতো বকছিস ? কে বলেছে উচিত হয় নি ? পাত্র হিসেবে আমাদের মধ্যে সব চেয়ে ভাল ছিলি তুই, আমরা সবটা ওপর-চালাকিতে মারতে চেষ্টা করতুম, তুই সেটা পারতিস না ; কিন্তু পৃথিবীতে ওপর-চালাকির স্থান নেই, এটা ঠিক জানবি।···রূপে, গুণে সবেতেই তুই আমাদের চেয়ে বড় ছিলি—'

সে জবাব দিলে, 'আমাকে ভোলাবার চেষ্টা করিস নি সোমেশ, আমি সব বুঝি।···আমার ভুলও আমি বুঝতে পারলুম বিয়ে করার পরই। দেখতে পেলুম প্রত্যেকটা লোকই ওকে দেখে চঞ্চল হয়ে ওঠে, বয়স নেই, সম্বন্ধ নেই,

কোন কিছু বাধা বা বিচার নেই তাদের কাছে। তার ওপর নিজের দিকে তাকিয়ে যখন দেখলুম ওকে পাবার মতো কোন যোগ্যতাই আমার নেই, তখন আর জ্ঞান রইল না—'

সে কিছুক্ষণ চুপ ক'রে রইল কিন্তু তার চোখের দিকে চেয়ে আমি শিউরে উঠলুম। এ যে ক্ষুধার্ত পশুর দৃষ্টি!

কিছুক্ষণ পরে সে যেন কতকটা নিজের মনেই বলতে লাগল, 'ওকে নিয়ে দেশ-বিদেশে কতই ছুটোছুটি করলুম কিন্তু কিছুতেই স্থির হ'তে পারলুম না, একদিকে দেখি সমস্ত পুরুষ ওকে ছিনিয়ে নিতে চাইছে আর একদিকে দেখতে পাই আমি ওর থেকে কেবলই দূরে সরে যাচ্ছি, যোগ্যতার পথে কেবলই অধঃপতন ঘটছে আমার—'

আমি বললুম, 'কিন্তু এ যে তোর নিছক পাগলামি বাসুদেব! ছিঃ ছিঃ, মিছে একটা ফাঁকা খেয়ালের বশে নিজেও কষ্ট পাচ্ছিস আর ওকেও কষ্ট দিচ্ছিস— এ দুর্মতি তোর কি ক'রে হ'ল? আমি বলছি তুই বিশ্বাস কর্, তুই সর্বাংশে ওর উপযুক্ত!'

সে মাথা নেড়ে বললে, 'তুমি মিছে কথা বলছ। ওর কষ্ট লাঘব করার জন্য আমাকে স্তোক দিচ্ছ। কিন্তু আমি জানি—'

কী বোঝাব এই উন্মাদকে!

মিনিট-খানেক চুপ ক'রে থেকে বললুম, 'কিন্তু মদ কেন ধরলি তুই? একেবারে পুরোপুরি সর্বনাশের পথে নেমে এলি?'

সে হঠাৎ আমার দিকে ফিরে আমার দুটো হাত চেপে ধরলে, তারপর ফিস্-ফিস্ ক'রে বললে, 'সর্বনাশ? যেদিন বিয়ে করেছি ঐ সর্বনাশীকে সেই দিনই তো আমার সর্বনাশ পুরো হয়ে গেছে সোমেশ!...কেন মদ খাই শুনবি? ...বিয়ের দু-তিন মাস পর থেকে আমি আর ওর সঙ্গে এক ঘরে শুই নি কখনও, শুতে পারি না, ঘৃণা বোধ হয়। মনে হয় যে ও আমার বুকের মধ্যে শুয়ে শুয়ে আমাকেই সর্বান্তঃকরণে ঘৃণা করবে, অবজ্ঞা করবে—সে আমি সইব কেমন ক'রে? তাই শুই না। কিন্তু তুই ভেবে দেখ—মানুষের শরীর তো? সমস্ত মন আকুল হয়ে ওকে চায়, সেই সাংঘাতিক কামনার সঙ্গে যুদ্ধ করা কি সহজ কথা? সেই জন্যেই আমায় মদ ধরতে হয়েছে, রাত্রে মদ না খেলে পারি

না এ ব্যথা সহ্য করতে—'

উঃ।···আমি আর শুনতে পারলুম না, ছুটে বাইরে এসে দাঁড়ালুম। শুনতে পেলুম ভেতরে বসে বাসুদেব হাসছে, ফাঁকা একটা আল্‌গা হাসি, অর্থহীন, কতকটা বিদ্রূপের সুর মেশানো।

বহুক্ষণ অন্ধকারে মাঠে মাঠে ঘুরে বেড়ালুম। দু-একবার হোঁচট খেয়ে পড়েও গেলুম কিন্তু আমার তখন কোন জ্ঞান ছিল না। শুধু মনে হচ্ছিল সেই নিশীথ অন্ধকারের বুক বিদীর্ণ ক'রে যদি নিয়তির দেখা পাই তো তাকে নখে ক'রে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো ক'রে ফেলি। যাকে দেখে অবধি নিজের জীবন শূন্য হয়ে গেছে, জীবনের সমস্ত নিষ্ফল কামনা যার ছায়াকে কেন্দ্র ক'রে দিন রাত আজও ঘুরে বেড়াচ্ছে, সেই মেয়েকে পেয়ে এ উন্মাদ এমন ক'রে নষ্ট করল। যার এক মুহূর্তের প্রসন্নতার জন্য সমস্ত জীবন উৎসর্গ করা যায়।···

বুক ভরা এই নিরতিশয় গ্লানি আর ধিক্কার নিয়ে কতক্ষণ ঘুরে বেড়িয়েছি জানি না, চৈতন্য হ'ল যখন দেখতে পেলুম যে সেই ছেলেটি আলো নিয়ে আমাকে খুঁজতে বেরিয়েছে। ফিরে এসে দেখলুম গৌরী সেই ভাবেই দোরের কাছে দাঁড়িয়ে আছে স্থির হয়ে। আমি কোথায় ছিলুম এবং কেন ঘুরে বেড়াচ্ছিলুম কোন প্রশ্নই করল না। শুধু, আমার মুখে বোধ হয় আত্মগ্লানির ও দুঃখের ছাপ স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠেছিল, সেদিকে চেয়ে মুহূর্ত দুই-এর জন্য তার দৃষ্টি উজ্জ্বল হয়ে উঠল। আমার দুঃখে তার জীবনে বোধ করি প্রথম স্তুতি-গান শুনলে সে।

ভেতরে ঢুকে দেখলুম চৌকী খালি। জিজ্ঞাসুনেত্রে গৌরীর দিকে চাইতেই সে নীরবে আঙুল দিয়ে দালানের কোণের ঘরটা দেখিয়ে দিলে। উঁকি মেরে দেখলুম, ঘরের মেঝেতে একটা ডিবে জ্বলছে আর তারই সামনে একটা ছেঁড়া মাদুর পেতে বসে বাসুদেব আপন মনে মদ খাচ্ছে। তার অদ্ভুত দৃষ্টি ধূমময়ী কম্পমানা অগ্নিশিখার ওপর নিবদ্ধ।···

ফিরে আসতে গৌরী বললে, 'ঐ ভাবেই সারারাত কেটে যাবে। সকালের দিকে ঘণ্টা-দুয়েকের জন্য শুধু ঘুমোন—'

অত্যন্ত সঙ্কোচের সঙ্গে প্রশ্ন করলুম, 'মাতাল হয়ে কিছু হ্যাঙ্গাম করে না তো?'

ঈষৎ হাসির চেষ্টা ক'রে গৌরী জবাব দিলে, 'বিশেষ না।'

আমি ঠিক কি জানতে চাইছি তা বুঝেই কথাটা এড়িয়ে গেল।

দালানেরই একপাশে খাবার জায়গা হয়েছিল, সেইখানে গিয়ে বসলুম। আয়োজন সামান্য, কিন্তু সমস্তটুকুর মধ্যে আন্তরিক যত্নের চিহ্ন সুস্পষ্ট।

পাতের কাছে বসলুম বটে কিন্তু মন আহারে সাড়া দিলে না। যা আমার হ'তে পারত, অবহেলায় যাকে হারিয়েছি, তারই মূল্য জীবনের মধ্যাহ্নে নূতন ক'রে চোখে পড়ে মনকে পীড়িত করছে, কিন্তু সে কথা কি ক'রে প্রকাশ করব, কেমন ক'রে জানাব সেই ব্যর্থতার বেদনা ?···পৃথিবীতে এক সময় আশ্চর্যভাবে এই যে জ্যোতির্ময়ী রমণীর জন্ম হয়েছিল, তা কি শুধু শোচনীয়ভাবে লোকচক্ষুর অগোচরে অন্তরে-বাইরে শুকিয়ে মরবার জন্যে ?

খেতে যে আমি পারছি না তা গৌরী লক্ষ্য করেছিল, কিছুক্ষণ পরে বললে, 'আপনার কথা আমি বুঝতে পারছি। কিন্তু নিজের হাতে রেঁধে আত্মীয়-বন্ধু-বান্ধবকে খাওয়াবার বা তাঁদের সেবা করার সাধ তো কোন দিনই মেটে নি, আজ জীবনে এই একটি দিন যদি সে সুযোগ পেয়ে থাকি তো তাকে নষ্ট করবেন না। আমার এই একটুখানি সেবা করার সাধকে সার্থক হ'তে দিন'।'

সুতরাং জোর ক'রে খেতে হ'ল। আহার্য পেটের মধ্যে গিয়ে যেন পাষাণ হয়ে উঠেছে, তবুও খাচ্ছি। অন্যমনস্ক হয়েই বসে খেয়ে গেলাম, আমার সমস্ত মন তখন মাথা খুঁড়ছে কথা খুঁজে। কি বলব এই মেয়েটিকে, কি সান্ত্বনা দেব, কোন্ পথ দেখাব! বিধাতার অদ্ভুত সৃষ্টি এই দেহ, কতদিনের অনশনে এমন ক'রে শুকিয়ে উঠেছে তা কে জানে—কিন্তু কি উপায় ? কিছুতেই এর দুঃখ লাঘব করার কোন উপায় চোখে পড়ল না।

নীরবে আহার শেষ ক'রে বাইরে গিয়ে দাঁড়ালাম। আমারই বিছানাটি ইতিমধ্যে গৌরী কখন এ ঘরের চৌকীটার ওপর পরিপাটি ক'রে বিছিয়ে রেখে ছিল, তারই প্রলোভন সামলাতে না পেরে একটু পরে শুয়ে পড়লুম, গৌরীও ততক্ষণে সব আলো নিভিয়ে বোধ হয় শুয়ে পড়েছে বলে বোধ হ'ল।

খানিকটা বিছানায় শুয়ে ছট্‌ফট্‌ ক'রে উঠে পড়লুম। ঘুম অসম্ভব, শুধু শুয়ে থাকা মনের এই অবস্থাতে আরও অসম্ভব হওয়ায় উঠে আস্তে আস্তে দোর খুলে একেবারে বাইরে বেরিয়ে পড়লুম। কিন্তু বাইরে পা দিয়েই স্তম্ভিত হয়ে গেলুম, খানিকটা দূরে বাগানে মাটির ওপরই স্থির হয়ে বসে রয়েছে একটি রমণী, এবং সে যে গৌরী তা নক্ষত্রের অস্পষ্ট আলোতেও নিঃসংশয়ে অনুভব করতে পারলুম! কাছে এগিয়ে গিয়ে আস্তে আস্তে ডাকলুম, 'গৌরী!'

সে পিছনের দিকে না চেয়েই জবাব দিলে, 'এসেছ? এইখানেই বোস। ......তুমি যে ঘুমোতে পারবে না তা আমি জানতুম!'

তার এই নিঃসঙ্কোচ সম্বোধনে, স্নেহের সম্পর্কের এই 'তুমি'তে সমস্ত মনটা আর একবার যেন আকুল হয়ে দুলে উঠল। কিন্তু কোন কথাই বলতে পারলুম না, শুধু তার পাশে বসে পড়লুম।

সে পূর্ব কথারই জের টেনে বলে চলল, 'কিন্তু কেন মিছে আমার জন্যে ভেবে কষ্ট পাচ্ছ! আমার আর কোন উপায়ই নেই।'

আমি জোর ক'রে মনের আবেগকে চেপে যথাসম্ভব সহজ গলাতেই বললুম, 'তোমার বাপের বাড়িতে কি কেউ নেই?'

সে একটুখানি চুপ ক'রে থেকে বললে, 'বাবা আছেন, দাদাও আছেন, কিন্তু সেখানে গিয়ে থাকার কোন উপায় নেই। উনি ছাড়বেন না, আর জোর ক'রে রেখে দেওয়ার মতো অবস্থাও তাদের নয়। হপ্তায় দু'দিন ক'রে উপোস ক'রে থাকতে হয় তাদের।'

আমি চুপ ক'রে রইলুম। কি আর বলব এর পর?

সেও কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে বললে, 'কি ভাবছিলাম জানো? সেই প্রথম দিন মেয়ে দেখতে যাওয়ার কথা। তোমরা তিনজনে গিয়েছিলে মনে আছে? ...দেখা দিতে এসে লজ্জায় ভাল ক'রে চেয়ে দেখতে পারি নি কিন্তু তারপর তোমরা যখন চলে এস, তখন জানলার আড়াল থেকে দেখেছিলুম, আমার ছোট বোন তোমাকেই ভুল ক'রে দেখিয়ে দিয়ে বলেছিল ঐ তোর বর! আমি তাই জানতুম, বিয়ের সময় ওঁকে দেখে চমকে উঠেছিলুম।......এ সব সামান্য কথা, তোমরা জান না, সেদিনের কথা হয়ত মনেও নেই—কিন্তু আমি একটি কথাও ভুলি নি।'

মনে যে কি আছে, তা কেমন ক'রে জানাব! সেদিনের প্রতিটি কথা বুকে আজও গাঁথা আছে—

অনেকক্ষণ ছু'জনেই চুপ ক'রে বসে রইলুম। তারপর যে কথাটা সংশয় ও সঙ্কোচের মধ্যে মনে দেখা দিচ্ছিল সেই কথাটাই বলে ফেললুম, 'গৌরী, আমি যদি তোমাকে নিয়ে যেতে চাই তো যাবে?'

অকস্মাৎ সে যেন পাগল হয়ে উঠল, সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে আমার ছুটো হাত চেপে ধরে বললে, 'যাবে? আমাকে নিয়ে যাবে? এখান থেকে অনেক দূরে আমাকে নিয়ে গিয়ে রাখতে পারবে? আমাকে ভালবাসতে পারবে?'

আমিও সজোরে তার হাত-ছুটি চেপে ধরে বললুম, 'পারব গৌরী, আমার ভালবাসা দিয়ে তোমার মনের সমস্ত শূন্যতা ভরিয়ে দিতে পারব! চল আজই, এখনই আমরা চলে যাই—'

সে আর কোন কথা বললে না, কেমন যেন স্বপ্নাবিষ্টের মতো আর একদিকে চেয়ে বসে রইল। কিন্তু আমার মুঠোর মধ্যে তার ফুলের মতো নরম হাত ছু'টি ধরা ছিল, তারই স্পর্শে বুঝতে পারলুম যে সমস্ত দেহ তার কাঁপছে, থর্ থর্ ক'রে—

খানিকটা পরে আমি বললুম, 'গৌরী প্রথমদিনের কথা বলছিলে? জানো যে তারপর থেকে একটি মুহূর্তের জন্যও তুমি আমার মন থেকে দূরে যাও নি? প্রতিদিন রাত্রে শোবার আগে শেষ ভেবেছি তোমারই কথা, আবার সকালে উঠে প্রথম মনে পড়েছে তোমাকে। তোমার জন্য সমস্ত মন মরুভূমি হয়ে আছে গৌরী, এ তুমি বিশ্বাস করো!'

ঘুম ভেঙে চমকে ওঠার মতো আমার দিকে চেয়ে হঠাৎ সে বললে, 'না, না, সে হয় না। আমি যাব না—'

আকুল হয়ে প্রশ্ন করলুম, 'কেন গৌরী?'

সে বললে, 'আবার যদি তুমি আমাকে ঠকাও, যদি নিয়ে গিয়ে ভাল না বাসো? না, না—সে আমি সইতে পারব না—'

আমি বললুম, 'কি বলছ তুমি, তোমাকে পেলে আমার সমস্ত জীবন সার্থক হয়ে উঠবে, ধন্য হবে। আমি তোমাকে ভালবাসব না?'

সে ঘাড় নেড়ে বললে, 'না, আমি শুনেছি এরকম ভালবাসায় লোকে সুখী হ'তে পারে না। আর তাহ'লে ওঁর ধারণাই যে সত্য হবে! সে আমি কিছুতে হ'তে দেব না। আমার আজীবন দুঃখ দিয়ে ওঁর কথা মিথ্যা প্রমাণ ক'রে যাব।…তুমি যাও, ওগো তুমি যাও, আজ যেটুকু জানতে পারলুম, এই আমার ঢের, আর কিছু চাই না।'

আমি ব্যাকুলকণ্ঠে ডাকলুম, 'গৌরী, গৌরী, জীবনের সার্থকতা হাতের মধ্যে তুলে দিয়ে এমন ক'রে কেড়ে নিও না—'

সে বললে, 'সার্থকতা!……তুমি যে আমাকে আজও নিয়ে যেতে চাও, আমার অভাবে তোমার মন আজও যে শূন্য হয়ে আছে—এই তো আমার যথেষ্ট পাওয়া হ'ল! এই কথাটুকুই থাক আমার বুক ভরে, আমার দুর্ভাগ্য দিয়ে তোমার জীবনকে বিড়ম্বিত করতে চাই না—না, তুমি যাও, যাও—

সে অকস্মাৎ এক রকম ছুটেই পালিয়ে গেল। আমি বাধা দিতে পারলুম না, শুধু মনে হ'ল আর একবার অসহ একটা শূন্যতা আমাকে গ্রাস করতে আসছে।

সারারাত পাগলের মতো ছুটোছুটি ক'রে ভোরবেলায় যখন ফিরে এলুম তখন দেখলুম বিছানার ওপর একটুক্‌রো কাগজে চিঠি—গৌরীর লেখা এর আগে চোখে দেখি নি, কিন্তু চিঠির ভাষাতে বুঝলুম এ চিঠি তারই। তাতে যা লেখা ছিল, তার অর্থ কতকটা এই—

"তুমি যে প্রস্তাব করেছ তা আমার পক্ষে যতই প্রলোভনের হোক—তা তোমার করুণা থেকে এসেছে। সুতরাং তা লজ্জার। তুমি এখন যাও, কিছু-দিন পরেও যদি আমার কথা মনে থাকে তো আবার এস। সেই দিন ভেবে দেখব, কিন্তু আজ আর দেরি ক'রো না। মানুষের মন বড় দুর্বল!"

অত্যন্ত আঁকাবাঁকা হাতের লেখা, অসংখ্য বানান ভুল। কিন্তু তবু সেই কাগজের টুকরোটি আমার কাছে জীবনের সার্থকতার আশা বয়ে এনেছে, আমার কাছে তা পরম মূল্যবান। সযত্নে আমি কাগজটি বুকের পকেটে রেখে দিলুম এবং তখনই আমার সামান্য মালপত্র নিজেই বয়ে নিয়ে বেরিয়ে পড়লুম। এ তার আদেশ, যার প্রসন্নতার জন্য কোনও সাধনা করবার অধিকার আমি

কোন দিন লাভ করব –এ আশা ছিল আমার স্বপ্নেরও বাইরে। সুতরাং এ আদেশ আমি পালন করবই, তা সে যত কঠিন হোক—

এর পর মাসখানেক কাটল আমার রঙীন স্বপ্নে। গৌরী ছিল আমার কাছে দুরাশা হয়ে সুতরাং তাকে নিয়ে স্বপ্ন-জাল বোনবার সৌভাগ্য আমার কোন দিন হয় নি, শুধু তাকে মনে ক'রে নিবিড় নৈরাশ্যের দীর্ঘশ্বাস পড়ত মাত্র। আজ সেই দুর্লভ অবসর আমার উপস্থিত, সেই অচিন্তিত সৌভাগ্য! দিন-রাত তার কথা ভাবতে ভাবতে প্রায় পাগল হয়ে উঠলুম যখন, তখন আর অপেক্ষা করতে না পেরে আবার একদিন বর্ধমানের পথে বেরিয়ে পড়লুম, অনেক আশা এবং অনেক আশঙ্কা বুকে নিয়ে। কিন্তু সামনে এসে বাড়ির অবস্থা দেখেই বুঝলুম আশঙ্কাই আমার অদৃষ্টে সত্য হ'ল। দোর-জানলা হাঁ-হাঁ করছে, জন-প্রাণীর চিহ্ন নেই! ঠিক এ ব্যাপারটার জন্য প্রস্তুত ছিলাম না বোধ হয়, আঘাতটা বুকের মধ্যে নিদারুণ ভাবে লেগে কিছুকালের জন্য আমাকে জড়, বিমূঢ় ক'রে দিলে! আমি আড়ষ্ট হ'য়ে মিনিট-কতক মাঠেরই মধ্যে বসে রইলুম। জীবনের সমস্ত আশা-আনন্দের আলো এক নিমেষে চোখের সামনে নিভে গেলে যে অবস্থা হয়—আমারও তখন সেই অবস্থা।

অনেকক্ষণ পরে উঠে গ্রামের লোকের দোরে দোরে ঘুরে সংবাদ যা পাওয়া গেল তাতে জানতে পারলুম যে আমি যেদিন গিয়েছিলুম তার পরের দিনই ওরা কোথায় চলে গেছে, একেবারে সম্পূর্ণ অজ্ঞাতবাসে। বহু খোঁজাখুঁজি করলুম কিন্তু কেউ কোন সংবাদ দিতে পারলে না! সেখান থেকে ফিরে সেই দিনই বাসুদেবের দেশে গেলাম, তারপর তার আত্মীয়-স্বজনদের কাছে। সকলেই সেই এক জবাব দিলে,—তার কোন খবরই রাখি না।

দিনকতক দুঃখ অসহ্য বোধ হ'ল—দেশ-বিদেশে ছুটোছুটি ক'রে বেড়ালুম। তারপর, সব দুঃখই একদিন না একদিন সয়ে যায়, সুতরাং আমার এ দুঃখও সয়ে গেল। আবার দৈনন্দিন জীবন শুরু হ'ল নিয়মিত ভাবেই—শুধু বুকের একটা দিক, যৌবন ও বসন্তের দিক, কামনা ও আশার দিকটা চিরকালের মতো পাথর হয়ে গেল।

এর পাঁচ বছর পরে আবার গৌরীর দেখা পেলাম।

মণিকর্ণিকার ঘাটে সন্ধ্যাবেলায় বেড়াতে গিয়েছিলাম, এমনই। তখনও গোধূলির আলো একেবারে ম্লান হয় নি, সন্ধ্যার কিছু বিলম্ব আছে, সময়টা এই রকম। শ্মশান থেকে একটু দূরে দাঁড়িয়ে একটা জ্বলন্ত চিতার দিকে চেয়ে আছি, সহসা নজরে পড়ল শতছিন্ন মলিন কাপড় পরা একটি রমণী, দেখলে পাগলী ব'লেই মনে হয়, হেঁট হয়ে পুরোনো চিতার ছাইয়ের মধ্যে থেকে কি যেন খুঁজছে—

এক মুহূর্ত মাত্র! কিন্তু দৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গেই মনের মধ্যে অকারণে যেন একটা দোলা লাগল, মনে হ'ল বিস্মৃতিলোকের কোন্ একটি মানুষের সঙ্গে এর কিছু সাদৃশ্য আছে। তার পরই চিনতে পারলুম। মাথার চুল ধুলোয় বালিতে জট্ পাকিয়ে গেছে, গায়ের রং রোদে ও ময়লায় কালো কিন্তু তবুও কি তাকে চিনতে বিলম্ব হয়? এ যে গৌরী! আমার আশা-নিরাশার ধন!

কয়েক মুহূর্ত কী জন্য যে চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইলুম, কি যে ভাবলুম তা মনে নেই—পরক্ষণেই ছুটে কাছে গিয়ে ডাকলুম, 'গৌরী, এ কি করছ? এ কি বেশ!'

সে চমকে মুখ তুলে চাইল, কিন্তু দৃষ্টির বিহ্বলতা দেখে বুঝলুম যে সে আমাকে চিনতে পারে নি! খুব সম্ভব আর পারবেও না।

আমি বললুম, 'গৌরী, আমাকে চিনতে পারছ না? আমি!'

সে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে শান্ত ভাবেই বললে, 'না।'

তারপর আবার হেঁট হ'ল।

আমি তার হাতটা ধরে ফেলে বললুম, 'কি খুঁজছ গৌরী?'

সে মাথা না তুলেই জবাব দিলে, 'তার অস্থি!...শুনেছি সে আত্মহত্যা করেছে, শুনেছি তাকে এইখানে পোড়ানো হয়েছে, কিন্তু অস্থি কিছুতেই খুঁজে পাচ্ছি না। অনেক দিন ধরে খুঁজছি।'

সমস্ত বুক আমার বেদনার মুগুরে যেন গুঁড়িয়ে যাচ্ছিল। তবু আমি জোর ক'রে তার হাত দুটো ধরে তাকে তুলে জিজ্ঞাসা করলুম, 'কার অস্থি খুঁজছ গৌরী, কার কথা বলছ?'

সে নির্বিকার কণ্ঠে জবাব দিলে, 'ওঁর কথা, আমার স্বামীর কথা বলছি। ওঁর অস্থি না পেলে যে আমার বিশ্বাস হচ্ছে না। নিশ্চিন্ত না হয়ে আমি কি

ক'রে তার কাছে যাব ?'

'কার কাছে যাবে গৌরী, কে সে ?'

সে যেন অসহিষ্ণু হয়ে বললে, 'জান না ? সোমেশের কাছে যাব। উনি বলেছিলেন যে "আমার জীবন থাকতে আর তার দেখা পাবে না"—তাই খুঁজছি আমি তাঁর অস্থি। আমি আর যে অপেক্ষা করতে পারছি না। আমাকে যেতেই হবে।'

অর্তকণ্ঠে বললুম, 'গৌরী, আমাকে তবু চিনতে পারলে না ? আমিই যে সোমেশ। তুমি ভাল ক'রে চাও, আমার দিকে তাকিয়ে দেখ—আমি তোমাকে এতকাল পরে খুঁজে পেয়েছি !'

সে যেন নিমেষের জন্য ব্যাকুল হয়ে চাইলে আমার দিকে, তার পরেই মাথা নেড়ে দৃঢ়কণ্ঠে বললে, 'না তুমি সোমেশ নও, আমাকে ঠকাচ্ছ ! উনি বুঝি পাঠিয়েছেন তোমাকে, আমায় ধরে নিয়ে যাবার জন্যে ? কিন্তু আর আমি কিছুতেই যাব না—

তার পর আমি কোন রকম বাধা দেবার আগেই সে বিদ্যুৎগতিতে ছুটে পালিয়ে গেল। উর্ধ্বশ্বাসে দৌড়ে মুহূর্ত মধ্যেই কোন গলির ফাঁকে অদৃশ্য হয়ে গেল।

শ্মশানের একটি মুদ্দফরাস হেসে বললে, 'বাবু কি পাগলীকে চিনতেন ?'

আমি বললুম, 'হ্যাঁ। ওকে চেন তুমি ?'

সে বললে, 'ও তো প্রায়ই এখানে আসে। এসে ঐ ছাই আর কয়লা ঘেঁটে বেড়ায়। ও কি আপনার কেউ হয় বাবু ?'

আমি তার কথার জবাব না দিয়েই জলের ধারে এসে দাঁড়ালুম। ওপারে গঙ্গার চড়ায় অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছে, তারই কালিমা পৃথিবীর বুক থেকে যেন শেষ আলোটুকুও কেড়ে নিতে চায়।

সেই দিনই রাত্রের ট্রেনে কাশী ত্যাগ করলুম।

কৃতকর্ম

তাকে আপনারাও দেখেছেন নিশ্চয়, অবশ্য যদি কলকাতায় চৌরঙ্গী অঞ্চলে আপনাদের যাতায়াত থাকে। ঐ এলাকাতেই ঘোরে বেশীর ভাগ।

দীর্ঘ শ্যামবর্ণ মানুষটা, জীর্ণ রং-চটা মিলিটারী পোশাক পরনে—দুই পকেটে টফি আর লজেন্স বোঝাই করে নিয়ে বেড়ায়। ছোট ছোট ছেলে দেখলেই তার কাছে যায়। অবাঙ্গালীদের বলে, 'টফী খায়গা? টফী? চকোলেট?' বাঙালীদের বলে 'অ খোকা লজেঞ্জস্ খাবে? ভাল লজেঞ্জস্, টফীও আছে—কী খাবে বল?'

শুধু ছেলেদেরই বলে। মেয়েদের না। মেয়েদের দিকে তাকায় না পর্যন্ত।

অধিকাংশ ছেলেরাই ভয় পায়। সঙ্গের লোকজন আরও বেশি। যারা চেনে বা নিত্য দেখে তারা আর ভয় পায় না—হাত পাতে। দু হাত বোঝাই ক'রে তাদের দেয় সে সেই টফী আর লজেঞ্জস্।

এই ওর কাজ। দুপুর থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত এই ভাবে ঘুরে বেড়াবে সে। পকেটের মাল শেষ হ'লে গিয়ে ঢুকবে কোন 'বার'-এ। বেশি নয়—দু পেগ মদ খাবে। তারপর গিয়ে বসবে ময়দানে কোথাও—যতক্ষণ না পাহারাওয়ালা এসে তুলে দেবে। তখন স্খলিত পদে কোন বিলিতী সুরে শীস দিতে দিতে ফিরে যাবে ইলিয়ট রোডের এক জরাজীর্ণ বাড়ির একতলার একখানা ঘরে—এইটেই ওর বর্তমান বাসা। ওর আশা আছে এইখান থেকেই একেবারে সে চলে যেতে পারবে অপার্থিব কোন আশ্রয়ে—এমন জায়গায়, যেখানে আর জীবন ধারণের সমস্যা নিয়ে মাথা ঘামাতে হবে না কোনদিন।

অসময়ে চাকরি ছেড়েছে বলে পেনসন পায় যৎসামান্যই। সে টাকা ওর মদ খেতে এবং টফী-লজেঞ্জস্ বিলোতেই শেষ হয়ে যায়। এই ঘরের ভাড়া এবং সকালের চা ও ব্রেকফাস্টের খরচ যোগায় ওর বোন। পাছে উপবাস ক'রে মরে এই ভয়ে ঐ বাড়ির মালিক র‍্যাংলো ইণ্ডিয়ান মহিলাটির সঙ্গে বন্দোবস্ত করেছে সে—টাকা একেবারে তাঁর কাছেই দিয়ে যায়। ঘরের ভাড়া, চা ও ব্রেকফাস্ট বাবদ মাত্র পঁচাত্তরটি টাকা নেন তিনি। সম্ভবত ওর অবস্থা দেখেই

দয়া হয়েছে তাঁর—তাই যেটুকু খরচ পড়ে তার বেশি নেন না। বোন আরও দিতে পারত কিন্তু রাত্রের খাওয়া পড়েই থাকে, কোনদিনই খায় না—বা খাবার মতো জ্ঞান থাকে না বলে বাড়িওয়ালা ভদ্রমহিলাই সে ব্যবস্থা রদ করেছেন। বলেছেন, 'সকালেই আমি বেশি ক'রে খাইয়ে দেব এখন—তুমি ভেবো না। দৈনিক একটা স্কোয়ার মীল খেলেও মানুষ বেঁচে থাকে—সুতরাং মরবার ভয় ওর নেই। মিছিমিছি কেন আরও চল্লিশ টাকা জলে ফেলবে তুমি?'

অনিল রায়। অন্তত বাপ-মা নাম রেখেছিলেন তাই।

সেটাকে ও নিজে ক'রে নিয়েছিল ও'নিল রয়।

ওর মাতামহ ছিলেন জজ—সিভিল জজ। কখনও বিলাত যান নি কিন্তু বিলিতি মানুষ ও বিলিতি জীবনের ওপর তাঁর ছিল অচলা ভক্তি। ও'নিল ছেলেবেলায় সেই মাতামহের কাছেই মানুষ হয়েছিল—তাঁর কাছ থেকে পেয়েছিল সেই ভক্তি—পেয়েছিল সাহেবিয়ানার প্রতি ঘোরতর আসক্তি।

দাদামশাইয়ের প্ররোচনা ও উদ্যমেই সে বিলেত গিয়েছিল। সেখানকার মিলিটারী কলেজ থেকে পাস করে একেবারে অফিসার হয়ে ফিরল। সাহেবি-আনার যেটুকু বাকী ছিল—সেটুকুও হয়ে গেল এই ক'বছরে। মনেপ্রাণে ইংরেজ সে—শুধু দেহে হ'তে পারে নি এই ছিল ওর আপসোস। তাতে বাদী হয়েছিল গায়ের চামড়াটা, যদিচ রংটা বাদ দিলে ওর চেহারাটা ছিল সত্যিই দেখবার মতো। পুরো ছ ফুট উঁচু—বিয়াল্লিশ ইঞ্চি বুকের ছাতি। লম্বা চওড়া দশাসই পুরুষ যাকে বলে।

ও যখন অফিসার হয়ে ফিরল তখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মুখ। সুতরাং এখানে থাকা হ'ল না বেশিদিন—শিগগিরই বাইরে যাবার হুকুম হ'ল। কিন্তু তার আগেই ওর মা একটি বিয়ে দিয়ে দিলেন।

বি. এ. পাস সুন্দরী মেয়ে—গান-বাজনা জানে। ভালই লাগল ও'নিলের, শুধু যথেষ্ট মেমসাহেব নয়, এই হ'ল ওর আপত্তি। বিদেশ যাত্রার আগে ব্যবস্থা ক'রে গেল, সে এক মেমসাহেবের কাছে ইংরেজী বলতে কইতে শিখবে ও বিলিতি নাচের স্কুলে নাচ শিখবে।

এরপর চার বছর বলতে গেলে সে পৃথিবীর ঘাটে ঘাটে ভেসে বেড়াল। নানা দেশ, নানা মানুষ,—তার ফলে যেটুকু ভারতীয় ওর মধ্যে ছিল তাও মরে

গেল। পাকাপাকি সাহেবী জীবন-যাত্রায় অভ্যস্ত হয়ে গেল সে, নিয়মিত মদ খাওয়া, নিয়মিত নাইট ক্লাবে হৈ-হল্লা করা—কোথাও কোন ত্রুটি রইল না।

যুদ্ধের শেষে সাত ঘাটের জল খেয়ে আবার যখন দেশে ফিরল ও'নিল, তখন আর আগের মতো আত্মীয়দের সঙ্গে এক বাড়িতে থাকা সম্ভব নয়। মাকে সে স্পষ্টই জানিয়ে দিলে—সে তার জীবন তার মতোই কাটাতে চায়—এবং মা কি ভাইবোনদের সঙ্গে এক বাড়িতে থাকলে তা হতে পারবে না। অতএব সে ও তার স্ত্রীর অতঃপর থেকে পৃথকই থাকবে।

অবশ্য তখনই অতবড় একটা আঘাত না দিলেও চলত তার। কারণ কলকাতার বাইরে বাইরেই থাকতে হ'ল তাকে বেশ কয়েক বছর। ভুসোয়াল, পুণা, বাঙ্গালোর, আগ্রা, মীরাট ইত্যাদি—। যে জীবন সে চাইছিল সেই জীবনই পেল সে। অপর অফিসারদের সঙ্গে মেলামেশা, অফিসার্স ক্লাবে মদ খাওয়া ও তাসখেলা এবং মধ্যে মধ্যে সাহেব বন্ধুদের বাড়ি নাচের মজলিসে যোগ দেওয়া।

কোন মিলিটারী অফিসারই—যাঁরা অবশ্য একটু ভদ্রভাবে থাকতে চান—তাঁদের নিজের মাইনেতে চলে না। ও'নিলেরও চলত না—যদি না তার বিবেচক দাদামশাই মরবার সময় কিঞ্চিৎ টাকা তাকে দিয়ে যেতেন। বেশি কিছু না হ'লেও—সামান্য সামান্য ভেঙে খাবার পক্ষে ঢের।

এইভাবে কাটল পুরো দশটি বছর। তারপর তদ্বির তদারক ক'রে যখন কলকাতায় বদলি হয়ে এল ও'নিল—তখন ওর মা মারা গেছেন, ভাই দিল্লীতে বসেছে স্থায়ীভাবে—কলকাতার বাসার আর চিহ্নমাত্র নেই। থাকার মধ্যে আছে ওর একটি বোন—সেও বিবাহিতা—সুতরাং আত্মীয়দের সঙ্গে থাকবার কোন প্রশ্নই উঠল না।

তাই বলে ফোর্ট উইলিয়ামেও থাকল না সে। আর একটু তদ্বির ক'রে বাইরে বাসা করবার অনুমতি আদায় করল এবং চৌরঙ্গী অঞ্চলে খাস সাহেবদের মধ্যে একটা ফ্ল্যাট ভাড়া করল। এতদিনে বহু দিনের সাধ মিটল তার।

ঠিক এই সময়ই সহসা একদিন দেখা হয়ে গেল মিটফোর্ডের সঙ্গে।

'মিটফোর্ড আমেরিকান—ইটালীর যুদ্ধক্ষেত্রে আলাপ হয়েছিল তার সঙ্গে। সে আলাপ বন্ধুত্বে পরিণত হতে দেরি হয় নি। অবশ্য তখন কেউই ভাবে নি যে আবার তুজনে দেখা হবে। ও'নিলের চিঠিপত্র লেখার বিশেষ অভ্যাস ছিল না বলে যোগাযোগও ছিল না। হঠাৎ কলকাতার রাস্তায় দেখা হয়ে যেতে তুই বন্ধুই খুব আনন্দিত হ'ল। ও'নিল তাকে টেনে নিয়ে এল নিজের ফ্ল্যাটে—স্ত্রী রীতার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলে এবং ডিনার খাইয়ে তবে ছাড়ল।

এরপর থেকে মিটফোর্ডের সঙ্গে বন্ধুত্বটা যেন আরও গাঢ় হয়ে উঠল। মিটফোর্ড এসেছে এখানে যুক্তরাষ্ট্রের চাকরি নিয়ে—মার্কিন পররাষ্ট্র বিভাগের যে সব বিশেষ প্রচার ব্যবস্থা হয়েছে—তারই একজন প্রধান কর্মকর্তা হিসেবে। কলকাতায় সে নতুন—বন্ধুবান্ধব বা পরিচিতদের সংখ্যা তার এখানে খুবই কম। সেও ও'নিলকে পেয়ে যেন বেঁচে গেল। ওকে সে সত্যিই পছন্দ করত। প্রথম প্রথম তার এই সাহেবী জীবনের অন্ধ অনুকরণ করার প্রয়াস দেখে হাসত মিটফোর্ড। বলত, 'ইংরেজদের তাড়াতে চাইছ তোমাদের দেশ থেকে—অথচ এমন ক'রে তাদের নকল করছ—লজ্জা ক'রে না তোমার?'

ও'নিল হেসে জবাব দিত, 'তাদের তাড়াতে চাইছি তারা আমাদের মাথার ওপর মনিব হয়ে বসে থাকতে চায় বলে। জাতি হিসাবে তাদের ওপর আমাদের বিতৃষ্ণা, কেন না তারা বিদেশী এবং শোষক। ব্যক্তিগতভাবে কোন রাগ নেই আমাদের। ইংরেজদের বহু এমন গুণ আছে যাকে আমাদের নেতারাও শ্রদ্ধার চোখে দেখেন, অনুকরণ করতে চেষ্টা করেন।'

এর পরও তু-একবার মিটফোর্ড বোঝাতে চেষ্টা করেছে তাকে যে—যার যার জাতীয় বৈশিষ্ট্যই বজায় রাখা উচিত, এমন ক'রে মনে প্রাণে বিদেশী সাজার কোন অর্থ হয় না। কিন্তু ও'নিল হেসে উড়িয়ে দিয়েছে সে কথা। বলেছে, 'ভাই দেহে তো কোনদিনই সাহেব হ'তে পারব না—মনেপ্রাণে যদি একটু হই তো ক্ষতি কি!'

কিন্তু সে মতভেদ নিতান্তই তুচ্ছ। তাতে বন্ধু হ'তে আটকায় নি কারুরই। এখানেও আটকাল না। বরং এই নির্বান্ধব দেশে ও'নিলকে পেয়ে বেঁচে গেল মিটফোর্ড। তার একটা আড্ডা দেবার জায়গা হ'ল। প্রথম প্রথম শুধু শনি রবিবারে আসত সে, তারপর মধ্যে আরও একটা দিন হ'ল—তারপরে প্রায়

প্রত্যহই সন্ধ্যায় এসে আড্ডা জমাত। কোন কোনদিন সে-ই ওদের নিয়ে যেত বাইরে কোথাও ডিনার খাওয়াতে। আবার কোন কোনদিন এদের এখানেই ডিনার খেয়ে ফিরত সে। একটা অসুবিধা এই যে ও'নিল যেমন বাঙালী খাবার একদম পছন্দ করত না—মিটফোর্ডের আবার তেমনি তাতেই প্রবল আসক্তি। অবশ্য রীতা বাঙালী রান্না ভোলে নি, সে নিজেই মিটফোর্ডের জন্য দু' একটা খাবার তৈরী ক'রে রাখত।

ক্রমে এমন হ'ল যে ও'নিল বাড়ি থাকে না—মিটফোর্ড এসে শুধুই রীতা আর তার ছেলে দুটোর সঙ্গে আড্ডা দিয়ে চলে যায়। ও'নিলের দুই ছেলেই 'আঙ্ক্‌ল ববি'র খুব ভক্ত হয়ে উঠল—ঐ নামেই তাকে ডাকতে শিখিয়েছে মিটফোর্ড—কারণ আঙ্ক্‌ল ববির মতো এত রকমের উদ্ভট উদ্ভট খেলা কেউ জানে না। পাপা তো নয়ই—মামিও নয়। আর এত খেলনা, ছবির বইও কেউ আনে না তাদের জন্য। পাপা শুধু নিয়ে আসে দু পকেট বোঝাই ক'রে চকোলেট টফী আর লজেঞ্জস্‌ কিন্তু শুধু খাওয়াতে তাদের মন ওঠে না।

রীতাকে খুব ভাল লেগেছিল মিটফোর্ডের। তার শান্ত স্বভাব ও মধুর প্রকৃতির জন্য রীতিমতো শ্রদ্ধাই করত সে। সুতরাং স্বামী তো বটে—স্ত্রীও ওর অন্তরঙ্গ বন্ধু হয়ে উঠল। রীতা ও'নিলের মতো অত হৈ হল্লা ঘোরাঘুরি পছন্দ করত না, কিন্তু ও'নিলের ওটা হয়ে গেছে জীবনের অঙ্গ। ক্লাবে যাওয়া তার চাই-ই। নাচগান হল্লা—এগুলোও। প্রথম প্রথম অতিথিকে ফেলে যেতে একটু বিবেকে বাধত তার—কিন্তু পরে যখন লক্ষ্য করল যে 'ববি' তার স্ত্রী ও ছেলে-মেয়েদের সঙ্গে গল্প ক'রেই বেশ সুখে থাকে তখন এক-আধদিন সরে পড়তে লাগল। আর একটু সয়ে যেতে অনুপস্থিতির মাত্রাটা বাড়িয়ে দিলে সে—শেষে এমন হ'ল যে যদি বা ডিনারের সময়টা পর্যন্ত কোনমতে থাকত ও'নিল, ডিনারের পর্ব শেষ হ'লেই সরে পড়ত কোন-না-কোন ছুতোয়। রীতা আপত্তি করলে বলত, 'তোমাকে তো গল্প করবার লোক দিয়ে গেলুম বাপু, আর কেন আমাকে আটকাও? ববি তো তাস খেলার রসে বঞ্চিত, আমার ওসব একটু না হ'লে চলে না।'

যেদিন মিটফোর্ড ওদের কোন হোটেলে নিয়ে যেত ডিনার খাওয়াতে। সেদিনও ডিনারের শেষে স্ত্রী-পুত্রদের ওর ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে সে ক্লাবে

চলে যেত।

এইভাবে মাস ছয়েক কাটবার পর রীতা হঠাৎ বড় গোলযোগ শুরু করল।

'তোমার মতলবটা কি বল দেখি ?'

'মতলব ? কিসের মতলব ?' একেবারে আকাশ থেকে পড়ল ও'নিল।

'এ যেন মনে হচ্ছে তুমি আমাকে হস্তান্তরিত করতে পারলে বাঁচ।'

'তার মানে ?'

'তার মানে খুবই সোজা। এভাবে একজন পুরুষ বন্ধুকে এন্টারটেন করবার জন্য আমাকে একা রেখে তুমি যে এইভাবে নিয়মিত সরে পড় এর মানেটা কি ?'

'আমার বন্ধু বলছ কেন—এখন তো তোমারও বন্ধু।'

'পুরুষের সঙ্গে মেয়েদের বিশুদ্ধ বন্ধুত্ব বেশিদিন থাকে না।'

'সিলি! এটুকু বিশ্বাস তোমার ওপর আমার আছে।'

'কিন্তু যদি আমার না থাকে ?'

'তাহলে এই বুঝব যে তোমাকে আমি তোমার থেকে বেশি চিনি।'

হেসে ওঠে সে জোরে জোরে।

রীতার মুখের মেঘ কিন্তু কাটে না।

সে বলে, 'আমি কিন্তু তোমাকে ওয়ার্নিং দিলুম—এর পর অপ্রীতিকর যদি কিছু ঘটে আমাকে দোষ দিও না!'

'ননসেন্স! অপ্রীতিকর ঘটবেই বা কেন! ববি তেমন লোক নয়—ওকে আমি চিনি—খাঁটি ভদ্রলোক!'

'আমি কিন্তু ওকে অত খাঁটি বলে মানতে রাজি নই। তোমাকে স্পষ্টই বলছি, কিছুদিন থেকেই ওর ভাবভঙ্গি আমার মোটেই ভাল লাগছে না।'

'না না—তুমি ওকে অবিচার করছ রীতা। ওরা তেমন লোক নয়। কোন ভারতীয় বন্ধু হ'লে তবু আমি একটু দ্বিধা করতুম—এরা অন্য জাতের মানুষ। মেয়েদের সঙ্গে অন্তরঙ্গ বন্ধুত্ব ওদের গড়ে ওঠে অনায়াসে—প্রণয় বস্তুটি বাদ দিয়েও।'

রীতা বিরক্তিতে ঠোঁট কামড়ায় শুধু।

আরও মাস দুই পরে রীতা আর একবার কথাটা তুলল। বলল, 'আচ্ছা স্ত্রী-পুত্র সংসার—এর চেয়েও কি তোমার ক্লাব বড় ?'

'বাই নো মীন্স—কে বলেছে তোমাকে ?'

'তবে তুমি প্রত্যহ আমাদের ফেলে অমন করে ছোট কেন ? একদিনও কি থাকতে পার না ?'

'না না—তা পারব না কেন ? নিশ্চয়ই থাকব। কোন দরকার হয় না বলেই—'

'সব দরকার সবাই দেখতে পায় না। কিন্তু দরকার না হ'লেও কি মানুষ স্ত্রীকে একটু সাহচর্য দেয় না। আমার কি ইচ্ছা করে না তোমার সঙ্গে একটু গল্প করি বসে ?'

'কিন্তু আসল কথাটা কি বল দিকি ? এখনও বুঝি সেই পুরনো সংস্কারের ভূতটা নামে নি ঘাড় থেকে ?'

'প্লীজ ও'নিল, প্লীজ ! আমি বড় লোনলি ফীল করি। তুমি কিছুদিন থাকো আমার কাছে :'

'আচ্ছা আচ্ছা, তাই হবে।' কাঁধ চাপড়ে চুমো খেয়ে স্ত্রীকে ঠাণ্ডা করল সে তখনকার মতো।

এর পর দিন পনেরো সত্যিই সে রাত্রে কোথাও গেল না। ববি দেখেশুনে একদিন ঠাট্টা করে বলল, 'কী ব্যাপার রয়, হঠাৎ গৃহবাসী হয়ে উঠলে যে ?'

'একটু মুখ বদলাতে ইচ্ছে হ'ল আর কি !' হেসে বলল ও'নিল, 'তাছাড়া গিন্নীর হুকুম, ক্লাবে যাওয়া আমার চলবে না আর।'

'তাই নাকি ?' কেমন একরকম অদ্ভুত দৃষ্টিতে রীতার দিকে চাইল মিটফোর্ড।

'হঠাৎ নতুন ক'রে স্বামীর সঙ্গে প্রেমে পড়লে নাকি ?'

'তুমি জান না ববি, আমরা হিন্দুর মেয়ে—স্বামী আমাদের নিত্য প্রেমিক, ও কখনও পুরনো হয় না।'

'হুঁ। তা বটে।'

ববি ওদের দিক থেকে ফিরে ছেলেদের দিকে মন দিল।...

ও'নিল কিন্তু পনেরো-ষোল দিনেই যেন হাঁফিয়ে উঠল।

এরই মধ্যে একদিন কী একটা ছুতো ক'রে বেরিয়ে পড়ল। তারপর আবার দু-তিন দিন কোনমতে বাড়িতে রইল যদিবা—আর পারল না। একটু সয়ে এসেছে দেখে ফের সেই ক্লাব-নাইট-ক্লাব-নাচের আড্ডায় বাসা বাঁধল।

আড়ালে একদিন মিটফোর্ডের কাছে চোখ মটকে বলল, 'রীতা মাঝে মাঝে অকারণেই ভয় পায়—কুসংস্কারের ভূতে পেয়ে বসে ওকে। তাই দিনকতক ওকে হিউমার করা আর কি! আর কদিন থাকব—পেট ফুলবে যে। সন্ধ্যে রাত্তিরে বসে বসে মেয়েছেলের সঙ্গে গল্প করা ও তোমারই পোষায় বন্ধু!'

মিটফোর্ড হেসেছিল একটু।

কিন্তু রীতা আর কোন অনুযোগ করল না স্বামীর কাছে—কোন অনুরোধও না।

ও'নিল যদি একেবারে বেহুঁশ না হ'ত তো লক্ষ্য করত যে বড় বেশি নিস্তব্ধ হয়ে গেছে সে—বড় বেশি চুপচাপ।

তার পরই, বোধ হয় বিগত পর্বের মাস দুই পরে একদিন, বিধাতা রূঢ় আঘাত হেনে হুঁশ করিয়ে দিলেন।

সেদিন বিকেলে বাড়ি ফিরে ও'নিল দেখল ফ্ল্যাটটা বড়ই খালি খালি।—রীতা এবং দুই ছেলে সকলেই কোথায় গেছে।

একটু বিস্মিত হ'ল সে। সাধারণতঃ এ সময় রীতা কোথাও যায় না।

আয়াটাকেও দেখা যাচ্ছে না, থাকার মধ্যে আছে শুধু বাবুর্চি তৈফুর।

তৈফুরকে ডেকে জিজ্ঞাসা করল, 'মেম সাব কাঁহা গিয়া তৈফুর?'

সে দু হাতের এক বিচিত্র ভঙ্গী করে বলল, 'কেয়া মালুম সাব! উও সাহাব আয়াথা দুপহরমে—উ আঙ্কল সাহাব—উনহি কা সাথ মেম সাব চলি গয়ী। আউর বাচ্চা লোক ভি। বাকস্ উকস্ লেকে।'

'বাকস্ উকস্ লেকে?'

চমকে লাফিয়ে ওঠে ও'নিল—যেন ইলেকট্রিক শক খায় একটা।

চারদিকে তাকিয়ে দেখে একবার ভাল ক'রে।

রীতার নতুন তিনটে স্যুটকেসই নেই। তার মধ্যে দুটো তো গত মাসেই কিনেছে।

পাগলের মতো গিয়ে স্ত্রীর আলমারিটা খুলে ফেলল। সব খালি। শুধু দু-একখানা পুরনো রংচটা কাপড় পড়ে আছে, আর ছেঁড়া জামা।

ছেলেদের পোশাকের দেরাজটার টানাগুলো টেনে নামিয়ে ফেলল মেঝেতে। সেখানেও সেই একই ইতিহাস। তবু বিশ্বাস হয় না কথাটা।

ঝগড়া ক'রে চলে গেছে ? রাগ ক'রে গেছে ?

কই ঝগড়া তো হয় নি। বহুকালের মধ্যে কোন রাগারাগি হয় নি ওদের।

তখনই ছোটে নিচে। জুতো খুলে স্লিপারে পা গলিয়েছিল কিনা তাও মনে পড়ে না।

একটা ট্যাক্সি নিয়ে যায় মিটফোর্ডের অফিসে। ওকে একবার জানানো দরকার। একজনের চেয়ে দুজনে খোঁজা অনেক ভাল। কিন্তু সেখানে আরও বিস্ময় অপেক্ষা করছিল ওর জন্য—আরও আঘাত।

মিটফোর্ড অফিসে নেই। সে স্বদেশেই অন্য কাজ পেয়েছে, ভাল চাকরি। হপ্তা তিনেক আগেই এখান থেকে ছাড়া পেয়ে গেছে সে। শুধু পাসপোর্ট প্যাসেজ—এই জন্যেই কয়েকদিন দেরি হয়ে গেল। যতদূর তারা জানে আজই বিকেলের প্লেনে রওনা হয়ে গেছে সে। সে প্লেন সোজা করাচী যাবে, সেখান থেকে রোম, ফ্রাঙ্কফোর্ট, লণ্ডন হয়ে নিউইয়র্ক পৌঁছুবে।

অর্থাৎ ভারতের মাটিতে আর নামবে না কোথাও।

'কিন্তু—'কৌতূহলী স্মিথ জিজ্ঞাসা করে, 'এতবড় খবরটা তুমি জান না রয়? তুমি ওর বেস্ট ফ্রেণ্ড! আশ্চর্য!'

কী একটা জবাব দেয় ও'নিল তা সে নিজেও জানে না।

পা আর চলতে চায় না, তবু স্খলিত পদে একবার শ্বশুরবাড়ির দিকেও যায় সে।

শ্বশুর নেই। বড় সম্বন্ধী আছে। সে তিক্তস্বরে বললে, 'এমনি একটা যে কিছু হবে তা আমরা জানতুম। শুধু তুমিই অন্ধ বলে কিছু দেখতে পাও নি। ...তা দুঃখ কি ? তোমার জীবনের সবচেয়ে যা শ্রেষ্ঠ অর্ঘ্য তাইতো নিয়েছেন তোমার সাদা চামড়ার দেবতা। তোমার জীবন তো ধন্য হয়ে গেছে।'

আর শুনতে পারে না ও'নিল।

বিশ্বাসও যেন হতে চায় না তবুও।

ছোটে দমদমে। প্যাসেঞ্জারদের তালিকা দেখে। হ্যাঁ—মিটফোর্ড আর তার স্ত্রী সেই প্লেনেই গেছে বটে! সঙ্গে দুটি বাচ্চা—ইউজিন রয়, লাভলি রয়। ও'নিলেরই দেওয়া আদরের নাম।

তারপর?

তারপর যে কী তা ও'নিলের ভাল মনে নেই। ভাবেও না কিছু। কী ক'রে যে মাস ছয়েকের মধ্যে এই অবস্থায় এসে পৌঁছল তা বোধ করি কেউই জানে না। বন্ধুরা না থাকলে বিনা ছুটিতে অবিরাম কামাই করার জন্য বরখাস্তই হ'ত চাকরি থেকে—কোনমতে সামান্য পেনসন বরাদ্দ হয়ে অব্যাহতি পেল। সে ফ্ল্যাট, সে জিনিসপত্র সব ফেলে এসেছিল সে সেইদিনই; ছোট বোন এই আশ্রয়টুকুর ব্যবস্থা না করলে বোধ হয় ওর পাগলা গারদে যাওয়া ছাড়া উপায় থাকত না—কিম্বা কোন ভ্যাগ্রান্ট হোমে।

দেখেছেন তাকে আপনারাও। অবশ্য যদি কলকাতায় চৌরঙ্গী অঞ্চলে যাতায়াত থাকে। ঐ এলাকাতেই ঘোরে সে বেশির ভাগ। পকেটে থাকে চকোলেট, টফী আর লজেঞ্জস্‌। ছোট ছেলে দেখলেই কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করে, 'লজেঞ্জুস খাবে খোকা?' কিম্বা 'টফী খায়গা?' শুধু ছেলেদেরই জিজ্ঞাসা করে। মেয়েদের নয়। মেয়েদের দিকে তাকায় না পর্যন্ত।

আত্মহত্যা

শকুন্তলা প্রদীপটি জ্বালিয়া লইয়া ঘরে ঘরে সন্ধ্যা দিয়া বেড়াইতেছিল, সহসা সন্ধ্যা আসিয়া সংবাদ দিল, 'দিদি, অমলদা আসছে!'

মুহূর্তের জন্য শকুন্তলার মুখখানা লাল হইয়া উঠিয়াই একেবারে ছাইয়ের মতো বিবর্ণ হইয়া গেল। চৌকাঠের উপরই দাঁড়াইয়া পড়িয়া সে কহিল, 'সে কি রে?...ধ্যেৎ!'

'হ্যাঁ গো দিদি, সত্যি। ঐ গলির মোড় পেরোচ্ছে দেখে এলুম, তুমি জানলা দিয়ে ছাখো না, এতক্ষণে বোধহয় এসে পড়েছে—'

কিন্তু জানলা দিয়ে আর দেখিতে হইল না, প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই একটি অত্যন্ত সুপরিচিত কণ্ঠের ডাক শকুন্তলার কানে আসিয়া পৌঁছিল, 'আরে, এরা সব গেল কোথায়—ও সন্ধ্যা! বাড়ি ছেড়ে ভাগল নাকি?'

শকুন্তলা অকস্মাৎ যেন ব্যাকুল হইয়া উঠিল, একবার নিজের পরনের কাপড়টার দিকে আর একবার আসবাবগুলার দিকে চোখ বুলাইয়া লইয়া চাপা আকুল কণ্ঠে কহিল, 'সন্ধ্যা, লক্ষ্মী দিদি আমার, ওকে একটু ছাদে বসা, হঠাৎ যেন ঘরে আনিস নি—যা ভাই!'

এবং পরক্ষণেই প্রায় ছুটিয়া আর একটা ঘরে গিয়া ঢুকিল।

সন্ধ্যা কিন্তু তখনই নিচে নামিতে পারিল না, দিদির এই আকস্মিক ভাবান্তরের কোন কারণ খুঁজিয়া না পাইয়া কতকটা মূঢ়ের মতোই দাঁড়াইয়া রহিল। অমল তাহার বড়দিদির দেবর এবং এ বাড়ির সকলের প্রিয় অতিথি। বিশেষ করিয়া, সন্ধ্যা তাহার জ্ঞান হইবার পর হইতেই দেখিয়া আসিতেছে যে, এই প্রিয়দর্শন এবং প্রিয়ভাষী তরুণটিকে দেখিলে তাহার মেজদি একটু বেশিই খুশী হয়। তাহার জ্ঞান অবশ্য বেশিদিন হয়ও নাই—বছর দুই-তিন হইবে—কিন্তু তখন ছিল অমল কিশোর মাত্র, এখন সে যৌবনে পা দিয়াছে, যদিও তাহার মুখের মধ্য হইতে কৈশোরের কমনীয়তা এখনও বিদায় লয় নাই, দেখিলে কেমন একটা স্নেহের সঞ্চার হয় মনে মনে। সন্ধ্যাও 'অমলদা'কে ভালবাসিত; সুতরাং সে অনেক দিন পরে তাহাকে দেখিতে পাইয়া খুশী মনেই দিদিকে সংবাদটা দিতে আসিয়াছিল—হঠাৎ দিদির এই অদ্ভুত আচরণে অত্যন্ত দমিয়া গেল—কেমন যেন একটু অপ্রস্তুতভাবে সেইখানেই দাঁড়াইয়া রহিল। ততক্ষণে অমল উপরে উঠিয়া আসিয়াছে। আন্দাজে আন্দাজে ছাদটা পার হইয়া একেবারে দুয়ারের কাছে আসিয়া কহিল, 'এ কী রে, এখানে এমন চুপটি ক'রে দাঁড়িয়ে আছিস কেন? ভূত দেখেছিস নাকি? মাউইমা কৈ? আর তোর মেজদি—?'

সন্ধ্যা ঢোঁক গিলিয়া কহিল, 'মা গা-ধুতে গেছেন আর মেজদি সন্ধ্যে দিচ্ছে—আ—আপনি বসুন না অমলদা। চলুন, আমি মাদুর পেতে দিচ্ছি ছাদে—'

'ইস! ভারী যে খাতির করতে শিখেছিস দেখছি! যা যা, আর মাদুর

পাততে হবে না, আমি এখানেই বসছি।'

সন্ধ্যা কোন প্রকার বাধা দিবার পূর্বেই সে সেই প্রকাণ্ড ভাঙা তক্তো-পোশটায় অতিশয় মলিন শয্যার উপরেই বসিয়া পড়িল। কহিল, 'আমার জন্যে ব্যস্ত হ'তে হবে না, এখন তোমার মেজদিকে সংবাদ দাও, তিনি দয়া ক'রে আমাদের অন্ধকার থেকে আলোতে নিয়ে যান। তাঁকে বলো যে এ ঘরটাও তাঁর সন্ধ্যে দেওয়ার এলাকার মধ্যে পড়ে—'

কিন্তু ইহার পূর্বের একটা ইতিহাস আছে ; প্রায় সব গল্পেরই থাকে।

শকুন্তলার বাবা হরিপ্রসাদবাবুরা চার ভাই, তাহার মধ্যে হরিপ্রসাদ এবং তাঁহার মেজো ভাই জ্যোতিপ্রসাদ উপার্জন করিতেন, আর দু-ভাই দেশের বাড়িতেই বসিয়া খাইতেন। জমিজমা যাহা কিছু ছিল তাহাতে ভাতটা হইত, বাকী হরিপ্রসাদ জ্যোতিপ্রসাদের অনুগ্রহে চলিত। হরিপ্রসাদ কাজ করিতেন ভালই, প্রায় শ'খানেক টাকা মাহিনা পাইতেন। কিন্তু মানুষটি খুব শৌখীন ছিলেন বলিয়া সঞ্চয় প্রায় কিছুই করিয়া যাইতে পারেন নাই। কলিকাতায় বাসা ভাড়া দিয়া, এখানে মাসিক দশ টাকা হিসাবে পাঠাইয়া, ভাল মাছ এবং ল্যাংড়া আম খাইয়া, ছেলেমেয়েদের ভাল কাপড়-জামা পরাইয়া ও স্কুলের খরচ জোগাইয়া বরং প্রতি মাসে তাঁহার কিছু ঋণই হইত। ফলে বলা বাহুল্য যে, জ্যেষ্ঠা কন্যার বিবাহে যে ঋণ তিনি করিয়াছিলেন—তাহার কিছুই শোধ দিতে পারেন নাই। ভবিষ্যতে উন্নতির আশা ছিল, হয়ত বা সেই উন্নতির পথ চাহিয়াই নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়াছিলেন, ইহারই মধ্যে যে জীবনের অধ্যায়ে পূর্ণচ্ছেদ পড়িতে পারে তাহা তিনি ভাবেন নাই।

কিন্তু কার্যত তাহাই ঘটিল। হঠাৎ তিনদিনের জ্বরে যখন তিনি মারা গেলেন তখন শ্মশান-খরচার জন্যই অলঙ্কার বাঁধা দিতে হইল। অফিসে যে ঋণ ছিল তাহাতেই প্রভিডেন্ট ফাণ্ডের টাকা প্রায় নিঃশেষ হইয়া গেল। গৃহিণীর সামান্য অলঙ্কার জ্যেষ্ঠা কন্যার বিবাহেই গিয়াছিল, কন্যাদের কাহারও ও বস্তু ছিলই না—সুতরাং ঘটি-বাটি বেচিয়াই, বলিতে গেলে, স্বামীর শ্রাদ্ধ শেষ করিয়া ভদ্র-মহিলা দুই কন্যা ও এক শিশুপুত্রের হাত ধরিয়া দেশের বাড়িতে ফিরিয়া আসিলেন।

হরিপ্রসাদের ভাইয়েরা অকৃতজ্ঞ নন, তাঁহারা যথাসাধ্য যত্নের সহিতই ইঁহাদের গ্রহণ করিলেন বটে কিন্তু তাঁহাদের সাধ্য আর কতটুকু? জ্যোতিপ্রসাদ ভাইদের যা সাহায্য করিতেন, তাহার উপর আর পাঁচটি টাকা বাড়াইয়া দিলেন, তাহার বেশি আর তাঁহার সাধ্য ছিল না। কিন্তু তাহাকে চারিটি প্রাণীর ভরণপোষণ চলে না। শকুন্তলা সেকেণ্ড ক্লাসে পড়িতেছিল তাহার আর সন্ধ্যার পড়াশুনা তো বন্ধ হইলই, তাহাদের ছোট ভাই অভয়েরও লেখাপড়া শিখিবার কোন সম্ভাবনা রহিল না। শুধু উদরান্নের জন্যই শকুন্তলা ও তাহার মায়ের অনেকগুলি ভাল ভাল শাড়ি আবার দোকানে চলিয়া গেল। শকুন্তলার ভগ্নি-পতির অবস্থাও এমন কিছু সচ্ছল নয়, আর সেখানে হাত পাতাও তাঁহাদের আত্মসম্মানে বাধে।

এ আজ প্রায় মাস ছয়েকের কথা। ইহার মধ্যে জামাতা বিমল বার দুই ইঁহাদের খবর লইতে আসিলেও অমল আসিতে পারে নাই। তাহার পরীক্ষা ছিল সামনে, সেইজন্য সে কলিকাতাতেই থাকিত, দেশে আসিবার তাহার প্রয়োজন ছিল না। কলিকাতায় থাকিতে সে প্রায় নিয়মিতভাবেই ইহাদের বাড়িতে আসিত, শকুন্তলার সহিত তাহার একটা বেশ সখ্যের সম্বন্ধই দাঁড়াইয়া গিয়াছিল। শকুন্তলার পড়াশুনার আগ্রহ ছিল খুব বেশি, অমলের দ্বারা সেদিকে অনেকটা সাহায্য হইত, অমলেরও এই প্রিয়ভাষিণী বুদ্ধিমতী মেয়েটির সাহচর্য ভালই লাগিত—যদিচ রূপগৌরব শকুন্তলার বিশেষ ছিল না।

এ-হেন অমলকে আজ এতদিন পরে আসিতে দেখিয়া শকুন্তলা যে বিব্রত হইয়া পড়িল, তাহার কারণও ঐ দারিদ্র্য। অমল ছেলেটি শৌখীন, যেমন আর পাঁচজন কলেজের ছেলে হইয়া থাকে—সিল্কের পাঞ্জাবী-স্নো-পাউডার-হাত-ঘড়ির একটা পুতুল। বিশেষ করিয়া ইদানীং যখন সে শকুন্তলাদের বাড়িতে আসিত তখন তাহার প্রসাধনের পারিপাট্য আর একটু বৃদ্ধি পাইত। সেই অমলকে এই অপরিসীম দারিদ্র্যের মধ্যে কল্পনা করিয়া শকুন্তলা লজ্জায় যেন মরিয়া গেল। শুধু কি তাই, তাহার নিজের পরনে যে কাপড়টা আছে সেটাও বোধহয় পনেরো দিন সাবানের মুখ দেখে নাই—পয়সার অভাবে সোডা-সাজিমাটিও আনানো যায় নাই।

সে এপাশের ঘরে আসিয়া ব্যাকুলভাবে আলনার দিকে চাহিল। না, ভদ্র

কাপড় একখানাও নাই। হয়ত এখনও বাক্সটা খুঁজিলে একখানা ফরসা কাপড় বাহির হইতে পারে কিন্তু তাহার চাবিও মায়ের কাছে, তাছাড়া মাকে কৈফিয়ৎই বা কি দিবে? মা যদি হঠাৎ বলিয়া বসেন যে, 'অমল ঘরের ছেলে, ওকে দেখে ফরসা কাপড় পরবার কি দরকার হ'লো?' তখন কি বলিবে সে?…

অকস্মাৎ শকুন্তলার আপাদমস্তক ঘামিয়া উঠিল। এপাশে একটা ঈষৎ জীর্ণ নীলাম্বরী শাড়ি আলনার উপর কোঁচানো আছে বটে কিন্তু সেটাও কয়দিন ব্যবহারের পর তুলিয়া রাখার ফলে তেলে-ময়লায় দুর্গন্ধ ছাড়িয়াছে—অথচ যেটা সে পরিয়া আছে সেটা এতই ময়লা যে কোনমতে ঘরের লোকের কাছেও পরিয়া থাকা যায় না। নীলাম্বরীতে দুর্গন্ধ হইলেও ময়লা বোঝা যায় না, এই একটা সুবিধা—

পাশের ঘর হইতে আবার অমলের কণ্ঠস্বর শোনা গেল, 'ব্যাপার কি? তোমার মেজদি আর নরলোকের মুখদর্শন করবেন না নাকি? হলা সহি শউন্তলে, দীনজনকে দয়া করো—এ ঘরেও একটা আলো দাও!'

শকুন্তলার কানের কাছটা অকারণেই গরম হইয়া উঠিল। শকুন্তলা নামটা লইয়া অমল যতদিন, যতবারই ঠাট্টা করিয়াছে, ততবারই শকুন্তলা এমনি একটা উষ্ণতা অনুভব করিয়াছে—এবং কে জানে কেন, ততবারই তাহার মনে হইয়াছে যে অমল নিজেকে দুষ্মন্ত বলিয়া পরিহাসটা সম্পূর্ণ করিতে চায় কিন্তু পারে না, লজ্জায় বাধে—

সে প্রায় মরীয়া হইয়াই নীলাম্বরীটা টানিয়া লইল। কিন্তু না, এ বড়ই দুর্গন্ধ, বহু দূর হইতেও পাওয়া যাইবে!…অগত্যা সে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া আরক্ত মুখে লণ্ঠনটা লইয়া সেই অবস্থাতেই এ ঘরে পা দিল।

'আরে, আসুন, আসুন, দেবী শকুন্তলে! তবু ভাল যে অভাজনদের মনে পড়ল—'

কিন্তু এই চাপল্য এবং অমলের পারিপাট্যযুক্ত প্রসাধন এই আব্‌হাওয়ার মধ্যে এতই বেমানান ঠেকিল, অন্তত শকুন্তলার কাছে যে, সমস্ত ব্যাপারটা যেন চাবুকের মতো তাহাকে আঘাত করিল। জরাজীর্ণ প্রকাণ্ড ঘর, বোধহয় ত্রিশ বৎসরের মধ্যে তাহাতে চুনের কাজ পর্যন্ত হয় নাই—জানলা দরজার

অর্ধেক নাই—আর তাহার মধ্যে পায়াভাঙা বিরাট এক তক্তাপোশ কোনমতে সাজানো ইটের উপর দেহরক্ষা করিয়া ঘরের অর্ধেকটা জুড়িয়া আছে। তাহার উপর কয়েকটা কাঁথা ও তোশকের অতিশয় মলিন একটা শয্যা এবং তাহারও উপরে অসংখ্য ছারপোকার দাগে কলঙ্কিত একটা শত-ছিন্ন মশারী খানিকটা ঝুলিয়া আছে। ঘরের মেঝে খানিকটা সিমেন্ট ও খানিকটা খোয়াতে বিচিত্রিত। এ পাশে একটা ভাঙা র‍্যাকে শকুন্তলার পিতামহের আমলের খানকতক পুঁথি ও বই কীটদষ্ট ও ধূলিমলিন অবস্থায় স্তূপাকার করা, ওধারে বিভিন্ন তাকে কতকগুলা ডেয়ো-ঢাকনা, ভাঙ্গা ফুটা জিনিসের বিচিত্র সমাবেশ। সমস্তটা জড়াইয়া এমনই শ্রীহীন এবং লজ্জাকর যে নিমেষমাত্র সেদিকে চাহিয়া লজ্জায় অপমানে শকুন্তলার মুখটা প্রথমে আরক্ত পরে বিবর্ণ হইয়া গেল। সে কিছুতেই মুখ তুলিয়া অমলের দিকে চাহিতে পারিল না। ঘরে ঢুকিবার সময়েই একবার শুধু সিল্কের পাঞ্জাবি, সোনার বোতাম এবং রূপালী ঘড়ির একটা মিলিত দীপ্তি বিদ্যুৎ-ঝলকের মতো চোখের সম্মুখ দিয়া খেলিয়া গিয়াছিল কিন্তু মানুষটার দিকে সে চাহিতে পারে নাই। সে লণ্ঠনটা ঘরের মেঝেতে নামাইয়া রাখিয়া কোনমতে ঢোঁক গিলিয়া শুষ্ককণ্ঠে কহিল, 'অমলদা ভাল আছেন? বসুন, মাকে ডেকে দিচ্ছি—'

তাহার পরক্ষণেই, অমল কোন কথা বলিবার পূর্বেই সে দ্রুতপদে ঘর ছাড়িয়া বাহির হইয়া গেল। অমল অত্যন্ত বিস্মিত হইল। এই মেয়েটি বিশেষ করিয়া তাহার আগমনে খুশী হয়, খুশী কেন উজ্জ্বল হইয়া ওঠে, ইহাই সে জানিত, কিন্তু আজ এ কি হইল? সে যতটা সম্ভব পুরাতন দিনের কথা ভাবিয়া দেখিল, কই শকুন্তলার রাগ করিবার মতো তো কোন ঘটনা ঘটে নাই।...সে তাহার দাদার মুখে ইহাদের অবস্থার কথা সবই শুনিয়াছিল, সুতরাং দারিদ্র্যের এই শোচনীয় রূপ তাহাকে আঘাত করিলেও বিস্মিত করিতে পারে নাই, কাজেই এইটাই যে শকুন্তলার ভাবান্তরের কারণ হইতে পারে, সে কথাটা তাহার একবারও মনে হইল না।

শকুন্তলা নিচে নামিয়া আসিয়া কুয়াতলাতে গিয়াই মাকে সংবাদ দিল, 'মা, অমলদা এসেছেন।'

'কে এসেছেন? অমল? ও—আমাদের অমল! একজামিন দিয়ে দেশে

এসেছে বুঝি।…বসাগে যা তুই, আমার হয়ে গেছে আমি যাচ্ছি—। কতদিন দেখি নি ছেলেটাকে।'

শকুন্তলা তবুও দাঁড়াইয়া রহিল। মায়ের আর একটা দরকারী কথা মনে পড়িল, কহিলেন, 'ঘরে তো বিশেষ কিছু নেই। ছাখ্ দিকি, কৌটোটায় চারটি সুজি পড়ে আছে কিনা, তা হ'লে উনুনটা ধরিয়ে একটু সুজি ক'রে দে, আর এক পেয়ালা চা—। ভাগ্যিস খোকার তুধটা সাবুর সঙ্গে মিশিয়ে ফেলি নি—'

অকস্মাৎ শকুন্তলার কণ্ঠস্বর তীব্র হইয়া উঠিল, 'তুমি কি পাগল হ'লে মা? ঐ ঘি-হীন সুজি, আর ঐ জঘন্য চা—ও আর খাওয়াবার চেষ্টা ক'রো না! ওসব হাঙ্গামা ক'রে কাজ নেই।'

মা অবাক হইয়া কিছুক্ষণ মেয়ের মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া কহিলেন, 'পাগল আমি হয়েছি, না তুই হয়েছিস? অমল আমার পেটের ছেলের মতো, ওর কাছে আবার লজ্জা কি? আর ও না জানেই বা কি?…ওর কাছে আমার ঢাকবার তো দরকার নেই কিছু।…মেয়ের যত বয়স বাড়ছে তত যেন ন্যাকা হচ্ছেন। যাও, যা বলছি তাই করো গে—'

মায়ের মেজাজ শকুন্তলা জানিত, প্রতিবাদ তিনি একদম সহিতে পারেন না। অগত্যা রান্নাঘরে গিয়া উনানে আঁচ দিবার চেষ্টা করিতে হইল; কিন্তু তাহার যেন ইচ্ছা হইতেছিল ছুটিয়া কোথাও চলিয়া যায় কিংবা কুয়াতে ঝাঁপাইয়া পড়ে। তাহার মন, তাহার দেহ সব যেন কেমন স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছিল। আর কিছুরই বোধ ছিল না, শুধু অনুভূতি ছিল একটা তুর্নিবার

সে উনানে আগুন দিয়া বাহিরে আসিল না, ধোঁয়ার মধ্যেই বসিয়া রহিল। অমল বি. এ. পড়িতেছে, খুব সম্ভব পাসও করিবে, সে সুশ্রী, সচ্চরিত্র—সুতরাং তাহার বাবা যে বিবাহে রীতিমত অর্থ দাবী করিবেন তাহা সুনিশ্চিত। শকুন্তলার সহিত তাহার বিবাহের যে কোন সম্ভাবনা নাই তাহা শকুন্তলা নিজেই জানিত; শুধু রূপা নয়, অমলের বাবা ছোট ছেলের বিবাহে রূপও চান। সে কথা সে কখনও বোধহয় ভাবেও নাই, আশা করা তো দূরের কথা। তবু, তবু আজ কে জানে কেন, তাহার মনে হইতে লাগিল যে তাহার বুকের অনেকখানি যেন কে

দলিয়া পিষিয়া নির্মমভাবে নষ্ট করিয়া দিয়াছে। তীব্র একটা আশাভঙ্গের বেদনাতে তাহার চিত্ত যেন মূর্চ্ছাহত।

তবে কি, তবে কি মনের অজ্ঞাতসারে, মনেরই কোন্ সঙ্গোপনে সে আশার স্বপ্ন দেখিয়াছিল? কলিকাতায় যখন অমল নিয়মিত তাহাদের বাড়ি আসিত, সেই সব দিনের কথা মনে পড়িল। অমলের কাছে সে পড়া বলিয়া লইত, অমল সেই পাঠচর্চার সঙ্গে সঙ্গে চালাইত সাহিত্যচর্চা। প্রকাশ্যে, সকলকার সামনেই চলিত তাহাদের গল্প, ঘণ্টার পর ঘণ্টা। কই, কখনও তো প্রণয়ের আভাসমাত্র তাহাদের কথাবার্তায় প্রকাশ পায় নাই। দুই-একবার সে অমলের সঙ্গে বেড়াইতে গিয়াছে, একবার বোটানিক্যাল গার্ডেনে, আর একবার দক্ষিণেশ্বরে —কিন্তু তখনও তো কেহ রঙ্গীন হইয়া উঠিবার চেষ্টা করে নাই। অমল তাহাকে বলিত—বন্ধু, সেই বন্ধুত্বতেই তাহারা সুখী ছিল। তবে?

কিন্তু সেদিন কোথাও, কোন কল্পনাতে কি তাহার রঙ ধরে নাই?···

অকস্মাৎ তাহার কর্ণকপোল উত্তপ্ত করিয়া বাবার অসুখের পূর্বে শেষ নিভৃত দিনটির কথা তাহার মনে পড়িল। অনেক রাত্রে অমল বাড়ি ফিরিতেছিল, সে এক হাতে পান আর এক হাতে আলো লইয়া সদর দরজা পর্যন্ত তাহার সঙ্গে আসিয়া ছিল। বিদায়ের আগে পান দিতে গেলে অমল হাত পাতিয়া লয় নাই, নিজের মুখের কাছে তাহার পান-সুদ্ধ হাতটা তুলিয়া ধরিয়াছিল; অগত্যা শকুন্তলা পানটা তাহার মুখে পুরিয়া দিতে যায়, আর সেই সময় দিয়াছিল অমল তাহার আঙ্গুলে ছোট্ট একটি কামড়। সামান্য ঘটনা, ছেলেমানুষি ছাড়া আর কিছুই নয়—ছেলেমানুষি অমল অহরহই করিত—তবু শকুন্তলা সেদিন ঘামিয়া উঠিয়াছিল, বহু রাত্রি পর্যন্ত ঘুমাইতে পারে নাই।

ভাবিতে ভাবিতে আরও একটা কথা তাহার মনে পড়িল; ঐ শেষের দিকেই—আকস্মিক বজ্রপাতে তাহার সুখের বাসা পুড়িয়া যাইবার ঠিক আগেই, রসিকতার ছলে অমল দিয়াছিল তাহার বাহুমূলে সজোরে এক চিম্‌টি। তখন সে আর্তনাদ করিয়া উঠিয়াছিল বটে, মায়ের কাছে নালিশ করিতেও ছাড়ে নাই—কিন্তু তবু, তাহার বেশ মনে আছে, সেই বেদনাটা তাহার যেন ভালই লাগিয়াছিল এবং সেই কালশিরার দাগটা মিলাইয়া যাইতে সে বোধ হয় একটু ক্ষুণ্ণই হইয়াছিল—

সহসা তাহার স্বপ্নভঙ্গ হইল অমলেরই কণ্ঠস্বরে, 'কিন্তু এর আজ হ'লো কি ?'

পরক্ষণেই রান্নাঘরের দোরের সামনে আসিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, 'ও মা গো, এই একঘর ধোঁয়ার মধ্যে চুপটি ক'রে বসে আছ ! পাগল নাকি ?'

এবং উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া একটা হাত ধরিয়া তাহাকে হিড়হিড় করিয়া টানিয়া বাহিরে লইয়া আসিল। শকুন্তলা ইহার জন্য একেবারেই প্রস্তুত ছিল না, সে এই আকর্ষণের বেগ সামলাইতে না পারিয়া একেবারে গিয়া পড়িল অমলের ঘাড়ে। মুহূর্ত মাত্র, তাহার পরই সে নিজেকে সম্বরণ করিয়া সোজা হইয়া দাঁড়াইল কিন্তু তাহার দেহ-মনের এই আঘাতের আকস্মিকতা তাহাকে ক্রুদ্ধ করিয়া তুলিল। সে অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া কঠিন স্বরে বলিল, 'আমরা গরিব ব'লে কি আমাদের মান-ইজ্জৎও থাকতে নেই মনে করেন ?'

এ কী হইল ? অমল নিজেই ব্যাপারটার জন্য অপ্রতিভ হইয়া পড়িয়াছিল সত্য কথা, কিন্তু এতটার জন্য প্রস্তুত ছিল না। বিশেষত এমন ঘটনা আগেও বহু ঘটিয়াছে, শকুন্তলা রূঢ় কখনই হয় নাই। মৃদু অনুযোগ করিয়াছে, হয়ত বা একটা চড় চাপড়ও দিয়াছে, অধিকাংশ সময়েই উহাকে ছেলেমানুষি বলিয়া উড়াইয়া দিয়াছে। কিন্তু—

অমল আহতকণ্ঠে কহিল, 'ছি !···তোমার আজ হয়েছে কি ব'লো তো ? এমন করছ কেন ?'

বহুক্ষণের অপমান, লজ্জা ও বেদনায় তাহার কণ্ঠস্বর ভাঙ্গিয়া আসিতেছিল। তবু সে প্রাণপণে নিজেকে সংযত করিয়া কহিল, 'কিছু হয় নি আমার, আপনি যান, ঘরে গিয়ে বসুন গে। আমি যাচ্ছি—'

সে আবার রান্নাঘরে ঢুকিয়া পড়িল। উনান তখন প্রায় ধরিয়া আসিয়াছে, জোর করিয়া সে কাজে মন দিল।

একটু পরেই মা আসিয়া বলিলেন, 'ওরে সন্ধ্যা, তোর অমলদাদাকে এই ছাদেই একটা মাদুর দে না, এখানে বসুক—ঘরে যা গরম !···চা হ'লো শকুন্তলা ?'

অমল মৃদুকণ্ঠে জানাইল, 'চা থাক্‌ না মাউই-মা, আবার ওসব হাঙ্গামা কেন ?'

মায়ের কণ্ঠস্বর গাঢ় হইয়া আসিল, 'হাঙ্গামার আর সামর্থ্য কোথায় বাবা, এখন শুধু একটু চা দেওয়া, তাই কষ্টকর! কিন্তু তাও যদি তোমাদের সামনে একটু না দিতে পারি তো বাঁচব কি ক'রে?'

অমল আর কথা কহিল না। মা রান্নাঘরে ঢুকিয়া কহিলেন, 'আর কত দেরি রে?'

শকুন্তলা ক্লান্তকণ্ঠে কহিল, 'তুমি একটু ক'রে দাও না মা, আমার শরীরটা বড্ড খারাপ লাগছে—'

মা উদ্বিগ্নভাবে তাহার দিকে চাহিয়া কহিলেন, 'কি হ'লো আবার তোমার? পারি নে বাবা ভাবতে—'

শকুন্তলা কথার জবাব না দিয়াই ঘর হইতে বাহির হইয়া বিনা বাক্যে অমলকে পাশ কাটাইয়া নিচে নামিয়া গেল। মা হালুয়া ও চা প্রস্তুত করিতে করিতে অনেক কথাই বলিয়া যাইতে লাগিলেন, অমল কিন্তু একেবারে স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল। সে কি ইহারই জন্য দীর্ঘ ছয় মাস দিন গণিয়াছে! শকুন্তলা যে তাহার মনের কতখানি জুড়িয়া বসিয়াছিল তাহা এই দীর্ঘদিন বিচ্ছেদের আগে বুঝিতে পারে নাই। তাহারা দেশে চলিয়া আসিবার পর কলিকাতার আকাশ বাতাস যখন বিবর্ণ-বিস্বাদ ঠেকিল তখনই প্রথম বুঝিতে পারিল। কিন্তু তখন আর দেশে ফিরিবার কোন অজুহাতই ছিল না বলিয়া কোনমতে তাহাকে এই দিনগুলি কাটাইতে হইয়াছে। সবার গোপনে নির্জনে বসিয়া সে দিনের পর দিন স্বপ্ন দেখিয়াছে, আবার কবে প্রথম এই মধুরভাষিণী মেয়েটির দেখা পাইবে! অথচ—

সে অনেক ভাবিয়াও নিজের কোন অপরাধ খুঁজিয়া পাইল না। মনে পড়ে কলিকাতা ছাড়িয়া আসিবার দিনটিতে সে স্টেশন পর্যন্ত উহাদের সঙ্গে আসিয়াছিল। গাড়িতে উঠিয়া বসিয়াও শকুন্তলা কত গল্প করিয়াছে, মায় সাহিত্যচর্চা পর্যন্ত বাদ যায় নাই। শরৎবাবুর কী একখানা উপন্যাস দেশে ফিরিবার সময় অমলকে সংগ্রহ করিয়া আনিতে বলিয়াছিল—অমল সেকথা ভোলে নাই, বই কিনিয়াই আনিয়াছে। বিদায়ের পূর্বে অমলই যেন একটু মুষড়াইয়া পড়িয়াছিল, শকুন্তলা তাহা লক্ষ্য করিয়া নানা হাস্য-পরিহাসে শেষ-মুহূর্তগুলিকে উজ্জ্বল ও সহজ করিয়া তুলিয়াছিল। কোথাও তো কোন অসঙ্গতি,

কোন ছন্দপতন হয় নাই। তবে?

শকুন্তলার কাকীমা কোথায় বেড়াইতে গিয়াছিলেন; তিনি ফিরিয়া আসিয়া অমলের পাশে বসিলেন, তাঁহার ছেলেমেয়েরাও ঘিরিয়া ধরিল। এই ছেলেটি এ বাড়ির সকলেরই প্রিয়—অনেকদিন পরে তাহাকে পাইয়া তাঁহারা কলরব করিয়া উঠিলেন। কিন্তু অমলের তখন এ সব অসহ্য বোধ হইতেছে, সে যেন পলাইতে পারিলে বাঁচে! কোথাও নির্জনে বসিয়া তাহার একটু নিশ্বাস ফেলা দরকার—

চা ও খাবার শীঘ্রই আসিয়া পৌঁছিল, তাহার তখন খাইবার মতো অবস্থা নয়, তবু পাছে সন্ধ্যার মা ক্ষুণ্ণ হন, তাই কোনমতে খানিকটা গলাধঃকরণ করিয়া উঠিয়া পড়িল।

'এরই মধ্যে চললে বাবা?'

'হ্যাঁ মাউই-মা, আবার কাল আসব। আজই এসেছি, গরমে ট্রেনে বড় কষ্ট হয়েছে। সকাল ক'রে শুয়ে পড়ব।'

কিন্তু তবুও অমল তখনই যাইতে পারিল না, একটু ইতস্তত করিয়া কহিল, 'শকুন্তলাকে তো দেখতে পাচ্ছি না, তার জন্যে এই বইটা এনেছিলুম—'

'কী জানি বাবা, তার আজ কি হ'লো!...ওরে সন্ধ্যা, এই বইটা তুলে রাখ্ তো—মেজদির বই।—আর বই! এখানে এসে ও পাট তো নেই-ই একেবারে। এখন কি ক'রে যে জাতধর্ম বাঁচবে তাই শুধু ভাবছি বাবা, একটা দোজ-বরে তেজ-বরে পেলেও বেঁচে যাই—'

কথাটা সজোরে অমলকে আঘাত করিল। এ ব্যাপারটা সে ভাবেই নাই। সত্যই তো, শকুন্তলার বিবাহের বয়স তো অনেকদিনই আসিয়াছে—

সে 'তা হ'লে আসি' বলিয়া নিচের দিকে পা বাড়াইল। আশা ছিল বিদায়ের পূর্বে অন্তত শকুন্তলার দেখা মিলিবে, কিন্তু কোথাও তাহার কোন সম্ভাবনা রহিল না।

'ওরে তোর অমলদাকে আলোটা দেখালি না?' মা কহিলেন।

'না, আলোর দরকার নেই, আলো রয়েছে—'

অমল তাড়াতাড়ি সিঁড়ি বাহিয়া নামিয়া আসিল। নিচের তলাটা যেমন অন্ধকার তেমনি ভাঙ্গা ও স্যাঁৎসেঁতে। এখানে প্রায় কেহই থাকে না, শুধু কিছু কিছু কাঠ-কুটা আবর্জনা রাখা হয়। সেখানে সে কাহাকেও দেখিবার আশা করে নাই, কিন্তু একেবারে সদরের কাছে গলিপথটায় গিয়া দেখিল একটি কেরোসিনের ডিবা পাশে রাখিয়া দেওয়ালে ঠেস দিয়া চুপ করিয়া বসিয়া আছে শকুন্তলা, দৃষ্টি তাহার কম্পমান দীপ-শিখার উপর নিবদ্ধ।

অমল কাছে যাইতেই সে চমকিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। অমল আরও কাছে আসিয়া তাহার স্বেদসিক্ত হাত দুইটি জোর করিয়া নিজের হাতের মধ্যে ধরিয়া কহিল, 'কী হয়েছে কিছুতেই বলবে না কুন্তলা? কেন তুমি এমন বিরূপ হয়ে রইলে আমার ওপরে?'

কুন্তলা! অমলের আদরের ডাক। অকস্মাৎ একটা প্রবল কান্না যেন শকুন্তলার কণ্ঠ পর্যন্ত ঠেলিয়া উঠিল। ক্ষীণ আলোক, তবু তাহাতেই অমলের চক্ষু দুইটি বড় করুণ, বড় অসহায় ঠেকিল। শকুন্তলার বুক কাঁপিয়া উঠিতেছিল কিন্তু সেই করুণ দৃষ্টির পিছনে যে সিল্কের পাঞ্জাবি ও সোনার বোতাম ঝল্‌মল করিতেছিল সেটাও চোখে পড়িতেই সে আবার নিজেকে কঠিন করিয়া লইল। ধীরে ধীরে হাতটা ছাড়াইয়া লইয়া শান্ত উদাসকণ্ঠে কহিল, 'কিছুই হয় নি অমলদা। আমরা বড় গরিব, দিনরাত অভাবের সংসারে খাটতে হয়, তাই হয়ত সব সময়ে হাসিমুখ রাখতে পারি না। তাতে যদি ত্রুটি হয়ে থাকে তো মাপ করবেন!'

অমলের ওষ্ঠ দুইটি কিছুক্ষণ নিরবে কাঁপিবার পর স্বর বাহির হইল, 'বিনা অপরাধে কেন যে বারবার এমন আঘাত করছ শকুন্তলা, বুঝতে পারছি না। থাক্—তুমি শান্ত হও, তারপর একদিন আমার দুষ্কৃতির কথা শুনব—'

কিন্তু তবু সে চলিয়া যাইতে পারিল না। শুধু শকুন্তলা অহেতুক একটা ক্রোধে যেন জ্ঞান হারাইল, কঠিনকণ্ঠে কহিল, 'আর, আপনি যখন-তখন আমার গায়ে অমন ক'রে হাত দেবেন না। আমরা বড় গরিব, মায়ের এক পয়সা পণ দেবার সামর্থ্য নেই তা তো জানেনই। কেউ যদি ভিক্ষে দেবার মতো ক'রে গ্রহণ করে তবেই তিনি কন্যাদায়ে মুক্ত হবেন। তার ওপর যদি কোন বদনাম ওঠে, তাহ'লে ভিক্ষাও কেউ দিতে চাইবে না, এটা আপনার বোঝা উচিত।'

সেই শকুন্তলা! সংসারের কোন ক্লেদ যাহাকে কোনদিন স্পর্শ করে নাই। অমল আর দাঁড়াইতে পারিল না। শুধু কপাটটা খুলিবার পূর্বে একবার স্খলিতকণ্ঠে সে কাহল, 'কিন্তু আমার দ্বারা যে কোন সাহায্যের সম্ভাবনা নেই তাই বা কি ক'রে জানলে কুন্তলা? শুধু অনিষ্টই করতে পারি, উপকার কিছু করতে পারি না?'

'না, না, না—'চাপা গলায় শকুন্তলা যেন আর্তনাদ করিয়া উঠিল, 'আপনি যান—বাড়ি যান। আমার কোন উপকার করা আপনার দ্বারা সম্ভব নয়। আপনি যান।'

অমল বাহির হইয়া গেল। তাহার পদশব্দ কপাটের ওপারে মিলাইয়া যাইতে হঠাৎ যেন শকুন্তলার তন্দ্রা ভাঙ্গিল। সে চমকিত ব্যাকুলভাবে একবার বাহিরের দিকে চাহিল, সেখানে শুধুই অন্ধকার।...অমল সত্যিই চলিয়া গিয়াছে।...

কপাটটা বন্ধ করিয়া দিয়া শকুন্তলা অনেকক্ষণ বজ্রাহতের মতো স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল, তাহার পর মাটির উপর লুটাইয়া পড়িয়া অমল শেষ যেখানে দাঁড়াইয়া তাহার সহিত কথা কহিয়াছিল, সেইখানে মুখ রাখিয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল। মনে হইল আজ সারারাতের মধ্যে এ কান্না যেন থামিবে না।

উপরে তখন শকুন্তলার মায়ের উদ্বিগ্ন কণ্ঠস্বর শোনা যাইতেছে।

বন্ধুর-পন্থা

গাড়ি নিয়ে যাবার কথা ছিল জর্জের। তার সঙ্গেই দরদস্তুর কথাবার্তা সব। কন্যাকুমারী থেকে মাদুরা যাব, সেখান থেকে ত্রিবান্দ্রাম স্টেশন পৌঁছে দেবে —ভাড়া ঠিক হয়েছিল মোট দুশো কুড়ি টাকা। ভাড়া অনেকে অনেক রকম চেয়েছিল, হয়তো দরদস্তুর করলে আর কিছু কমেও হত—কিন্তু জর্জকে আমাদের পছন্দ হয়ে গিয়েছিল। হাসি-খুশী মানুষ, ছোট ছোট চোখ দুটি কৌতুকে যেন সর্বদাই নাচছে, একটা সিগারেট দিলে সকলের সামনেই এক পাক নেচে নেয় আনন্দে, নিজেও 'অফার' করে অবশ্য যখন-তখন—ভাঙা ভাঙা

ইংরেজী বলতে পারে—ওর অনেক গুণ।

পছন্দ অবশ্য আরও অনেকেরই—ক'দিনে যা দেখলুম। ওদিকে কেরালা ভবন, টুরিস্ট লজ থেকে এদিকে বিবেকানন্দ সেণ্টার, ট্রাই-সি লজ সর্বত্রই—যাত্রী ওর একচেটে। ওর গাড়ি বসে থাকে না একদিনও। ভাড়াও অবশ্য, বাংলায় যাকে রিজনেবল্ বলে তাই চায়—আকর্ষণের সেও একটা কারণ। তিনশো চেয়ে শেষ পর্যন্ত দেড়শোয় নামে না, সেসব ক্ষেত্রে সোজাসুজি দেড়-শোই চায়, এবং দর করতে গেলে হেসে হাতজোড় করে।

ওর এই বাঙালী জনপ্রিয়তাই আমাদের কাল হ'ল কিন্তু। যাত্রার দিন বোঁচকা-বুঁচকি বেঁধে হোটেলের লাউঞ্জে নেমে এসে দেখি শ্রীমান জর্জ আর একজন কাকে সঙ্গে এনেছে। ও যেতে পারবে না, আগের দিন সারারাত গাড়ি চালিয়েছে—এক বাঙালী পার্টি নিয়ে গিয়েছিল রামেশ্বরমের দিকে, এই একটু আগে—মাত্র চারটেয় ফিরেছে, এখন আর ওর পক্ষে চারশো মাইল গাড়ি চালানো সম্ভব নয়। ওর বন্ধু মুরুগাকে আমাদের সঙ্গে দিচ্ছে, মুরুগারও খুব ভাল হাত, আমাদের তকলিফ হবে না—ইত্যাদি। ওরই গাড়ি, দরদামও সব ঠিক রইল, কেবল ওর জায়গায় মুরুগা চালাবে—এইটুকুই যা রদবদল হ'ল বন্দোবস্তে। আশা করি তার জন্যে আমরা কিছু মনে করব না।

সাড়ে পাঁচটায় রওনা হবার কথা, পৌনে ছটা বেজে গেছে এই সব কথা-বার্তা হতেই। তখন আবার নতুন গাড়ি ঠিক ক'রে যেতে গেলে অনর্থক আরও খানিকটা দেরি হয়ে যাবে। আর তাতে লাভই বা কি, সেও তো অচেনা ড্রাইভার, তার কি রকম হাত, কেমন চালায় তাও তো জানি না। আর একদিন দেরি করব সে উপায়ও নেই, ওদিকে রিজার্ভেশ্যনের প্রশ্ন আছে। অতএব 'দুর্গা' বলে হোটেলের মালিক এলবার্টের সঙ্গে হ্যাণ্ডশেক ক'রে মুরুগার ভরসাতেই গাড়িতে চড়ে বসলুম।

অবশ্য—মানতেই হবে, ছেলেটার হাত খারাপ নয়। ভালই চালাল সে। বয়স জর্জের চেয়েও কম, মানুষটাও ভদ্র। অত হাসি-খুশী কি মিশুক নয়—এই যা। গাড়ি চড়াতে কোন অসুবিধা হ'ল না, কেবল ফাউ যেটুকু, জর্জের সঙ্গলাভ, সেইটুকু থেকেই বঞ্চিত হলুম।

কিন্তু তখনও একটা কথা ভাবি নি। ছেলেমানুষ বলেই মুরুগার একটা

থামতি ছিল। এমনিতেই মাদুরা থেকে ত্রিবান্দ্রাম ট্যাক্সি ক'রে কেউ যায় না, বাস কিম্বা ট্রেনেই যায়। গেলেও মাদুরা থেকেই যায়—মাদুরার ট্যাক্সিতেই। কন্যাকুমারী থেকে মাদুরা পর্যন্ত গিয়ে কলকাতাযাত্রী আবার ত্রিবান্দ্রাম আসবে, আমাদের মতো এমন উদ্ভট শখ আর কারও নেই। অন্তত বেশি নেই এটা জোর ক'রেই বলা যায়। তাও জর্জের মতো জনপ্রিয় ড্রাইভারের পক্ষে সে অভিজ্ঞতা সম্ভব—ছেলেমানুষ মুরুগার ভাগ্যে এমন যাত্রী বার বার জুটবে—আশা করা অন্যায়। আগে অবশ্য সাউখুড়ি ক'রে বলেছিল যে সে সব চেনে, পরে জেরা করতেই ধরা পড়ে যে—এ পথে এই ওর প্রথম আসা। তবে জর্জ খুব নিখুঁত ভাবে পথের নির্দেশ দিয়ে পাঠিয়েছিল, তাতেই ওর বিশ্বাস হয়েছিল যে ঠিক চিনে চালাতে পারবে গাড়ি।

দিনের বেলায় খুব অসুবিধা হয়ও নি। সন্ধ্যার মুখে পড়ল 'ঘাট'—অর্থাৎ পশ্চিমঘাট পর্বতমালার পাহাড়ে পথ। আগে ছিল একরকম, এখন দিন দিন নতুন নতুন ডাইভার্শ্যন, কর্ড প্রভৃতি হচ্ছে—নতুন নতুন রাস্তা নব নব জনপদকে কেন্দ্র ক'রে। যে নিত্য যাতায়াত করে না তার পক্ষে চেনা শক্ত। বিশেষ বেলা চারটে না বাজতেই আকাশ কালো ক'রে জমল জলভরা নিবিড় মেঘ; ঝমঝম ক'রে বৃষ্টি নামল; তাতে যতটুকু দিনের আলো আমাদের পাওয়া উচিত ছিল, যতক্ষণ—ততটুকুও পেলাম না। প্রবল জলের ছাটেই কাচ ঝাপসা হয়ে যাচ্ছে, তার সঙ্গে ভেতরের নিশ্বাস তো আছেই—ঘষা কাঁচের মতো অবস্থা দাঁড়াচ্ছে—তার ওপর মধ্যে মধ্যে এক এক টুকরো মেঘও গড়িয়ে এসে সম্পূর্ণ অবলুপ্ত ক'রে দিচ্ছে পাহাড় রাস্তা গাছপালা—কিছুকালের জন্য। সে সব সময় হেডলাইটের আলোতেও বিশেষ কাজ হচ্ছে না, সামনে তিন-চার গজের বেশি নজর চলে না—আস্তে আস্তে সাবধানে যদি বা গাড়ি চালানো যায়—আর একজনের-বুঝিয়ে-দেওয়া-নির্দেশের সঙ্গে মিলিয়ে পথ চেনা যায় না।

ফলে বার বারই ভুল হতে লাগল। একবার তো অনেক দূর পর্যন্ত গিয়ে আবার ফিরে আসতে হ'ল। ছোটখাটো ভুল—অল্পের ওপর দিয়ে সংশোধন—সে তো বেশ ক'বার। আর তার ফলে দীর্ঘ পথ দীর্ঘতর হয়, রাত ঘনিয়ে আসে ভালরকমই। জর্জ বলেছিল বেলা আড়াইটে-তিনটেয় মাদুরা থেকে বেরোলে

সাতটা-সাড়ে সাতটায় ত্রিবান্দ্রাম পৌঁছব—আমরা বেরিয়েছি ঠিক পৌনে ছটোয়—আটটা বেজে গেলেও পার্বত্য পথের কোন সমাপ্তির আভাস পেলুম না। পাহাড় আর বন—অদৃশ্য অস্পষ্ট, আর অদৃশ্য অস্পষ্ট বলেই ভয়াবহ—রহস্যময় বনের আভাস চারিদিকে, তার সঙ্গে বর্ষণ চলেছে—সমানে। কখনও জলের বেগ একটু কমছে, আমরা আশ্বস্ত হবার চেষ্টা করছি—পরক্ষণেই আবার ঝমঝম শব্দে প্রবলা মুখরা বৃষ্টিধারা নেমে আসছে পাহাড়ে, আমাদের গাড়ির মাথায়। সে সময়গুলোয় মনে হচ্ছে কে যেন খুব বড় একটা বালতি ক'রে জল ঢালছে। গাড়ির চালে বিছানাগুলো ভিজছে—তা ভিজুক, আমরা তো আগে বাঁচি তার পর বিছানার কথা ভাবা যাবে। ওয়াটারপ্রুফ-হোল্ডল—মনকে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করি—খুব বেশিরকম ভিজবে না। যদিও মনে মনে বেশ বুঝছি এতক্ষণে সুখশয্যা অসুখপ্রদ হয়ে উঠেছে, ভারী এবং শয়নের অযোগ্য। অথচ উপায়ই বা কি, পিছনে তিল ধরার ঠাঁই নেই আর।

লোকালয় যে মধ্যে মধ্যে পড়ছে না, তা নয়। হঠাৎ 'নিবিড় কালো আঁধারে'র মধ্যে নক্ষত্রবিন্দুর মতো দু-একটি আলো চোখে পড়ছে, ক্রমশ সেগুলি স্পষ্টতর ও নিকটবর্তী হচ্ছে, ঘরবাড়ি যে বিশেষ চোখে পড়ছে তা নয়, বোঝা যাচ্ছে অন্য লক্ষণে 'পর্বতো বহ্নিমান ধূমাৎ'—এদিকের অবশ্যম্ভাবী হোটেল, পানের দোকান, তাতে গোটা দুই-তিন কলার কাঁদি, কাফির দোকান, ট্রানজিস্টারে বিবিধ-ভারতী সিনেমার গান—কোথাও বা অধিকন্তু এক-আধটা হেল্‌থ্‌ সেণ্টার, জন্ম-নিয়ন্ত্রণের বিজ্ঞাপন-বোর্ড—তার পরই আবার সেই ত্রিভুবন-একাকার-করা নিকষ-কালো অন্ধকার, সেই অরণ্যের ভয়াবহ চেহারা আর অন্তহীন আঁকা-বাঁকা রাস্তা।

চলেছি তো চলেইছি। বন্ধু সুরেশবাবুর মুখ উঠেছে শুকিয়ে—মাঝে মাঝে যে আলোয় এসে পড়া যাচ্ছে সে আলো গাড়ির মধ্যেও এক-আধটু এসে পড়ছে বৈকি। তাতেই মুখ-শুকনোটা টের পাচ্ছি। তপুর বুকের মধ্যে নাকি হাতুড়ির ঘা পড়ছে—অন্তত প্রহ্লাদের তাই বিশ্বাস। সুরেশবাবুর ধারণা লোকটার মতলব ভাল নয়, নিশ্চয়ই কোন বিপথে নিয়ে যাচ্ছে। তিনি অতঃপর লোকালয় এলেই হাঁক-ডাক ক'রে পুলিস ডাকবেন বার বার প্রতিজ্ঞা করছেন। কিন্তু লোকালয় মানেই বিজলীবাতি, তাতে আবার সাময়িক ভাবে

ভরসা ফিরে আসছে। তাছাড়া দু-একবার জিজ্ঞাসা ক'রেও জানলেন যে এই পথেই ত্রিবান্দ্রাম গেছে। তাতেও খুব ভরসা পেতেন না—কারণ এদেশে না বোঝে কেউ হিন্দী আর না বোঝে ইংরেজী; আমরা যে প্রশ্ন করছি তার মর্ম বুঝে ঠিক উত্তর দিচ্ছে অথবা আমরাই তাদের উত্তর ঠিক বুঝছি কি না, তা বোঝার উপায় নেই—শেষ পর্যন্ত একটা বোর্ড নজরে পড়ল—তাতে 'টু ত্রিবান্দ্রাম' বলে লেখা দেখে তবে আশ্বস্ত হলেন। কিন্তু তা-ই বা কতক্ষণ? আবারও ঠিক দশ মিনিট পর সে-ই সংশয় নতুন ক'রে—পথ ভুল হচ্ছে কিনা।

আরও বিপদ, বর্ষার বিরাম নেই। জল পড়েই যাচ্ছে। কখনও ঝমঝম, কখনও রিমঝিম। তার ফলে দৃষ্টিটা ঝাপ্‌সাই থেকে যাচ্ছে—চালক আরোহী দুজনেরই। পাহাড়ে বর্ষার আর এক অসুবিধা—বৃষ্টির সঙ্গে দ্রবীভূত জলকণিকা ছাড়াও মেঘের একটা আচ্ছন্নতা থাকে। তার জন্যে দু-একবার দৈহিক বিপদের সামনেও পড়তে হল বৈকি। একটা লরী বোধহয় খারাপ হয়ে গেছে, আলো-টালো নিভিয়ে রেখে তার চালক সম্ভবত গেছে সাহায্যের জন্যে। ভেতরে কেউ আছে কিনা তা বোঝা গেল না, লরীটার অস্তিত্বই বোঝা যায় নি, একেবারে সামনে পড়াতে লক্ষ্য হ'ল। মুরুগা কোনমতে শেষ মুহূর্তে গাড়িটা ঘুরিয়ে আত্মরক্ষা করল। বেশি ঘোরানোও সেখানে মুশকিল—না, অতলস্পর্শী খাদ নয়—গগনচুম্বী দুটি বনস্পতি ছিল বাঁয়ে—তাতে আছড়ে পড়লে গাড়ি বা তার আরোহীদের চিহ্ন থাকত কিনা সন্দেহ, চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যেত। আর একবার ঐ অন্ধকারে হঠাৎ একটা হাতী পড়ে গেল সামনে। তার তো আর আলোর প্রশ্ন ওঠে না—তার চালকের কাছেও নিশ্চয় কোন টর্চ বা আলোর ব্যবস্থা নেই। হাতীটার শুঁড়ে একটা বড় কাঠ—শালগাছই গোটা একটা বলতে গেলে, ডালপালাগুলো কাটা এই যা। সেটা হাতীই শেষ পর্যন্ত সামলে নিল, শুঁড়টার কৌশলে কাঠটা একটু উঁচুতে তুলে এবং ঘুরিয়ে গাড়ির সঙ্গে সমান্তরাল ক'রে নিয়ে—নইলে দমাস ক'রে এসে লাগত গাড়িটায়।...

রাত যখন সাড়ে আটটা ঘড়িতে, আমারও ধৈর্যচ্যুতি ঘটতে বসেছে প্রায়, এমন কি প্রদোষও উশখুশ করছে—এদের ভয় না বাড়াবার প্রাণপণ চেষ্টা সত্ত্বেও তার ভয় ও ক্লান্তি চাপতে পারছে না—হঠাৎ দূর থেকে একটা বৃহত্তর

আলো নজরে পড়ল। আলো মানে মিশ্রিত দীপ্তি একটা—অনেকগুলো অনেক রকমের বাতির মিলিত আলোর আভাস। কাছে আসতে দেখলাম বড়সড় একটা জনপদই বটে। কী নাম আজ আর মনে নেই, লম্বা গোছের দাঁতভাঙা একটা নাম। প্রথমেই নজরে পড়ল এক পাবলিক লাইব্রেরী, এক য্যাডভোকেটের দোতলা বাড়ি, নারকেল পাতার ছাউনী একটা ইস্কুল। তাছাড়া যা সর্বত্রই অনিবার্য—তিন-চারটে হোটেল, কফিখানা, কাপড়ের দোকান—কলার কাঁদি ঝোলানো কয়েকটা পানের দোকান, মনোহারী ও ওষুধের দোকান; মদের দোকান একাধিক।

গাড়ি থামিয়ে আমরা এক জায়গায় কফি খেলুম। মাছভাজা ও তৈলজাত বোঁদের লাড্ডু—কফির বিচিত্র উপকরণ—রয়েছে দেখলাম, সেই সঙ্গে লঙ্কাবাটা মাখানো ডিম চচ্চড়ি। মাছ ভাজা সামনে এনে ধরলেও—কিন্তু, যদিচ কদিন মাছ খাওয়া হয় নি, তবু তার চেহারায় ও আঁশটে গন্ধে খেতে প্রবৃত্তি হল না। এগুলো প্রধানত—দুপাশের দুটি মদের দোকানের জন্যেই প্রস্তুত বুঝলুম, মদে অনুভূতির দৃষ্টি আচ্ছন্ন না হ'লে সে কেউ খেতে পারে না।

ত্রিবান্দ্রাম কোন্ দিকে প্রশ্ন করতে (প্রশ্নের ভাষা বুঝল না, নামটা বুঝল) —একজন ওদেশের রীতিমাফিক উলটো ঘাড় নেড়ে দেখিয়ে দিল আমাদের সামনের পথই—যেদিকে আমাদের গাড়ির মুখ। সুতরাং কফি পান শেষ ক'রে এবার আমরা অনেকখানি আশ্বস্ত হয়ে গাড়িতে চড়ে বসলুম আবার গুছিয়ে-গাছিয়ে। এখন প্রধান চিন্তা ত্রিবান্দ্রাম পৌঁছে কোথাও আশ্রয় পাবো কি না। তবে যদি অনেক বেশি রাত হয়—সেজন্যেও আর বিশেষ ভাবতে হবে না, কারণ গাড়ি শেষরাত্রি চারটেয়—সুরেশবাবু রসিকতা ক'রে বললেন।

জনপদ ক্রমশ আবার পিছনে পড়ল, তবে তখনও পথের আলো বন্ধ হয় নি। এই আর এক অসুবিধা, গ্রাম বা লোকালয়ের আগে-পিছে বহুদূর পর্যন্ত পথের আলো থাকে, তারপর আবার সেই গাঢ় নিরন্ধ্র অন্ধকার। তাতে আরও বেশি দিশাহারা হয়ে পড়তে হয়। বিদ্যুৎ-চমকও, ইংরাজীতে যাকে বলে far and few, তার আলোতে কিছু দেখব সে সুবিধেও নেই। যাই হোক, লোকালয়ের সেই প্রায় শেষ প্রান্তে পৌঁছে একটা মেটারনিটি সেণ্টার পেরিয়ে এসে মুরুগা সেই অন্ধকারেই কী লক্ষ্য ক'রে ক'রে দেখে হঠাৎ এক জায়গায়

ঘ্যাঁচ ক'রে গাড়িটা থামাল, তারপর আবারও একটু এদিক-ওদিক তাকিয়ে দুরূহ ভাষায় কি একটা বলে চোখের নিমেষে ডান পাশের জমাট বাঁধা অন্ধকারে অন্তর্হিত হ'ল। শুধু দুটি মাত্র শব্দ বুঝলুম, 'ওয়ান মিনিট।'

প্রথমটা অত কিছু মনে করি নি। কোন প্রাকৃতিক কার্য সারতে যাচ্ছে এইটেই ভেবেছিলুম। স্বাভাবিকও—কারণ সেই সময়টাতেই, এতক্ষণ পরে, বৃষ্টির বেগ একটু কমেছে, সামান্য গুঁড়ি গুঁড়ি জলকণাতে এসে ঠেকেছে। মুরুগা ঐ ধরনের কাজেই গেছে চিন্তা করার সঙ্গে সঙ্গে আমাদেরও নামবার ইচ্ছা হ'ল, সেরেও এলুম ইতিকর্তব্য।

কিন্তু দু মিনিট, পাঁচ মিনিট, দশ মিনিট কেটে গেল—শ্রীমানের সাক্ষাৎ নেই। প্রহ্লাদ তার নিজস্ব প্রাকৃত ভাষায় যা বলল তার অর্থ দাঁড়ায়—মুরুগা জপের লঘুসংখ্যা নয়, পূর্ণসংখ্যা সারতে গেছে। তবে তাতেই বা কত সময় লাগে? এধারে যে কুড়ি মিনিট পার হতে যায়।

পূর্বের টুকরো টুকরো আবছা আশঙ্কাগুলো যেন জমাট বেঁধে ফিরে এল এবার, বহুগুণ হয়ে। সুরেশবাবুর শ্যামবর্ণ মুখ সাদা হয়ে উঠেছে তা গাড়ির আলো জ্বালতে টের পেলুম। গৃহিণী 'উঃ' 'আঃ' করছেন। তাঁর ভয় কম—আমরা আছি বলে—ক্লান্তিই বেশি। তপু, প্রদোষ, কারও অবস্থাই বিশেষ ভাল নয়। এখন স্বীকার করতে দোষ নেই—আমিও খুব একটা নিশ্চিন্ত বোধ করছিলুম না। খবরের কাগজে পড়া নানারকম ভয়াবহ কাহিনী মনে পড়ে যাচ্ছিল।

তবু নামতে হল এক সময় সত্যি সত্যিই! আর অপেক্ষা করা চলে না। দুটো টর্চ ছিল, একটা গাড়িতে রেখে আর একটা নিয়ে আমি আর প্রদোষ বেরিয়ে পড়লুম। ভাগ্যে জলটা তখন একেবারেই থেমে গেছে তাই রক্ষা।

টর্চের আলো ফেলে ফেলে দেখলুম (পথের আলো খুব উঁচুতে একটা জ্বলছে বটে, তবে সে এখান থেকে বহুদূরে, সেটা লোকালয়ের চিহ্ন হিসেবে আশ্বাস মাত্র, তাতে পথ দেখার কাজ চলে না) পাকা অ্যাশফালটের রাস্তা ছাড়া দুটি মাত্র পাকদণ্ডী অর্থাৎ পায়ে চলা পথের রেখা জঙ্গলের মধ্যে চলে গেছে। আমাদের বাঁ পাশে উঁচু জমি, পাহাড়ের অংশ বলা চলে, তাতে দু-একটা বাড়িও নজরে পড়ল—তবে সে সবই বন্ধ; কেউ বসবাস করে হয়তো,

কিন্তু জেগে নেই কেউ। আর ওদিকে যায় নি যে মুরুগা, ডান দিকেই কোথাও অদৃশ্য হয়েছে, সেটা দেখেছি। এখন প্রশ্ন—তুটো পথের কোন্‌টা ধরব। কী মনে হ'ল, নিতান্ত দৈবের ওপর নির্ভর ক'রে অপেক্ষাকৃত সরু পথটাই ধরলুম।

একেবারে খাড়া উঁচু না হ'লেও পাহাড়ে জায়গা। আস্তে আস্তে ওপরেই উঠতে লাগলুম আমরা—উঁচু-নিচু আঁকাবাঁকা পথ বেয়ে। পাহাড় হ'লেও কিন্তু জঙ্গল নয়—মানে শাল বা ঐ ধরনের আরণ্যবৃক্ষ ছাড়াও ফল-ফুলুরি আম-কাঁঠাল কাজুবাদামের গাছ বিস্তর চোখে পড়ল। হয়তো কারও-বাগানেরই সামিল এগুলো, অনাবশ্যক বলেই বেড়া বা পাঁচিল দেয় নি।

অনেকখানি গিয়েও না লোক না লোকালয় কিছুরই চিহ্ন মিলল না—ফিরে গিয়ে আবার চওড়া রাস্তাটা ধরব কিনা ভাবছি, প্রদোষ একবার চট ক'রে আলোটা নিভিয়ে বলল, 'ঐ একটা আলো না?' আমিও এবার দেখতে পেলুম। আলোই বটে। প্রদীপ বা বাতি—ঐ জাতীয় কোন আলোর কম্পমান শিখা। দূরে হলেও এই গাঢ় অন্ধকারে তার কাঁপনটা বেশ বোঝা যাচ্ছে।

আলোটা লক্ষ্য ক'রেই এগিয়ে গেলুম। কিন্তু ভাগ্য যে এতটা অনুকূল হবে তা ভাবি নি। মানুষ পেলে খোঁজ করার চেষ্টা করব এই কথাই মনে ছিল (তবে কী ভাষায় করব সে কথাটা ভাবতেও সাহস হচ্ছিল না—প্রশ্নটার দিকে বলতে গেলে পিছন ফিরেই এগোচ্ছিলাম)—খানিকটা কাছে যেতে খোদ শ্রীমান মুরুগাকেই চোখে পড়ল।

তবে যে নাটকীয় দৃশ্যের সম্মুখীন হলুম আমরা, তাতে তখনকার মতো মুরুগার এই রহস্যময় সন্দেহজনক অনুপস্থিতি বা এ অরণ্যে আত্মগোপনের অপরাধও তুচ্ছ হয়ে গেল।

তুদিকে তুটো ল্যাম্প বা কুপী জ্বলছে। এই তৈলকৃচ্ছ্রতার দিনে তুটো কেন তা জানি না। ফলে দৃশ্যটা দেখারও কোন অসুবিধা নেই। অত অন্ধকারে সামান্য আলোই যথেষ্ট। দেখি একটা বুড়ি-মতো মেয়েছেলে সামনের মাটিতে উবু হয়ে বসে কি বিড়বিড় করে বকছে—যেন কিছু কৈফিয়ৎ দেবার চেষ্টা করছে। তার চুল বেশভূষা—সবই যেন কেমন কেমন, সেকালের উপন্যাস-বর্ণিত ডাইনীর মতো—আর মুরুগা তার সামনে দাঁড়িয়ে খুব কটুকণ্ঠে কি যেন

বলছে, ভাবভঙ্গী দেখে মনে হয় কঠোর কোন তিরস্কার করছে, এক-আধবার তেড়ে মারতেও যাচ্ছে। এদের থেকে সামান্য একটু দূরে আর একটা প্রায়-উলঙ্গ লোক দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই ঈষৎ টলছে ও চড়া গলায় অথচ জড়িত স্বরে কি সব বলছে—মনে হ'ল মুরুগাকে লক্ষ্য ক'রেই। বোধহয় ঐ মেয়েছেলেটার হয়েই ঝগড়া করছে।

আমরা যে গিয়ে দাঁড়িয়েছি, কেউই লক্ষ্য করে নি। আমরা যাবার একটু পরেই মুরুগা প্যান্টের পকেটে হাত ঢুকিয়ে একটা কি মুদ্রা—আধুলি কি সিকি হবে—লোকটার দিকে না চেয়েই সেই দিকে ছুঁড়ে দিলে। ঠিক যেন মন্ত্রবৎ কাজ হ'ল—অত তড়পানি নিমেষে বন্ধ হয়ে গেল। লোকটা হাতড়ে হাতড়ে পয়সাটা কুড়িয়ে নিয়েই পলকের মধ্যে সেই গাঢ় অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে গেল, সম্ভবত নিকটবর্তী কোন গোপন ভাটিখানার দিকে।

তার এই নাটকীয় প্রস্থানে মুরুগার কিছু সুবিধা হ'ল। ঐ লোকটির জোরেই—পক্ষ অবলম্বনের ভরসায়—বুড়ীটা এতক্ষণ দমে নি। এবার যেন অসহায় হয়ে পড়ল একটু। মুরুগা আর একবার তেড়ে উঠতেই সে উঠে ওর পিছনের-মাটির-সঙ্গে-মেশানো চালাঘরটায়* ঢুকে গেল এবং একটু পরেই একটা অল্পবয়সা মেয়ের হাত ধরে হিঁচড়ে টানতে টানতে বার ক'রে এনে প্রায় মুরুগার পায়ের ওপর ফেলে দিলে।

মেয়েটা সেই যে পড়ল, উঠল না, ওঠবার কোন চেষ্টাও করল না। বরং মুখটা সরিয়ে মুরুগার দুই পায়ের খাঁজে এনে গুঁজে দিয়ে স্থির হয়ে পড়ে রইল। দেখতে দেখতে আশ্চর্য একটা পরিবর্তন ঘটে গেল মুরুগার। আলো খুব স্পষ্ট নয়—তবু মনে হ'ল তার মুখ-ভাব এক মুহূর্তেই কোমল হয়ে এল। হেঁট হয়ে খুব নরম গলায় মেয়েটাকে কি যেন বলল, তারপর মেয়েটার হাত

* এ ধরণের ঘরে ইটের বা মাটির এমন কি বাঁশ-কঞ্চির দেওয়ালও লাগে না, কতকটা গোল তাঁবুর মতো দেখতে এই গোলাকার নারকেল বা তালপাতার চালাঘরগুলোর একপ্রান্তে একটা ফুটো থাকে, সেখান দিয়েই গুঁড়ি মেরে ভেতরে ঢোকা বা বাইরে বেরুনোর কাজ চলে।

ধরে টেনে তোলার চেষ্টা করল। মেয়েটা কিন্তু মুখ তুলল না বরং আরও জোরে পায়ের ওপর চেপে ধরল। তার পিঠের ভঙ্গী দেখে মনে হল সে কাঁদছে, কাঁদতে কাঁদতেই পায়ে মুখ ঘষছে।

দৃশ্যটা সত্যিকার নাটকের মতোই তাতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু আমাদের তখন সে নাট্যরস উপভোগ করার মতো মনের বা দেহের অবস্থা নয়। অনেক রাত হয়ে গেছে, গভীর রাত্রে ত্রিবান্দ্রাম পৌঁছলে কিছুই হয়তো খেতে পাব না—হয়ত একটু মুখ-হাত ধুয়ে পরিষ্কার হয়ে নেবার মতো একটু আশ্রয়ও জুটবে না—ওয়েটিং রুমে গিয়ে দেখব মালে আর মানুষে বোঝাই হয়ে গেছে, কলে জল নেই ; তাছাড়া এই গভীর অরণ্য পথ (হয়ত এত গভীর নয়, অন্ধকারে যতটা মনে হচ্ছে—কিন্তু আমাদের তো বোধ হচ্ছে সেকালের আফ্রিকায় এসেছি) না ছাড়লে স্বস্তিও পাচ্ছি না। ভয়ের কারণ যে একেবারে নেই, তাও তো নয়। ওখানে গাড়িতে যারা আছে তারা বোধহয় এতক্ষণ ভয়ে ভিমিই গেল। আমাদের জন্যে চিন্তাটাও নিশ্চয় এতক্ষণে অন্য চিন্তার সঙ্গে যোগ হয়েছে।

অগত্যা একটু বিরক্ত কণ্ঠেই হাঁক দিলুম, 'মুরুগা!' সঙ্গে সঙ্গে প্রদোষ টর্চের আলোটাও ফেলল এবার ওদের ওপর।

মুরুগা যে চমকে উঠল তা ভয়ে কি লজ্জায় নয়। সে যেন একটা অন্য জগতেই চলে গিয়েছিল, আমাদের কথা, গাড়ি চালানোর কথা, তার কাজ—গাড়িটা যে যাত্রী-সুদ্ধ বনের ধারে পড়ে আছে—এসব কিছুই মনে ছিল না। এ চমকে ওঠাটা সেই মনে পড়ারই আঘাত, স্বপ্নের আকাশ থেকে বাস্তবের জমিতে পড়ার রূঢ় অনুভূতি।

মেয়েটাও বিস্রস্ত বেশবাস সামলে নিয়ে উঠে বসল তাড়াতাড়ি। চোখের জলের সঙ্গে ধুলো লেগে সারা মুখটা তার কাদায় মাখামাখি হয়ে গেছে, বেশ-ভূষাও যৎপরোনাস্তি দীন ও মলিন। বয়সটা অল্প, তবে নিতান্তই সাধারণ চেহারার, মেয়ে গায়ের রঙও শ্যামবর্ণ—অন্তত টর্চের আলোয় যা মনে হ'ল।

চমকে উঠেছিল বুড়িটাও। কেমন যেন ভয়ে বিবর্ণ হয়ে গিয়েছিল সে। একটা হাত দিয়ে টর্চের আলো থেকে চোখ দুটো আড়াল ক'রে আমরা কে দেখার চেষ্টা করতে লাগল আর বিড়বিড় ক'রে কি বকতে লাগল। বোধহয়

তার মনে হল মুরুগাই লোকজন সঙ্গে ক'রে এসেছে, সে লোকজন পুলিশ কিনা সেটাই সম্ভবত তার দুশ্চিন্তা।

আবারও কড়া গলায় ডাক দিল প্রদোষ, 'মুরুগা!'

এতক্ষণ মুরুগা শব্দ খুঁজে পেয়েছে গলায়, 'ইয়েস স্যার। জাস্ট এ মিনিট স্যার। কামিং কুইক স্যার।' তার সঙ্গে তামিল ও মালয়ালাম মেশানো তার মাতৃভাষায় আরও অনেক কিছু বলে গেল।

আমরা আমাদের জানা ইংরেজীতে যথেষ্ট তিরস্কার করলুম। অবশ্য সে বুঝল কিনা সন্দেহ। কারণ, এ কদিনে যা দেখলাম, এখানে এই শ্রেণীর লোক-দের মধ্যে শুদ্ধ ইংরেজী—টানা বাক্য—বেশির ভাগই বোঝে না। পিজিন ইংলিশ যাকে বলে—ইয়েস-নো-ভেরিওয়েল গোছের—সেই অবধিই এদের দৌড়। যাই হোক—ভাষা না বুঝুক, ভঙ্গীটা ও বিরক্তিটা বুঝল। অপ্রতিভ কুণ্ঠিত মুখে এদিকে ফিরল, চলে আসারই ভঙ্গী সেটা—তবু তখনই আসতে পারল না। সেই মেয়েটার দিকে ফিরে আগের মতোই খুব কোমল কণ্ঠে কা বলল—কতকটা সান্ত্বনা ও আশ্বাস দেবার মতো—কিন্তু মেয়েটা যেন আবারও ভেঙে পড়ল, ডুকরে কেঁদে উঠে আবারও সেই রকম পায়ে আছড়ে পড়ল মুরুগার।

মুরুগার উভয় সঙ্কটটা টর্চের আলোতেও বুঝতে কোন অসুবিধা নেই। তার থাকারই ইচ্ছে, সেটা স্পষ্ট। আমাদের বিরক্তিটাও প্রত্যক্ষ। তাই বিব্রত মুখে কিছুটা জোর ক'রেই ওকে উঠিয়ে বসিয়ে দিয়ে মাথায় হাত বুলিয়ে শান্ত করার চেষ্টা করল, তারপর একটু ইতস্তত ক'রে কী ভেবে পকেট থেকে একটা কি বার ক'রে মেয়েটার শিথিল হাতে গুঁজে দিল। তারপর সেই বুড়িটার দিকে তর্জনী তুলে একটা শাসানির ভঙ্গী ক'রে কি বলে দ্রুত এগিয়ে এসে আমাদের সঙ্গ ধরল।

গাড়িতে ফিরে আসতে একযোগে আমাদের প্রতি প্রশ্ন ও মুরুগার প্রতি অনুযোগ বর্ষণ হ'ল বৈকি! মুরুগা প্রায় অপরাধীর মতো মাথা হেঁট ক'রে সব তিরস্কারই সহ্য করল, একটাও উত্তর দিল না। আমরাও দুজনে অনেক কৌতূহল, অনেক প্রশ্ন—এবং আবারও মুরুগার প্রতি অনেক বকুনি—

এড়াবার জন্যে সত্য ঘটনাটাকে যতটা সম্ভব সংক্ষিপ্ত এবং ওপর ওপর ভাবে বর্ণনা ক'রে গাড়িতে উঠে বসলুম। এখনই কৌতূহল চরিতার্থ করার জন্যে সকলে মিলে ওকে চারিদিক থেকে প্রশ্ন করতে থাকলে ওর মেজাজ খিঁচড়ে যাবে, সতর্কও হয়ে উঠবে। এ ঘটনার মর্মোদঘাটন করতে হবে সাবধানে, সহানুভূতির তা দিয়ে।···অবশ্য যথেষ্ট কম বলা সত্ত্বেও একেবারে ওকে বাঁচানো গেল না, তবে বকাবকিটা অনেক কমের ওপর দিয়ে গেল—এটা ঠিক।···

লোকালয়ের শেষ চিহ্নটা মিলিয়ে গেল দেখতে দেখতে। আবারও সেই নিঃসীম অন্ধকারে প্রায়-অন্তহীন যাত্রা। আমি ছিলুম সামনের সীটের মাঝখানে, অর্থাৎ মুরুগার পাশেই। নিচে সাইডলাইটের অস্তিত্বজ্ঞাপক যে ক্ষুদ্র আলোকবিন্দুটি জ্বলে তার এবং হেডলাইটের প্রতিফলিত আলোয় লক্ষ্য ক'রে দেখলুম মুরুগার দুই চোখ বাষ্পার্দ্র, হাত দুটো কাঁপছে অল্প অল্প। এ পথে আবেগাভিভূত হবার ফলে কত কী ঘটতে পারে তা সে জানে, দেখলুম প্রাণপণেই নিজেকে সামলাবার চেষ্টা করছে—তবু পারছে না।

আরও বেশ খানিকটা যাওয়ার পর, আর একটা কি গ্রাম পার হয়ে এসে আমি ওকে একটা সিগারেট বার ক'রে দিলুম, লাইটার জ্বেলে ধরিয়েও দিলুম। যে তিরস্কার প্রাপ্য বলে মেনে নিয়েছে, সে আদর পেলে কৃতজ্ঞ হবেই—মুরুগাও কৃতজ্ঞ হ'ল বুঝলুম। এক ধরনের গভীর দৃষ্টিতে চাইল আমার মুখের দিকে।

সিগারেট খেতে উপকারও হ'ল ওর। এবার দেখলুম হাত আগের চেয়ে অনেক স্থির ও দৃঢ় হয়ে এসেছে—স্টেডী যাকে বলে—দৃষ্টির সে কাতরতাও কমেছে অনেকটা। এবার সুযোগ বুঝে আস্তে আস্তে, ভাঙা—ওর বোধগম্য—ইংরেজীতে প্রশ্ন করতে লাগলুম একটা একটা ক'রে, আপাত-বিক্ষিপ্ত, নিরুৎসুক প্রশ্ন। মুরুগা প্রথমটা 'নাথিং ডুইং' গোছের ভাব নিয়েছিল একটা, সংক্ষিপ্ত উত্তরে আসল কথা এড়িয়ে যাচ্ছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত—ফ্লাস্ক খুলে শিবকাশী থেকে আনা কফি বার ক'রে খাওয়াতে বরফ গলল, একটু একটু ক'রে সব কথাই জানা গেল।

যা বলল তা ওর সেই ভুল পিজিন ইংরেজীর সঙ্গে শব্দ যোগ ক'রে বাংলায়

রূপান্তরিত করলে এই রকম দাঁড়ায় :

'আপনার কাছে বলতে অবশ্য বাধাও নেই স্যার, আপনি বিদেশী, বহুদূরে থাকেন। এত বয়সে এই প্রথম এলেন এদেশে, আর হয়তো কখনই আসবেন না। এলেও আমার সমাজে, আমার আত্মীয়-স্বজনদের সঙ্গে পরিচয় হবে না, হয়ত আমারই দেখা পাবেন না। আর আমিই যে চিরদিন এখানে থাকব তারও মানে নেই।···তা কেন, না থাকার সম্ভাবনাই বেশি। যে কাজ করতে যাচ্ছি তাতে মা-বাবা-ভাইদের সঙ্গে বাস করা হয়ত সম্ভব হবে না আর।··· আমরা ক্রীশ্চান, জানেন তো স্যার, আমাদের সমাজে আবার বড্ড বেশি গোঁড়ামি।'

'ক্রীশ্চান!' চমকে উঠলুম, 'মুরুগা নাম যে!'

মুরুগা যে ভগবানের নাম—বোধহয় বালগোপাল বা এরকম কিছু—বালক রামচন্দ্রও হতে পারে—এদেশে এসে নানান সাইনবোর্ড দেখে সেইরকমই ধারণা হয়েছে।

'এদেশে অমন অনেক আছে স্যার,' মুরুগা উত্তর দিল, 'ক্রীশ্চানের নাম পিটার ভেঙ্কটেশ্বর—আমার আত্মীয়ের মধ্যেই আছে।'

একটুখানি চুপ ক'রে থেকে, একটা সঙ্কটজনক বাঁক সাবধানে পার ক'রে —এখন অনেকটা সমতলের দিকে আসছি অর্থাৎ নামছি, এখন আরও সতর্ক হতে হচ্ছে চালককে—আগের প্রসঙ্গের খেই ধরল আবার, 'ঐ যে মেয়েটাকে দেখলেন স্যার, ও আমার বৌ, দস্তুরমতো গির্জেয় মন্ত্র-পড়া প্রথম পক্ষের বৌ।'

'সে কি! প্রথম পক্ষ মানে? কটা বিয়ে করেছ এই বয়সে?'

'তা করেছি স্যার। দুটো বিয়ে আমার। বৌ না হ'লে সংসারধর্ম কি ক'রে চলে বলুন? আমি যে খুব একটা ইচ্ছে করেছিলুম তা নয়, মা-বাবাই জোর করলেন আরও। এ ছাড়াও—আর একটা কথা কি জানেন, এ বৌ পালিয়ে এসেছিল একজনের সঙ্গে, তাতে দুঃখও যেমন হয়েছিল তেমনি অপমান-বোধও। সেই জন্যেই আরও, মা-বাবা বলতেই বিয়ে করেছি, সবাইকে দেখাবার জন্যে যে আমার বৌ হবার জন্যে সাধাসাধি করে এমন মেয়ের অভাব নেই।'

'ছেলেপুলে হয় নি?'

'আগের বৌয়ের? না স্যার। দ্বিতীয় বৌয়ের হয়েছে। বিয়ে যখন করেছি

তখন সে ধর্ম তো পালন করতেই হবে। তাকে বঞ্চিত করব কী ক'রে? আর ধরুন, আমিও তো মানুষ, এই আমার ত্রিশ বছর বয়স, আমার দেহের দরকারও তো আছে। ভালবাসি একে ঠিকই—সে কথা তো শরীর মানবে না স্যার! সে চুপ ক'রে থাকবে না। একটা বাচ্ছা—মেয়ে একটা হয়েছে,—আর একটা হবে দু-তিন মাসের মধ্যেই।'

আবারও অনেকক্ষণ চুপ ক'রে রইল মুরুগা। আর একটা সিগারেট দিতে গেলুম, ঘাড় নাড়ল, 'নো, থ্যাঙ্ক ইউ স্যার, অল দ্য সেম।'

তারপর উদাস নেত্রে সামনের বাঁকা পথটার দিকে চেয়ে বলল, 'আসল ব্যাপারটা কি হল জানেন স্যার, সে সময় আমার বিয়ে করাই উচিত হয় নি। তখন আমার এক পয়সাও রোজগার নেই, সংসারের অবস্থাও যে খুব একটা ভাল তা নয়। মা-বাবারই সেটা ভাবা উচিত ছিল কিন্তু এদেশে কেউই এই দরকারী কথাটা নিয়ে মাথা ঘামায় না। গরিবের ঘর থেকে গরিবের ঘরে আসছে, যেমন জুটবে তেমনি থাকবে বৌ—কর্তারা এই রকমই ভাবেন সর্বদা। তখন আমি গাড়ি চালানোর কাজও ধরি নি—এক পয়সার সিগারেট কেনবারও অবস্থা নেই, দরকার হলে মা-র কাছে চাইতে হয়। সামান্য এক একর জমির ওপর ভরসা, কিছু ভাগ-চাষ হয়, অবসর সময় দড়ি পাকান বাবা, এই তো রোজগার। ঠিক সেই সময়টাই আবার পর পর দু'বছর অজন্মা গেল, ফসল কিছুই ঘরে উঠল না বলতে গেলে। অর্ধেক দিন উপোস ক'রে কাটত শেষের দিকটা। অল্প বয়স ওর, ক্ষিধের জ্বালা খুব। পেছনে লোকও লাগল। রূপটাও ছিল বিস্তর—দেখলেনই তো নিজের চোখে স্যার (হে ঈশ্বর!—মনে মনে ভাবি)। যদি তেমন ভাল কোন লোকের সঙ্গে যেত, ভালবেসে কেউ নিয়ে যেত—আমার দুঃখ থাকত না। ওর কপাল খারাপ—অদৃষ্টে জুটল একটা বদ লোক। মাতাল, জোচ্চোর, জুয়াড়ি—কোট্টায়ামের বাজারে নিয়ে গিয়ে তুলে দিনকতক লুটে নিয়ে একজনকে বেচে দিয়ে চলে গেল।'

'বেচে দিলে! সে কি! লোক বেচাকেনার আইন তো নেই।'

'আইনের খবর কে কত রাখছে বলুন। বিশেষ মেয়েছেলে। যার সঙ্গে স্বেচ্ছায় বেরিয়ে এসেছে সে-ই মালিক। সে যদি ইচ্ছেমতো বেচে দেয় তো কার কি বলার আছে—এই ওরা জানে। তাছাড়া ভয় দেখিয়ে মারধোর ক'রে

গায়ের জোরে কাবু করতে কতক্ষণ? বুঝলেন না স্যার।'

আর একটু থেমে বলল, 'প্রথমটা খুব রাগ আর অভিমান হয়েছিল, সেই ঝোঁকেই বিয়েও করলাম আর একটা। বৌ ছেড়ে দিয়ে চলে গেছে, এতে ডিভোর্স পেতেও দেরি হয় না তো। কিন্তু এবার বিয়ে করার পরই ওর জন্যে খুব মন-কেমন করতে লাগল। ওরই বরাত, দেখুন না স্যার। ও চলে গেল তারপরই আমার মাথায় গেল যে, এইটুকু জমির ওপর ভরসা ক'রে আমাদের আর চলবে না। গাড়ি চালানো শিখলুম, কাজেরও অভাব রইল না। কিন্তু যে থাকলে এ টাকায় সুখ হত সে-ই নেই। এসব কিছুই ভাল লাগে না, মনে কোন উৎসাহ পাই না। ঠিকমত খাটলে আরও বেশি রোজগার হয় কিন্তু কেবলই ভাবি এ টাকা আমাকে আর কী সুখ আনন্দ দেবে, মিছিমিছি কেন খাটব—বেকার।'

দূরে বড় একটা শহর আসছে। অত আলো শহর ছাড়া সম্ভব নয়। নিশ্চয়ই ত্রিবান্দ্রাম। আমাদের যাত্রা শেষ হয়ে আসছে। এ আলো আশার আলো, স্বস্তির আলো তাতে সন্দেহ নেই। রাত সাড়ে দশটা বেজে গেছে, দেহ আর বইছে না কারুরই, গাড়ি থেকে নামতে পারলে বাঁচি। তবু মনে হচ্ছে আর একটু দেরি হ'লে মন্দ হয় না—গল্পটা শেষ হয় তাহ'লে।

তবে এদিকেও আর অনাগ্রহ তেমন নেই। আলো মুরুগারও নজরে পড়েছে, সে-ও বলার বেগ দ্রুততর ক'রে দিল।

'শেষে এমন হ'ল বুঝলেন, যে, আর দিনে রাতে খেয়ে বসে সুখ রইল না। সেই সময়ে আমার এক বন্ধু এর কথা আমাকে বলে, ঐ বুড়ো মেয়েমানুষটাকে দেখলেন, ওর কথা। ও নাকি ভাল কড়ি চালাতে পারে, পাখী চালাও জানে, ভূত ভবিষ্যৎ গুণতে পারে। বন্ধু বললে, সে নিজে অব্যর্থ ফল পেয়েছে, এ বুড়ি যা বলেছে সব মিলে গেছে। তখন কি আর জানি যে এর কাছে কমিশন খেয়ে মক্কেল জোটাত সে।

'গেলুম বুড়ির কাছে—খুব বুড়ি নয় অবশ্য, ঐ রকম ডাইনীর মতো থাকে তাই বুড়ি মনে হয়—বললে, এসব গণনায় টাকা লাগে, অনেক টাকা। তিন দিন উপোস করে একমনে প্রার্থনা করলে নাকি ওর স্বামীর ওপর মেরি মায়ের

ভর হয়, তখন সে-ই বলে দেয় যা জানতে চাও। ছোটখাটো চুরি-টুরির ব্যাপার হলে সে-ই গুণে বলে দিতে পারত। কিন্তু এ অন্য ঘটনা তো। এই সব ভরে ওর পুরুষের—পরে জেনেছি স্যার, স্বামী না আরও কিছু, এমনি ভর করে—শরীর খারাপ হয়, কাজেই তার খেসারৎ চাই। বেশ, জিজ্ঞেস করলুম, কত টাকা চাই, বললে পুরো একশো টাকা লাগবে। তাই দিলুম, নতুন বৌয়ের একটিই গয়না ছিল, হার একটা, সেইটে আর আমার ঘাড় বাঁধা দিয়ে। সাতদিন ঘুরিয়ে অনেক ভড়ং ক'রে বললে, অমুক জায়গায় আছে, খুব বড় এক তহসিলদারের সঙ্গে বাস করছে। গেলুম খুঁজে খুঁজে, আরও একরাশ টাকা খরচ হ'ল—কোন পাত্তাই পেলুম না।

'তখনই বোঝা উচিত ছিল ওদের দৌড়, কিন্তু জানেন তো প্রেমে মানুষ বোকা হয়ে যায়। আবারও গেলুম ওর কাছে, ও বললে নিশ্চয়ই তোমার কোন অপরাধ হয়েছে, অন্য কোন মেয়েলোকের টাকা এনে আমাদের দিয়েছ, তাই মা অসন্তুষ্ট হয়ে মিথ্যে কথা বলেছেন।' আমিও বোকা বনে গেলুম, মনে হ'ল সত্যিই তো, এ বৌয়ের গয়না বেচেছি, এ ঘড়িও শ্বশুরই দিয়েছিল—ধরুন সেও বৌয়েরই। বললুম, 'তাহ'লে এখন উপায়?' বললে, 'তোমার খুব লোকসান হয়ে গেল—তা এক কাজ করো, এবার তুমি পঞ্চাশ টাকা দাও।' দিলুম ধার-দেনা করে এনে। সাতদিন পরে বললে, 'কোট্টায়ামে আছে—বেশ্যাপল্লীতে।' লাগে তাক না লাগে তুক, বুঝলেন না স্যার, এবার লেগে গেল। কোট্টায়ামে গিয়ে তিনদিন পথে পথে ঘুরে খবর মিলল—ঐ খবর। কিন্তু যে কিনেছে সে কোথায় নিয়ে গেছে সে খবর কেউ বলতে পারল না। ফিরে এসে, তখন বুড়ির ওপর অগাধ ভক্তি আর বিশ্বাস জন্মে গেছে, ওর পায়ে পড়লুম একেবারে। বুড়ির তাল মিলে গেল, নানান ভাবে দম দিয়ে দিয়ে টাকা দুয়ে নিতে লাগল। এদিকে দেনায় মাথার চুল পর্যন্ত বিকিয়ে যাবার দাখিল হ'ল আমার। না পেলুম মেয়েটার দেখা, না পেলুম কোন খবর। শেষে যখন হাত 'টাইট' করতে বাধ্য হলুম—একদিন বললে সে পাকা খবর পেয়েছে, কুইলনে আছে, খুব বড়-লোকের সঙ্গে বাস করছে। বৌয়ের নাকি আর ভাল লাগছে না, কিন্তু যে এখন মালিক সে ভীষণ কড়া লোক; পুলিসের বড় সাহেব তার শালা; আমি যে খোঁজ করেছি সে খবর নাকি তার কানে উঠেছে, বলে রেখেছে কুইলনে পা

"দিলেই নাকি, আমাকে ধরে কোন ছুতোয় হাজতে পুরবে। তাতে দরকার নেই, অনেক পয়সা সে আমার খেয়েছে তো—বেইমানী করতে পারবে না—সামান্য রাহাখরচটা দিলেই গিয়ে কোন একটা ফন্দী ক'রে মেয়েটাকে ওর কবল থেকে বার ক'রে আনতে পারবে।

'আমি তো স্যার পাগল তখন—লুকিয়ে মায়ের যা যৎসামান্য পুঁজি ছিল চুরি ক'রে এনে দিলুম ওকে পঁয়ত্রিশটা টাকা। আরও থাকলে হয়ত আরও দিতুম। কিন্তু পরের দিন দেখি যে ঘরদোর ফেলে সেখান থেকে হাওয়া দুজনেই —কোন চিহ্ন পর্যন্ত নেই। এইবার আসল খবরটা পেলুম আমার সেই বন্ধুর মুখে। তার এমন রোজগারটা বন্ধ হয়ে গেল, তাছাড়া তার নাকি অনেক পাওনাও হয়ে গিছল—মেজাজ খচে গেছে, বুঝলেন না? ওদের এটা ব্যবসাই ছিল, স্রেফ জোচ্চুরি। কিন্তু ভাঁওতা তো চিরদিন চলে না, বাজারে জানাজানি হয়ে আসছে দেখে, জায়গাটা গরম হয়ে উঠছে—পথে-ঘাটে অপমান হতে হচ্ছে, মরদটাও নাকি মদ খেয়ে বিস্তর দেনা করেছে, এক এক ভাটিখানারই পাওনা দেড়শো দুশো টাকা—বেগতিক দেখে সরে পড়েছে, শেষে এই বোকারামের টাকা ক'টা হাতিয়ে নিয়ে!

'সে হ'ল স্যার আজ এক বছরের কথা। বোকা হতে পারি, বা বোকা বলেই —আমার গোঁ খুব। আমি তখন থেকে লেগে আছি, হাত গুণিয়ে-ফুনিয়ে নয়, নিজেই খবর বার করেছি। অবশ্য দৈবও সহায় হয়ে গেল শেষটায়। কিন্তু যা শুনলুম তাতে আমার হাত-পা হিম হয়ে যাবার দাখিল এদের শয়তানীতে। বুড়িটা নাকি তিনিভেলির বাজারে হঠাৎ ওর দেখা পেয়ে যায়। খুব ভাল বর্ণনা দিয়েছিলুম তো, ফোটোও দিয়েছিলুম একটা—তাতে চেনার কোন অসুবিধেও হয় নি। ততদিনে ওর সে প্রথম মালিক আর এক বুড়োর কাছে বেচে দিয়েছে লীলাকে—মানে আমার এই প্রথম বৌকে—সে ভাড়া খাটাচ্ছে। এই শয়তানী সে বুড়োকে গিয়ে ভয় দেখিয়েছে যে লীলার স্বামী মানে আমি নাকি পুলিসে খবর দিয়েছি, পুলিস নিয়ে আসছি, ধরতে পারলে অব্যর্থ জেল—ভাল চায় তো বুড়ো যেন সরে পড়ে সেখান থেকে।

'বুড়ো সত্যিই ভয় পেয়ে পালাল সেখান থেকে। মেয়েটা হয়ে পড়ল একেবারে অসহায়। সে নাকি আমার কাছে সত্যিই আসতে চায় তখন। এরা

বোঝাল যে, তাদের সঙ্গে গেলে তারা ওকে নিরাপদ নির্জন জায়গায় রেখে চুপি চুপি আমাকে খবর দেবে, তারপর আমাকে অনেক বুঝিয়ে হাতে-পায়ে ধরে ঠাণ্ডা ক'রে মিলিয়ে দেবে। নইলে পুলিসে যদি ধরে তাকেও তো ছাড়বে না। বে-আইনী বেশ্যাবৃত্তি করার দায়ে তাকেও জেলে দেবে। এ মামলা নাকি এখানে অনেক হচ্ছে, 'নান' করবে বলে নিয়ে গিয়ে বাইরে চালান দিচ্ছে, তাতে পার্লামেন্টে গোলমাল হচ্ছে খুব, পুলিস ক্ষেপে আছে একেবারে। একে এই ভয় দেখানোয়, তাতে আমার দেওয়া ফটোটা দেখে বিশ্বাসও হয়েছে যে আমার লোক, সে বিনাদ্বিধায় এদের সঙ্গে চলে এসেছে।

'সেই থেকে এখানে এই জঙ্গলে আছে লীলা, এইখানে আশপাশের পাহাড়ী গাঁয়ের লোক ডেকে এরা ভাড়া খাটায়। পরনের কাপড় পর্যন্ত কেড়ে নিয়েছিল, ল্যাংটো ক'রে রাখত, যাতে না পালাতে পারে। এখন আমার কাছে বার করবে বলে নিজের ছেঁড়া কাপড় পরিয়ে এনেছিল। ঐ লোকটা একখানা বড় ছুরি দেখিয়ে রেখেছে, বলে কথা না শুনলে গলা কেটে দেবে, পাগল ক'রে দেবে—এই সব। এখানেও নানা মন্ত্রতন্ত্র জড়িবুটি নিয়ে বুজরুকি চালায়, বুজরুকি বলে তো জানে না লীলা—ওর ভয়ও হয়েছিল—মুখ বুজে সব সহ্য করেছে। তাও, যে শরীরটা ভাড়া খাটায়, সেটার যে যত্ন দরকার—সে জ্ঞানও নেই, কী ক'রে ফেলেছে দেখলেন তো। সুন্দর স্বাস্থ্য ছিল স্যার, দেখলে চোখ ফেরানো যেত না, এখন তো হাড় ক'খানায় এসে ঠেকেছে। শুধু চোখ দুটো দেখে চিনতে পারলুম। ঐ সুন্দর চোখ—ও আর কে পাবে বলুন।'

হে ঈশ্বর, প্রেমিকের দৃষ্টিতে কোন্ চশমা লাগিয়ে দাও তুমি! মনে মনে বলি। মুখে প্রশ্ন করি, 'তা এত কথা কে বললে তোমাকে?'

'ঐ তো স্যার, ধর্মের কল বাতাসে নড়ে। এখানে এই কাছেই একটা চোরাই ভাটিখানা আছে, সেখানেই খদ্দের বেশি। মানে লীলার খদ্দের—এরা ওইখান থেকেই যোগাড় করেছে সব। কিন্তু পৃথিবীতে ভাল-মন্দ সব মানুষই আছে, ঐ ভাটিখানার যে মালিক শম্ভুশিব নায়ার—খদ্দেরদের মুখে শুনতে শুনতে খুব মায়া বোধ হয়েছে তার, সে একদিন নিজেও এসেছে। তার কাছে একগাদা টাকা দেনা—তাছাড়া এক বোতল মদ পেলে ও লোকটা নিজের মা-বোনকেও ভাড়া খাটাতে রাজী—অবিশ্যি যদি কেউ চায়—কাজেই শম্ভু-

শিবকে আর 'না' বলতে পারে নি। সে-ই আদ্যোপান্ত সব শুনেছে, কী হাল চোখেই দেখেছে। লীলা তাকে আমার নাম-ঠিকানা সব বলেছে। তার যে এই আশা বা আমার ওপর ভরসা এসেছে এতটা—তার কারণ কি জানেন? আমি যে লীলার খবরের জন্যে পাগল হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছি, এত টাকা খরচ করেছি—বোকার মতো ঐ লোকটাই নেশার ঝোঁকে অনেকবার বলেছে লীলার কাছে। হাসা-হাসি করেছে কেমন আমাকে বোকা বানিয়েছে বলে। ওরা ভেবেছিল এই জঙ্গলের মধ্যেকার খবর আমার পাওয়ার কোন সম্ভাবনাই নেই। কিন্তু শম্ভুশিব লোকটাই—ওর এক কাকা থাকে কন্যাকুমারীতে—তাঁকে দিয়ে খবর পাঠিয়েছে।

'খবরটা পেয়েছি সবে কাল স্যার। সেই জন্যেই—গাড়ি এদিকে আসবে শুনে জর্জের হাতে-পায়ে ধরে এই ভাড়াটা তার কাছ থেকে নিয়ে নিলুম। এসবই ক্রাইস্টের যোগাযোগ—তাই না? তিনি তো দয়াময়, আমাদের দুঃখ চরমে পৌঁচেছে দেখে তাঁর করুণা হয়েছে। নইলে আজই বা এমন উল্‌টো পথে আসবার মতি কেন হবে আপনাদের, একগাদা টাকা দিয়ে গাড়িভাড়া করবেন?'

'তা এখন কি করবে?' প্রদোষ শুনছিল মন দিয়ে, সে-ই প্রশ্ন করে।

'ওকে ক'টা টাকা দিয়ে এসেছি, বলেছি শম্ভুশিবার কাছে জমা দিয়ে তার বাড়ি থেকে একখানা শাড়ি আনিয়ে নিতে। এখান থেকে ফেরার সময় ওকে তুলে নিয়ে যাব। বুড়িকে বলেছি যে পুলিসে খবর দেওয়া আছে, শম্ভুশিবা আমার লোক তাও জেনেছে—বুড়ির জোঁকের মুখে নুন পড়েছে। ওর মরদ তো মদ খেয়ে অজ্ঞান, সে আর কোন হারামজাদকী করার ফুরসুৎ পাবে না। দেখলেন তো, তখনই টলছে। তার ওপর আরও পয়সা দিয়েছি, তখনই গিয়ে আরও খানিক গিলেছে নিশ্চয়, কোথায় খানা-ডোবায় বেহুঁশ হয়ে পড়ে আছে।'

'তা ওকে নিয়ে গিয়ে কি করবে?' এবার আমিই প্রশ্ন করি।

'এখন তো ভাল ক'রে চিকিৎসা করাই দিন কতক। তারপর একসঙ্গেই ঘর করব তুই বৌ নিয়ে। বৌ মানে—বিয়ে করা তো আর যাবে না। যদি না নতুন বৌ ডিভোর্স করে। তা এমন তো লোকে রক্ষিতাও রাখে, অনেকে

বাড়িতে এনেও তোলে—তাই না হয় ধরে নেব। যদি দেখি মা-বাবা কি ছোট-বৌ খুব গোলমাল করছে—দুজনে অন্য কোথাও চলে যাব, গাড়ি চালানোর কাজ শিখেছি—যেখানে যাব দুটো ভাত জুটবে। যাই হোক, লীলাকে আমি ছাড়তে পারব না স্যার।'

গাড়ি ততক্ষণে ত্রিবান্দ্রাম স্টেশনে পৌঁছে গেছে। এতই ফেরার তাড়া ছেলেটার—দুপুরে মাদুরাই থেকে যে নতুন টায়ার কিনেছে, সেটা ছিল পিছনের কেরিয়ারে আমাদের মালের ওপর, এখানে মাল নামাবার সময় আগে নামিয়ে মাটিতে রেখেছিল, সেটা আবার তুলে নেবার কথা আর খেয়াল রইল না। কোনমতে আমাদের মালগুলো নামিয়ে দিয়েই টাকাটা প্যান্টের পকেটে গুঁজতে গুঁজতে গিয়ে গাড়িতে উঠে বোঁ ক'রে গাড়ির মুখ ঘুরিয়ে চলে গেল। সেখানটা অন্ধকার মতো—আমাদের মাল কুলির মাথায় ওঠাতে গিয়ে যখন নজরে পড়ল—টায়ারটা আমার চেনা, আমার সামনেই কিনেছে তখন ওর গাড়ি চোখের বাইরে অদৃশ্য হয়ে গেছে। পড়ে রইল সেখানেই, যার ভাগ্যে আছে সে-ই পাবে।

ছেলেটার জন্যে এখন যেন মন-কেমন করে—কথাটা ভাবলেই। লীলা ওর জীবনে অশুভ গ্রহের মতোই এসেছিল, আবার ওকে ঘরে নিয়ে যাবার চেষ্টা না করলেই পাবত। এসে পর্যন্ত তো ক্ষতিই করছে, পুনর্মিলনের সূচনাতেও আবার এত বড় ক্ষতি হয়ে গেল। ওর পক্ষে তো বিস্তর ক্ষতি বটেই। কে জানে কেমন আছে এখন, কোথায় আছে, আরও কি দুর্গতি হ'ল।

পরিণতি

শান্তিলালের সঙ্গে আমার প্রথম দেখা হয় ঠিক উনিশ বছর আগে।

সেতুবন্ধ রামেশ্বরে আমাদের যিনি মারাঠী পাণ্ডা তাঁরই ছড়িদার ছিল সে। আঠারো উনিশ বছরের কান্তিমান ছিপছিপে গুজরাটী ছেলে; চোখ দুটি উদাস, স্বপ্নালু; কণ্ঠস্বর মৃদু ও মধুর। নানা প্রদেশের তীর্থযাত্রী আসে বলে এদেশে সব পাণ্ডাই হিন্দীজানা ছড়িদার রাখেন। কিন্তু ইংরাজী জানলে আরও ভাল হয়। শান্তিলাল দেখলাম দুটোই জানে।

ওর সঙ্গে কথাবার্তা বলে ক্রমে আমার সন্দেহ হ'ল যে শান্তিলাল ঠিক সাধারণ ছড়িদার নয়। কোথায় ওর কি একটা মস্ত গোলমাল রয়ে গিয়েছে। একদিন সন্ধ্যার সময় সমুদ্রের ধারে গিয়ে বিরাট একখানা পাথরের ওপর বসলাম দু'জনে। সমুদ্রতীর জনহীন। শান্ত নিস্তরঙ্গ জলে আর নারিকেলশীর্ষে প্রথম চাঁদের লালচে আলো লেগেছে—ভারি মধুর পরিবেশ। একথা সেকথার পর ওর বাড়ির খবর জিজ্ঞাসা করলাম। চোখ নামিয়ে দু'একটা কথার জবাবও দিতে লাগল। অবশেষে ওর গলাটা জড়িয়ে খুব কাছে টেনে নিয়ে প্রশ্ন করলাম, 'ঠিক ক'রে বল তো শান্তিলাল, তুমি বাড়ি থেকে পালিয়ে এসেছ কিনা।'

হঠাৎ ওর দু'গাল বেয়ে জল গড়িয়ে পড়ল। তারপর কান্নায় ভেঙে পড়ল একেবারে—কান্না থামে না।

অনেক কষ্টে, অনেক আদর ক'রে ভোলানো গেল। ক্রমে ক্রমে একটু একটু ক'রে সব কথাই খুলে বললে সে। মিষ্টি গানের গুঞ্জনের মতো ওর গলা —খুব আস্তে কথা বলে। বেশ কান পেতে শুনতে হয়। যাক্—যা জানা গেল তা এই—ওর বাবা-মা নেই। বোম্বে শহরে ওরা থাকত। ওর দাদা আছেন, খুব বড় সরকারী চাকরী করেন অথচ ওকে কলেজে পড়াবেন না। ম্যাট্রিক পাস করার সঙ্গে সঙ্গেই ওকে একটা ব্যাঙ্কে ঢুকিয়ে দিয়েছিলেন। সামান্য মাইনেতে ডেস্‌প্যাচার হয়ে ঢুকেছিল শান্তিলাল। নিজের চেষ্টায় এক বছরের মধ্যেই ভাল কাজ শিখে লেজারে কাজ করছিল, মাইনেও বেড়েছিল। এমন সময়, মানে এই মাসখানেক মাত্র আগে—হঠাৎ ওর দাদা ওকে একদিন সামান্য কারণে যাচ্ছেতাই অপমান করেন। দারুণ অভিমান হয়, আর সেই অভিমানের বশেই ও এক কাপড়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসে। পকেটে সামান্য কিছু টাকা ছিল, তাই দিয়েই টিকিট কিনে ও এখানে চলে আসে এখানে পৌঁছে এক ধর্মশালায় পড়ে ছিল, অবশিষ্ট একটি টাকাকে আট ভাগে ভেঙে দৈনিক দু' আনা হিসাবে খেয়ে জীবনধারণ করছিল। এমন সময় এই পাণ্ডার নজরে পড়ে যায়। কথা কয়ে শান্তিলালের হিন্দী এবং ইংরেজী ভাষায় জ্ঞান আছে দেখে তিনি নিজে থেকেই ওকে চাকরী দিতে চান। দু'বেলা খাওয়া এবং বাসস্থান। সামান্য কিছু কাপড়-জামাও কিনে দিয়েছেন। দৈনিক চার আনা হিসাবে মাইনেও দেন।

কিন্তু শান্তিলালের সে চার আনা কিছুই থাকে না, যদিও সে বিড়ি এবং কল্কি কোনটাই খায় না। অধিকাংশ সময়ে সারা দিনে ভিক্ষে দিয়েই সে ঐ চার আনা উড়িয়ে দেয়। অন্য ছড়িদারদের প্রধান উপার্জন হ'ল যাত্রীদের কাছ থেকে আদায় করা বখশীস—কিন্তু শান্তিলালের আজও সম্ভ্রমে বাধে—সে কারুর কাছ থেকেই বখশীস নেয় না।

আরও দু'একটা প্রশ্ন ক'রে দাদার সঙ্গে ঝগড়ার বিবরণটাও জানা গেল। প্রায় সমবয়সী ওর একটি ভাইপো আছে। সেও স্কুলের পড়া শেষ করামাত্র দাদা তাকে কোন একটা অফিসে চাকরীতে ঢুকিয়ে দিতে চান, কিন্তু শান্তিলাল তার প্রতিবাদ করে। সে বলে, 'আপনার এমন কোন অভাব নেই যাতে আপনি ছেলেকে কলেজে পড়াতে পারেন না। আমার জীবনটা তো নষ্ট ক'রে দিয়েছেনই, ওরটা আর দেবেন না। আপনি না পড়াতে পারেন—আমি ওর খরচ দেব।'

তাতেই ওর দাদা খুব রাগ করেন। বলেন যে, 'আমি তোর জন্যে যা করেছি অন্য লোক হ'লে চিরদিন কেনা থাকত। আজকালকার দিনে একটা চাকরী যোগাড় করা কি সোজা কথা! আবার আমার কাছেই এসেছিস পয়সা দেখাতে! আমার ছেলের আখের আমি জানি না—? তুই আমার সামনে থেকে দূর হ'য়ে যা—আমি তোর মুখ দেখতে চাই না।'

আমি শান্তিলালকে অনেক বুঝালাম। বললাম ফিরে যেতে। এ জীবন ওর জন্যে নয়। এ তো এক রকমের আত্মহত্যা। ও লেখাপড়া শিখেছে, ব্যাঙ্কের কাজ শিখেছে—চাই কি কাজ করতে করতেও লেখাপড়া করতে পারে। যদি লেখাপড়াই উদ্দেশ্য ছিল তো ও সে দিকে না গিয়ে এমন ভেঙে পড়ল কেন? এ তো পুরুষের মতো কাজ নয়। ওকে ফিরে যেতে বললাম বার বার। অবশেষে নিমরাজী হ'ল সে। আমাকে ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিলাম। ও বললে, সে এবার থেকে পয়সা জমাবে—ফেরবার খরচ জমলেই ফিরে যাবে।

সেদিন আর কিছু শুনলাম না। পরের দিন ভোর বেলা আমাকে তুলে দিতে এসেছিল। শেষ রাত্রের ম্লান আলোতে ওর ছল-ছল চোখ দুটি দেখে বড় মায়া হ'ল। ছেলেমানুষের মতো দু'হাতে জড়িয়ে ধ'রে কেঁদে ফেললে ও। 'বাবুজী' 'বাবুজী' বলে আর কাঁদে।

গাড়ি ছেড়ে দিতে ওর শিথিল হাতে একরকম জোর করেই একখানা দশ টাকার নোট গুঁজে দিলাম। বললাম, 'বাকি যা লাগে তুমি যোগাড় ক'রে নিও। মোদ্দা আর দেরি ক'রো না।'

বস্তুটা কি বুঝতে বুঝতে গাড়ি বেশ স্পীড নিয়েছে। ফিরিয়ে দেবার অভিপ্রায়ে ও অনেকটা ছুটে এল—কিন্তু কাছে আর পৌঁছতে পারল না।

বছর আষ্টেক আগে কি একটা কাজে লক্ষ্ণৌ গিয়েছি। পানদরিবাতে আমার এক দিদি থাকতেন, তাঁর বাড়িতে গিয়েই উঠেছি। ঘেঁষাঘেঁষি অনেকগুলি বাড়ি—আরও অনেক ভাড়াটে। প্রতি বাড়ি পিছু তিন ঘর তো বটেই, আরও বেশি। ফলে সরু গলিপথে কত যে ছেলেমেয়ে খেলা করত তার ইয়ত্তা নেই। সন্ধ্যাবেলা দিদির নিচের তলার ঘরখানাতে বসা যেত না। এত গোলমাল—এক এক সময় মনে হ'ত কানে তালা লেগে যাবে।

দিদিকে কথাটা বলতে তিনি বললেন, 'বিশেষ ক'রে সামনের বাড়ির নিচের তলায় ঐ ভাড়াটের ছেলেগুলো। এত অসভ্য—বলবার কথা নয়। কারুর শাসন মানে না—দিনরাত হল্লা করছে; হয় আশেপাশে মারামারি করছে, নয় তো পাড়ার ছেলেদের সঙ্গে ঝগড়া করছে।'

'তা ওদের বাপ মা কিছু বলে না?'

'না। বাপটাও মেনিমুখো ভালমানুষ। মা-টা মাঝে মাঝে একটু বকাবকি করে, কিন্তু কত সামলাবে? সাত বছর বিয়ে হয়েছে—পাঁচটা ছেলে।…মুয়ে আগুন! যেমন বিয়ে করতে গিয়েছিলি! গলায় দড়ি এমন বিয়ের। বাঙালীর মেয়ে, বর জুটল না—এক মেড়োকে বিয়ে ক'রে বসলি!'

'তাই নাকি? কি রকম ব্যাপারটা?'

'ব্যাপার ট্যাপার অত জানি নে ভাই। প্রথম প্রথম বাঙালী দেখে দু এক-দিন আলাপ করেছিলুম। তারপর ঐ ব্যাপার দেখে আর পিরবিত্তি হয় নি। বরটা কাজ করে এখানের কোন এক ব্যাঙ্কে। আয় কম, সংসার বড়—বাড়ি-ভাড়া দিতে পারে না—বাড়িওলা আমাদের কাছে দুঃখের কান্না কাঁদে। হবে না, অধিক সন্তান দারিদ্দিরের লক্ষণ! আদ্ধেক টাকা তো ডাক্তার বদ্যিতেই যায়—তা আর কোথা থেকে দেবে?'

কৌতূহল বাড়ল। সেদিন বিকেল বেলা তাড়াতাড়ি কাজ মিটে গেল। বিকেল বেলাই এসে পৌঁছলাম। স্নান ক'রে চা খেয়ে আর বেরুতে ইচ্ছে হ'ল না, বাইরের ঘরের দোরটা খুলে, দোরের কাছাকাছি ইজিচেয়ারটা নিয়ে বসলাম। হৈ হৈ করছে দশ বারোটা ছেলেমেয়ে। তার ভেতর একরকমের মুখ চারটে ছেলে দেখে বুঝলাম এগুলিই সেই বাঙালী ভদ্রমহিলার ছেলে। বেশ ফুট-ফুটে তবে মোটা নয় কেউ। রোগা রোগা আর তেমনি দুর্দান্ত। বাকি আট নটা ছেলে মিলেও তাদের বাগে আনতে পারছে না। বার দুই মহিলাটিকেও দেখলাম। ক্লান্তসুরে এসে ছেলেদের শাসন করবার চেষ্টা করলেন কিন্তু বলা বাহুল্য কেউই শুনল না সে কথা। মেয়েটি দেখতে মন্দ নয়—ফরসা রং, এক-হারা সুডোল চেহারা। কিন্তু সুগভীর ক্লান্তি মুখে, চোখের দৃষ্টিতে। বয়স বেশি নয়— পঁচিশ-ছাব্বিশ হবে।

একটু পরেই দেখলাম স্বামী ফিরলেন। তাঁরও দেখলুম বয়স কম। যদিচ অকাল বার্ধক্যের ছাপ পড়েছে দস্তুর মতো। খোঁচা খোঁচা গোঁফদাড়ি, পোশাকের অবস্থাও নিতান্ত দীন। অবসন্ন ভাবভঙ্গী।

ভদ্রলোকের চোখ দুটোর দিকে চেয়ে কেবলই মনে হতে লাগল, কোথায় যেন দেখেছি ওকে। কিন্তু কিছুতেই মনে করতে পারলুম না। এই রকম চাহনি যেন আমার বিশেষ পরিচিত, মনের গভীরে বিশেষ কোথাও দাগ রেখে গেছে এই চাহনি—কোথায় সেইটে খুঁজে পাচ্ছি না।

খানিক পরেই ছেঁড়া একটা পায়জামা পরে ভদ্রলোক রাস্তায় বেরিয়ে ছেলেদের নাম ধরে ডাকলেন। সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে গেল—আরে, এ যে শান্তিলাল!

উত্তেজিত হয়ে ছুটে বাইরে এসে দাঁড়ালুম।

ডাকলুম—'শান্তিলাল!'

শান্তিলাল অবাক হয়ে মুখ তুলে তাকাল। চিনতে পারল না।

'শান্তিলাল, চিনতে পারছ না? সেই রামেশ্বরে দেখা হয়েছিল ১৯৩৭ সালে?'

তবুও ওর চোখ থেকে বিহ্বলতা কাটে না।

অনেকক্ষণ পরে একটা অস্পষ্ট শব্দ ক'রে ছুটে এল—'বাবুজী!'

ঘরে এসে বসলাম। দিদিকে বলে চা আনালাম।

'এ কী ব্যাপার শান্তিলাল ? এ কী গেরো তোমার ?'

মাথা নিচু ক'রে রইল শান্তিলাল অনেকক্ষণ। আজও ওর চোখ ছলছল ক'রে এল, কিন্তু জলটা আর বেরোল না।

অবশেষে সেই রামেশ্বরের দিনটির মতোই আস্তে আস্তে একটু একটু ক'রে যা বলল তা এই ঃ

আমার সে টাকায় ওর বাড়ি ফেরা হয় নি। এক বুড়ী মারা গিয়েছিল, ওর বাস যে বাড়িতে ছিল সেইখানে। অর্থাভাবে সৎকার হচ্ছিল না বলে ও পাঁচটি টাকা দান করে। আর কোন দিনই সে টাকা জমাতে পারে নি। লজ্জায় দাদার কাছেও লিখতে পারে নি। এই ভাবে বছর দুই কেটে যায় আরও। এমন সময় আসে একটি বাঙালি পরিবার। তাদের তিন দিন থাকার কথা কিন্তু একটি ছেলের অসুখ করায় আটকে পড়ে। তিন সপ্তাহ দেরী হয়। শান্তিলালই দেখাশুনা করত। এই মেয়েটি তাদেরই বাড়ির মেয়ে। কি চোখে দেখে শান্তিলালকে সে—দিনরাত ওকে অনুসরণ করতে শুরু করে। প্রথমটা শান্তিলাল আমল দেয় নি কিন্তু একটি তরুণী মেয়ের এমন একান্ত ভালবাসা কতক্ষণ তার মতো ছেলে অবহেলা করে ? অবশেষে সেও একটু আকৃষ্ট হ'ল। সমুদ্রের ধারে, বালির পাহাড়ের আড়ালে—দেখা হ'ত ওদের। শেষে একদিন কল্যাণী এক কাণ্ড করে বসল। রাত্রিবেলা আরতি দেখার ছুতো করে গিয়ে একটু আবছায়ায় ডেকে নিয়ে গেল ওকে, তারপর হঠাৎ গলায় একটা প্রসাদী মালা পরিয়ে দিয়ে বললে, 'আজ থেকে তুমিই আমার স্বামী, এই মন্দিরে দাঁড়িয়ে তোমাকে বরণ করলুম।'

এর পর আর ফেরার উপায় রইল না। কল্যাণী তখনকার মতো চলে গেল কিন্তু মাদ্রাজ পর্যন্ত গিয়ে ফিরে এল আবার—ওরা দুজনে ওখানেই বিয়ে শেষ ক'রে চলে এল বোম্বেতে। ওর হাতে একটি পয়সাও ছিল না, কল্যাণী যা নিয়ে এসেছিল তাই ভেঙে খেতে লাগল আর পাগলের মতো চাকরী খুঁজতে লাগল। কিন্তু তখন যুদ্ধ থেমে গেছে। চাকরী যাবার আওয়াজ চারদিকে, ওকে দেবে কে ? শেষ অবধি সেই বড় ভাইয়ের শরণাপন্ন হ'তে হল। তার হাতে পায়ে ধরে এই ব্যাঙ্কে একটা কাজ পেয়েছে। আগে ছিল আগ্রায়, সেখান থেকে

লক্ষ্ণৌতে এসেছে বদলি হয়ে। মাইনে যা পায়, তাতে কুলোয় না—টিউশানী করতে হয়। তার ওপর সংসারের সহস্র ঝামেলা। অসুখ বিসুখে জেরবার, ছেলেগুলো অসভ্য হয়ে উঠছে, তাদের পড়াশুনোরও সুবিধে করতে পারছে না। কল্যাণীর শরীর একেবারে ভেঙে এসেছে। একটা রাঁধুনী রাখা উচিত হয়ত, কিন্তু শান্তিলালও আর পারে না। ব্যাঙ্কে খুব খারাপ মাইনে পায় না কিন্তু তার নিত্য অভাব মেটাবে কে ? তার ওপর ঘরে এতটুকু সুখ নেই। কল্যাণীর কাছে এলেই শোনে নিত্য অভিযোগ আর তার রকমারী অসুখের ফিরিস্তি। ইদানীং আবার ওর সন্দেহ বাতিক বেড়েছে। মনে হয় কেবলই যে, সে রুগ্না স্ত্রী বলে বাইরের কোন মেয়ের দিকে আকৃষ্ট হচ্ছে শান্তিলাল। মধ্যে একটি ভাল টিউশানী পেয়েছিল কিন্তু ছাত্রের এক তরুণী দিদি আছে শুনে কল্যাণী কিছুতেই সেটা নিতে দিলে না।

সব কথা শেষ ক'রে শান্তিলাল বললে, 'এক-একসময় মনে হয় বাবুজী যে রেলের লাইনে গিয়ে মাথা পেতে দিই—আমার সব যন্ত্রণা শেষ হয়ে যাক। এমন জীবন আর আমি সইতে পারি না।'

এতক্ষণ পরে সত্যিই তার চোখে জল এসে গেল।

অনেক করে বোঝালাম ওকে। গায়ে হাত বুলিয়ে মাথায় হাত রেখে অনেক আশা ও আশ্বাসের বাণী শোনালাম। তিরস্কারও করলাম কিছু। এত-গুলি ছেলে হ'তে দেওয়া তার কিছুতে উচিত হয় নি। তার স্ত্রী শুনলাম আই. এ. পাস মেয়ে—একেবারে নিরক্ষর নয়—সেও আজকালকার ছেলে—সতর্ক হওয়া উচিত ছিল না কি ?

মাথা নিচু ক'রে শুনল শান্তিলাল। একটু যেন সান্ত্বনা পেল মনে হ'ল। ওঠবার সময় আমার হাত দুটো চেপে ধরে বললে, 'বাবুজী, আপনাকে ভগবান পাঠান। যখনই আমি চারিদিকে অন্ধকার দেখি তখনই আপনি আসেন কোথা থেকে। আপনার কথা আমি ভুলব না।'

পরের দিনই চলে আসতে হ'ল। এসেও একখানা চিঠি দিয়েছিলাম কিন্তু কোন উত্তর পাইনি। বুঝলাম দিনরাতের নিরন্ধ্র নিরবসরে এ সব অকেজো চিঠি লেখার সময় পায় নি সে।

তারপর আবার ধীরে ধীরে ভুলেই গেলাম।

গত বছর গরমের সময় হৃষিকেশ গিয়েছিলাম।

গঙ্গার কাছাকাছি একটা নতুন ধর্মশালা দেখে উঠেছি, ইচ্ছা—কয়েক দিন চুপচাপ শান্তিতে কাটাব। নেহাতই একা এসেছি—তাই গঙ্গার ধারে ধারে ঘুরে বেড়াই। সাধুদের ঝোপড়া দেখে গিয়ে উঠি, আলাপ করি। সত্যি-সত্যিই যে তাদের কাছ থেকে কিছু পাব সে রকম কোন প্রত্যাশা নেই—অলস কৌতূহল বশেই যাই।

এর ভেতর একটি আড্ডায় যাতায়াত বেড়ে গেল। পাশাপাশি তিনটি ঝোপড়া বেঁধে জন-পাঁচেক সন্ন্যাসী ও সন্ন্যাসিনী বাস করতেন, হঠাৎ একদা আবিষ্কার করলাম যে এরা সবাই বাঙালী। যদিও কথাবার্তা ও ভাবভঙ্গীতে তা আদৌ বোঝার উপায় ছিল না।

একদিন সকালে গিয়ে বসে আড্ডা দিতে দিতে দেরী হয়ে গেল। বিষয় ছিল পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে জমাট—ভগবান। তর্ক করতে করতে সূর্য মধ্যাহ্ন গগনে পৌঁছে গেছেন কখন—একটুও লক্ষ্য করি নি। দলেব সর্বকনিষ্ঠ যেটি সেটি অবশ্য আগেই কালীকমলি ধর্মশালায় চলে গিয়েছিল—ওখানকাব সদাব্রত থেকে তাঁদের আহার্য আসত। ডাল ভাত ও রুটি—গুনে গুনে মাথা পিছু করে দেন তাঁরা। ছোকরাটি একসঙ্গে নিয়ে আসে, এখানে এসে ভাগ হয়।

আজ দেখলাম ভাগ হওয়ার সময় এরা আবার প্রত্যেক ভাগ থেকে এক-খানা দুখানা হিসাবে রুটি আলাদা ক'রে এক জায়গায় জমা করছেন।

প্রশ্ন করলুম, 'ও আবার কার ?'

চৈতন্যানন্দ অবধূত উত্তর করলেন, 'আর বলবেন না মশাই। এক ছোকরা সাধু আজ মাস কতক ঐখানে এক ঝোপড়া বেঁধে এসে আছে—সে না বেরুবে কোনদিন ভিক্ষায়, না করবে কোন সদাব্রতের টিকিট। অনেকদিন খোঁজখবর করি নি—শেষে একদিন দেখি কঙ্কালসার অবস্থা। কত করে বললাম—কিন্তু ও কোথাও নড়বে না। বললেই বলে—কাল বেরুব। কিন্তু কোথাও বেরোয় না। অগত্যা কি করি—কৃষ্ণের জীব মারা যাবে—এই নিজেদের মধ্যে থেকে ভাগজোগ ক'রে দিই। বলি কোনমতে জীবনটা রক্ষা হোক।'

'কোন্ সম্প্রদায় ওর ?'

'কে জানে মশাই কোন্ সম্প্রদায়।' মুখটা উলটে উত্তর দেন অবধূত, 'চুপ চাপ তো পড়ে থাকে, কি যে সাধন ভজন তাও বুঝি না। স্নান ক'রে এসে ভিজে কাপড়েই বসে থাকত, গত মাসে এক রাণী সাহেবা এসে সব সাধুকে একখানা ক'রে কাপড় দিয়েছিলেন সেই থেকে ছুছোট হয়েছে, এক নাপিত অবস্থা দেখে দয়া ক'রে এসে মাঝে মাঝে মাথা গোঁফদাড়ি কামিয়ে দিয়ে যায়, তা নইলে জটা বেঁধে যেত। অথচ জটাধারী সন্ন্যাসী ঠিক নয়।'

কৌতূহল হ'ল কিন্তু তখন আর সময় নেই। স্নান ক'রে হোটেলে খেতে যেতে হবে, নইলে হরিমটর।

বিকেলবেলা গেলাম খোঁজ ক'রে ক'রে সেই সাধুর আস্তানায়। ঝোপড়ার অবস্থাও তথৈবচ। কিন্তু সাধুজী তখন বাইরে একটা পাথরে বসে একদৃষ্টে গঙ্গার দিকে চেয়ে আছেন।

পাশে গিয়ে বসতেও ফিরে তাকাল না। তন্ময় হয়ে কি যেন ভাবছে।

আমিই চেয়ে চেয়ে দেখতে লাগলাম। এক রাশ গোঁফদাড়ি ও বড় বড় চুল, তার মধ্যে থেকে কিছুই প্রায় দেখা যায় না, শুধু চোখ দুটি ছাড়া। কিন্তু সে চোখও অন্য দিকে ফেরানো।

একবার গলা খাঁকারি দিতে এদিকে ফিরল। চোখ দুটো মনে হ'ল বড় চেনা চেনা। কিন্তু এবার আর দেরী হ'ল না বেশি, একটু ভাবতেই চাউনিটা মনে প'ড়ে গেল।

অবাক হয়ে ডাকলাম, 'শান্তিলাল!'

শান্তিলাল চমকে ফিরে তাকাল। খানিকটা বিহ্বল হয়ে চেয়ে থাকবার পর চিনতে পারলে, 'বাবুজী!'

পাশে গিয়ে বসলাম। প্রশ্ন করলাম, 'এ কি হ'ল শান্তিলাল, এমন হ'ল কি ক'রে? তোমার বউ, ছেলেমেয়ে?'

মাথা হেঁট ক'রে ব'সে রইল অনেকক্ষণ, তারপর বললে, 'পালিয়ে এলাম বাবুজী, আর পারলাম না।'

'পারলে না কি? তারপরে? তাদের কি অবস্থা?'

শান্তিলাল বললে, 'যা হয় হয়ে যাবে একটা। লেখাপড়া জানে কল্যাণী, চাকরীবাকরী একটা জুটিয়ে নিতে পারবে। কিন্তু সে কথা ভাবতে গেলে

আমার আর চলত না। সত্যিই একদিন আত্মহত্যা করতে গিয়েছিলাম। এক সাধু শেষ মুহূর্তে আমাকে টেনে নেন বলতে গেলে গাড়ির চাকার নিচে থেকে। তিনিই একখানা গেরুয়া কাপড় ভিক্ষা দেন আমাকে। সেখান থেকে সোজা চলে এসেছি এখানে।'

অনেক বোঝালাম। বাড়ি ফিরে যেতে বললাম কিন্তু সে হাতজোড় করে কেবল। 'আমাকে ছুটি দিন বাবুজী। আমি অকর্মণ্য, আমি অমানুষ। আমি ও সব পারব না। আমি মরতেই চেয়েছিলাম। ঈশ্বর যে কদিন বাঁচিয়ে রাখেন থাকব—নইলে আমি নিজে থেকে বাঁচবার কোন চেষ্টাই করব না। আমাকে মাপ করুন।'

অগত্যা ফিরে এলাম।

সামনে শীত আসছে। এখনই বেশ গা শিরশির করে। কী করবে এখন বেচারী! কিছুই তো নেই। আসবার সময় পুরনো কম্বলটা দিয়ে এলাম ওকে। আর একটা কাপড়। প্রত্যাখ্যানও করলে না, ধন্যবাদও দিলে না, শান্তভাবে গ্রহণ করলে মাত্র।

হয়ত কল্যাণীকে খবরটা দেওয়া উচিত ছিল কিন্তু ভেবেচিন্তে সে চেষ্টা আর করলাম না।

এতদিনে নিশ্চয়ই একটা ব্যবস্থা সে ক'রে নিয়েছে। তা ছাড়া ও মানুষকে জোর ক'রে সংসারে ফিরিয়ে আনলে তারই ভার বাড়বে—কোন উপকার হবে না।

বোনাস্

বোনাসের টাকা হাতে পেয়ে আর একবার নিজের বুদ্ধিকে তারিফ করল অভিজিৎ।

তারিফ অবশ্য অনেকদিন ধরেই করছে। যেদিন থেকে এই বোনাসের হিসাবটা ঘোষণা করা হয়েছে, সেইদিন থেকেই। কিন্তু আজ করকরে সাড়ে চারশো' টাকা হাতে গুণে পেতে আরও বেশি ক'রে করল।

অথচ প্রথম যেদিন ও পাকা সরকারী চাকরী ছেড়ে অপেক্ষাকৃত অল্পবয়সী

এবং অল্পখ্যাত ভাটিয়া ফার্মে কাজ নিয়ে এল—সেদিন ঘরে বাইরে লাঞ্ছনার শেষ ছিল না। মা কান্নাকাটি করেছিলেন (কিছুই বোঝেন না তিনি চাকরী-বাকরীর—তবু করেছিলেন; ভেবেছিলেন—ভেবেছিলেন কেন, প্রকাশ্যেই বলেছিলেন—তাঁকে ও তাঁর নাবালক দুটি ছেলেকে পথেই বসাবে বলে সংকল্প করেছে ভজু। নইলে এই বাজারে সরকারী চাকরী কেউ ছাড়ে?). পুরো এক-দিন জল মুখে দেন নি। কাকা মামা প্রভৃতি অভিভাবক স্থানীয়রাও দীর্ঘ দীর্ঘ উপদেশ দিয়েছিলেন। বলেছিলেন, 'হ্যাঁ, আজকাল মার্চেন্ট অফিসে ঢের সুবিধে পাওয়া যায় স্বীকার করি, সরকারী অফিসে সেসব কিছু নেই। কিন্তু এ যদি মার্চেন্ট অফিসের মত মার্চেন্ট অফিস হ'ত বলবার কিছু থাকত না। টাটা বল, বার্মাশেল বল, ম্যাকিনন ম্যাকেঞ্জী বল—এসব মানে বুঝতে পারি। কিন্তু এ একটা ভাটিয়া ফার্ম, আজ আছে কাল নেই—রাতারাতি কবে গণেশ ওলটাবে আর নাম পালটাবে টেরও পাবে না। এখানে থাকার কোন অর্থ নেই!'

এমন কি ওর ভাবী বধূ—ওর বড়বাবুর ভাষায় 'ফিয়াঁসে' অনিলাও আপত্তি করেছিল; বলেছিল, 'এখনও সময় আছে, ভাল ক'রে ভেবে ছাখ অভিজিৎ। হাজার হোক পাকা চাকরী একটা। এর পর যদি ওখানে কিছু হয়, সরকারী চাকরীতে আর ফিরে আসতে পারবে না। সে বয়স তোমার গেছে।'

একমাত্র ওর কথাতেই একটু দমে গিয়েছিল অভিজিৎ, একটু দ্বিধায় পড়ে-ছিল। তবু শেষ পর্যন্ত পিছিয়ে আসে নি। বলেছিল, 'নাথিং রিস্ক নাথিং গেন নীলা। তেবে ছাখো এখানে থাকলে কোনদিনই তোমাকে বিয়ে করতে পারব না। দুটি নাবালক ভাই একদিন সাবালক হবে কিন্তু ততদিনে আমারও চুলে পাক ধরে যাবে। তুমি আমি দু'জনেই ততদিনে কন্‌ফার্মড্ ব্যাচেলার হয়ে পড়ব। এ তবু একটা চান্স থাকে—দেখাই যাক না।'

অনিলাকেও এ চাকরী ছাড়বার প্রস্তাব করেছিল অভিজিৎ, কি অনিলা রাজী হয় নি। সাহস করে নি। তার বাড়িতে অন্ধ বাবা ও চিররুগ্না মা। বাবা যখন ব্লাড প্রেসারে অকালে অন্ধ হয়ে যান তখন যথাসর্বস্ব খরচ করে তাঁর অফিসের টাকা তো বটেই, মার যা কিছু ছিল গহনাগাঁটি সব বেচেই চিকিৎসা করানো হয়ে ছিল। মূর্খতাই হয়েছিল হয়ত, বারণও করেছিল কেউ

কেউ, কিন্তু একটা আপাত সুস্থ সবল ছেচল্লিশ বছরের লোক একেবারে অন্ধ হয়ে যাবে—এ ওরা কেউ ভাবতে পারে নি। মেনে নিতে রাজী হয় নি ভাগ্যের এই নিদারুণ আঘাত। ফলে ঘরের সমস্ত সঞ্চয় ধুয়ে বেরিয়ে গিয়েছিল, শুধু বাবার চোখটা ফেরে নি।

ওর বাবার যখন এই ব্যাপার হয় অনিলা তখন আই. এস. সি. পড়ছে। ঐ দুর্যোগের মধ্যেও কোনমতে পরীক্ষাটা দিতে পেরেছিল। পাসও করেছিল টায়ে টায়ে, কিন্তু তারপর আর এগোতে পারে নি। চাকরীর খোঁজে বেরোতে হয়েছিল। তদ্বির করার লোক ছিল না—সোজা রাস্তায় পরীক্ষা দিয়ে যা হয় —সুতরাং এই সরকারী চাকরাটা পেয়েই যেন কৃতার্থ হয়েছিল সেদিন— ভাগ্যকে ধন্যবাদ দিয়েছিল মনে মনে।

কাজেই, তার যদি এ চাকরী ছাড়তে সাহসে না কুলোয় তো তাকে দোষ দেওয়া যায় না। একটি মাসও মাইনে না পেলে চলবে না তার—সবাইকে উপোস ক'রে থাকতে হবে। এমনিতেই যে অবস্থায় থাকে সে—টালিগঞ্জ অঞ্চলে একখানি মাত্র ঘর ভাড়া ক'রে বাস করে ওরা, একটা লোয়ার ডিভিশান ক্লার্কের মাইনেতে কোনমতে প্রাণ ধারণ ও লজ্জা নিবারণই হয় তিনটে লোকের—তার চেয়ে বেশি কিছু নয়।

বাড়ির অবস্থা অভিজিতেরও অবশ্য খুব ভাল নয়। সে এখন বি. এ. পাস করেছে বটে কিন্তু সেও ঢুকেছিল ম্যাট্রিক পাস করেই—এল. ডি. ক্লার্ক হয়েই। মাইনে তারও শোচনীয় রকমের কম। তারও কোথাও কিছু সঞ্চয় নেই, কারণ তার বাবাকে চারটি কন্যার বিবাহ দিয়ে যেতে হয়েছিল। যা দু'এক কুঁচি সোনা তবুও অবশিষ্ট ছিল—তাও বাবার শ্রাদ্ধে এবং তাঁর চারটি কন্যার বাড়ি লোক-লৌকিকতা বজায় রাখতে নিঃশেষে বেরিয়ে গেছে। তারও এক মাস মাইনে ঘরে না এলে সঙ্কটজনক পরিস্থিতির উদ্ভব হবে।

তবু সে সাহস ক'রে ছেড়েই দিয়েছিল চাকরী।

সাহসের মূলে দুটো ভরসা ছিল তার। প্রথম হ'ল পৈতৃক এই বাড়িটা। নিতান্তই সামান্য বাড়ি পুরনো—ভাঙা, তবুও ভাড়া দিতে হয় না; এ একটা মস্ত বড় সুবিধা। আর একটা হল টিউশানি। সে বি,-এ, পাস করেছে টিউশানী গোটাকতক যোগাড় করা খুব কঠিন হবে না। এখনই দুটো করে—নইলে

সংসার চলত না, ভাইদের লেখাপড়া শেখার বিপুল ব্যয় ঐ 'এল. ডি'র মাইনে থেকে যোগানো যেত না। প্রয়োজন হলে আরও দু'একটা করতে পারবে, পুরনো সহকর্মীদের বললে ছাত্রছাত্রীরও অভাব হবে না।

এই ভরসাতেই, সামান্য ক'টি টাকা বেশি মাইনের জন্য সরকারী চাকরী ছেড়ে এখানে এসেছিল। এবং এখন দেখছে ভুল করে নি। এই এক বছর চাকরীতেই কুড়ি টাকা মাইনে বেড়েছে, নগদ সাড়ে চারশো' টাকা বোনাস পেয়েছে। যা নাকি পাকা সরকারী চাকুরে অনিলা দত্তের স্বপ্নেরও বাইরে!

সাড়ে চারশো টাকা।

চেক নয়-নগদ টাকাই। হাতে পেয়ে ভাল ক'রে গুণে দেখলে আর একবার।

মনে হ'ল অনেক টাকা। অভাবনীয় রকমের অনেক।

এত টাকা নিয়ে কী করবে সে?

প্রথমেই তার মনে হ'ল চেঞ্জে যেতে হবে কোথাও। দীর্ঘদিন একটানা খাটছে সে, এর মধ্যে কোথাও কোন ছেদ পড়ে নি, বিশ্রাম পায় নি। সবচেয়ে যেটা পীড়াদায়ক—বাড়ি অফিস ও ছাত্রদের বাড়ি—এই তিন-চারটি সঙ্কীর্ণ, ঘেঞ্জা, জনবহুল নোংরা পাড়ার মধ্যে সীমিত হয়ে আছে তার জীবন গত সাত-আট বছর ধরে। বাইরে যাওয়ার কথা তো ভাবাই যায় না—বহু পরিচিত এই কটা বাঁধা রাস্তার বাইরে যে কলকাতারই বিপুল একটা অংশ পড়ে আছে, সেখানেও তো যাওয়া হয় নি কোনদিন।

না, বাইরে সে যাবেই। কারুর কোন কথা শুনবে না। নীলাকে নিয়ে যাবার উপায় নেই, নইলে তাকেও সঙ্গে নিত। কিন্তু তাই বলে—তার যাবার উপায় নেই বলে—অভিজিৎও চুপ ক'রে বসে থাকবে—তা হবে না। ওর শরীরও খারাপ হয়েছে খুব, সেটা আর কেউ না বুঝলেও অভিজিৎ নিজে বুঝছে। বাড়ির লোক তো বুঝবেই না, তারা ভাববে এটা বাজে খরচ, এ টাকাটাও তাদের জন্য ব্যয় করা উচিত। যে লোকটা টাকা রোজগার করে—তার জন্য একটু বিশেষ বিবেচনা যে থাকা উচিত—এ কথা ওদের মাথাতেই যায় না। সুতরাং মাকে মিছে কথাই বলতে হবে, বলতে হবে পাস পাওয়া

যাচ্ছে, তাই। কত টাকা বোনাস পেয়েছে, তাও বলা চলবে না। কারণ তাহলেই হিসেবের প্যাঁচে পড়তে হবে। সংসার বড় বিচিত্র জায়গা, নিজের টাকা নিজের খুশি মতো খরচ করবার জো নেই।

পূজার বাজার—হ্যাঁ, তাও কিছু কিছু করবে বৈকি। টাকাও তো কম নয়। অনেক টাকা। দেড়শোটি টাকা সে সরিয়ে রেখে দেবে নিজের জন্যে—মানে ঐ বিদেশ যাত্রার জন্যে। পুরী কিম্বা কাশী—যাওয়া-আসা, সাত-আটদিন হোটেলে থাকা—সবই ওতে চলতে পারবে। বাকী থাকে তিনশ' টাকা। তার মধ্যে ওদের কাপড় জামা জুতো সব হয়েও কিছু বাঁচবে। পুজোর কদিন, যে কদিন ও থাকবে না—সে কদিন মা আর ভাই দুটো একটু কিছু ভাল-মন্দ খেতে পাবে যাতে সে ব্যবস্থাও করবে। একসেরী একটা ঘিয়ের টিন আর সাদা ময়দা কিনে দিয়ে যাবে সে নিজেই। অন্তঃ লুচির ব্যবস্থাটা হয়ে থাক।

অফিসের ডেস্কেই চাবির মধ্যে দেড়শো টাকা আলাদা ক'রে রেখে দিল অভিজিৎ। আজ আর সে সন্ধ্যায় টিউশানীটা করবে না, ছাত্রের পরীক্ষা হয়ে গেছে, সে না গেলেও ক্ষতি নেই। বরং বাজারটাই সেরে ফেলবে।

অফিস থেকে বেরিয়ে একটা রিক্সা করল অভিজিৎ, এতগুলো টাকা নিয়ে ট্রামে বাসে চড়তে সাহস হ'ল না। ট্যাক্সি পেলে ট্যাক্সিই করত। কিন্তু এ সময় ব্রাবোর্ন রোডে ট্যাক্সির আশা করা আর লটারীর টিকিট কেটে পাবার প্রত্যাশা করা একই। বরং দেখা যাবে বাজার-হাট ক'রে ফেরবার সময়।

রিক্সায় যেতে যেতে ফর্দটা ভেবে নিল একবার মনে মনে।

মার থান একটা, মেজ ভাইয়ের ট্রাউজার শার্ট—ছোট ভাইয়ের হাফপ্যাণ্ট আর শার্ট। ধুতি পাঞ্জাবি ওরা কেউ পরে না—সুতরাং ওসব হাঙ্গামা ক'রে লাভ নেই। নিজের? হ্যাঁ নিজেরও কিছু চাই বৈকি। তবে সে পরের কথা। ওসব এখন থাক।

দোকানের সামনে গাড়ি থেকে নেমে থমকে দাঁড়াল অভিজিৎ।

আচ্ছা, মার জন্যে একখানা তসরের কাপড় নিলে কী হয়? আহ্নিক পূজা করেন আজ্কে দিন ভিজে কাপড় পরে—সুতির কাপড় সহজেই নোংরা হয়ে যায়, ঐটুকু বাড়িতে সকলের ছোঁয়া বাঁচিয়ে শুকোনোই শক্ত। ভূতের মত খাটে বেচারী—রান্নাবাড়া থেকে সবই—একটা ঠিকে ঝি আছে তাও সে মাসে সাত-

দিন কামাই করে। অথচ ওরা তার জন্যে বলতে গেলে কিছুই করতে পারে নি। বাবা চোখ বোজবার পর থেকে শুধু ঝিয়ের কাজই করছে না—ঝিয়ের মতোই দুখানি থান কাপড় ভরসা হয়েছে। মা ধোপার বাড়ি কাপড় দিচ্ছেন এই বছর খানেক—নইলে ছেলেদের কাপড় জামা কাচতে দিলেও নিজে বরাবর ক্ষারেই কেচে নিয়েছেন বাড়িতে।

ওঃ—হঠাৎ একখানা তসরের কাপড় পেলে কী খুশীই হবেন মা! নেবো নাকি? কতই বা পড়বে। গত বৈশাখে ওর বড়বাবুর সঙ্গে কিনতে এসেছিল—দেখে গেছে, টাকা পঁয়ত্রিশ হলেই একখানা চলনসই তসরের কাপড় হয়।...

সিল্কের কাউন্টারে গিয়ে প্রথমেই তসরের কাপড়টা কিনে ফেলল অভিজিৎ। দেখল তার হিসাব ভুল হয় নি। সাঁইত্রিশ টাকাতেই পেল কাপড়টা—বিক্রয় কর সুদ্ধ।

কিন্তু ঐটে কিনতে কিনতেই নজর পড়ল পাশে নানা রকম রেশমী জামার কাপড়। গরদ মটকা—তসর মটকা, বাফতা—আরও কত কি!

ভাই দুটোর জামার জন্যে একটু এই জাতীয় কাপড় নিলে হয় না? নিজেকেই নিজে প্রশ্ন করে অভিজিৎ। বেচারীরা তো কখনই কোন ভাল জামা পরতে পায় না—বাবার আমলে তবু যা হয় হয়েছে। তিনি মরবার পর সস্তা ছিটের শার্ট ছাড়া আর কিছুই দিতে পারে নি সে। কত আর লাগবে! পৌনে চার গজেই হয়ে যাবে বোধ হয় দুটো জামা।

নিজের অজ্ঞাতেই সে একটা সিল্কের থানে হাত বাড়ায়।

ভায়েদের জামার কাপড় কেনা হ'লে তাড়াতাড়ি সেখান থেকে সরে এল। ট্রাউজারের কাপড় চাই—জিন? না জিন নয়, ওরই মধ্যে একটু ভাল কিছু। কী যেন আজকাল ফ্যাশন হয়েছে—সিল্ক গ্যাবারডিন—নাকি! তাই একটু নিলে তো হয়। পূজোর জন্যে অন্তত।

ঐ ট্রাউজার আর এই শার্ট দেখলে ভাই দুটোর চোখ কী পরিমাণ চক্‌চক্ ক'রে উঠবে আনন্দে আর লোভে—কল্পনা-নেত্রেই দেখতে পেল অভিজিৎ। বেশ হয়, মায়ের আশঙ্কারও ভালমত জবাব দেওয়া হয় একটা। ভায়েদের পথে বসাবার জন্য কিম্বা সুখে রাখার জন্যেই সরকারী চাকরী ছেড়েছে সে—বুঝুন এবার তিনি।

সিল্ক গ্যাবারডিনই কিনল শেষ পর্যন্ত। তার সঙ্গে সাধারণ ছুটো ক'রে প্যান্ট আর শার্টের কাপড়ও। মার জন্যেও একটা সাদা থান—আটপৌরে, কিন্তু তবু তাঁতেরই কাপড় নিল একখানা। কে জানে মনের অজ্ঞাতে একটু ঐশ্বর্য দেখাবার গোপন বাসনাই জেগেছিল কিনা।

এর পর নিজের শার্ট আব ট্রাউজারের কাপড়—সেই সঙ্গে একটা দেশী ধুতি এবং পাঞ্জাবির আদ্দিও খানিকটা। সামাজিক ব্যাপারে, নিমন্ত্রণ উপলক্ষ্যে ধুতিই পরতে হয়—একটা ভাল ব্যবস্থা থাকা দরকার।

এই পর্যন্ত বাজার ক'রে সে দোকানের টি-রুমে ঢুকল চা খেতে। ক্লান্ত হয়ে পড়েছে সে। ভাড় ঠেলে ঠেলে বাজার করা কি সহজ!

চা খেতে খেতে ক্যাসমেমোগুলো খুলে মনে মনে একবার একটা আন্দাজী যোগ দিয়ে নিল। আছে, এখনও বেশ কিছু টাকা হাতে আছে।

হঠাৎ মনে পড়ে গেল ওর ছোট বোন সবিতার কথা। ওর পিঠোপিঠি বোন, বাল্যকালে বিস্তর মারপিট খুনসুটি করেছে কিন্তু ভালও বাসে সে তাকে সব-চেয়ে বেশি। সবিতার বিয়ের পরই বাবা মারা গেলেন—একটা তত্ত্বতাবাস পর্যন্ত করা হয় নি কখনও। সে জন্যে শ্বশুরবাড়িতে কত কথা শুনতে হয়েছে সবিতাকে।

সবিতার জন্যে একখানা শাড়ি নিলে মন্দ হয় না। কখনই কিছু দিতে পারে নি সে আজ পর্যন্ত হাতে তুলে।

কিন্তু শুধু কি সবিতার জন্য কেনা যায়? আরও তিনটি বোন আছে ওর—তিন দিদি। তারা কি মনে করবে। তারাও ওর নিজেরই বোন। আর কথাও চাপা থাকবে না, একদিন' না একদিন বেরিয়েই যাবে—সবিতাই গল্প করবে হয়ত তখন তারা কি বেশ একটু দুঃখ পাবে না?···না, কিনতে গেলে চার-খানাই কিনতে হয়। তবে হ্যাঁ—ওরই মধ্যেই একটু উনিশ-বিশ করা যেতে পারে। সবিতা ছোট, তাকে একটু ভাল জিনিস দিলে কিছু বলার থাকে না।

তাই করল অভিজিৎ। তিন দিদির জন্য নিল বার থেকে পনেরর মধ্যে তিনখানা তাঁতের শাড়ি, আর সবিতার জন্য নিল কাশ্মীরী আর্ট সিল্কের কাপড় একখানা আঠারো টাকা দিয়ে।

এগুলো কেনা হতেই মনে হল ওর চার বোন বাবদ একুনে এগারোটি

ভাগ্নে-ভাগ্নীর কথা। তারাও তো কখনও কিছু পায় নি। পোশাক—না, পোশাক বা শাড়ি দেওয়ার প্রশ্নই উঠছে না, তবে এক-আধ গজ ক'রে জামার কাপড় নেওয়া যেতে পারে বটে। ছেলেদের শার্টের কাপড়, মেয়েদের ফ্রক বা ব্লাউজের—বয়স হিসেবে। না, দামী কিছু তো নয়ই, সাধারণ সুতী ছিটের কাপড়ই যথেষ্ট। তবু তো ওর বোনেরা কেউই মার ধাত পায় নি। তিনটির বেশি সন্তান আজ অবধি কারুরই হয় নি। সবিতারও পরে যে—তার তো মোটে দুটি।

আন্দাজে আন্দাজে ওদেরও জামার কাপড় কেনা হ'ল। কিনতে কিনতেই মনে হ'ল ঝিয়ের একখানা কাপড় চাই—এবার সে এক মাস আগে থেকে চোখ-রাঙিয়ে রেখেছে। আর ঝিয়ের কাপড় মনে হতে আরও একটা কথা মনে পড়ল। গত বছরই মা বলেছিলেন তাঁদের গুরুদেবকে একখানা থান ধুতি দেওয়ার কথা। তখন খুব চেঁচিয়ে উঠেছিল অভিজিৎ—তাই আর উচ্চবাচ্য করেন নি, ম্লান মুখে চুপ ক'রে ছিলেন। কিন্তু এবার যখন সকলেরই হ'ল—তাঁরই বা বাদ থাকে কেন। হাজার হোক ওর বংশের, ওর বাবা-মার দুজনেরই গুরু। একটা দেশী ধোয়া থানধুতি আট-ন' টাকাতেই হয়ে যাবে।

এ পর্যন্ত বাজার ক'রে আর একবার ঘুরে ফিরে টীরুমে এসে বসল। সাড়ে আটটা বাজে, এখনই এঁরা বন্ধ করবেন হয়ত, তবু একবার হিসাবটা মিলিয়ে নেওয়া দরকার।

হিসেব করে দেখলে অভিজিৎ, তখনও পনেরেটি টাকা হাতে আছে তার। তবে আর কি, মার দিয়া কেল্লা। সবাইকে খুশি করেও যা হাতে আছে—এক সের ঘি ময়দা কিছু চিনি অনায়াসে কিনে দেওয়া যাবে। মাসকাবারী সংসার-খরচ ছাড়া—এটা বাড়তিই করবে অভিজিৎ, নিজে কিনে দেবে। মার হাতে দিলে তিনি আর প্রাণ-ধরে ওসব খরচা করতে পারবেন না, দৈনন্দিন সংসার যাত্রাতেই কোথায় ঘুব চলে যাবে।

কিন্তু—

খুশি-মনেই ডেলিভারী কাউন্টারের দিকে পা বাড়িয়ে ছিল সে, হঠাৎ মনে পড়ে গেল কথাটা।

নীলার জন্যে কিছু নেওয়া হ'ল না তো!

তার প্রিয়তমা, তার ভাবী স্ত্রীর জন্যে।

আজ দু বছরেরও ওপর হ'ল তারা পরস্পরের বাগ্‌দত্ত—কিন্তু আজ পর্যন্ত কেউ কাউকে একটা উপহারও দিতে পারে নি। দুজনেই রুদ্ধ নিঃশ্বাসে অপেক্ষা করছে সেই শুভদিনটির যেদিন, বুঝিবা আলাদীনের আশ্চর্য প্রদীপের দৌলতেই, তাদের এই দুঃসহ দারিদ্র্য ও অভাব ঘুচে যাবে।

কিন্তু আজ, আজ অন্তত তার মনে পড়া উচিত ছিল। তার প্রায়-ভুলে-যাওয়া ভাগ্নে-ভাগ্নীদেরও মনে পড়ল, অথচ অনিলার কথা মনে পড়ল না—আশ্চর্য!

অভিজিৎ কতকটা আপনা-আপনিই যেন রেশমী বস্ত্রের কাউন্টারের দিকে এগিয়ে গেল। টাকা সঙ্গে নেই—কিন্তু অন্যত্র আছে। বাইরে যাবে সে ঠিকই—তবে যেখানে সে দশদিন থাকত সেখানে না হয় পাঁচদিনই থাকবে। তবু নীলার জন্য একটা কিছু কিনতেই হবে।

তাছাড়া এর মধ্যে অন্যরকম আত্মতৃপ্তির কথাও আছে একটু। সে যে আগের চাকরী ছেড়ে সেদিন ভুল করে নি, ঠিকই করেছে, দূরদৃষ্টির পরিচয় দিয়েছে, তার প্রত্যক্ষ প্রমাণই দেওয়া হবে একটা ওকে এই উপহারের মধ্য দিয়ে।

কাউন্টারের লোকেরা বিচিত্র দৃষ্টিতে তাকাচ্ছে তার দিকে। লোকটা সন্ধ্যে থেকে কেবলই বাজার করছে এই ভাবছে হয়ত। তা ভাবুক। এখন মোটেই ভীড় নেই, এই সময় ধীরেসুস্থে বাছা যাবে।

তা বাছলও সে একখানা ভাল কাপড়ই।

উনসত্তর টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা। বিক্রয় কর নিয়ে আর একটু বেশি। তা হোক—এই তার প্রথম উপহার বাগ্‌দত্তা বধূকে, এর চেয়ে খেলো কোন জিনিস দেওয়া সম্ভব নয়।

কাউন্টারের ভদ্রলোককে একটু বেশ গর্বের সঙ্গেই বলল অভিজিৎ, 'তিন-শোটি টাকা কড়কড়ে গুনে এনে ছিলাম. তার সবই প্রায় রেখে গেলাম আপনাদের' এখানেই। এটা নেবার টাকা আর নেই এখন। এই দশটা টাকা রেখে দিন—কাল বাকী টাকা দিয়ে নিয়ে যাব। আপত্তি নেই তো?'

'না না—সে কি কথা! এত টাকার জিনিস কিনলেন আপনি, চোখেই তো দেখলাম। আমরা কি আর লক্ষ্য করি নি ভাবছেন। আপনি নিশ্চিন্ত হয়ে চলে

যান। কাল সন্ধ্যে পর্যন্ত মাল আপনার ঠিক থাকবে।'

নিজের অফিস থেকে একটু আগেই বেরিয়েছিল অভিজিৎ। সে কাজের লোক, ম্যানেজারের নজরে পড়ে গেছে। দরকার হ'লে নিজেই এসে ছুটির দিন কাজ ক'রে যায়—সুতরাং তার আসা-যাওয়া নিয়ে কেউ কিছু বলেন না। সে চারটে নাগাদ বেরিয়ে পুরনো অফিসে চলে গিয়েছিল। ছুটি তখন হয় নি—কিন্তু পাছে অনিলাও কোন কারণে আগে বেরিয়ে যায় এই ভয় ছিল।

অনিলা ওকে দেখে অবাক।

'একি—তুমি হঠাৎ? অফিসে?'

'এমনি। চলো না একটু একসঙ্গে চা খাওয়া যাক আজ কোথাও বসে। অনেকদিন নিরিবিলি বসা হয় নি।'

রোগা হয়ে গিয়েছে নীলা। হাতের শিরাগুলো আজকাল যেন বড় বেশি বেরিয়ে পড়েছে। কণ্ঠার হাড়গুলোও যেন বেশি উঁচু দেখাচ্ছে। বেচারী ভাল ক'রে খেতেও পায় না বোধ হয়। আর এই খাটুনা। বাড়ির সব কাজ করতে হয় ওকেই। রান্নাবান্না সব। সেই জন্যেই টিউশনি নেওয়া সম্ভব হয় না।

মুখেও বলল সে, 'বড্ড রোগা হয়ে গিয়েছ নীলা এই কদিনে!'

অনিলা হাসল একটু। এখান থেকে যাবার পর অভিজিতের স্বাস্থ্যটা বেশ ভালই হয়েছে। এমন কি ওর মাজা-মাজা রংটাও যেন আজকাল ফরসা-ঘেঁষাই মনে হয়। সে জায়গায় অনিলার অমন সোনালী রং যেন তামাটে হয়ে যাচ্ছে দিন দিন। সবচেয়ে ওর আজকাল আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে ভাল ক'রে মুখ দেখতেও ভয় করে। সন্দেহ হয় মেচেতার লক্ষণ প্রকাশ পাচ্ছে সেখানে একটু একটু ক'রে—

সে দীর্ঘশ্বাস ফেলল একটা—ঘড়ির দিকে তাকাল। তার পর বলল, 'আর দশ মিনিট তো মোটে আছে—চল উঠেই পড়ি। সুপারিন্টেণ্ডেণ্টও চলে গেছেন আজ আগে—কেউ কিছু বলবে না।'

আজ—সম্ভবতঃ একটু আগে বেরোবার জন্যেই বাইরে বেরোতেই ট্যাক্সি পাওয়া গেল। অনিলা একটু আপত্তি করার চেষ্টা করতেই অভিজিৎ গাড়ির দোর খুলে একরকম তাকে জোর করেই ঠেলে ঢুকিয়ে দিলে ভেতরে। তারপর

নিজেও উঠে পড়ল।

'এত নবাবী কেন? লটারীতে টাকা পেয়েছ নাকি?'

'না, লক্ষ্মীকে পেয়েছি—পাশেই।' হেসে বলল অভিজিৎ।

অনিলাকে টী-রুমে বসিয়ে চা আর ফ্রেঞ্চ টোস্ট হুকুম ক'রে 'একটু আসছি' বলে বেরিয়ে গেল অভিজিৎ, তারপর গত রাত্রির সেই উনসত্তর টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সার কাপড়খানা কিনে একেবারে দাঁড়িয়ে থেকে ডেলেভারী নিয়ে ফিরে এসে অনিলার কোলের ওপর ফেলে দিল।

'কী এটা?' চমকে উঠল অনিলা। একটা যেন আশঙ্কাই প্রকাশ পেল ওর কণ্ঠে।

'তোমার কাপড়। তোমার পুজোর উপহার।'

প্রাণপণে সহজ হবার চেষ্টা করে অভিজিৎ।

তাড়াতাড়ি বাক্সটা খুলে ফেলে মেলে ধরে কাপড়খানা।

খুশির একটা রক্তিমাভা, লোভের একটা ক্ষণিক দীপ্তি কি খেলে যায় না মুখেচোখে? হয়তো যায়। কিন্তু তার পরই মুখ বিবর্ণ হয়ে ওঠে অনিলার। একেবারে ছাইয়ের মতো সাদা হয়ে যায়।

'এ কী, এ করেছ কী? তুমি কি পাগল হয়ে গেছ নাকি? এর যে অনেক দাম!'

'এমন কিছু নয়। উনসত্তর টাকা আট আনা প্লাস সেলস্ ট্যাক্স। নাও, চা খাও।

মুখ টিপে টিপে হাসে অভিজিৎ, খুশিতে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। বলে, 'এর চেয়ে খেলো কোন জিনিস তোমার হাতে দেওয়া যায় না নীলা।'

অনিলার কোলের ওপর বাক্সটা খোলাই থাকে, মুখের বিবর্ণতা এবং দৃষ্টির অভিভূত ভাবটাও কাটে না। সে অভিজিতের মুখের দিকে চেয়ে থাকে শুধু।

তার সেই বিস্ময়-অভিভূত ভাব দেখে মায়া হয় অভিজিতের। হেসে বলে, 'ভয় নেই, চুরি ডাকাতি করি নি। মোটা বোনাস পেয়েছি।'

আবারও একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বাক্সটার ডালা বন্ধ করে অনিলা। তারপর বলে, 'কেন এ কাজ করলে অভিজিৎ, আমাকে জিজ্ঞাসা করলে পারতে। তোমার এ উপহার তো আমি নিতে পারব না!'

এবার বিবর্ণ হবার পালা অভিজিতের।

'তার মানে? যাও, চালাকি করো না।'

'সত্যিই পারব না। তোমার সঙ্গে আমার যা কথা হয়েছে তা নিতান্তই আমাদের মধ্যের কথা। সে কেউ জানে না। জানিয়েও লাভ নেই। কিন্তু তা যতক্ষণ না জানছে ততক্ষণ তুমি আমার এক অবিবাহিত পুরুষ বন্ধু মাত্র। আমি অবিবাহিতা। হঠাৎ তোমার এই দামী উপহারের অন্য কদর্থ হবে। এটা তোমার ভাবা উচিত ছিল।'

'কদর্থ? কদর্থ কী হবে?…ওঃ! যাঃ! কী বলো!' ছেলেমানুষের মতো অসংলগ্ন ভাবে বলে অভিজিৎ।

'ঠিকই বলেছি। ভেবে গ্যাখো। সাধারণ একজন পুরুষ বন্ধুর এত দামী উপহার দেওয়ার একটাই অর্থ হয়।'

'আমি—আমি যদি এটা তোমার মার হাতে দিয়ে আসি?'

'মাও কদর্থ ই করবেন। তোমাকে কতক কটূ বলবেন, আমাকে গালাগাল দেবেন—নিজে মাথা খুঁড়বেন। আর অন্য লোকেই বা কি ভাববে বল তো!'

অনেকক্ষণ চুপ ক'রে থাকে দুজনেই।

সামনের ফ্রেঞ্চ টোস্ট ঠাণ্ডা হতে থাকে, চায়ে সর পড়ে।

খানিকটা পরে অভিজিৎ বলে, 'তোমার বাবা-মার জন্যেও যদি কাপড় কিনি একটা ক'রে—তারপর যদি এক সঙ্গে তাঁদের হাতে দিয়ে আসি? মাকেও তো আমি মা বলি, তিনি খুব আপত্তি কি করতে পারবেন?'

'তা হয়ত পারবেন না। সে কতকটা মন্দের ভাল। কিন্তু কেন অনর্থক এত খরচ করবে মিছিমিছি। তার চেয়ে এর দামটা ফেরত নিয়ে অন্য কোন জিনিস কিনে নাও।'

'না—সে হয় না। তোমার জন্যে কিনেছি। তুমি না নিলে গঙ্গার জলে ফেলে দেব!'

অভিজিতের সামান্য এই কথাটাতেই যেন চোখে জল এসে পড়ে অনিলার। সে-জল ঢাকতে তাড়াতাড়ি ঠাণ্ডা চায়ের পেয়ালাটা মুখে তুলে চুমুক দেয়।

দুজনেই নিঃশব্দে খেতে শুরু করে।

খানিক পরে অনিলা ম্লান একটু হেসে বলে, 'যা কাপড় কিনেছ, পরে বেরোলে লোকে হাসবে। কী চেহারা হচ্ছে দিন দিন দেখছ না? বুড়ো হয়ে গেছি।'

'তুমি বুড়ো হলে আমিও হচ্ছি। সে কথা নয়, কিন্তু সত্যিই তোমার চেহারা বড় খারাপ হয়ে যাচ্ছে, কেন বল দিকি?'

'কে জানে! আজকাল হজম হয় না ভাল। রাত্রে ঘুমও হয় না। তার ওপর বুকের এইখানটায় মধ্যে মধ্যে এমন একটা বিশ্রী ব্যথা ধরে—'

'আর তুমি তাই নিয়ে চুপ ক'রে বসে আছ! ডাক্তার দেখাও এখনি। চল, এখনই কোন ডাক্তারের কাছে যাই—'

'থাম থাম, অত ব্যস্ত হয়ো না। ডাক্তারের কাছে যাওয়া হয়েছিল। লম্বা একটা ওষুধের ফর্দও হয়েছে। কিন্তু কিনব কোথা থেকে? এ এমন একটা প্রত্যক্ষ অসুখ নয় যে সরকার থেকে পাব। সাধারণ দুর্বলতা আর অপুষ্টি—এই বলেই ডাক্তার খালাস। দামী দামী টনিক জাতীয় ওষুধ দিয়েছেন। মার জন্যে একটা ওষুধ না কিনলেই নয়—হাঁপানিটা ভীষণ বেড়েছে—তাও কিনতে পারছি না। সামনে পূজো—হরেক রকমের খরচা—'

অভিজিৎ হঠাৎ হাতটা বাড়িয়ে বলল 'কই দেখি কী প্রেসক্রিপশ্যান—'

'কী হবে? না—না, তোমার অত খরচ করতে হবে না। সে প্রায় চল্লিশ টাকার ধাক্কা। ও লাগবে না। এমনিই ভাল হবে।'

'আচ্ছা দেখি না একবার। কে ডাক্তার—কী প্রেসক্রিপশ্যান!'

'না—না। দরকার নেই।'

আরও কিছুক্ষণ তকরারের পর হাতব্যাগটা খুলে প্রেসক্রিপশ্যানটা বার করতেই হয় অনিলাকে। একবার চোখ বুলিয়েই সেটা পকেটে পোরে অভিজিৎ। তারপর বলে, 'চলো ওঠা যাক। আজ পড়াতে যেতেই হবে—কাল যাওয়া হয় নি।'

'কিন্তু ওটা পকেটে পুরছ কেন—দাও দাও—ওটা দাও—'

'থাক না। বলি ডাক্তার বন্ধুবান্ধব তো আছে দু-চারজন। তাদের কাছে নানা রকম স্যাম্পল ফাইলও তো আসে—যদি কিছু মিলে যায়, দেখি না একটু চেষ্টা করে।'

ওরা বাইরে আসে। অনিলা থাকে বেলেঘাটায়, অভিজিৎ যাবে চিৎপুরে।

অভিজিৎ বলে, 'আগে তোমাকে শিয়ালদায় বাসে উঠিয়ে দিই চলো। তার পর আমি এইটুকু হেঁটে গিয়ে ট্রামে চড়ব।'

কিন্তু অনিলাকে বাসে তুলে দিয়ে সে ট্রামের পথ ধরল না। আবার ফিরে এল ওই দোকানটিতেই। একখানা ভাল লালপাড় তাঁতের শাড়ি ও একখানা ধোওয়া ধুতি কিনল। তারপর সেখান থেকে বেরিয়ে গেল একটা বড় ওষুধের দোকানে। ফর্দ মিলিয়ে সব কটা ওষুধ কিনল, যেটা প্রধান টনিক সেটা দু শিশিই কিনল বরং। একটা পুষ্টিকর পানীয় নিল বড় শিশি দেখে। কিছু শুকনো ফল কিনল, কিসমিস খেজুর প্রভৃতি। তারপর একটা ট্যাক্সিতে চেপে যখন সন্ধ্যার কিছু পরে অনিলাদের বাড়ি পৌঁছল, তখন ওর আগের দিনে পাওয়া সেই সাড়ে চারশো টাকা বোনাসের আর মোট সতেরো টাকা তেতাল্লিশটি নয়া পয়সা অবশিষ্ট আছে।...

বিদেশ যাওয়া আর সম্ভব নয়। না হোক, ফিরে আসতে—আসতে কথাটা যতই মনে মনে তোলপাড় করতে লাগল অভিজিৎ ততই দেখল, আশাভঙ্গের কোন ব্যথাই মনে মনে সে অনুভব করছে না। অনিলার অশ্রু-ছলছল চোখের সকৃতজ্ঞ দৃষ্টি এবং তার মায়ের কয়েকটি ফোঁটা আনন্দাশ্রু ওর মনের সমস্ত বেদনা ধুয়ে মুছে নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছে। কোন মালিন্য কোন পশ্চাত্তাপ কোথাও রেখে যায় নি।

স্মরণীয়

ঘটনাটা আপনাদেরও মনে আছে নিশ্চয়। এমন কিছু বেশি দিনের কথা নয়।

দেবপ্রয়াগ থেকে বেরিয়ে শ্রীনগরের পথে যাচ্ছিল বাসখানা, কেদার-বদরীর যাত্রী নিয়ে। হঠাৎ একটা পাহাড়ী ছাগল না কি বাঁচাতে গিয়ে গড়িয়ে পড়ে যায় নিচের খাদে। বহু নিচে পড়ে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যায় বাসখানা। বাইশ-জন যাত্রী আর কনডাকটর ড্রাইভারের একজনও বাঁচে নি।

এই হ'ল খবরের কাগজের রিপোর্ট।

কিন্তু এটা ঠিক নয়।

একজন বেঁচে ছিলেন। শচীন ঘোষ মশাই। বড় কনট্রাক্টর এবং কলকাতা শহরের একটি বিখ্যাত সিনেমা-গৃহের মালিক। বর্তমান বয়স পঞ্চান্ন বছর।

ওঁর নিজের ধর্ম-কর্মের দিকে কখনই তেমন মন নেই। আসলে সে অবসরও ছিল না। সামান্য সরকারী চাকরিতে ঢুকেছিলেন, তারপর সুদীর্ঘকাল কঠোর পরিশ্রম ক'রে পয়সা রোজগার করতে হয়েছে তাঁকে—বাজে কাজ বা চিন্তার অবসর ছিল না। মধ্যে মধ্যে মা কালীকে পূজো মানসিক করেছেন বটে, সত্যনারায়ণও দিয়েছেন বহুবার—আর খুব বিপদে পড়লে সামনে যে দেব-দেবী পড়েছেন বা যাঁকেই জাগ্রত মনে হয়েছে তাঁকেই ডেকেছেন এবং পূজো মানসিক করেছেন; অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সে মানসিক শোধ হয় নি। এ ছাড়া ঠাকুর-দেবতার সঙ্গে সম্পর্ক কম। ভগবান ব'লে কোন একজনকে ধারণা করবার চেষ্টাই করেন নি। দেব-দেবীরা প্রসন্ন হ'লে হয়ত ভাল করতে পারেন—এই বিশ্বাসবশতই পূজো মানসিক করা—তাঁদের নিয়েও চিন্তা করার কখনও অবসর পান নি। জ্যোতিষী-তান্ত্রিকের কথামত দু-একবার মাদুলী পরেও দেখেছেন —দামী পাথরের আংটি কয়েকটা এখনও আছে হাতে। কিন্তু সে কোন্‌টা কোন্ গ্রহকে তুষ্ট করার জন্য তা আর আজ তাঁর মনে নেই। যখন পরেছেন তখনও অত মাথা ঘামান নি বোধ হয়। যে যা বলেছে নির্বিচারে কিনেছেন। পাথর আর সোনা, দামী জিনিসই তো হাতে রইল—পয়সা তো আর জলে যাচ্ছে না।

এ-হেন শচীন ঘোষকে যে কেদার-বদরীর উদ্দেশে যাত্রা করতে হ'ল সে কেবলই স্ত্রীর পীড়নে। তাঁর মেজ মেয়ের শ্বশুর নাম-করা ধনী ডাক্তার। গৃহিণী যুক্তি দিলেন, 'বেয়াই মশাই অমন প্র্যাক্‌টিস্ ফেলে যদি যেতে পারেন, তুমি এই ক-টা দিন ব্যবসা থেকে ছুটি নিতে পারো না! তোমার তো তবু কর্ম-চারীরা রয়েছে—দুই ছেলে রয়েছে। একেবারে কারবার বন্ধ হয়ে তো যাবে না! ওঁর তো সবটাই লোকসান!'

কথাটা মিথ্যে নয় ব'লেই জবাব দিতে পারেন নি। দু-একবার গাঁই-গুঁই ক'রে রাজী হতে হয়ে হয়েছিল। বেয়াই, বেয়ান, তাদের বেয়াই—এমনি সব দূর-সম্পর্কিত আত্মীয়-স্বজনেই কুড়িজন হয়ে গিয়েছিল—সঙ্গে ছিল ঝি আর বামুন। সুতরাং একটা বাস রিজার্ভ ক'রেই যাচ্ছিলেন তাঁরা। গেঁয়ো যাত্রীরা

পাশে বসে বমি করতে করতে যাবে—সে অসহ্য। তা ছাড়া বাইশজন যাত্রীকে বাসওলারাও সহজেই রিজার্ভেশ্যন দিয়েছে—এর ওপর কজন লোকই বা ধরত!

সে যাই হোক—শচীন ঘোষ মশাই মরেন নি। বাকী সব যাত্রীর মধ্যে এমন ভাবে তিনি পড়ে গিয়েছিলেন—যে দলিত পিষ্ট হলেও চূর্ণ বিচূর্ণ হন নি। 'রাখে হরি মারে কে' এই প্রবচনকে যেন সার্থক করবার জন্মই তিনি বেঁচে গেলেন এ যাত্রা। গাড়িখানা গুঁড়িয়ে গেল, তার কাঠগুলো দিয়াশলাইয়ের কাঠিতে পরিণত হ'ল, লোহার অংশটুকু তালগোল পাকিয়ে গেল, কাঁচের গুঁড়ো বালুকা-কণায় মিশিয়ে গেল, লোকগুলো তার ভেতরে পড়ে কীচকের মতো অবস্থা হয়ে মারা পড়ল—তবু তারই ভেতর কেমন এক অত্যাশ্চর্য ভাবে শচীন ঘোষ বেঁচে গেলেন।

তবে প্রথমটা তাঁরও কোন জ্ঞান ছিল না। আঘাতের প্রচণ্ডতায় সমস্ত চৈতন্য লোপ পেয়েছিল। মুমূর্ষুর গোঙানি ও আর্তনাদ নিস্তব্ধ হবারও অনেক পরে একটু একটু ক'রে তাঁর জ্ঞান ফিরে এল। প্রথম একটা কি গোলমেলে অনুভূতি বোধ হ'ল। তারপর একসময় তিনি অনুভব করলেন, তাঁর শরীরের সর্বত্র অসহ্য যন্ত্রণা। কে যেন লোহার মুগুর দিয়ে আপাদমস্তক পিটেছে তাঁকে। অবশ্য সে অভিজ্ঞতা যে আছে তাঁর—তা নয়। তবে ঐরকমই কল্পনা করলেন।

অসহ্য যন্ত্রণা। মাথা ছিঁড়ে যাচ্ছে। সারা দেহ যেন কে চিবুচ্ছে।

কিন্তু কেন?

তাঁর কি কোন অসুখ করেছে? মায়ের অনুগ্রহ? প্লেগ? বাত? না কি এটা?

চোখ মেলে তাকাবার চেষ্টা করলেন, কিছু বোঝা গেল না। প্রথমত ভাল ক'রে চোখ চাওয়া গেল না, দ্বিতীয়তঃ, সব যেন কেমন গোলমেলে মনে হ'ল।

আচ্ছা, তিনি এখন কোথায়?

ভাবতে ভাবতে একটু একটু ক'রে মনে পড়ল কথাটা।

ও, তিনি তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে কেদার-বদরী যাচ্ছিলেন। বাসে ক'রে রওনা হয়েছিলেন দেবপ্রয়াগ থেকে ভোরবেলা। একমুঠো কিসমিস্ আর এক কাপ চা খেয়ে।

তার পর?

তারপর কা যে হ'ল তা তিনি জানেন না। বাসটা কেমন ঘুরতে ঘুরতে ধাক্কা খেতে খেতে পডাছল, এটা তাঁর মনে আছে। কিন্তু সে কয়েক মুহূর্ত মাত্র। তারপর আর মনে নেই।

তা হ'লে একটা দুর্ঘটনাই ঘটেছে নিশ্চয়। বাসটা ওপর থেকে গড়িয়ে পড়েছে। অনেক নিচে—কারণ একটু আগেই তাঁরা অনুমান করবার চেষ্টা করছিলেন, বাঁদিকেব খাদটা কত নিচু। কেউ বলছিলেন খাড়া দেড় হাজার ফুট, কেউ বলছিলেন আঠাবো শো' ফুটের কম নয়।

ঐ অতটাই পড়েছেন তা হ'লে।

তা তো হ'ল,—এখন কি অবস্থা?

মারা গিয়েছেন তিনি তাতে তো কোন সন্দেহই নেই। কিন্তু এখন এ অনুভূতিটা কিসের? এ কি মরণের পরের অনুভূতি। পরলোকে পৌঁছে কি আবাব চেতনা ফিবে পেয়েছেন তিনি!

কিন্তু তা হ'লে এ যন্ত্রণা কিসের? পৃথিবীর অনুভূতি, দৈহিক যন্ত্রণা—পরলোকে তো থাকবার কথা। তবে? তবে কি তিনি নরকে পৌঁছেচেন? এইটেই কি নবকযন্ত্রণা? স্বর্গ নবক তবে কি কোথাও আছে সত্যিই? তবে নরক যদি হবে—সে যমদূতরাই বা কই?

আর যেন ভাবতেও পাবেন না শচীনবাবু। ক্লান্তভাবে পড়ে থাকেন খানিকটা। কিন্তু যন্ত্রণাও যে আর সহ্য হয় না।

হাত-পা একটুখানি নাড়বার চেষ্টা করেন—পারেন না। চারদিকে যেন কী এক নাগপাশ বেঁধে রেখেছে তাঁকে। কি এগুলো?

আর একবার ভাল ক'রে চোখ মেলে তাকালেন। দেখা যায় না ভাল ক'রে, কিন্তু এ কি—একেবারে মুখের কাছে এ কার মুখ? এ যে ভবশরণবাবুর। হ্যাঁ—সেইরকমই তো মনে হচ্ছে।

না—আর একটু ভাল ক'রে দেখা দরকার। একেবারে চোখের এত কাছে থাকলে কি দেখা যায় কিছু?

মাথাটা অতি কষ্টে একটু সরান শচীনবাবু। ওঃ—যেন ছুঁচ বিঁধছে ঘাড়ে!

ও হ'ব এ কি কাণ্ড! যাকে তিনি নাগপাশ মনে করছিলেন, আসলে সে

তো কতকগুলো নরদেহই। তাঁর চারপাশে মানুষ—সব দিকেই। তিনি মানুষের ওপর পড়ে আছেন, তাঁর ওপরে মানুষ, দুদিকে মানুষ। এ বোধ হয় বেয়ান, গয়নার কোণগুলো বিঁধছে প্রতিনিয়ত। অত ভারি সাবেকী ফ্যাশনের গয়না নিয়ে কেউ তীথে আসে! বড়মানষী দেখানো শুধু। পাশে যে থাকে তার প্রাণ যায় আর কি।

মনে হ'ল চেঁচিয়ে বলেন, 'বেয়ান, আপনার ঐ কঙ্কনপরা হাতটা সরিয়ে নিন!' পারলেন না। ভবেশরণবাবুকে ডাকবার চেষ্টা করলেন, ক্ষীণ স্বর মাত্র বেরোল গলা দিয়ে।

আবারও চোখ বুজে পড়ে রইলেন খানিকক্ষণ। ক্লান্তিতে দেহ এলিয়ে আছে। সামান্য কিছু করবারও ক্ষমতা নেই।

অনেকক্ষণ পরে আবার চোখ চাইলেন।

হোক যন্ত্রণা, হাতখানা তিনি মুক্ত করবেনই।

এবার ডাকলেন চেঁচিয়ে, 'ও বেয়ান, হাতটা সরাবেন?'

কোন উত্তর নেই। অজ্ঞান হয়ে আছে বোধ হয়।

হাতখানা টেনে বার করা যায় না কিছুতেই? ওঃ, ভগবান, মাথা ছিঁড়ে যাবে এবার। আর একটু, একটু—হ্যাঁ হাতখানা মুক্ত হয়েছে। হাতেও যেন জোর নেই। অসাড়। হয়ত ভেঙেছে। কে জানে!

আরও খানিকটা পরে ভবশরণের মুখখানা সরাবার চেষ্টা করেন। এমন কাঠ কেন? আড়ষ্ট, শক্ত! তবে কি? তবে কি—?

আশেপাশে যতটা পারা যায় হাত দিয়ে দিয়ে অনুভব করলেন। কঠিন, শীতল দেহ। বেয়ানের নাকে হাত দিয়ে থাকেন। আর একটা কার মুখ—না, সেখানেও নেই। নিশ্বাস নেই কারুর।

তা হ'লে কি সবাই মারা গিয়েছে—এক তিনি ছাড়া?

এগুলো সব মড়া?

শোকে, দুঃখে, ভয়ে—একটা চিৎকার ক'রে উঠলেন শচীনবাবু।

কি সর্বনাশ! এ তাঁর কি হ'ল?

তাঁর স্ত্রীরও কি ওই অবস্থা?

নাম ধরে ডাকলেন। অনেকদিন পরে ও নামটা ব্যবহার করলেন।

'ও গো শুনছ! হ্যাঁ গো! ও প্রমীলা?'

না। কারুর সাড়া নেই; হয়ত সেও গিয়েছে। কিংবা বেঁচে গিয়েছে তাঁর মতো। অজ্ঞান হয়ে আছে। হয়ত হাত-পা ভেঙেছে।

বেশ হয়েছে! যেমন জেদ ক'রে আসা!

এইবার একটা সত্য একটু একটু করে প্রতিভাত হ'ল। তিনি এখন পরলোকে নেই—দস্তুরমত ইহলোকেই আছেন এবং বাপ-মার পুণ্যে এ যাত্রা রক্ষা পেয়েছেন। হয়ত বা হাত-পা ভেঙেছে। কিন্তু সে আলাদা যন্ত্রণা। ছেলেবেলায় একবার হাত ভেঙেছিল তাঁর—তিনি জানেন সে কি যন্ত্রণা! না, তিনি রক্ষাই পেয়েছেন!

জয় বাবা কেদারনাথ!

এর পরে সুদীর্ঘ ইতিহাস!

একটু একটু ক'রে মৃতদেহের সুকঠিন বন্ধন যদি বা কাটিয়ে বেরোবার চেষ্টা করেন—লোহার কাঠামোটা বেঁকে চুরে তালগোল পাকিয়ে গেছে—সেটায় আটকে যান।

নানা কৌশল ক'রে—কয়েক ঘণ্টার চেষ্টায় তিনি যখন সেই বিচিত্র নাগ-পাশ থেকে মুক্তি পেলেন তখন সন্ধ্যা নেমে এসেছে। গিরিবেষ্টিত সঙ্কীর্ণ উপত্যকার ভয়াবহ সন্ধ্যা। দেখতে দেখতে সূচীভেদ্য অন্ধকার নেমে এসে ঘিরে ধরল তাঁকে। তখন কোথাও যাবার চেষ্টা করাও বাতুলতা। ক্ষতবিক্ষত আড়ষ্ট দেহে পড়ে পড়ে নানা অজানা জন্তু-জানোয়ারের ডাক শুনতে লাগলেন তিনি। দু-একটা ডাক বাঘের ডাক বলেই বোধ হ'ল। মনে হ'ল খুবই কাছে ডাকছে। কিন্তু মনে মনে এই বলে আশ্বাস লাভ করলেন শচীনবাবু—এই নির্জন পাহাড়ে-অঞ্চলে খুব দূরের ডাকও খুব কাছে বলে মনে হয়।

তবু, একটু আগে যে সান্নিধ্য ভয়াবহ বলে বোধ হচ্ছিল, সেই মৃতদেহপূর্ণ লৌহপিণ্ডের দিকেই ঘেঁষে বসলেন। মরা হোক—তবু মানুষ!

অসহ্য তৃষ্ণা। আঘাতে বোধহয় জ্বরও এসেছে, তাইতে তৃষ্ণা আরও অসহ্য বলে বোধ হচ্ছে। আর পারা যায় না।

অথচ উপায়ই বা কী?

ক্রমে ক্রমে আবারও চৈতন্য আচ্ছন্ন হয়ে আসে শচীনবাবুর।

শুকনো পাতা ও পাথরের ওপর পদশব্দে ঘুম বা আচ্ছন্ন ভাব কেটে গেল শচীনবাবুর। তিনি তাকিয়ে দেখলেন, চারদিকে বেশ ফরসা হয়ে গেছে। প্রথমেই চোখ পড়ল উঁচু পাহাড়ের চূড়ায়—সেখানে রীতিমত রোদ ঝল্‌মল্‌ করছে। প্রথম প্রভাতের সোনালী রোদ।

আঃ! বেঁচে থাকার মতো আরাম আছে!

পদশব্দ আরও কাছে এল।

চেয়ে দেখলেন কৌপীনবস্ত এক সন্ন্যাসী। রীতিমতো জটাজুট-বাঁধা ছাই-মাখা সন্ন্যাসী। হাতে একটি কাঠের কমণ্ডলু। স্তব্ধ হয়ে ভাঙা গাড়িটার দিকে চেয়ে আছেন, সর্বস্ব-ত্যাগীরও চোখ ছল্‌ছল্‌ করছে এই শোচনীয় মৃত্যুর দিকে চেয়ে!

ক্রমশঃ তাঁর চোখ পড়ল শচীনবাবুর দিকে।

পরিষ্কার উর্দু-মেশানো হিন্দীতে বললেন, 'তুমি বেঁচে গেছ বাবা? সবই পরমাত্মার কৃপা।' তারপর হেঁট হয়ে বললেন, 'কাল থেকে পড়ে আছ এমনি? জল খাবে?'

কমণ্ডলু থেকে শচীনবাবুর শুষ্ক জিহ্বায় ঠাণ্ডা, অমৃতের মতো জল ঢেলে দিলেন।

'চলো বাবা—উঠতে পারবে? থোড়া দূরে আমার আশ্রম। কাল আমি আশ্রমে ছিলাম না যখন এই কাণ্ড হয়েছে। রাত্রে ফিরেছি—অত কিছুই বুঝি নি। আজ সকালে উঠে দেখতে পেয়েই ছুটে আসছি!'

শচীনবাবু ওঠবার চেষ্টা করলেন, পারলেন না।

আরও যেন ব্যথা হয়েছে তাঁর গায়ে। হাত-পা নাড়বার ক্ষমতা নেই। সন্ন্যাসী ইঙ্গিতে তা বুঝলেন। কমণ্ডলু রেখে অনায়াসে ওঁকে তুলে নিয়ে পাহাড়ী পথ বেয়ে এক সময় একটি স্রেফ শুকনো পাতা দিয়ে বানানো কুটীরে—পাতারই শয্যায় এনে শুইয়ে দিলেন।...

আর কিছু মনে নেই শচীনবাবুর। প্রবল জ্বরে অজ্ঞান, অচৈতন্য হয়ে রইলেন কয়েকদিন।

সুস্থ হয়ে উঠে যেদিন বেরোতে পারলেন সেইদিনই গেলেন জায়গাটার খোঁজ করতে। খুঁজেও পেলেন। কাঠ ও কাঁচের গুঁড়ো তখনও ছড়ানো। কিন্তু আর কিছু নেই। সাধুর মুখে শুনলেন, সরকারী লোক এসে সাফ ক'রে নিয়ে গেছে।

আরও একদিন বাদে সাধু তাঁকে ওপরের লোকালয়ের পথটা দেখিয়ে দিলেন। পকেটে টাকাকড়ি সবই ঠিক ছিল, শচীনবাবু কিছু দিতে গেলেন সাধুকে—সাধু হেসেই অস্থির। টাকা কি হবে? তিনি তো খান কিছু কন্দ আর পাকা ফল, যা এ পাহাড়ে মেলে। কুলই বেশি। পাহাড়ী গরু এসে দুধ দিয়ে যায় তাঁকে। পয়সা কি হবে? এ ক'দিন শচীনবাবুর জন্যই তিনি দুধ আর আটা বাইরে থেকে চেয়ে আনছিলেন। তাঁর দরকার নেই।

অপ্রতিভ হলেন শচীনবাবু। অবাকও হলেন রীতিমতো। টাকা চায় না এমন লোক এই প্রথম দেখলেন তাঁর জীবনে। দুখানা দশ টাকার নোট বার করেছিলেন—কম নয় টাকাটা—আবার পকেটে পুরে নমস্কার জানিয়ে রওনা হলেন।

সাধু যে পথ দেখিয়ে দিয়েছিলেন সেটা দিয়ে সোজা গিয়ে একসময় একেবারে দেবপ্রয়াগেই পৌঁছলেন। অপেক্ষাকৃত জনবহুল জায়গা, শহর বললেই হয়। এখানে এসে যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন শচীনবাবু। এ গভীর অরণ্যে মানুষ শখ করে দু-একদিন থাকতে পারে, কর্মকোলাহল-মুখরিত নাগরিক জীবনের পর মন্দ লাগে না এক-আধদিন, তাও দল বেঁধে এলে তবে। চারিদিকে অভ্রংলিহ পাহাড়—যেন উঁচু পাঁচিল দেওয়া জেলখানা। বেলা আটটার আগে সকাল হয় না, আবার চারটে বাজতে না বাজতে চারিদিকে অন্ধকার ক'রে আসে।

এমন জায়গায় মানুষ থাকে!

দেবপ্রয়াগে পৌঁছে জিজ্ঞাসাবাদ ক'রে পাণ্ডার বাড়ি পৌঁছলেন। পাণ্ডাদের বাড়ি পুরুষ কেউ নেই, সকলেই যাত্রী নিয়ে বেরিয়ে গেছে। বাড়ির মেয়েরা প্রথমটা চিনতেই পারে না ওঁকে। কাপড়চোপড়ের যা দুরবস্থা, ক'দিন তো একবস্ত্রেই কাটালেন বলতে গেলে। তার ওপর দাড়িগোঁফ কামানো হয় নি—জংলির মতো দেখতে হয়েছে। যাই হোক—পরিচয় পেয়ে অবশ্য খাতির-যত্ন

করল। চা খেয়ে বাঁচলেন কদিন পরে। ফরসা কাপড় জামা কিনলেন, বিছানাও কিনলেন কিছু কিছু। দাড়ি কামিয়ে স্নান ক'রে মৃতা স্ত্রীর উদ্দেশ্যে তর্পণ করলেন। তারপর আহারাদি সেরে বিকেলের বাসেই রওনা হয়ে গেলেন ঋষিকেশ। বাস চাপবার আর সাহস ছিল না—কিন্তু দ্রুত ফেরবার ইচ্ছাতেই সে আশঙ্কা দমন করলেন।...

ঋষিকেশ পৌছতে সন্ধ্যা পেরিয়ে গেল। সেদিনের মতো একটা ধর্মশালাতেই উঠলেন। দুর্বল শরীর, প্রবল ঝাঁকানিতে আরও জখম হয়ে গেছে। বিশেষত পাহাড়ের পথে নামবার সময় বারবার বমি আসছিল। সেটা সামলাতে গিয়ে মাথা ধরে উঠেছে বেজায়। ধর্মশালাতে পৌছেই শুয়ে পড়লেন। এ কদিন পাতার বিছানায় শুয়ে বাঘের চামড়া মুড়ি দিয়ে দিন কেটেছে। আজ তো রীতি-মতো বিছানা। আরামে চোখ বুজে এল।

পরের দিন সকালে যখন ঘর ছেড়ে চায়ের চেষ্টায় বেরিয়ে পড়লেন—তখন অনেকটা সুস্থ বোধ হচ্ছে। একটা দোকান থেকে কিছু গরম জিলাপি সংগ্রহ ক'রে খুঁজে খুঁজে একটা চায়ের দোকান বের করলেন। চা ফরমাস ক'রে তাদের বেঞ্চিতে জাঁকিয়ে বসতেই নজরে পড়ল সেই বেঞ্চেরই অপর পাশে খান-দুই বাংলা খবরের কাগজ পড়ে রয়েছে। আর কোন খদ্দের চা খেতে এসে ফেলে গেছে বোধ হয়। কারণ পরিপাটি পাট করা, একটার খাঁজে আর একটা —এই অবস্থায় পড়ে আছে।

খবরের কাগজ এতকাল পরে—তায় বাংলা। সাগ্রহে টেনে নিলেন শচীন-বাবু। পুরোনো কাগজ, তবে বেশী পুরনো নয়। দিন তিনেক আগেকার। এ কদিনের খবর তো কিছুই প্রায় জানেন না। ভালই হ'ল।

কাগজ খুলতেই প্রথম চোখ পড়ল তাঁর—নিজেরই একটি ছোট ছবির দিকে।

এ কী কাণ্ড!

তাঁর ছবি কাগজে কেন? কে দিলে ছাপতে!

ওহো—

এ যে শোক-সংবাদ! ওরা ধরেই নিয়েছে যে তিনি মারা গেছেন।

তা আর কীই বা ভাবতে পারে! এক বাস লোক সবাই ম'ল কেবল তিনিই

বেঁচে রইলেন—ভাবা কঠিন বৈকি।

তবু একটু ধাক্কা খেলেন যেন মনে মনে। কেন, কে জানে।

সময় লাগল একটু সামলে নিতে। তারপর আবার ভাল ক'রে চেয়ে দেখলেন। বেশ ভাল ক'রেই খবরটি ছাপা হয়েছে :—

"কলিকাতার বিশিষ্ট ব্যবসায়ীর শোচনীয় মৃত্যু"

"তীর্থপথে বাস-দুর্ঘটনার শোচনীয় পরিণতি।"

"কলিকাতার বিশিষ্ট ব্যবসায়ী, ব্রজরাণী চিত্রগৃহের মালিক শচীন্দ্রনাথ ঘোষ সম্প্রতি কেদার-বদরীর পথে এক শোচনীয় বাস দুর্ঘটনায় নিহত হইয়াছেন। গত ২৫শে মে তিনি অপর আত্মীয়স্বজনদের সহিত সস্ত্রীক তীর্থযাত্রায় বহির্গত হন। যেদিন দেবপ্রয়াগ হইতে"...ইত্যাদি।

বিরাট খবর।

ঘটনাটা মোটামুটি ঠিকই দেওয়া হয়েছে। সবশেষে তাঁর সম্বন্ধে ব্যক্তিগত বিবরণও কিছু আছে।

"তিনি দানশীল, পরোপকারী, উদার হৃদয়, ভগবদ্ভক্ত ও বন্ধুবৎসল ছিলেন। সামান্য অবস্থা হইতে স্বীয় প্রতিভাবলে প্রভূত বিত্তের অধিকারী হইয়াছিলেন বটে কিন্তু নিজের সেই দুর্দিনের কথা ভুলেন নাই। শুধু আত্মীয়স্বজন নহে, শুধু বন্ধুবান্ধবরাও নহে,—একান্ত অপরিচিত লোকও কখনও তাঁহার নিকট হইতে বিমুখ হইয়া ফেরে নাই। দীর্ঘদিন ব্যবসায়ে লিপ্ত থাকিলেও তিনি কদাচ মিথ্যা-ভাষণ বা প্রবঞ্চনার আশ্রয় গ্রহণ করেন নাই। তাঁহার চরিত্রগুণে ও অমায়িক ব্যবহারে তাঁহার সহকর্মী ও সমব্যবসায়ীরা সকলেই মুগ্ধ ছিলেন।...কর্মচারী-গণের সহিত পুত্রবৎ ব্যবহার করিতেন। তাঁহার মৃত্যুতে শুধু ব্যবসায়ী জগৎ নহে—সমগ্র বাংলা দেশেরই এক অপূরণীয় ক্ষতি হইল।"

এ কী লিখেছে এরা? কার কথা লিখেছে?

তাঁর কথা? তাঁর গুণাগুণ?

পরিচিত কেউ উপস্থিত না থাকলেও তিনি কেমন যেন একটু লজ্জাবোধই করলেন। যদিও বেশ জানেন যে পাঞ্জাবী চা-ওয়ালা বাংলা জানে না এবং পড়তে পারবে না, তবু যেন তাঁর মনে হ'ল সে তাঁর দিকে চেয়ে সকৌতুকে

হাসছে মুচকি মুচকি ?

তাড়াতাড়ি পিরীচে ঢেলে চা-টা গলাধঃকরণ ক'রে বেরিয়ে এলেন।

ওঁর মনে হ'ল ওঁরই অন্তরের কোন সত্তা যেন ওঁকে তাড়া করেছে।

ভেবেছিলেন আগেই বাড়িতে একটা টেলিগ্রাম করবেন। শুধু স্ত্রীর খবরটা পান নি বলেই দেরি করছিলেন। দেবপ্রয়াগের থানায় জানিয়ে এসেছেন, দুটি টাকাও দিয়ে এসেছেন—খবর পাওয়া মাত্র এখানে টেলিগ্রাম করতে। যতদূর জানা গেছে—কেউই বাঁচে নি। ঐ তো কাগজেও তাই লিখেছে—'বাস্-এর একজন যাত্রীও রক্ষা পায় নাই।'

তবু—। যদিই তাঁর মতো কোন অলৌকিক উপায়ে রক্ষা পেয়ে থাকে ?

এখন মনে হ'ল একটা টেলিগ্রাম ক'রে নিজের খবরটা অন্ততঃ ছেলেদের দেন। কিন্তু তখনও ডাকঘর খোলে নি, অপেক্ষা করতে হবে।...আবার মনে হ'ল, অত তাড়াই বা কি ? শ্রাদ্ধশান্তি তো চুকেই গেছে। পয়সা যা খরচ হবার সবই হয়েছে। এখন ধীরে সুস্থে খবর দিলেই চলবে।

ঘুরতে ঘুরতে গঙ্গার ধারে এসে বসলেন শচীনবাবু। বড় শান্তির জায়গা। কুল কুল করে বয়ে যাচ্ছেন গঙ্গা। কাকচক্ষু স্বচ্ছ জল খরস্রোতে পাথরে পাথরে ঘা খেয়ে ফেনায়িত হয়ে উঠছে—সবটা মিলিয়ে অপূর্ব।

অনেকক্ষণ বসে রইলেন তিনি।

ভাবতে লাগলেন ঐ খবরের কথাটা।

অমনিই লিখতে হয় নাকি ? সকলের বেলাই কি ঐভাবে লেখা হয় ?

আর পাঁচজনের নামে যা পড়েন—তারও কি মূল্য এই ?

এই প্রসঙ্গে বহুদিন পর তাঁর নিজের জীবনের কথা মনে পড়ল। দীর্ঘ যে জীবন তিনি পেছনে ফেলে রেখে এসেছেন।

ভগবদ্ভক্ত ? ভগবান সম্বন্ধে কখনই তিনি কিছু ভাবেন নি। মানসিক কল্পার মতো দেবদেবী ছাড়া কোন ভগবান কোথাও আছে কি না এ নিয়ে মাথা ঘামাবার দরকার হয় নি তাঁর। অবশ্য হ্যাঁ—একটা দিন তিনি ডেকেছিলেন বটে—যেদিন একেবারে সরকারী চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে পুরোপুরি ব্যবসাতে ঝাঁপিয়ে পড়লেন, সেদিন তিনি ঈশ্বরকে ডেকেছিলেন।

'হে ভগবান রক্ষা ক'রো বাবা। দেখো, যেন একেবারে না ডুবি।' এমনি-ভাবে সেদিন ডেকেছিলেন। সারারাত ঘুমোতে পারেন নি—কাতর ভাবে ডেকেছিলেন সবাইকে। জোড়া সত্যনারায়ণ, কালিঘাটে জোড়া পাঁঠা, সংকটাকে বেনারসী শাড়ি—মায় পাড়ার শীতলা মাও বাদ যান নি। সেসব মানসিকের অধিকাংশই শেষ পর্যন্ত দেওয়া হয় নি বটে কিন্তু ডেকেছিলেন তিনি খুব আন্তরিকতার সঙ্গেই। কে জানে সেই মানসিক শোধ না করার অপরাধেই হয়ত তাঁর এমন ভরাডুবি হ'ল।

পরোপকারী ? দানশীল।

হ্যাঁ—। তা লোককে খাটিয়ে নিয়ে পয়সা দেওয়া যদি পরোপকার হয় তো তা তিনি করেছেন। কিন্তু সেটাকে ঠিক দান বলা যায় কি ? লোকে যাকে দান বলে তা তিনি করেন নি কোনদিন। অনেকে অনেক বার এসে ধরেছে তাঁকে। হাসপাতাল উপলক্ষেই বেশি—রকমারী হাসপাতালের জন্যে তা-বড় তা-বড় লোক এসে তাঁকে বহুবার ধরেছে। কিন্তু তিনি দেন নি। কঠোর পরিশ্রমের ধন— যাকে 'দশ আঙ্গুলে খাটা কড়ি' বলে—তা তিনি অপরকে দেবেন কেন ? কেউ কি তাঁকে কোনদিন একটা পয়সা দিয়েছে ? ঐ ভয়ে তিনি কখনও কোন দাতব্য প্রতিষ্ঠানের বাড়ি-ঘর করবার কন্ট্র্যাক্ট নেন নি। প্রথমত শেষের দিকের পেমেন্ট পেতে দেরি হয়—শেষ টাকাটা যোগাড় হ'তে চায় না কিছুতেই। তারপর—একেবারে না হ'লে হয় তো ধরে পড়বে—'এটা স্যার আপনি আমাদের দানই করুন না।' না, দুষ্টু গরুর চেয়ে শূন্য গোয়াল ভাল।

ঐ একটা কথা ওর ভেতর ষোল আনা সত্যি লিখেছে বটে। 'সামান্য অবস্থা হইতে—' ঐ কথাটা। চাকরি করতে করতেই এটা-ওটা ব্যবসায়ে লেগেছিলেন। প্রথম প্রথম এক বন্ধুর সঙ্গে ছুটির পর বড়বাজারে শুধু ঘুরেই বেড়াতেন। পুরো একটি বছর এইভাবে ঘুরেছেন। তারপর ঘাঁৎ-ঘোঁৎ জেনে নিয়ে একটু একটু ক'রে কাজে নেমেছেন, খুব সন্তর্পণে। যখন দেখেছেন সারা দুপুর খাটার মাইনের চেয়ে সন্ধ্যাবেলা দু ঘণ্টা খাটুনির মজুরী ঢের বেশি পাচ্ছেন, তখনই চাকরি ছেড়ে সোজাসুজি ব্যবসায়ে নেমে পড়েছেন।

তবে 'যে এসেছে তাকেই' সাহায্য করার কথাটা ঠিক নয়। কেনই বা করবেন ? তাঁকে কে করেছে ? কেউই কাউকে করে না। নিজের বুদ্ধি আর

উদ্যমে নিজের ভাগ্য গড়ে তুলতে হয়। সংসারে ঐ এক শ্রেণীর লোক আছে—তারা কেবল পরের মুখ চেয়ে থাকে। ভাবে আত্মীয়রা বন্ধুরা খেটেখুটে পয়সা করেছে শুধু তাদের জন্মে। সামনে তোষামোদ করে—পেছনে বোকা বলে। না—এদের তিনি যে কোনদিন কোন সাহায্য করেন নি, তার জন্মে তিনি আজ অনুতপ্ত নন। ঠিকই করেছেন। তোষামোদকে তাঁর অত্যন্ত ঘৃণা—তোষামোদকে আর ভিক্ষাবৃত্তিকে।

মিথ্যাভাষণ আর প্রবঞ্চনা?

নির্জনে বসেও লাল হয়ে উঠলেন শচীনবাবু কথাটা মনে ক'রে। না, সত্য পথে অবিচল থাকতে তিনি পারেন নি। ওটা বিশ্বাসও করেন না। যে বন্ধুটি তাঁকে প্রথম উৎসাহ দিয়েছিল—একটু একটু ক'রে তার কাছ থেকে সাতটি হাজার টাকা তিনি নিয়েছিলেন, সেটা আর শোধ করা হয় নি। লভ্যাংশের অর্ধেক ভাগ দেওয়াও তাঁর পক্ষে সম্ভব হয় নি। কারণ সে হঠাৎ মারা গেল। লেখাপড়া ছিল না। তার স্ত্রী জানত—এসে দাবীও করেছিল কিন্তু শচীনবাবুর পক্ষে তখন কথাটা উড়িয়ে দেওয়া ছাড়া উপায় কি? স্বীকার করলেই ঐ সাত হাজার টাকা বার ক'রে দিতে হ'ত তখনই—তাছাড়া লাভের অর্ধেক, চুলচেরা। সেও কোন্ না ছ'-সাত হাজার হয়ে দাঁড়াত। অতগুলো টাকা হাতে ছিলও না—আর কারবার থেকে ঐ টাকা তখনই বার করতে গেলে পথে বসতে হ'ত, কারবার চলত না। কাজেই ঝেড়ে জবাব দিয়েছিলেন।...তারপর কি আর নতুন করে সে টাকা দিতে যাওয়া যায়?

সে ছাড়াও দু-চারজনের টাকা তিনি মেরেছেন। নানা ঘটনাচক্রে সেটা হয়েছে—কিন্তু এটা ঠিক যে, সতর্ক হবার চেষ্টাও তিনি করেন নি। টাকাটা শোধ দেবার জন্মে খুব যে ব্যস্ত হয়েছিলেন তা'ও মনে হয় না।

নানাভাবে ঠকিয়েছেন নানা লোককে। কিন্তু কি করা যাবে? পৃথিবীর সাংসারিক গঠনটাই এই রকম। তুমি না ঠকালে লোকে তোমাকে ঠকাবে। ঠকতে তিনি রাজী নন। চিরদিনই জেদী। উন্নতি করতেই হবে—যেমন ক'রে হোক, এই ছিল তাঁর জেদ। তার ফলে হয়ত—তাঁকে ঠকাতে হয়েছে। এমন কি কর্মচারীদেরও। তা কি করবেন! তারা দিনরাত চেষ্টা করছে কেমন করে বেগ দিয়ে তাঁর কাছ থেকে পয়সা দুটো বেশি নেবে—তিনি যদি চেষ্টা ক'রে

থাকেন যে কি ক'রে তাদের দু'পয়সা কম দেবেন তো সেটা এমন কিছু অপরাধ নয়। আত্মরক্ষার অধিকার সকলকারই আছে।···পুত্ররাও? তা একরকম বটে—পুত্ররা ঐ রকম ব্যবহার করলে তিনি তাদেরও সহজে ছেড়ে দিতেন না।

বেলা বেড়ে ওঠে। উঠে পড়েন শচীনবাবু। স্নানাহার আছে। এখানে স্নানটা সেরে নিতে পারলে হ'ত—কিন্তু গামছা আনেন নি। ধর্মশালাতেই সেরে নেবেন—আহারের হোটেল তো আছেই।

যাবার পথে ডাকঘরের সামনে দিয়েই গেলেন কিন্তু কে জানে কেন, 'তার' করার কথা তখন আর মনে রইল না।

ছেলেদের কথাই ভাবছিলেন অবশ্য।

কথাটা ঠিক নয়। ছেলেরাও চায় তাঁর কাছ থেকে টাকা বার ক'রে নিতে। তা তিনি জানেন। কিন্তু কর্মচারীদের মতো তাদের তো জব্দ করতে পারেন না। ছেলেরা তাঁকে কৃপণ ভাবে, তারা চায় খুশিমতো খরচ করতে। ব্যবসা সম্বন্ধেও তাদের ধারণা আলাদা। তারা চায় বড় ক'রে ব্যবসা ফাঁদতে—ধনী ব'লে এবং ধনী ব্যবসায়ী ব'লে যাতে তারা গণ্য হ'তে পারে।

হয়ত তারা তাঁর মৃত্যু-সংবাদে খুশীই হয়েছে। তাঁর স্ত্রীর মৃত্যু-সংবাদে পুত্রবধূরাও খুশী হবে। স্বাধীন হবে তারা।

হয়ত বা সেই কৃতজ্ঞতাতেই অমন ক'রে শোক-সংবাদটা প্রকাশ করেছে। ওঁর বড় ছেলের বিজ্ঞাপন লেখার হাত খুব ভাল—সে-ই হয়ত লিখে দিয়েছে সংবাদটা। সব খবরের কাগজেই তাঁদের বিজ্ঞাপন থাকে, জানাশুনো তো আছেই।

এখন তিনি বেঁচে আছেন শুনলে তারা কি করবে?

আনন্দিত হবে না খুব—এটা তিনি জানেন।

হয়ত অপ্রতিভ হবে। হয়ত ঘটা ক'রে শ্রাদ্ধ করার জন্যে অনুতপ্ত হবে। মিছিমিছি এতগুলো টাকা গেল।···

অন্যমনস্ক হয়েই স্নানাহার সারেন শচীনবাবু। প্রচণ্ড রোদ বাইরে, হু হু ক'রে তপ্ত বাতাস বইছে। তবু ঘরে বসে থাকতে পারেন না। ভিজে গামছাটি মাথায় চাপিয়ে গঙ্গার ধারে ছায়া-শীতল স্থানে এসে বসেন।

মধ্যাহ্নে আরও নির্জন হয়ে উঠেছে গঙ্গাতীর। কোথাও কোন মানুষের চিহ্ন নেই।

আশ্চর্য!

ঐ শোক-সংবাদের বিশেষণগুলো যেন তাঁকে বড়ই বিচলিত করেছে।

আজ মনে হচ্ছে ঐ বিশেষণগুলো যদি তাঁর প্রাপ্য ব'লে গ্রহণ করতে পারতেন তো মন্দ হ'ত না। এই তো মানুষের জীবন, এক মুহূর্তেই শেষ হয়ে যেতে বসেছিল। শেষ হয়ে গেলও তো তাঁর স্ত্রীব। তাঁর স্ত্রীর জন্যে পুত্রবধূরা ছাড়া সকলেই দুঃখ করবে তা তিনি জানেন। বহু গোপন দান ছিল গৃহিণীর—তার জন্যে স্বামীর কাছে অনেক লাঞ্ছনা সহ্য করতে হয়েছে। বিশেষ ক'রে ঝি-চাকরদের ও আত্মীয়স্বজনদের—স্বামীকে লুকিয়ে প্রায়ই টাকা-পয়সা দিতেন। কিন্তু শচীনবাবুর জন্যে কেউ দুঃখ বোধ করবে না।···

অথচ আজ মনে হচ্ছে—মানুষের এই ভাল বলার, শোক করার কিছু মূল্য আছে। অথবা এইটেরই মূল্য আছে। এতদিন যে সব ভুলে একমাত্র টাকারই সাধনা ক'রে এসেছিলেন—সে টাকার কতটুকু মূল্য? এই তো, এক মুহূর্তের দুর্ঘটনাতেই সব শেষ। ও টাকা তো তাঁর কোন উপকারেই আসত না। এ পৃথিবী ত্যাগ করার পর আর যেটুকু স্বীকৃতি বা স্নেহ পৃথিবী থেকে চায় মানুষ—তা টাকা জমিয়ে পাওয়া যায় কি? বরং খরচ করলেই পাওয়া সম্ভব।

ভগবান? না ভগবানকে তিনি কোনদিন ভাবেন নি। ভেবেছেন শুধু বর্তমান জীবনকেই। সামান্য খণ্ডকালকে তিনি সমস্ত সত্তা দিয়ে আঁকড়ে ধরেছেন, নিরবধি কালের কোন হিসেব রাখেন নি।

অনন্ত কালের কাছে এই জীবন কতটুকু—তা ভাবতে কেউ তাঁকে শেখায়ও নি।

এখন ফিরে গেলেও কি তা ভাবতে পারবেন তিনি?

কোন প্রায়শ্চিত্ত করতে পারবেন? মোড় ফেরাতে পারবেন নিজের জীবনের? মনে তো হয় না। বহু পুরাতন অভ্যাস সেই ভুল পথেই তাঁকে চালনা করবে। আর এই শোক-সংবাদের বিশেষণগুলো তাঁকে বিদ্রূপ করবে তাঁর স্মৃতিপথে। প্রকাশ্যে ঐ বিশেষণ নিয়েই বিদ্রূপ করবে তাঁর কর্মচারীরা, তাঁর দূরসম্পর্কের হতাশ আত্মীয়-স্বজনরা।

এটা মিথ্যা প্রমাণ করতে ফিরে যাবেন, না মিথ্যাটাকেই সত্য মনে করবার সুযোগ দেবেন ?…

দিন গড়িয়ে অপরাহ্নে পৌঁছল : অপরাহ্ন পৌঁছল সন্ধ্যায়।

শচীনবাবু বসেই রইলেন এক ভাবে। বহু রাত্রে ধর্মশালায় ফিরে গেলেন আবার।

সে দিনও ছেলেদের কাছে সংবাদ দেওয়া হ'ল না। পরের দিনও না, তার পরের দিনও না।

অবশেষে একদিন আবার শচীনবাবু যাত্রা করলেন দেবপ্রয়াগের দিকে। হয়ত সে সাধুর পর্ণকুটীর এখনও সম্পূর্ণ ভুলে যান নি। সে পথ একদিন খুঁজে পাবেন।

মিথ্যাই মধুর। থাক সে মিথ্যা সত্য হয়ে।

জবানবন্দী

কেন মিছিমিছি এত হাঙ্গামা করছেন হুজুর। অনর্থক সময় নষ্ট। আমাকেই বলতে দিন না তার চেয়ে।…

হ্যাঁ, সাক্ষীসাবুদের দরকার নেই, আমি নিজেই স্বীকার করছি, পর পর আটটি মেয়েকেই আমি খুন করেছি। বিশ্বাস না হয়, কাউকে পাঠিয়ে দিন আমার ঘরে। গিয়ে দেখে আসুক—বড় আলমারিটার চোরা ড্রয়ারে পর পর আটটি ডান পায়ের পাটি লেডিজ স্লিপার লুকনো আছে। ঐটেই আমি রাখি, যাদের খুন করি তাদের নিদর্শন। মনে করে দেখুন এই মেয়েটিরও এক পাটি জুতো আপনারা খুঁজে পান নি, ভেবেছেন জলে পড়ে গেছে। না, কোথাও পড়ে নি। আমার কাছেই আছে। আমি জমিয়ে রাখি ভবিষ্যতে হিসাবের সুবিধের জন্যে। সেই আরব্য উপন্যাসে পড়েন নি, সমুদ্রের নিচের দৈত্য সিন্দুকের মধ্যে যে মেয়েটিকে পুরে রেখেছিল, সে প্রতিটি পুরুষের কাছ থেকে একটি করে আংটি চেয়ে রাখত। এই ক'রেই সে শেষ পর্যন্ত দু শো আংটির মালা গেঁথেছিল। আমারও ইচ্ছে ছিল দু শো না হোক—একশো পাটি জুতো জমিয়ে মালা গাঁথব একটা—আর সেই মালা উৎসর্গ ক'রে যাব বিশ্বের সমস্ত

ছলনাময়ী কুহকিনী নারীর উদ্দেশ্যে—আমার অন্তরভরা তিক্ততার শ্রেষ্ঠ অর্ঘ্য।

হুজুর অবাক হচ্ছেন, ভাবছেন আমার মাথার ঠিক আছে কিনা?

ভয় নেই, মাথা খুব ঠিক আছে। এমন ঠিক বোধ করি কখনও ছিল না। যা বলছি হিসেব ক'রেই বলছি। আজ না বললে তো আর বলাও হবে না, তা ছাড়া ভয়ই বা কি—খুন যটাই করি, ফাঁসি তো একবারের বেশি হবার উপায় নেই। আর ফাঁসির বেশি কি শাস্তিই বা দেবেন। কী দিতে পারেন আপনারা। এ তো তবু গোচর পাপ, অপরাধী হাতের মুঠোর মধ্যে, সমস্ত অপরাধই স্বীকার করছে সে। কত অসংখ্য ঘৃণ্য অপরাধ, কত পাপ নিত্য লোকের চোখের আড়ালে অনুষ্ঠিত হচ্ছে তার খবর রাখেন? শুনলে শিউরে উঠবেন সে সব পাপের কথা। কিন্তু আপনাদের সাধ্য নেই তার কোন কিনারা করেন বা অপরাধীকে ধরে বিচারালয়ের কাঠগড়ায় দাঁড় করান।

কী বললেন? ভগবান তাদের শাস্তি দেবেন?

কে জানে—হয়ত দেবেন কিন্তু আমার অত বিশ্বাস নেই, হয়ত অত ধৈর্যও নেই। আমি পারি নি সেই অদৃশ্য ভগবানের অপ্রত্যক্ষ কোন শাস্তি নেমে আসার জন্য অনির্দিষ্ট কাল অপেক্ষা করতে। আমার বিচার আমি নিজের হাতে তুলে নিয়েছিলাম। ভুল করেছি হয়ত—কিন্তু তার জন্য অনুতপ্ত নই। তবে আপনাদেরও দোষ দেব না, সমাজ রক্ষার জন্যে এই শাস্তি দেওয়া এবং পাওয়া দুটোই হয়ত দরকার, তবু তো অনেক দিন ফাঁকি দিয়েছি ফাঁসিকাঠকে —এবার যদি নিজের ফাঁকি পড়বার পালা এসে থাকে তো দুঃখ করব কেন।

কী বললেন হুজুর, আমি এমন পিশাচ হলুম কেন?

শুনবেন সে কথাটা? আমার মতো একজন ঘৃণ্য নরপশুর কুৎসিত ইতিহাস শোনবার মতো ধৈর্য আছে আপনাদের?

শুনুন তবে। সংক্ষেপেই বলছি। আপনানের ধৈর্যের ওপর বেশি অত্যাচার করব না।

স্নেহ দয়ামায়া এসব কোমল বৃত্তিগুলো মানুষ কোথা থেকে পায় বলুন তো হুজুর? মায়ের কাছ থেকে। কিন্তু আমার অদৃষ্টে বিধাতা যে শুরুতেই ঐখানে একটি বিরাট ফাঁকি লিখে রেখে ছিলেন। জ্ঞান হবার পর থেকে মাকে যে

মোটে দেখলুমই না। না, মারা যান নি। তাহ'লে তো বাঁচতুম। আমার অমন দেবতার মতো বাবা, আমরা দুটি ভাই—বিশ্বাস করুন ছেলেবেলায় ফুটফুটে সুন্দর দেখতে ছিলুম আমরা দুজনেই। আজও তার কিছু প্রমাণ থেকে গেছে দেহে। নইলে মেয়েগুলো অমন করে পাখা মেলে ধেয়ে আসত না তাদের ভয়াবহ পরিসমাপ্তির দিকে—সেই ফুটফুটে সুন্দর দুটি সন্তানকে ফেলে মা চলে গিয়েছিলেন। ঝগড়া নয় ঝাঁটি নয়, দুঃখ দারিদ্র্য কিছুই নয়—'শুধু-শুধুই'—মনের মানুষের কাছে যাবেন বলে। তখনকার দিনে হিন্দু বিবাহের বিচ্ছেদ ছিল না, তাই ধর্মান্তর গ্রহণ ক'রে মা তাঁর মনের মতো মানুষকে বিবাহ করেছিলেন। কাগজে কাগজে ছাপা হয়েছিল ঘটনাটা, তখনকার দিনে রীতিমতো চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছিল। সেই অপমানে দুঃখে আমার শান্ত ভালমানুষ বাবা পাগলের মতো হয়ে গেলেন, আমাদের জ্ঞান হবার পর দেখেছি কারুর সঙ্গে কথা বলতেন না, কারুর সঙ্গে দেখা করতেন না—দিনরাত ঘরের মধ্যে চোখ বুজে বসে থাকতেন। মস্ত বড় বিদ্বান ছিলেন, সরকারী কলেজের নামকরা অধ্যাপক—সেই মানুষ জবুথবু জড়ভরত হয়ে গেলেন চিরদিনের মতো। ভাগ্যে নিজেদের বাড়িটা ছিল আর আমার জাঠতুতো দাদা ছিলেন একজন। আমাদের সেই বড়দাই আমাদের বাপের কাজ করেছিলেন সেদিন,—নইলে—মানুষ হই নি এটা ঠিকই—কিন্তু খেয়ে-পরে বড় হওয়ার কি কাজ চলার মতো এই সামান্য লেখাপড়া শেখা—এটুকুও হ'ত না—তিনি না থাকলে।

সত্যি, বাপের মতোই মানুষ করেছিলেন তিনি। কারণ বাবা বেশীদিন বাঁচেনও নি। অন্ধকার ঘরের মধ্যে দীর্ঘকাল রেখে দিলে টবের গাছ যেমন বিবর্ণ হয়ে শুকিয়ে যায় ক্রমশ, আমার বাবাও তেমনি আস্তে আস্তে বিবর্ণ হ'তে হ'তে শুকিয়ে—যেন ঝরে পড়লেন। আমার তখন মোটে এগারো বছর বয়স—বাবা যখন মারা গেলেন, কিন্তু সে অভাব একদিনের জন্যও বুঝতে দেন নি আমাদের বড়দা।

আশ্চর্য মানুষ ছিলেন বড়দা। নিজের ভাইও এমন করতে পারে না, তিনি যা করেছেন। একাধারে মা ও বাবার স্নেহ পেয়েছি তাঁর কাছে। বিয়ে করেন নি তিনি বহুদিন পর্যন্ত। করতে পারেন নি আমাদেরই জন্যে। আমার নিজের দাদা বি.এ. পাস করে চাকরিতে না ঢোকা পর্যন্ত সাহস করেন নি তিনি বিয়ে

করতে। যদি পরের মেয়ে এসে আমাদের পর করে দেয়—এই ছিল তাঁর ভয়। হায় রে! পরের মেয়ে কতটা করতে পারে যদি জানতেন তিনি!

বড়দা যখন বর সেজে টোপর মাথায় দিয়ে পিঁড়িতে গিয়ে বসেছিলেন তখন তাঁর এদেশের নিয়মে বিয়ের বয়স পেরিয়ে গিছল তা মানছি। চল্লিশ না হ'লেও, খুব বেশি দেরিও ছিল না চল্লিশ হ'তে। কিন্তু তা হোক, স্বাস্থ্য ছিল তাঁর অটুট, চেহারাও ভাল—রীতিমতো সুপুরুষই বলতে হয় তাঁকে। আর মানুষ? অমন মানুষ আমি আজ অবধি আর দেখি নি—অমন শত্রু-মিত্র-নির্বিশেষে সর্বজীবে মায়া—কিন্তু তাঁর তেইশ বছরের এম.এ. পাস বৌ তাঁকে চিনতে পারলেন না। কে জানে কেন প্রথম থেকেই তিনি একটা বিষদৃষ্টিতে দেখেছিলেন বড়দাকে। অত্যন্ত অবজ্ঞা করতেন, হীন চোখে দেখতেন—ইংরেজীতে যাকে বলে 'লুক ডাউন' করা। বড়দা ভয় পেয়েছিলেন—আমাদের পর করবে কিনা তাঁর বৌ—সে বড়দাকেই পর ক'রে রাখল চিরকাল। কখনও একটা মিষ্টি কথা বলে নি। লোকে চাকরবাকরের সঙ্গেও অমন তুচ্ছতাচ্ছিল্য ক'রে কথা বলে না—বা বলতে সাহস করে না—তিনি স্বামীর সঙ্গে তেমন ভাবে কথা বলতেন। মানুষ বলেই মনে করতেন না যেন। বড়দা কিছু বলতে গেলেই যেন থাবা মেরে থামিয়ে দিতেন। মুখের ওপরেই হেসে ভেংচি কেটে পাগল বানিয়ে দিতেন। সেজন্যে কতদিন বড়দার চোখে জল দেখেছি।

কারণটা বোঝা গেল আর দিন কতক পরে। বৌদির সমবয়সী একটি মাসতুতো ভাই এখানকার নিত্য অতিথি হয়ে উঠল। তার জন্যে প্রত্যহ জামাই-আদরের ব্যবস্থা, তার সম্মান গৃহস্বামীর থেকে ঢের বেশি। বৌদি তাঁর এই আসক্তি গোপন করারও চেষ্টা করেন নি কোনদিন। প্রকাশ্যেই মুগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে থাকতেন, তাঁর সেই ভাইয়ের প্রতিটি কথা যেন বেদ-বাক্য ছিল তাঁর কাছে।

কিন্তু তবুও আমার ভালমানুষ বড়দা তাঁকে একটি কথাও বলেন নি। নিজের বাড়িতে নিজের উপার্জনে খেয়ে ও সকলকে খাইয়ে যেন চোরের মতো থাকতেন। ঠিক ক্রীতদাসের মতো ব্যবহার করতেন বৌদি স্বামীর সঙ্গে—ছাগল বলদ বলে মনে করতেন।

বড়দার বোধ হয় সবই সহ্য হত—কিন্তু আমাদের অসহ্য হয়ে উঠল ক্রমশ।

আমি শেষে প্রতিবাদ করতে বাধ্য হলুম। প্রথম প্রথম বৌদি যা কাণ্ড করতেন তার উত্তরে—সে বলা যায় না। কোন লেখাপড়াজানা ভদ্র বংশের মেয়ে যে এত ইতর হ'তে পারে তা আপনারা কল্পনাও করতে পারবেন না। কিন্তু আমি পিছু হঠলুম না। ইতরতা ও ছোটলোকমিতে তাঁর কাছে দীক্ষা নিয়েই তাঁকে হটিয়ে দিলুম; মনে মনে জোর ছিল যে ভালমানুষ বড়দা বৌকেও যেমন কিছু বলতে পারবেন না—তেমনি আমাদেরও না। শেষে একদিন বৌদি ও বড়দার সামনেই সেই মাসতুতো ভাইটিকে গলাধাক্কা দিয়ে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিলুম।

এর ফলে বৌদির যেন একটা আশ্চর্য পরিবর্তন হয়ে গেল। প্রথম দুটো-তিনটে দিন ভয়ঙ্কর কাণ্ডকারখানা করলেন—খেলেন না দেলেন না, জিনিস-পত্র ফেলে ছড়িয়ে ভেঙে কুরুক্ষেত্র কাণ্ড বাধিয়ে তুললেন। শেষে আমি তাঁকেও দূর ক'রে দেব বলে তেড়ে যেতে যেন তাঁর চৈতন্য হ'ল, কারণ তাঁর বাপের বাড়ির অবস্থা ভাল নয়, কায়ক্লেশে দিন চলে, তার ওপর সেখানে আবার ছিল তাঁর সৎমা। আমার মতো চোয়াড়ে গুণ্ডার পক্ষে সবই সম্ভব বুঝে যেন ভয়েই স্তব্ধ হয়ে গেলেন, কিন্তু সে স্তব্ধতা যে ভয়ঙ্কর ঝড়ের পূর্বাভাস তা তখন বুঝি নি। তিনি যে সেদিন সেই মুহূর্তে আমাদের সাংঘাতিক সর্বনাশ করবার সঙ্কল্প নিয়েই শান্ত হয়ে গিয়েছিলেন তাও বুঝি নি।

সে শান্তির তাঁর প্রয়োজনও ছিল, নইলে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হ'ত না।

সবটাই বুঝলুম, দিবালোকের মতোই পরিষ্কার হয়ে গেল সবটা—মাত্র মাস দুই পরেই যখন তিনি এবং আমার নিজের দাদা একত্রে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেলেন। উঃ, সেদিনের কথা কোন দিন ভুলব না হুজুর। আমার বড়দা কিছুই বললেন না কিন্তু আমি লজ্জায় তাঁর মুখের দিকে চাইতে পর্যন্ত পারলুম না আর। লজ্জা নিজের দাদার জন্যে, লজ্জা নিজের নির্বুদ্ধিতার জন্যে—মেয়ে-ছেলেটিকে এতদিন দেখেও তার আপাত-শান্ত ভাবকে ভুল বোঝবার জন্যে।

এই দুটি আঘাতই যথেষ্ট—কী বলেন? কিন্তু তবু ঐতেই শেষ নয়, আরও কিছু আছে।

মালতী বলে যে মেয়েটিকে ট্রাঙ্কের মধ্যে পাওয়া গিয়েছিল আসানসোল

স্টেশনে, মনে আছে হুজুর? টুকরো টুকরো ক'রে কাটা, চোখ দুটো ওপড়ানো—? পাছে ওর সেই আশ্চর্য সুন্দর চোখ দুটো দেখে সনাক্ত করতে পারে কেউ—এই ভেবেই চোখ দুটো তুলে নিয়েছিলুম কিন্তু তবু চেনা গিয়েছিল, হাতের বালা আর শাড়িতে লণ্ড্রীর মার্কা সনাক্ত করেছিল ওর স্বামী। তবে খুনী আপনারা ধরতে পারেন নি, আজও পারেন নি। আমি স্বীকার না করলে পারতেন না হয়ত। কারণ ওর বিয়ের পরেও যে আমার সঙ্গে যোগাযোগ ছিল তা কেউ জানত না।

মালতীর সঙ্গে আমার পরিচয়ও হ'ত না, যদি না মালতীর মা একরকম জোর ক'রেই গায়ে পড়ে পরিচয় করতেন। পাড়াতে ওঁরা ভাড়াটে এসেছিলেন—আমাদের বাড়ির কাছে, কিন্তু সে তো অমন কতই আসে—আমি ওসব কোন বাড়ির দিকে তাকাই নি কখনও। কিন্তু মালতীর মা আমার দিকে তাকিয়ে দেখেছিলেন। বয়স অল্প, চেহারা ভাল—ভাল রোজগার করি এবং বাড়িখানা আমার পৈতৃক—এ খবরটুকু সংগ্রহ করতে তাঁকে বেশি বেগ পেতেও হয় নি। তারপর নানা কৌশলে তিনি পরিচয়ের জাল বিস্তার করলেন, আমিও সে জালে ধরা দিলুম কতকটা ইচ্ছা ক'রেই। কারণ প্রথম দিনই মালতীকে দেখে মুগ্ধ হয়েছিলুম আমি। মুগ্ধ হবার মতো আর কি ছিল তা জানি না, অত হিসেব করি নি কিন্তু ওর চোখ দুটিই যথেষ্ট। চোখ দুটিই পাগল ক'রে দিয়েছিল আমাকে।

এ মিলনে কোথাও কোন প্রতিবন্ধকতা ছিল না। পাত্র হিসাবে যে আমি ঈপ্সিত ব্যক্তি—তা আমিও জানতুম। তাই নিশ্চিন্তই ছিলুম। তাঁরাও ধরে নিয়েছিলেন যে আমি তাঁদের জামাই হতে প্রস্তুত আছি। তবে তাড়া কোন পক্ষেই খুব ছিল না। সবই যেখানে ঠিক, পাত্রপাত্রীর মনের মিল এবং অভিভাবকদের মতের মিল কোনটাতেই যখন কোন বাধা নেই, তখন আর তাড়া কি? কিন্তু হঠাৎ এর মধ্যে কোথা থেকে এসে পড়ল গৌরাঙ্গ পাল—কলকাতায় সাতখানা বাড়ি, তিনটে গাড়ি এবং গুটিপাঁচেক ব্যবসার মালিক বা অংশীদার। মালতীর দাদার সঙ্গে মালতীকে কোন সিনেমায় দেখে সে লোক লাগিয়ে পরিচয় ও ঠিকানা বার করেছিল। তারপর আর তার পরিচয় ক'রে বাড়ি আসতে কতক্ষণ লাগে। টাকাই পৃথিবীর সবচেয়ে শক্তিশালী পরিচয়-

পাত্র তা আজকাল পাঁচ বছরের শিশুও জানে।

গৌরাঙ্গ রঙ্গস্থলে দেখা দিতেই অভিনয়ের পালা বদল হ'ল অর্থাৎ নায়ক গেল পালটে। মালতীর মা বাবা তো বটেই, মালতীও যেন কেমন আড়ষ্ট হয়ে উঠল আমার সম্বন্ধে।

গৌরাঙ্গ আমার মতো বোকা নয়—সে সময়ের মূল্য বোঝে। ওদের পরিচয়ের দু মাসের মধ্যে ঘোর ঘটা ক'রে বিয়ে হয়ে গেল। পাছে কোন হাঙ্গামা বাধাই কি গোলমাল করি এই ভয়ে ঢাকুরিয়ার কাছে একটা বড বাড়ি ভাড়া ক'রে বিয়ের ব্যবস্থা করলেন ওঁরা—এবং আমাকে একটা নিমন্ত্রণ জানানোও উচিত মনে করলেন না।

সেই দিনই—আমি স্বীকার করছি হুজুর—সেই দিনই আমার ঐ একশোটি জুতোর মালার সঙ্কল্প নিই। খুব কি অন্যায় করেছিলাম—? আইন বাদ দিয়ে ন্যায় ও সত্যের দিকে তাকিয়ে আপনারা বলুন, আমি কি খুব একটা অপরাধী? লোকে কথায় বলে বার বার তিনবার। এই তিনটে আঘাতই কি মানুষকে পিশাচে পরিণত করাব পক্ষে যথেষ্ট নয়?

আমার অভিজ্ঞতা হয়েছিল বড় বৌদিকে দেখে, তাই কোন চেঁচামেচি গণ্ডগোলের দিক দিয়েই যাই নি। শান্ত ভাবেই অপেক্ষা কবেছিলুম সুযোগের। আমি জানতুম আমার সম্বন্ধে সত্যকারের একটা দুর্বলতা ছিল মালতীর। গৌরাঙ্গের অন্য কোন চার্ম ছিল না—তার টাকা ছাড়া। তাই মাস পাঁচ-ছয়, টাকাতে অরুচি হয়ে যাবার মতো সময় দিয়ে, আবার একদিন মালতীর সঙ্গে দেখা করলুম গোপনে। সে যদি তখন আমাকে প্রত্যাখ্যান করত, যে স্বামীকে সে স্বেচ্ছায় বেছে নিয়েছে তার প্রতি এতটুকু বিশ্বস্ততা দেখাত তো আমি অনায়াসেই তাকে ক্ষমা করতুম কিন্তু সে আমার টোপ গিলল। নিয়তি ঘনিয়ে এলে যেমন পাখা মেলে মনের আনন্দে পতঙ্গ গিয়ে প্রদীপে ঝাঁপিয়ে পড়ে তেমনিই পড়ল সে।

সেই শুরু ধর্মাবতার—আর এই শেষ। সেই দিন থেকে এইটিকেই আমার জীবনের ব্রত বলে গ্রহণ করেছিলুম—একটি করে মেয়েকে ভুলিয়ে এনে তার অজ্ঞাতসারে, তাকে জানিয়ে হত্যা করব। আর তাদের একটি ক'রে পাটি জুতো জমিয়ে রাখব—নিদর্শন। খুব মাথা খাটিয়ে করতুম এ কাজ, খুব হুঁশিয়ার হয়ে

—যাতে কোন প্রমাণ কেউ না পায়। কিন্তু পর পর সাতটা সাফল্যেই বোধ হয় একটু অহঙ্কার বোধ হয়েছিল—তাই এবারে আর অতটা খেয়াল করি নি। ধারে-কাছেই যে সাক্ষী বসে ছিলেম একজন তাও দেখি নি। কিন্তু কী আর করা যাবে, আটটাও বড কম না। আমার বাবার, আমার বড়দার, আমার হয়ে অনেক শোধ তোলা হয়ে গেছে। অনেক বেশি। কী বলেন?

উষা থেকে সন্ধ্যায়

উনিশশো তেইশ-চব্বিশ সালে আমি বার তিনেক বৃন্দাবন গিয়েছিলাম।

ছাব্বিশ সালেও যেতে হয়েছিল একবার—বাধ্য হয়ে। সেই সময়ই উষাকে দেখি। সেই বছর শোভারামকেও প্রথম দেখি। তখন আমার বয়স কম, বছর পনেরো মাত্র। শোভারামের সাতাশ-আটাশ, উষার উনিশ-কুড়ি। শেষ দেখলাম গত উনিশশো চৌষট্টি সালে—দিল্লীর পাহাড়গঞ্জ এলাকার এক বস্তিতে।

শোভারামের বাড়ি আগ্রা শহরে। কাজ খুঁজতে বৃন্দাবনে এসেছিল। রামবাবুদের ঠাকুরবাড়ি বা কুঞ্জে পূজারীর কাজ করত, পূজারী মানে নিত্য-সেবা তো বটেই, রান্নার কাজও। ভোগের রান্না, বাবুদের রান্না—বিশেষ কেউ অতিথি এলে, যেমন আমি, তাদেরও। ঝঞ্ঝাটও ছিল। রাত্রে ঠাকুরের বারোখানা লুচি, কর্তার তিনখানা রুটি—বাকী সকলের পরোটা বা টেকরা। ঠিকরে বলাই উচিত, সামান্য ঘি ছোঁয়ানো মোটামোটা পদার্থ, কাঠের মতোই কঠিন। এখানের এত কাজ করেও শোভারাম বারো টাকা শুখো মাইনেতে আর একটা ঠাকুরবাড়িতে ঠিকে পূজো ভোগের কাজ করে আসত। তবে সেখানে অত হাঙ্গামা ছিল না, প্রসাদ যা হত, একজন ভাণ্ডারী ছিল সে খেত। শোভারামেরও একটা অংশ পাওনা হত—মাসিক দু টাকায় সে 'পারস' বিক্রী করে দিত।

শোভারাম দীর্ঘকায় কান্তিমান পুরুষ। দোহারা, টকটকে রঙ, কাটা-কাটা নাক চোখ—বলিষ্ঠ সুশ্রী চেহারা। উষা মেদিনীপুরের মেয়ে, স্নিগ্ধ শ্যাম বর্ণ, ছিপছিপে গড়ন, আসা-ভাসা দুটি চোখ, পাতলা ঠোঁটের ওপরে আর নাকের

ডগায় বারো মাস বিন্দু বিন্দু ঘাম জমে থাকত, ভারী ভাল লাগত দেখতে।

অল্প বয়সে বিধবা হয়ে বাপের বাড়ি এসেছিল। গাঁয়ের ছেলেরা নষ্ট করবার তালে আছে দেখে এক পিসী সঙ্গে ক'রে বৃন্দাবনে নিয়ে আসে। কাঁচা বয়সের লাবণ্যবতী মেয়ে কোন ধনী গোঁসাইয়ের চোখে পড়ে গেলে অনেক টাকা বাগিয়ে নিতে পারবে, তাতে পিসীরও কিছু সুবিধে হ'তে পারে। ধর্ম যদি বিকোতেই হয় চড়া দামে বিকনোই ভাল—এই যুক্তিতেই এখানে এনেছিল সে। খদ্দেরও জুটেছিল—কিন্তু পোড়া মেয়ের ধর্মজ্ঞান টনটনে হয়ে উঠল, একেবারে বেঁকে দাঁড়াল। পিসী এক কুঞ্জে কাজ করে, সে কতকাল বসে খাওয়াবে? অগত্যা এই রামবাবুর কুঞ্জে ঝিয়ের কাজে ঢুকিয়ে দিলে। খাওয়া-পরা সাত টাকা মাইনে। মাইনের জন্যে যত না হোক—রামবাবুর গিন্নী জবরদস্ত মেয়েছেলে, চোখে চোখে রাখতে পারবে এই আশাতেই এখানে দেওয়া—

কিন্তু 'একদা কী করিয়া মিলন হল দোঁহে/কী ছিল বিধাতার মনে!'

অবশ্য 'কী করিয়া' যে সেটা পরে শুনেছিলুম উষারই মুখে—পাছে এমন কাজের মেয়েটাকে অন্য কেউ দু-এক টাকা বেশি মাইনে দিয়ে ভাঙিয়ে নিয়ে যায় তাই গিন্নীই একরকম 'জুটিয়ে' দিয়েছিলেন ওদের। এখনকার 'পুশ অ্যাণ্ড পুল'—আগে ঠেলে দাও পরে টেনে তোল, মেয়ের বাপ-মার এ মন্ত্র তখন ওঠে নি—এটা নিস্তারিণী দেবীর সহজাত বুদ্ধি।

তা, নিস্তারিণী দেবী যা চেয়েছিলেন তা পেলেন ওতেই। শোভারাম বুদ্ধিমান, বিশ্বস্ত, তাকে ভাঙিয়ে নেবার কম চেষ্টা হয় নি, উষার জন্যে দুরকম প্রস্তাবই এসেছে অতঃপর—কুঞ্জদাসী বা কুঞ্জস্বামিনী হবার, অনেক গোঁসাইও দূতী পাঠিয়েছেন, কামদার বা ম্যানেজার শ্রেণী তো বটেই। কিন্তু এ দুজন তখন দুজনের প্রেমে মশগুল, তুচ্ছ টাকা-পয়সা সুযোগ-সুবিধার জন্য একে অন্যকে ছেড়ে যাবে তা সম্ভব নয়। এই ধরনের প্রস্তাব এসেছে শুনলে নিস্তারিণী মুখ টিপে হাসতেন আর ধূর্ত চোখে উষার লজ্জারুণ-বর্ণ মুখের দিকে চেয়ে থাকতেন। এ ব্যাপারে তিনিই লাভবান হয়েছিলেন সবচেয়ে বেশি—উষা মনের খুশিতে (ওর নিস্তার মা বলতেন 'মনের সুখে') একা দুটো লোকের খাটুনী খাটত। কুঞ্জস্বামিনী দোতলায় বাথরুমে চান করতেন এক

চৌবাচ্চা জল ঢেলে, সে জল কুয়া থেকে তুলে সংকীর্ণ সিঁড়ি বেয়ে বালতি ক'রে ক'রে তুলত উষাই, প্রতিদিন তিনবার।

ওরা যে পরস্পরের মধ্যে কিভাবে ডুবে ছিল তার প্রমাণ পেয়েছি বারকতকই। গরমের দিনে ঘুঁচি চলনে ছোট্ট একটি খাটিয়া পেতে শুয়েছে শোভারাম—রামবাবু নিজে বলেছেন, 'আহা, এই গরমে ওখানে কেন শুচ্ছ, এই উঠোনটায় শোও না, কিম্বা এ বাড়ির ছাদেও তো যেতে পার।' শোভারাম তার কোন উত্তর দেয় নি। আমি গভীর রাত্রে কুয়াতলাতে যেতে গিয়ে দেখেছি সেইটুকু একরত্তি খাটিয়া—যা একজনের মতোও নয়, তাইতেই দুজনে এমন জড়াজড়ি করে শুয়ে আছে যে মনে হয় আরও একজন শুতে পারে ওদের পাশে। এই গরমে তিন দিক চাপা চলনে শোওয়া—এমন ঘাম যে মনে হচ্ছে বালতি করে জল ঢেলেছে কেউ। ওদের কিন্তু তাতে বিন্দুমাত্র ভ্রূক্ষেপ নেই, কিছু যে অসুবিধা হচ্ছে তা মনেই হয় না। এমনি দেখেছি মন্দিরের সংকীর্ণ রকে পর্দা ফেলে দুপুরবেলায় ওর থেকেও সংকীর্ণ স্থানে শুয়ে থাকতে। তিনটের সময় নিস্তারিণীর ডাকে উষা যখন চা করতে উঠে গেছে এখন মনে হয়েছে সদ্য কোন পুষ্করিণী থেকে ডুব দিয়ে এসেছে—কাপড়জামা সুদ্ধ। অথচ মুখে যে তৃপ্তির হাসি—তা চতুর্দশ লুইয়ের ভার্সাই প্রাসাদের কোমলতম শয্যা থেকে উঠে এলেও কারও মুখে ফুটত কিনা সন্দেহ।

নিস্তারিণী অবশ্য মধ্যে মধ্যে বিবেকের কাছে সাফ থাকার চেষ্টা করেন, কণ্ঠস্বর গাঢ় গম্ভীর করার চেষ্টায় ঈষৎ নাকী হয়ে যায় তাঁর, বলেন, 'শোভারাম, তুমি বাউনের ছেলে, বে করেছ, দু-তিনটি ছেলেমেয়ে হয়ে গেছে, তোমার কি এসব নোংরামো শোভা পায়। বৌ-ছেলেদের কথাটা ভাব একবার।'

তিনি স্পষ্ট বলেন বলেই স্পষ্ট উত্তর শুনতে হয়। শোভারাম কোন সঙ্কোচ করে না, সোজা উত্তর দেয়, 'আমি আগেও বছরে দশ-পনের দিনের ছুটি নিয়ে দেশে যেতাম, এখনও যাই। বৌয়ের সঙ্গে যেমন সম্পর্ক ছিল, এখনও তাই আছে। টাকা সবই তাদের পাঠাই। এখানে আমার কোন খরচ নেই, বিড়ি খাই না, আজকাল পান খাই এক-আধটা—সে উষার খরচ। ধরুন আমি যদি আর একটা বিয়েই করতুম, এমন তো তিন-চারটেও করে অনেকে, তাতে তো দুটো সংসার টানতে হত, রোজগার ভাগ হয়ে যেত, এ তো তা যাচ্ছে না।'

নিস্তারিণী খুশি প্রসন্ন মুখে বসে মালা জপ করেন।

উনিশশো ছাব্বিশের পর যখন আবার বৃন্দাবন যাই তখন শোভারাম ছিল, কিন্তু উষার দেখা পাই নি।

ব্যাপারটা কি জিজ্ঞাসা করতে শোভারাম হাউ হাউ ক'রে কেঁদেই উঠল; যা শুনলাম, অতি বুদ্ধিমতী নিস্তারিণীর বুদ্ধির দোষেই কাণ্ডটা ঘটেছে।

তাঁর কে এক ধনী গুরুভাই এসেছিলেন, গুরুভাইও বটে, দূর সম্পর্কের আত্মীয়ও বটে, নিস্তারিণী ভেবেছিলেন তাঁকে জপিয়ে (অথবা তোয়াজ করে) তার কাছ থেকে কিছু টাকা আদায় ক'রে মন্দিরটা বড় ক'রে নেবেন। পিছনের পুরনো জরাজীর্ণ রান্না মহলটা ফেলে ওখানেও দোতলা বাড়ি করে ভাড়া দেবার চেষ্টা করবেন—চাই কি 'লাইসিন' করিয়ে যাত্রী তোলা বাড়িও করতে পারেন। এখানের নতুন যাত্রীদের যে ছটা ভেট দিতে হয় তার মধ্যে কুঞ্জ ভেটও একটা। কেউ বা বলে বৃন্দা ভেট। মোদ্দা কথা এই—যেখানে থাকবে সেখানের ঠাকুরঘরে বা তুলসীতলায় এটা দিতে হয়। সেই বা মন্দ রোজগার কি? লাল ভেট হ'লে দু'টাকা দু'আনা, কাঙাল ভেটও সাড়ে আট আনা।

এই মতলবেই, বেশি তোয়াজ করার জন্যে, উনি উষাকে নবাগত ভৈরব-বাবুর সেবায় নিযুক্ত করেছিলেন। আগে থাকতে বলে-কয়ে—শোভারামকে শাসিয়ে যে, যাতে নিজের স্বামিত্ব স্থাপন করতে না যায়, বা সতীনের হিংসে প্রকাশ ক'রে না ফেলে—ভাল ধোপদুরস্ত পাটভাঙা চওড়া পাড় ধুতি পরিয়ে উষাকে সামনে ঠেলে দিয়েছিলেন। বলে দিয়েছিলেন, 'সর্বদা কাছে কাছে থাকবি, কখন কি দরকার হয় তার তো ঠিক নেই—মুখে মুখে সব যোগাবি।'

উষা যে সেবাযত্ন করতে জানে, এটা ওর কর্ণর কবচ কুণ্ডলের মতো সহজাত, সে আমি নিজেই দেখেছি বহুবার। তাকে বেশি বলতে হয় নি। মনিবের হুকুম—যে মনিব ইতিপূর্বে এমন হুকুম কখনও দেন নি—শোভারামও বিশেষ আপত্তি করে নি। আসলে এ সম্ভাবনাটাও ওর মাথায় যায় নি।

ভৈরববাবুর বয়স বেশি—পঞ্চাশের ওপরেই হবে। কিন্তু বেশ সুপুরুষ, স্বাস্থ্যবান মানুষ বলে এতটা বয়স দেখাত না। স্বাস্থ্যবান যে তাতে সন্দেহ

নেই, কারণ মদ ও মেয়েমানুষ এ দুইয়ে তিনি ডুবে আছেন প্রায় আকৈশোর, এখনও তাতে অরুচি হয় নি। অথবা তার ফলে শরীরও ভাঙে নি। তবে এবার তিনি সত্যিসত্যিই তীর্থধর্ম করতেই এখানে এসেছিলেন, একা—ইচ্ছা ছিল এখানে একটু নিরিবিলি থেকে সাধন ভজন করবেন—এ জীবনে আর ফিরবেন না।

কিন্তু, কলকাতায় যে ভাড়াটে-রমণী-সমাজে তিনি অভ্যস্ত, দীর্ঘকাল সম্ভোগের ফলে যে ধরনের মেয়েছেলেতে তাঁর 'বিতৃষ্ণা' এসেছিল—উষা সে সমাজের, সে ধরনের মেয়ে নয়। শান্ত, নম্র, সেবাময়ী। পল্লীগ্রামের শ্যাম-স্নিগ্ধতা যেন তার দেহে জড়িয়ে আছে। তার অস্খলিত সেবায়, তার সরল অথচ সসম্ভ্রম কথাবার্তায়, তার পেলব দেহসুষমায় মুগ্ধ হয়ে গেলেন ভৈরববাবু। উষারও, এই প্রথম বুদ্ধি-বিভ্রম ঘটল, অথবা লম্পট পুরুষ সম্বন্ধে মেয়েদের আকর্ষণ চিরকালের—সেও এই প্রৌঢ় লোকটির প্রতি আকৃষ্ট হ'ল। নিস্তারিণী রান্না মহলের জন্যে কিছু টাকা পেলেন বটে, তাও পর্যাপ্ত নয়—কিন্তু এমন অমূল্য অসামান্য দাসীটি তাঁকে হারাতে হ'ল। ভৈরববাবু যে বাকী জীবনটা এখানেই ভগবানের নাম ক'রে কাটাবার সঙ্কল্প প্রকাশ করেছিলেন, সেকথা ভুলে জরুরী কাজের নাম ক'রে অকস্মাৎ একদিন কলকাতায় ফিরে গেলেন—তার পরের দিন থেকে উষাও অদৃশ্য হ'ল।

এর বছর ছয়-সাত পরে হঠাৎ একদিন যেন নাটকীয়ভাবে উষার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল এই কলকাতা শহরেই।

মির্জাপুর স্ট্রীট দিয়ে (এখন সূর্য সেন স্ট্রীট) ঐ সময়টা হামেশা যাতায়াত করতে হ'ত। ওখানে এক বন্ধুর একটা দোকান ছিল, গিয়ে বসলে স্থানীয় এক বিখ্যাত দোকানের ভাল টোস্ট ও চা পাওয়া যেত, আরও অনেক বন্ধুও এসে জুটত, আড্ডা জমত ভাল। তাছাড়া এই পাড়ায় নিজেরও একটা আস্তানা হয়েছে, জীবিকার প্রশ্ন—ওখানে এমনিতেও ঘোরাঘুরি করতেই হয়।

একদিন কি একটা কাজে আটকে গেছি, ফিরতে অনেক রাত হয়েছে। শিয়ালদা আসতে হবে—হেঁটে আসা—মির্জাপুর দিয়েই আসা সুবিধা। তখন ঐ রাস্তাটায় শিয়ালদা আসতে ডান-হাতি একটা খোলার ঘরের ছোট্ট

বস্তি ছিল। পাড়ায় যারা দিনে সন্ধ্যা পর্যন্ত ঝিয়ের কাজ করত, তাদের মধ্যে কেউ কেউ ওখানে থাকত এবং যৎকিঞ্চিৎ উপরি রোজগারের আশায় রাত নটার পর মুখে খড়ির গুঁড়ো মেখে চোখে কাজল টেনে আধা-আঁধারে 'বার' দিয়ে দাঁড়াত। এই বস্তি বা কটা খোলার ঘর ছিল দীর্ঘকাল—এখনও আছে কিনা বলতে পারব না।

এটা জানি, এর আগেও দেখেছি, আটটার পর থেকেই এরা এসে এমনি দাঁড়ায়। যেতে যেতে দেখেছি কতকগুলি বিগতযৌবনা কিম্বা প্রৌঢ়া মেয়েছেলে বলিরেখা ঢাকার ব্যর্থ চেষ্টায় পুরু ক'রে খড়ি কিম্বা এরারুটের প্রলেপ দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। এক-আধদিন ছোট মেয়েও দেখেছি দু-একটি।

লক্ষ্য ক'রে দেখার মতো নয়। দেখিও নি, শুধু চোখে পড়েছে মধ্যে মধ্যে, এই পর্যন্ত। আমার বন্ধুরা হাসাহাসি করে, এদের রূপসজ্জা নিয়ে আলোচনা করে, আমি কখনও করি নি। কত দুঃখে এরা সারাদিন হাড়ভাঙা খাটুনির পর এই উঞ্ছবৃত্তি করতে এসেছে—সেটা কিছুটা বুঝতুম, কারণ আমাকেও অন্ন-সংস্থানের জন্য বিস্তর কষ্ট করতে হয়েছে, বিস্তর অপমান লাঞ্ছনা সইতে হয়েছে। তবে এও ঠিক—এদের নিয়ে এক শ্রেণীর কবি বা কবিভাবাপন্ন লোক যে ভাববিলাস প্রকাশ করেন, কপট দুঃখের কাব্য রচনা করেন—তাও করি নি কোনদিন। নিজের দুঃখের সীমা নেই, কতকগুলি নিম্নশ্রেণীর বারনারী নিয়ে হা-হুতাশ করব কখন এবং কেন?

কিন্তু সেদিন বাধ্য হয়েই ওদের দিকে চাইতে হ'ল। ট্রেনের কথা ভেবেই দ্রুত আসছি। হঠাৎ বোধ হয় আম বা কলার খোসায় পা পিছলে একটা সজোর আছাড় খেলাম। আর খেলাম ওদের সামনেই। বেশ লেগেছিল—তবু চারদিকে লোকে হাসছে এই ভেবেই তাড়াতাড়ি ওঠবার চেষ্টা করছি, হঠাৎ একটা গলা কানে এল 'মনে হচ্ছে খুব লেগেছে বাবু? ঐ ইস্কুল বাড়িটার রকে একটু বসবেন, জল দিয়ে দেব?'

চমকে উঠলুম। কেন চমকে উঠলুম তা ঠিক সে মুহূর্তে বুঝতে পারি নি, শুধু মনে হ'ল এ কণ্ঠস্বর আমার যেন পরিচিত, তাই কান দিয়ে ঢুকে মস্তিষ্কে বা স্মৃতিতে আঘাত করেছে সবেগে, কোন এক দূর ইতিহাসের দরজা খোলার জন্য মন আকলি-বিকলি করছে।

উঠতে কষ্ট হচ্ছে, অনেক চেষ্টা ক'রেও উঠতে পারছি না, বোধ হয় সেই মেয়েটিই হেঁট হয়ে বলল, 'যদি অপরাধ না নেন বাবু, আমার হাতটা ধরবেন ?'

বলতে বলতেই সেও যেন চমকে উঠল, 'ওমা, দাদাবাবু !'

আর সন্দেহের কোন অবকাশ কি কারণ রইল না। এমনকি মুখটা দেখারও আগে চিনতে পারলুম—এ বৃন্দাবনের সেই ঊষা।

অবশ্য মুখটাও দেখলাম এবার ভাল ক'রেই। ওর হাত ধরতে হ'ল না, এতক্ষণে আরও অনেক লোক দাঁড়িয়ে গেছে তাদেরই দু-তিনজন ধরে তুলল। পায়ে জোর নেই একটুও, অগত্যা তারাই ধরে নিয়ে গিয়ে পাশের ইস্কুল বাড়ির রকে বসাল। এবার ঊষা কোথা থেকে—সম্ভবত পথের ধারের চা-ওলার কাছ থেকে একটা ভাঁড় চেয়ে এনে সবাইকে একরকম সরিয়ে—অবশ্য এ সব মূর্তির সঙ্গে সকলেই পরিচিত বলে বেশি ঠেলতেও হ'ল না, যেন স্পর্শদোষ বাঁচাতেই সকলে সরে গেল—রাস্তার ওপরই উবু হয়ে বসে আমার হাঁটু দুটো জল দিয়ে চুঁচে দিতে লাগল।

সেবায় সে চিরদিনই পটু, অদ্বিতীয় বললেই হয়, বিশেষ এ সময় এ পদসেবা খুবই ভাল লাগল। কিন্তু ওর দিকে চেয়ে দেখে মনটা খুব খারাপ হয়ে গেল। সে ভঙ্গুর পেলবতা, সে কবির ভাষায় 'রজনীগন্ধার পুষ্পদণ্ডের মতো' দেহশ্রী, সেই কচি মুখ—যাতে আসল বয়সের চেয়েও তাকে ছোট দেখাত—সে সব কোথায় গেল। ললাট ও কপোলে বলিরেখা দেখা দিয়েছে, গাল বসে গিয়ে চোয়ালের হাড় ঠেলে উঠেছে, মেচেতার দাগ পাউডার বা খড়ির গুঁড়োয় ঢাকা পড়েনি। খুবই রোগা—কণ্ঠা দুটো ঠেলে উঠেছে—অস্বাস্থ্য, অনাচার, অনাহার ও পরিশ্রমের চিহ্ন তার সর্বাঙ্গে পরিস্ফুট।

দেখে মমতাও হল—একটু রাগও হল। নিরাপদ আশ্রয়, অল্পবয়সী প্রেমিক ছেড়ে মুখপুড়ী জেনেশুনে একটা লম্পটের সঙ্গে চলে এলি। সে যে দুদিন বাদে ছেঁড়া জুতোর মতো ত্যাগ করবে এ তো জানা কথাই। তোর অভিজ্ঞতা না থাক কারও মুখে কি শুনিসও নি এই শ্রেণীর পুরুষের কথা।

আমার মুখের দিকে চেয়ে না দেখেও বোধ হয় আমার মনের কথাগুলো বুঝতে পেরেছিল ঊষা, তার এই স্বেচ্ছাকৃত দুর্ভাগ্যে আমার মনের কি প্রতিক্রিয়া হবে তা বুঝেই—কারণ দেখলাম এবার তার কোটরগত চোখ দুটি—

একদা যা আশ্চর্য এক জাদু সঞ্চার করত সবার মনে—দিয়ে ঝর ঝর ক'রে জল ঝরে পড়ছে আমার পায়ের উপর।

আমি বৃথা কোন ভূমিকা না ক'রে প্রশ্ন করলুম, 'এখন এ-ই কি একমাত্র রোজগার?'

মাথাটা আরও হেঁট হ'ল। তবু আস্তে আস্তে জবাব দিলে, 'ঐ পিশাচটা যখন ফেলে চলে গেল তখন এই পথ ধরা ছাড়া গতি ছিল না। তখন চলেও যেত কিন্তু এখন আর এতে বিশেষ কিছু হয় না, অর্ধেকদিন শুধু দাঁড়িয়ে থাকাই সার হয়—আর হ'লেও সে খুব সামান্য, এর জন্যে যেটুকু খরচ তাও ওঠে না সব দিন—এমনি তিন বাড়ি ঠিকে কাজ করি—বাসন মাজা ঘর মোছা। কিন্তু শরীরের যা অবস্থা, কতদিন পারব তা জানি না—'

আরও এক ঝলক জল তার গাল বেয়ে গড়িয়ে পড়ল।

আমি একটা রিক্সা ডেকে কোনমতে উঠে বসলুম, শিয়ালদা পর্যন্ত হেঁটে যাওয়া চলবে না, উঠে বসে মনে পড়ল আজ এক প্রকাশকের কাছ থেকে একটা ছেলেদের বই বাবদ সাতটা টাকা পেয়েছি, আংশিক রয়ালটি হিসেবে। তা থেকেই দুটো টাকা বার ক'রে বললুম, 'এটা রাখ ঊষা, মিষ্টি-টিষ্টি খেও—'

সে মাথা হেঁট ক'রেই বলল, 'না বলার আর উপায় নেই বাবু। পরনের কাপড় বলতে কিছু নেই, একখানা অন্তত মিলের শাড়ি না কিনলে চলবে না।'

আমার রিক্সা ছেড়ে দিলে। সে সঙ্গে সঙ্গে দু পা এসে চুপি চুপি প্রশ্ন করল, 'ওদের—ওদের খবর কিছু রাখেন না কি বাবু?'

'হ্যাঁ, রাখি বৈকি, রামবাবু মারা গেছেন। নিস্তার মাসীমা ভালই আছেন। শোভারাম শুধু তোমার শোকেই বোধ হয়—বড্ড যেন অসময়ে বুড়ো হয়ে গেছে। তবে হ্যাঁ, ওখানেই কাজ করছে এখনও—'

রিক্সা ছেড়ে দিয়ে সরে গেল ঊষা।

এর পর—অনেক বছর পরে—শোভারামের সঙ্গেই দেখা হল দিল্লীর পাহাড়গঞ্জে। কিছুদিন আগে একটি বাঙালী ছেলের সঙ্গে ট্রেনে আলাপ হয়েছিল। এইখানেই তাদের পৈতৃক বাড়ি। ছেলেটি ইতিহাসে এম. এ. পাস, রঙের ব্যবসা করে। সেই উপলক্ষেই নানা স্থানে ঘুরে বেড়ায়। ভারী ভাল

লেগেছিল আলাপ ক'রে। তারই আমন্ত্রণে ওদের বাড়ি যেতে হয়েছিল সেবার।

ওদের বাড়ির কাছেই একটা বস্তি ছিল। খাপরার বস্তিও নয়—যাকে ঝুগ্‌গি বলে এদেশে—তারই সারি বেশির ভাগ। এমনি অলসভাবে দেখতে দেখতে যাচ্ছি—দেখি এ পল্লীর সঙ্গে একান্ত বেমানান এক গৌরবর্ণ শুভ্রকেশ বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ উদ্বিগ্নভাবে পথের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

তার দৃষ্টি আমার দিকে ছিল না এটা ঠিক। কিন্তু আমার কেমন একটা খটকা লাগল, মনে হ'ল এ চেহারা, ঐ চোখ—যা একদা কারণে অকারণে কৌতুক-হাস্যে উজ্জ্বল হয়ে উঠত—দাঁড়াবার ভঙ্গী, আমার পরিচিত।

মিনিট খানেক দেখার পরই আমার মুখ দিয়ে যেন আপনি বেরিয়ে গেল—'শোভারাম'।

লোকটি চমকে এদিকে চাইল—কিন্তু তার বিস্মিত অথচ শূন্য দৃষ্টি দেখেই বুঝলুম আমাকে চিনতে পারে নি। তবে আমার আর সংশয়ের কারণ ছিল না। বললুম, 'শোভারাম, আমাকে চিনতে পারলে না?'

এবার বিহ্বল দৃষ্টিতে পরিচয়ের আলো ফুটল। বলল, 'কেষ্ট দাদাবাবু? বাব্বা, আপনি কত বড় হয়ে গেছেন, ভারিক্কী চেহারা, চিনব কি ক'রে। তা আপনি এখানে?'

'তোমার চেহারাও তো কম বদলায় নি—বুড়ো হয়ে গেছ একেবারে—আমি তো ঠিক চিনেছি। তুমি চিনতে পারলে না!...আমি এসেছি এখানে এক বন্ধুর বাড়ি, তুমি এখানে কোথা থেকে? কী করছ? পথের ওপর দাঁড়িয়েই বা কেন?'

শোভারামের স্বভাবসহাস্য দৃষ্টি আবারও যেন চোখের নিমেষে ম্লান হয়ে উঠল। বলল, 'আর বলেন কেন, গ্রহের ফের।...ঊষাকে মনে আছে বাবু, সেই যে মেয়েটা ওখানের কুঞ্জে কাজ করত—?'

'খুব মনে আছে। কলকাতায় একবার দেখাও হয়েছিল। সে একেবারেই নষ্ট হয়ে গেছল, পথের ধারে দাঁড়িয়ে খদ্দের ধরতো। কেন, তার কথা কি? সে বেঁচে আছে?'

'সে তো এখানে। তাকে নিয়েই তো এসেছি। বাঁচবে না বেশিদিন—তবু

যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ। মেয়েছেলেটা একেবারে বিনা চিকিৎসায় মরে যাবে—এ কি ক'রে দেখব।'

'তা তোমার ঘাড়ে আবার চাপল কি ক'রে, তুমিই বা আবার ঘাড় পাততে গেলে কেন?'

শোভারামের মুখের ভঙ্গীটা এই বয়সেও কেমন যেন নব-অনুরাগীর মতো সলজ্জ হয়ে উঠল। আস্তে আস্তে বলল, 'আমি তখন দেশে গিছলাম বাবু। ছেলেরা তো কাজ করতে দিতেই চায় না—বলে এখন আমরা রোজগার করছি, ঘরে বসে খাও। তাছাড়া জানেনই তো মা মারা গেছেন, নতুন সেবাইত হয়েছে ওঁর ভাইপোরা—তারা আসেও না দেখেও না, গোটাকতক টাকা পাঠিয়ে খালাস। কুঞ্জের যা হাল হয়েছে, দেখলে আপনার চোখে জল আসবে।…তবু আমি যেন মায়া কাটাতে পারি না, ষোল বছরে এসেছি, ষাট পার হয়ে গেছি কবেই—তাছাড়া বলি শরীর তো পড়ে যায় নি, কেন ছেলেদের ঘাড়ে চেপে বসে খাব—খোরাকীটা তো চলে যাচ্ছে, মাইনেও পাই একটা—আর ঠাকুরের সেবা হয়, তাই কাজ ছাড়ি নি। আসলে আপনার কাছে মিছে বলব না—মনে কেমন একটা আশাও ছিল যে, ও একদিন ফিরবে, তখন যদি না খুঁজে পায়? আর হ'লও তো তাই। সেইখানেই ও চিঠি দিয়েছিল একটা, কাকে দিয়ে লিখিয়েছে—পরিষ্কার হাতের লেখা—একজনকে দিয়ে পড়িয়ে নিলুম। চিঠি যেদিন এল সেদিনই আমি অন্য লোক রেখে আগ্রা যাচ্ছি কদিনের জন্যে। তবু ওখানে বাঙালী পাব না বলে যাবার আগে বৃন্দাবনেই পড়িয়ে নিলুম চিঠিখানা। লিখেছে, 'তোমার কাছে অনেক অপরাধ করেছি—তার ফলও ভোগ করেছি চারগুণ, এখন মৃত্যুশয্যায়। বেশিদিন আর বাঁচব না, খারাপ অসুখে দেহ ঝাঁঝরা ক'রে দিয়েছে, ভিক্ষে ক'রে খাচ্ছিলুম, এখন আর উঠতেও পারি না। মরার আগে তোমাকে খুব দেখতে ইচ্ছে করছে, একবার পায়ের ধুলো দিয়ে যেতে পার না? আমার মাপ চাইবার মুখ নেই, কাঞ্চন ফেলে হীরে মনে ক'রে কাঁচে গেরো দিয়েছি—তুমি যদি পার নিজগুণে মাপ ক'রো।'

'তা দাদাবাবু চিঠিটা পেয়ে অনেক ভাবলুম। প্রথমটা খুব রাগ হ'ল। আমার জীবন খালি ক'রে, নিজের জীবন বরবাদ ক'রে তার শাস্তি ভোগ করছে, আমাকে আবার টানা কেন এতকাল পরে? কিন্তু বড্ড মন-কেমনও করতে

লাগল। শেষে লাজলজ্জার মাথা খেয়ে আমার স্ত্রীকে বললাম কথাটা। সে দাদাবাবু দেবীর মতো আমাকে ক্ষমাই ক'রে এসেছে চিরকাল, কখনও একটা উঁচু কথা বলে নি। বরং আমার দিদির কাছে বল্লেছে 'সত্যিই তো, ওখানে একা থাকা, পুরুষমানুষ—পাথর তো নয়—একটু-আধটু করলেই বা, দোষ কি। তার জন্যে ছুটো দিনের জন্যে আসা—ঝগড়া ক'রে অশান্তি করব।' সে-ই এবারও পথ দেখাল বাবু। বললে, 'হাজার হোক তুমিই ওকে প্রথম নষ্ট করেছ, এ স্বাদ তুমিই দিয়েছ, তারপর ছেলেমানুষ যদি ভাল কাপড় গয়নার লোভে গিয়েই থাকে—তার জন্যে তোমার দোষ ধরা উচিত নয়—তুমি একবার যাও।' ছেলেরা দাদাবাবু আপনার মা বাবার আশীর্বাদে ভাল রোজগার করে। একজন তো সরকারী দপ্তরে বড় কাজ পেয়েছে—আমি যা টাকা পাঠাই সংসারে লাগে না—আমার স্ত্রী সব টাকা জমিয়ে রেখেছিল—এখন বার ক'রে দিয়ে বললে, 'যাও, টাকাগুলো রাখ—দরকার হয় ডাক্তার-টাক্তার দেখাতে পারবে।'

'দাদাবাবু কলকাতায় পৌঁছে ওর হাল দেখে আমার এতকাল পরেও কান্না পেয়ে গেল। সে যে কী দুর্দশা, একটা ছেঁড়া মাত্থরের ওপর একখানা চামড়ায় ঢাকা কঙ্কাল পড়ে আছে। সর্বাঙ্গে নানারকম ঘা, তাতে মাছি বসছে—তাড়াবার ক্ষমতা নেই। চারিদিকে নোংরা, ঘায়ে দুর্গন্ধ। একটা মাটির ঘরে ছেঁড়া মাত্থরে পড়ে আছে, একটা ভাঙা গেলাসও নেই, নারকেল মালায় জল খায়—তাতে বাড়িওলা পুলিস ডেকে তাড়াতে গিছল। চার টাকা ভাড়া, তা নাকি এক বছর দেয় নি—কিন্তু ওর হাল দেখে পুলিসও ফিরে গেছে। বলেছে তোমার ঐ চার টাকার জন্যে তুমি মরে যাবে।···আমি লোক ডেকে পরিষ্কার করাই—পথ্যি খাওয়াই, ডাক্তার ডাকি। ডাক্তার এসে দেখে ওষুধ দিলেন। তবে বলছেন, 'এ আর বেশিদিন নয়—যা খেতে-টেতে চায় দিও।' ওখানে বাবু আমিও কাউকে চিনি না, আমাকেও কেউ চেনে না। কোথায় থাকব, কি করব—হু হু ক'রে টাকা খরচ হয়ে যাচ্ছে—ভাবলুম দিল্লীতে বড় বড় হাসপাতাল আছে—নিয়ে যাই সেখানেই। আসলে আমার মামাতো ভাই এখানে থাকত, মানুষটা বড় দিল-খোলা আর দয়ালু—সেই ভরসাতেই আসা। কিন্তু আপনারা সেই বলেন না, অভাগা যে দিকে চায় সাগর শুকায়ে যায়—এখানে এসে শুনলুম সে ভাই মারা গেছেন। কি করি, তারই এক বন্ধু

আমাকে চিনত। সে-ই এখানে এ বাসা ঠিক ক'রে দিলে। বাবু এখনে যা ঘরের ভাড়া সে দেওয়া আমার সাধ্যি নয়—তাছাড়া এ রুগী নিয়ে কেউ থাকতেও দেবে না। তাই শেষে এই জায়গায় উঠতে হ'ল, তারই ভাড়া বলে দশ টাকা মাসে। হাসপাতালে হাসপাতালে ঘুরলুম, কোন হাসপাতাল রাজী হ'ল না। শেষে, শুনলুম, এখানে কে একজন ঘোষালবাবু ডাক্তার আছেন। খুব ভাল ডাক্তার, দয়া-মায়াও আছে—তাঁর কাছে গিয়েই পড়লুম। হাতে পৈতে জড়িয়ে তাঁর পায়ে ধরলুম একেবারে—তা তিনি দয়া করলেন। এসে দেখেছেন, ওষুধও দিয়েছেন—কিছু নিজেরই ব্যাগ থেকে দিয়েছেন, তার দাম নেন নি। বলেছেন, 'বেশিদিন বাঁচবে না ঠিকই—তবে জ্বালা-যন্ত্রণা না ভোগ করে সেই রকম ওষুধই দিলাম। সাতদিন পরে আবার আসব।' আজ সেই দিন, তাই পথে দাঁড়িয়ে আছি যদি বাসা চিনতে না পারেন।'···তারপর একটু ইতস্তত করে বললে—।

'বাবু, এই ঘরেই পড়ে আছে, দেখবেন নাকি ?'

আমার চোখের সামনে ভেসে উঠল, উজ্জ্বল শ্যামবর্ণের ছিপছিপে গঠনের এক হাস্যমুখী তরুণী—চোখে যার স্বপ্নের আবেশ মাখানো।

আমি ঘাড় নেড়ে বললাম, 'না শোভারাম, থাক। দেখে লজ্জা পাবে। আর কীই বা দেখব। এ পরিণাম হবে তা তো জানতুমই।'

পকেট থেকে কুড়িটা টাকা বার ক'রে ওর হাতে দিয়ে বললুম, 'এইটে রাখ, তোমার হাতও তো খালি হয়ে আসছে, দরকারে লাগবে।'

সে একটু ইতস্তত ক'রে নিল শেষ পর্যন্ত। বলল, 'ছেলেদেরও লিখেছি, যদি কিছু কিছু পাঠায়। লজ্জা করে বাবু, এই বয়সে—। কিন্তু ওকে, মেয়ে-ছেলেটাকে এই অবস্থায় ফেলে যাই-ই বা কি ক'রে!'

পূর্ব-পরিচয়

এ যেন কি হ'তে কী হয়ে গেল। লোকে বলে চায়ের পেয়ালায় তুফান ওঠা—এ একটা গোটা জাহাজই ডুবি হয়ে গেল বলতে গেলে—চায়ের পেয়ালায়।

এমন জানলে শোভন কী এ উচ্ছ্বাস প্রকাশ করতে যেত!

আসলে ইতিকে পেয়ে শোভন তো শুধু সুখী নয়, রীতিমত গর্বিতও বোধ করেছিল যে। সে গর্বের সমর্থন বন্ধুদের কাছ থেকে আদায় করতে না পারলে আশ মেটে কই ? তাদের ঈর্ষাতুর দৃষ্টির সামনে এই মালিকানার পূর্ণ সৌভাগ্যটা মেলে ধরতে না পারলে এ মালিকানা, এ পাওয়ার যে কোন মূল্যই থাকে না।

না, অসামান্য সুন্দরী নয় ইতি—এটা সত্যিকথা। কিন্তু যাকে সত্যিকারের নিখুঁত সুন্দরী বলে এমন ক-টা মেয়েই বা আছে, বাংলা দেশে ? তবু তো, এর চেয়ে ঢের নিকৃষ্ট, ঢের কুরূপা মেয়ের জন্যেই খুনজখম মারামারি আত্মহত্যার শেষ নেই।

আর নিখুঁত সুন্দরী না হোক, অপরূপ লাবণ্যবতী তাতে তো সন্দেহ নেই। এ সেই রূপ—যা পুরুষের চোখে পড়া মাত্র তার চিত্তকে স্নিগ্ধ আনন্দে ভরিয়ে তোলে—যে দিকে চাইলে মন অকারণেই প্রফুল্ল হয়ে ওঠে। অর্থাৎ খুঁটিয়ে দেখতে গেলে যে রূপে অনেক ত্রুটি অনেক খুঁত বেরোবে—তবু সবটা জড়িয়ে বড় মধুর, বড় চিত্তহারী।

কোথাও কোন অসাধারণত্ব নেই হয়তো, তবু ইতি যে অসামান্য এ কথা কে না স্বীকার করবে ?

আর শুধু তো লাবণ্যই নয়, ইস্পাতের মতোই ধারালো মেয়ে যে! অনার্সে বি. এ. পাস ক'রে ভর্তি হয়েছিল এম. এ. ক্লাসে, হঠাৎ বাবা মারা গেলেন। ছোট ভাই তখন সবে আই. এ. পড়ছে। দুজনের পড়া আর সম্ভব নয় বোঝা মাত্র এক কথায় এম. এ. পড়া ছেড়ে শর্টহ্যাণ্ড ইস্কুলে ভর্তি হয়ে গেল ইতি এবং বড় বিলিতী ফার্মে পরীক্ষা দিয়ে প্রথম হয়ে স্টেনোর চাকরি পেল। ওদের যখন বিয়ে ঠিক হ'ল তখন সে ঐ ফার্মেরই ম্যানেজার, খাস ইংরেজ সাহেবের পার্সোনাল স্টেনো।

শুধু কি তাই ?

গানবাজনা, গৃহস্থালির কাজ, রান্না—কিসে ওর দক্ষতা কম ? গানের গলা তো খুবই মিষ্টি ; রেডিও-রেকর্ডে গান দেবার মতো চর্চা ওর নেই বটে কিন্তু যেটুকু জানে সভাসমিতিতে বা অফিসের ফাংশনে গাইবার পক্ষে যথেষ্ট। বস্তুত এমনি এক সভাতেই ওকে প্রথম দেখে শোভন, উদ্বোধন-সঙ্গীত গাইবার জন্য ধরে এনেছিল তারা, তার পর ফ্রেফ তপস্যার মতো ক'রেই লেগে থেকে শোভন সেই

দেখাটাকে আলাপ এবং আলাপটাকে অন্তরঙ্গতায় পরিণত করেছিল।

এ হেন অসামান্য মেয়ে যে এক আধাবিদেশী পাবলিসিটি প্রতিষ্ঠানের মাঝারি কেরানীকে বিয়ে করবে—এ একটা অঘটন বৈকি। এবং শোভনের পক্ষে সুদুর্লভ সৌভাগ্যও বটে। কিছুটা তার কৃতিত্বেরও পরিচায়ক।

এই সৌভাগ্যের বার্তা দিতে এবং কৃতিত্বের বাহবা নিতেই মণীশকে চায়ে বলেছিল শোভন। মণীশকেই প্রথম বলেছিল, কারণ মণীশ সাধারণ সওদাগরী অফিসের কেরানী হলেও সে শিল্পী এবং বন্ধুমহলে সূক্ষ্ম পরিচ্ছন্ন রুচিবোধের জন্য বিখ্যাত। তার ওপর সে-ই বন্ধুদের মধ্যে সবচেয়ে সুদর্শন আর একটু শৌখিনও। অর্থাৎ ইতির কাছে বন্ধু বলে পরিচয় দেবার মতোই।

আয়োজনে কোন ত্রুটি ছিল না। সুন্দর সুসজ্জিত একফালি বসবার ঘর। আধুনিক প্রথায় আলোকিত। তারই মধ্যে স্ত্রীর হাত ধরে এনে দাঁড় করিয়ে নাটকীয় ভঙ্গীতে বললে শোভন, 'ইনিই আমার অর্ধাঙ্গিনী, সহধর্মিণী, গৃহিণী, সচিব, সখী—যা বলো, আসলে ইনি ইতি, অর্থাৎ কিনা আমার সমস্ত খোঁজার পরিসমাপ্তি, ইহলোকের চরম লক্ষ্য, জীবনের ধ্রুবতারা।'

'কী কর!' হাসি-হাসি মুখে চাপা ধমক দিয়ে ওঠে ইতি।

'তোমাকে পেয়ে কা আর আমার মাথার ঠিক আছে সখী? চপলতা আজি যদি ঘটে, তবে করিও ক্ষমা, হে নিরুপমা!'

হাতের বিচিত্র ভঙ্গী ক'রে গেয়ে ওঠে শোভন। তার পর মণীশের কাঁধে একটা চাপড় মেরে বলে, 'কী রে, বাক্যি হরে গেল যে! একেবারে যে চুপ হয়ে গেলি!'

মণীশ একটু হেসে বলে, 'না, চুপ হওয়ার আর কী আছে, অপরিচিত তো নয়!'

'তার মানে?' চমকে সোজা হয়ে বসে শোভন, 'অপরিচিত নয়? কোথায় আবার পরিচয় হ'ল তোদের?'

আবারও মুচকি হাসে মণীশ, বলে, 'হয়েছে অনেকদিন আগেই দীর্ঘকালের পরিচয়।'

চমকে উঠেছিল ইতিও। এবার তার চারু ললাটে ভ্রূকুটি ঘনিয়ে এল।

বললে, 'কিন্তু কই, আমার তো মনে পড়ছে না।'

মণীশ মুচকি হেসেই যাচ্ছে ; সে বললে, 'আপনার মনে পড়ার কথাও নয়। দেবী কি তাঁর অসংখ্য ভক্তকে চিনে রাখতে পারেন ? কিন্তু ভক্ত চেনে বৈকি !'

শোভন বোকার মতো একবার ইতি একবার মণীশের মুখের দিকে তাকাতে থাকে। ঠোঁটের ওপর থেকে হাসি তার তখন মুছে যায় নি বটে, কিন্তু চাপল্য অনেক কমে এসেছে। সে বলে, 'তোর ওসব হেঁয়ালি আমার ভাল লাগে না বাপু, কী ব্যাপার, কবে কোথায় আলাপ হয়েছিল তাই বল্ না কেন—সোজা-সুজি !'

'তা জেনেই বা তোর লাভ কি ? এত কৌতূহল কেন ?'

মণীশের চোখে কৌতুক, মুখে একটু দুষ্টুমির হাসি।

ইতি বলে, 'কী জানি উনি কি বলছেন, আমি কিন্তু ওঁকে একটুও চিনতে পারছি না, একটুও না। আমি ওঁকে এই প্রথম দেখছি।'

একটু কি অস্বাভাবিক রকমের তীক্ষ্ণ শোনায় ইতির কণ্ঠস্বর ? একটু কি বেশি জোর দেয় শেষের কথাগুলোয় ? অকারণ জোর ? অন্তত সেই রকম কি মনে হয় শোভনের ?

শোভনের মুখ থেকে হাসির ভঙ্গীটাও মিলিয়ে আসে ক্রমশ। সে যেন একটু বিরক্ত হয়ে বলে, 'আচ্ছা হয়েছে, হয়েছে—এখন চা নিয়ে এসো দিকি !'

চায়ের ব্যবস্থা বোধ হয় করাই ছিল। ঝি ট্রের ওপর খাবারের থালা আর চায়ের সরঞ্জাম সাজিয়ে নিয়ে ঘরে ঢুকল।

শোভন মণীশের খাবারের থালাটা নিজেই তুলে ওর সামনে টিপয়ের ওপর রাখে—একটু শব্দ ক'রেই—তার পর মুখে আবার একটা হাসি-হাসি ভাব এনে বলে, 'খাবার কিন্তু সবই ওর তৈরী, বাজার থেকে একটা মিষ্টি পর্যন্ত আনতে দেয় নি !'

'তাই নাকি ! এ যে একেবারে সুদুর্লভ সৌভাগ্য। বিশেষত আজকালকার দিনে। উদর বিভাগে দৈহিক পরিতোষ, সঙ্গী জোটায় মানসিক মধুরতা—এটা তো আমাদের কুলাঙ্গনারা আজকাল ভুলতেই বসেছেন !'

তার পর পটলের দোলমায় একটা কামড় দিয়ে বললে, 'অপূর্ব ! শুধু রূপ

নয়, রূপের আড়ালে যে এত গুণ আছে তা জানলে বন্ধু অনেকদিন আগেই কম্পিটিশনে লেগে যেতাম। নাঃ, বড্ডই ভুল করা গেছে, যাই হোক—থাউজেণ্ড কনগ্র্যাচুলেশন—সহস্র অভিনন্দন। খুবই জিতেছিস, যাই বলিস।'

মনের মেঘ পাতলা হয়ে আসে শোভনের, মুখের হাসিতে প্রসন্নতার আভাস লাগে। সে স্ত্রীর দিকে চেয়ে হেসে বলে, 'আমিই কি তপস্যা কম করেছি রে। তবু তো সব গুণের এখনও পরিচয় পাস নি। সি ইজ্ এ জুয়েল।'

ইতি কিন্তু তখনও গুম খেয়ে বসে ছিল। এবার সে একটু ঝাঁজের সঙ্গেই বললে, 'তোমাদের এ কথাবার্তাগুলো আমার কাছে আদৌ রুচিকর নয়—তা আমি বলতে বাধ্য হচ্ছি। উনি তো গোড়াতেই একটা বাজে কথা বলে আলাপের সূত্রপাত করলেন—তার পর আবার এমন সব কথা বলছেন—আমি যেন নিলামের ডাকের জন্য প্রস্তুত হয়ে পড়েছিলুম, উনি ডাকেন নি ব'লে আপসোস করছেন!'

ইতির এই আকস্মিক রূঢ়ভাষণে শোভন একটু অপ্রস্তুত হয়ে পড়ে, ব্যাকুল কণ্ঠে কী একটা বলতেও চায়, কিন্তু তাকে ইঙ্গিতে নিরস্ত করে মণীশ। হেসেই বলে, 'ভুল করেছেন আপনি, বাজারের জিনিস দাম দিলেই পাওয়া যায়, তার জন্য প্রতিযোগিতা করতে হয় না। বরবর্ণিনীর অনুগ্রহের জন্য সেকালে রাজা-মহারাজা নাইটরা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হতেন, সে গৌরবেরই কথা। আর প্রথম কথাটা—একটুও বাজে বা মিথ্যা নয়, আপনি বিশ্বাস করুন। আমি আপনাকে অনেকদিন ধরেই চিনি।'

'কিন্তু আমি আপনাকে একটুও চিনি না।' বলতে বলতে উত্তেজিত ভাবে উঠে দাঁড়ায় ইতি, 'কোন দিন দেখেছি ব'লেও মনে পড়ছে না। আর আমি যত দূর জানি, আমার স্মৃতিশক্তি খুব একটা খারাপ নয়।'

ততক্ষণে খাবার শেষ ক'রে চায়ের পেয়ালা টেনে নিয়েছে মণীশ। সে উত্তর দিল না, শুধু প্রশান্ত ভাবে ইতির আরক্ত উত্তেজিত মুখের দিকে চেয়ে মুচকি মুচকি হাসতে লাগল।

শোভনের কিছু পূর্বের প্রসন্নতা আবার যেন মিলিয়ে এল। সেও ভ্রূ কুঞ্চিত ক'রে বললে, 'কোথায় তোদের পরিচয় হয়েছিল তাই বল্ না বাপু, তা হ'লেই

তো গোলমাল মিটে যায়।'

'ওঁকেই জিজ্ঞাসা কর্ না। ওঁর তো খুব স্মৃতিশক্তির গর্ব, সেই শক্তিই একটু প্রয়োগ করুন না।'

ইপ্তি মণীশের দিকে পিছন ফিরে দাঁড়াল একেবারে ; বললে, 'আমার যা বলবার তা আগেই বলেছি। এক্ষেত্রে হয় আমি মিথ্যা বলছি নয় উনি বলছেন—এইটেই বুঝতে হবে। ওঁকে মিথ্যাবাদী বলতে চাই না, অথচ আমি অকারণে মিথ্যা কথা বলছি—এটাও মানতে প্রস্তুত নই। অতএব আমার আর এখানে না থাকাই ভাল।'

সে দুই কাঁধের এক বিচিত্র ভঙ্গী ক'রে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

শোভনের অবস্থাটা অতঃপর হয়ে ওঠে অবর্ণনীয়।

সে কিছুক্ষণ বিমূঢ়ের মতো ওর গতিপথের দিকে তাকিয়ে থেকে একটা সরব নিঃশ্বাস ত্যাগ ক'রে বলে, 'কী জানি এসব কি কাণ্ড। কী কুক্ষণেই যে তোকে আসতে বলেছিলাম।'

'অনুতাপ হচ্ছে ?' মণীশ কাপ নামিয়ে রেখে উঠে দাঁড়ায়, তার পর ওর কাঁধে একটা হাত রেখে গলাটা নামিয়ে বলে, 'একটু রাগারাগি না হ'লে কি গৃহস্থালি জমে বন্ধু, তাই ইচ্ছে ক'রেই রাগিয়ে দিলাম। আর তা না দিলে ঐ উষ্মাস্ফুরিত অধরের রোষরক্তিম ভঙ্গীটাই কি দেখতে পেতিস !'

মজ্জমান ব্যক্তি যেন কূল দেখতে পায়। শোভন সবেগে ওর একটা হাত চেপে ধরে বলে, 'তা হলে তুই-ই মিছে বলছিলি এতক্ষণ ? তাই বল্ ! তা হলে ও ঠিকই বলেছে আগাগোড়া !'

'না, আমি সত্যিই মিছে বলি নি ! তুই বিশ্বাস কর্ !' আবারও কৌতুক নেচে ওঠে মণীশের দুই চোখে। তার পর—বোধ করি বন্ধুর বিহ্বল ঘর্মাক্ত মুখের দিকে তাকিয়ে মায়াই হয় শেষ পর্যন্ত। হা হা ক'রে হেসে উঠে বলে, 'হায় বোকচন্দর ! কথাটা ধরতেই পারলি না। আমি ওঁকে চিনি তাই বলেছি, আলাপ হয়েছে এর আগে—তা তো বলি নি একবারও। বলি আমি আগে কোন্ অফিসে কাজ করতুম তা ভুলে গেছিস ? তোর বোয়ের অফিস আর আমার অফিস একই বিল্ডিংয়ে ছিল যে। পুরো দুটি বছর এক দোর দিয়ে ঢুকেছি, এক সিঁড়ি দিয়ে ওঠানামা করেছি। এক লিফ্‌টেও চড়েছি কতদিন।

আর অমন লাভলি মেয়ে—কে, কোথায় থাকে, কোন্ অফিসে কাজ করে সে খবরটা নেব এও তো স্বাভাবিক! বুঝলে বোকারাম, কেন ওকে চিনি বলেছি?'

সত্যি সত্যিই যেন একটা বোঝা নেমে যায় শোভনের বুক থেকে। বিশ্রী একটা অস্বস্তি থেকে মুক্তি লাভ করে সে। সেও খুব খানিকটা হাসে হা হা ক'রে। বলে, 'সত্যিই তো আমি একটি আস্ত গর্দভ! এ যোগাযোগটা একবার মনেই পড়ল না, স্ট্রেঞ্জ্!'

সে যেন কৃতজ্ঞচিত্তেই মণীশের সঙ্গে সঙ্গে এসে ওকে বাসে তুলে দিয়ে যায়।

কথাটা বলার আগে রহস্যটা আর একটু ঘনীভূত ক'রে আর একটু মজা দেখবারই ইচ্ছা ছিল শোভনের, কিন্তু ঘরে ঢুকে জানলার কাছে-বসে-থাকা ইতির কঠিন মুখের দিকে চেয়ে আর সাহসে কুলোল না।

বরং গলায় অস্বাভাবিক একটা চটুলতা এনে হাসি-হাসি মুখেই বলল, 'ছোকরা আমাদের আচ্ছা বোকা বানিয়ে গেল!···অবশ্য এটাকে আমারই ভুলের মাশুল বলা যেতে পারে!···আসলে কি ব্যাপার জান, মণীশ এখন যে অফিসে কাজ করছে তার আগে বছর দুই স্ট্যানলী গার্ডনার-এর অফিসে কাজ করেছে। তোমাদের ঐ বিল্ডিংয়েরই চারতলায় অফিসটা। সেই সময়েই বহু-বার দেখেছে তোমাকে—একপথে যাওয়া আসা ছিল তো। সেই কথাটাই একটু ঘুরিয়ে ব'লে মজা দেখছিল। চিরদিনই সমান পাজী ওটা।'

ইতির মুখের পাষাণ-কাঠিন্য তবু দূর হয় না। সে তেমনি অপ্রসন্ন শুষ্কস্বরে বলে, 'কী জানি, আমার একটুও মনে পড়ছে না। ওঁকে কখনও দেখেছি ব'লে বোধ হচ্ছে না।'

শোভন যেন কেমন থতমত খেয়ে যায়। স্ত্রীর এখনও এই অহেতুক উষ্মার কোন কারণ খুঁজে পায় না। খানিকটা চুপ ক'রে থেকে সে আস্তে আস্তে বলে, 'কে জানে কেন মনে পড়ছে না। ও অফিসে মণীশ কাজ করেছে ঠিকই, আমিই কতদিন গেছি ওখানে ওর সঙ্গে দেখা করতে। আমার আগেই মনে পড়া উচিত ছিল।'

'তা হবে হয়তো। কী জানি। কিন্তু এ প্রসঙ্গ আপাতত থাক। প্লীজ।··· অন্য কথা পাড়।' জোর ক'রে যেন সহজ হতে চায় ইতি। কিছু-পূর্বের তিক্ত স্মৃতিটাকে ঝেড়ে ফেলতে চায় প্রাণপণে।

হালকা হয়ে ওঠে শোভনও। বলে, 'যা বলেছ। কী কুক্ষণেই যে ওটাকে নেমন্তন্ন করেছিলাম। বরাবরই ওর ঐ স্বভাব অবশ্য, মিসচীফ করতে পারলে আর কিছু চায় না।···তবে খুব সাংঘাতিক ধরনের নয় ও, তামাশাই ভালবাসে, আর তা-ই করে। ওর সঙ্গে মিশলেই টের পাবে মনটা ওর খুব ভাল।'

'থাক। তোমার ও-বন্ধুর সঙ্গে তুমিই মিশো। আমার দরকার নেই। ঐ ধরনের দাঁত-বারকরা গায়ে-পড়া মানুষ আমি দু চোখে দেখতে পারি না।' ···আবারও কঠিন হয়ে ওঠে ইতির কণ্ঠস্বর, সে যেন কতকটা উত্তেজিত ভাবেই উঠে দাঁড়ায়।

শোভন ব্যস্ত হয়ে প্রসঙ্গটা পালটে দেয়। বলে, 'সে যাক গে, মরুক গে। এখন খাবারগুলো নষ্ট ক'রে কিছু লাভ আছে? এসো খেয়ে নেওয়া যাক।'

অনেক চেষ্টা ক'রে আবারও প্রকৃতিস্থ হয় ইতি। আস্তে আস্তে বলে, 'ও তো ঠাণ্ডা জল হয়ে গেছে সব। খেতে পারবে? দাঁড়াও, বরং একটু গরম ক'রে নিয়ে আসি। আর একটু গরম চাও করতে বলি।'

খাবারের প্লেট দুটো হাতে নিয়ে ভেতরে চলে যায় ইতি।

শোভনও যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচে।

চা পর্ব শেষ হ'লে দুজনেই আবার গুছিয়ে বসে রাস্তার দিকের জানলাটার ধারে।

'রেডিওটা খুলব?' প্রশ্ন করে শোভন।

'থাক্ গে, ও প্যানপ্যানানি আজ আর ভাল লাগছে না।'

এর পর শুরু হয় খুচরো গল্প—এটা ওটা কথা।

হঠাৎ তারই এক ফাঁকে—কতকটা যেন অসংলগ্ন ভাবেই—ব'লে ওঠে শোভন, 'যাই বল বাবু, তুমি যে খুব স্মৃতিশক্তির বড়াই করলে ওর কাছে—সেটা কিছু নয়। বরং আমার তো মনে হয় যে তোমার মেমরী খুবই দুর্বল।'

'তার মানে ?' তীক্ষ্ণকণ্ঠে প্রশ্ন করে ইতি, হঠাৎ যেন সোজা হয়ে বসে।

'না, এই—মানে ঐ কথাটাই ভাবছিলুম।' একটু অপ্রতিভ ভাবে বললেও কথাগুলো শেষ পর্যন্ত ব'লেই ফেলে শোভন, 'সত্যি, মণীশ বেচারার কী অপরাধ বলো। ও তো সত্যিকথাই বলেছে। একই বিল্ডিংয়ে তোমরা ছ বছর কাজ করেছ, যাতায়াতে কতবার দেখা হয়েছে, হয়তো বা এক লিফ্‌টেও চড়েছ কতবার—তবু ওর মুখটা মনে করতে পারলে না।'

'মনে পড়ছে না তা কী করব বলো ?' বিষাক্ত কণ্ঠে বলে ইতি, 'জোর ক'রে বলব যে, হ্যাঁ ওকে দেখেছি ?· ·এই সামান্য জিনিসটা নিয়েই বা তুমি এত কচলাকচলি করছ কেন তা বুঝি না। আমি কি ইচ্ছে ক'রে মিছে কথা বলছি তোমার বিশ্বাস ! এর দ্বারা কী ইঙ্গিত করতে চাইছ তাই শুনি ?'

তার মুখের চেহারা আর গলার আওয়াজে সত্যিই বুঝি ভয় পেয়ে যায় শোভন। এলোমেলো ভাবে বলে, 'ইঙ্গিত আবার কি, বা রে ! আমি বুঝি তাই বলছি। এ বাপু তোমার—। ছি ছি, কী যে বলো তুমি। আমি এমনিই—। আচ্ছা, ঘাট হয়েছে, আর যদি কখনও এসব কথা পাড়ি।'

এরপর দুজনেই চুপ ক'রে যায়। স্থির হয়ে বসে থাকে দুজনেই। অন্য কথা আর কিছুই তোলা যায় না, তোলা যে সম্ভব নয় তা ওরাও বোঝে, তাই সে চেষ্টাও আর করে না কেউ। চমৎকার আনন্দ-উচ্ছলতায় সে সন্ধ্যার শুরু হয়েছিল—এক অস্বস্তিকর নীরবতার মধ্যে তার পরিসমাপ্তি ঘটল। এই ভাবেই ক্রমশ রাত গভীর হয়ে এল, তবু দুজনের কেউই আর মনের উপর থেকে সেই অকারণ নীরবতার ভারী পর্দাটা সরিয়ে ফেলতে পারল না।

যেমন সাজানো ঘর তেমনই রইল, আলোগুলো তেমনি নিঃশব্দে উজ্জ্বল হয়ে জ্বলতে লাগল, প্রত্যাশিত বন্ধু-মিলন উৎসবের সজ্জাগুলোর কোথাও এতটুকু বিচ্যুতি ঘটল না। শুধু উৎসবটা যাদের করবার কথা—তারাই কেমন যেন একটা শোকাহত স্তব্ধতায় ম্লান হয়ে উঠল। আর বিকেলে তাড়াতাড়িতে ফুলগুলো সাজাবার সময় ফুলদানিতে জল রাখা হয় নি, সেইগুলোই এবার একটু একটু ক'রে শুকিয়ে উঠতে লাগল।

বিপাশার বর দেখে এমন কি ওর বাপ-মাও খুশী হলেন। 'এমন কি' বলাটা হয়ত ভুল হ'ল। তাঁরাই খুশী হলেন। কারণ ওর যারা সহকর্মিণী এবং আত্মীয়া, তাদের কারুরই খুশী হবার কথা নয়। বিজয়িনী বিপাশার কষ্টকৃত গাম্ভীর্য ভেদ ক'রে ওর চোখের কোণে এবং ঠোঁটের ফাঁকে যে গর্বের ও আনন্দের হাসি উপ্‌ছে উঠেছিল—তা দেখে কোন নারীই খুশী হ'তে পারে না। কুমারীরা তো নয়ই—তাদের মায়েরাও নয়।

তবে 'এমন কি' বলবার কারণও একটু আছে বৈকি! মধ্যবিত্ত ঘরের কন্যারা যখন উপার্জন করতে শুরু করে, তখন তাদের বিবাহ দেবার কথা উঠলে আয়ের ঘরে ঘাট্‌তির কথাটাও মনে উঠে পড়ে। বিপাশার বাবা সাধারণ সরকারী চাকুরে। হিসেবের অফিসে কাজ, হাজার এবং লাখ টাকার শুক্‌নো অঙ্ক কষে মাস গেলে আড়াইশোর বেশি ঘরে আসে না। উপরীর কোন পথ নেই। সওদাগরী অফিসের কেরানীদের বোনাস আছে, বিদেশ ভ্রমণের খরচা আছে, চিকিৎসার খরচা আছে, (কোন্ না তা থেকে দু'পয়সা আসে। দীর্ঘ-নিঃশ্বাসের সঙ্গে কল্পনা করেন মাধববাবু), জলখাবার আছে—কত কি সুবিধা! কিন্তু এখন সেকথা ভেবে ঈর্ষিত হওয়া ছাড়া কোন পথ কোন দিকে খোলা নেই। মাধববাবু যখন চাকরিতে ঢুকেছিলেন তখন সরকারী চাকরি পাওয়াটাই মানবজীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ সৌভাগ্য ব'লে বিবেচিত হ'ত। সেই সুদুর্লভ সৌভাগ্যেরই তো ফলভোগ ক'রে চলেছেন তিনি—সুতরাং কাকে কি বলবেন!

তবে একটা বুদ্ধিমানের কাজ তিনি করেছিলেন, নিজেরা বহু কষ্ট ক'রেও একমাত্র কন্যাকে শিক্ষার পূর্ণ সুযোগ দিয়েছিলেন। অবশ্য সেদিন বিপাশাই ছিল একমাত্র সন্তান। ওর জন্মের কুড়ি বছর পরে খোকা এসেছে বটে, কিন্তু তাকে মানুষ ক'রে তার উপার্জন খেয়ে যাবেন—এ আশা মাধববাবু অন্তত রাখেন না। সে ভার এবং দায়িত্ব মাত্র, ভরসা নয়। তবে তার জন্য কোন দুঃখ নেই—কারণ বিপাশা তাঁর মুখ রেখেছে, তাঁদের সমস্ত কষ্ট সার্থক করেছে।

সাধারণ মেয়েদের মতো নয়—বেশ অসাধারণ ভাবেই সে ফার্স্ট ক্লাস পেয়ে এম. এ. পাস করেছে। পরীক্ষা দেওয়া শেষ ক'রেই সে এই মেয়ে ইস্কুলে চাকরি নিয়েছিল। চাকরি করতে করতেই বি-টি পাস করেছে এবং ইংরেজী ডিগ্রির জোরে হেডমিষ্ট্রেস হয়ে বসেছে। মাস গেলে ভাতাটাতা নিয়ে দুশো টাকার বেশি ঘরে আনে।

সুতরাং তার বিয়ের কথা উঠলে বাপ-মা যে একটু উদাসীন থাকবেন সেইটেই স্বাভাবিক। উপযুক্ত সৎপাত্র ছাড়া এমন কন্যারত্ন তো যার-তার হাতে দেওয়া যায় না। সেই আকাঙ্ক্ষিত সৎপাত্র খোঁজবার অজুহাতে তাঁরা দুজনেই নিশ্চিন্ত আছেন। দু-চারজন আত্মীয়-আত্মীয়া উপযাচক হয়ে সম্বন্ধ এনেছে এর মধ্যে—বলা বাহুল্য তাদের কাউকেই বিপাশার উপযুক্ত মনে হয় নি। সুতরাং কথাটা সেইখানেই চাপা প'ড়ে গেছে।

ইতিমধ্যে বিপাশার বয়স কিন্তু বেড়েই গেছে। আজ তার আটাশ বছর বয়স হয়েছে। মাথার সামনের দিকের চুল উঠে গেছে সেই সঙ্গে—অনেকখানিই। চশমার কাঁচ বদলাতে হয়েছে বহুবার। চোখের ঠিক নিচে গালের এক জায়গায় বোধ করি একটু মেচেতাও পড়েছে। হাতের শিরাগুলো অশোভনভাবে আত্মপ্রকাশ করেছে—অর্থাৎ গতানুগতিকভাবে 'পাত্রী দেখে' তাকে পছন্দ করবে, সে সম্ভাবনা হয়ে পড়েছে সুদূরপরাহত।

সেটা বিপাশাও বুঝেছে। এবং সেই সঙ্গে আরও একটা কথা বুঝেছে—বহুকাল নিজের সহজ বুদ্ধির সঙ্গে লড়াই করেছে বিপাশা, মনের মধ্যে কথাটা উঁকিঝুঁকি মারবার চেষ্টা করার সঙ্গে সঙ্গেই কঠোরভাবে দমনও করেছে নিজের মনকে, শুভাকাঙ্ক্ষিনীর দল সব পরিবারে সবাইকারই থাকে। তাঁরা অবশ্যই চুপ ক'রে থাকেন নি, কথাটা পাড়বার চেষ্টা করেছেন মধ্যে মধ্যেই, তাঁদেরও কটুভাষায় নিরস্ত করেছে সে—কিন্তু দীর্ঘকাল পরে পরাজয় স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে মনে মনে। বাবা-মা যে তাঁদের অসুবিধার কথা ভেবেই (চেতনে না হোক অবচেতনে) তার বিবাহের কথায় উৎসাহ দেখাচ্ছেন না—একথা অস্বীকার করার মতো কোন জোরই আর আজ নেই ওর মনের মধ্যে।

সুতরাং এই অভাবনীয় এবং অপ্রত্যাশিত সুযোগ হারাতে রাজী হয় নি বিপাশা। অপূর্ব রূপবান ছেলে বিজয়, সত্যিকারের চোখ-ধাঁধানো রূপ তার।

শুধু রূপ বা কান্তি নয়—স্বাস্থ্যও তার দেখবার মতো। বহুকাল ব্যায়াম করা সুগঠিত দেহ—রাস্তার লোকেও অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে তার দিকে। সেই বিজয় যদি স্বেচ্ছায় তার কাছে এসে ধরা দেয় তো বিপাশার আপত্তি করারই কি থাকতে পারে।

ওর চেয়ে বয়সে ছোট?

তাই-ই তো হবে। চব্বিশ-পঁচিশের বেশি কিছুতেই হবে না বিজয়। কিন্তু সেকথা যদি তার তরফ থেকে না উঠে থাকে, তো বিপাশার কি দরকার এসব তুচ্ছ কথা নিয়ে মাথা ঘামাবার? বিজয় তো প্রশ্নও করে নি কোনদিন, জানতেও চায় নি। বিপাশা নিজের বয়স গোপন করেছে এমন কথা অন্তত বিজয় বলতে পারবে না এর পর।

ওর চেয়ে বিদ্যায় ছোট?

হ্যাঁ, বিজয় নিজেই স্বীকার করেছে, ইণ্টারমিডিয়েট পড়তে পড়তে কলেজ ছেড়ে দিয়েছিল সে—কবিতা আর ব্যায়াম—এই দুই বিপরীতধর্মী নেশায় পড়ে পড়াশুনো আর তার এগোতে পারে নি। কিন্তু তাতে কি? এতকাল শিক্ষিত পুরুষরা এদেশে নির্বিচারে অশিক্ষিত মেয়েদের বিবাহ ক'রে তাদের সঙ্গে জীবন কাটিয়ে গেল। তাদের যদি কোন অসুবিধা না হয়ে থাকে তো মেয়েদেরই বা হবে কেন? তাছাড়া জীবনের বহু ব্যবহারিক ক্ষেত্রেই পুরুষের শ্রেষ্ঠতা অবিসম্বাদিত, একথা অন্তত বিপাশা স্বীকার করে, সুতরাং তার সঙ্গে ঘর করতে গেলে ডিগ্রিটার কথা মনে পড়বে—এমন আশঙ্কা ওর নেই।

বেকার নয় বিজয়, চাকরি করে এবং সরকারী চাকরীই করে। সচ্চরিত্র, ভদ্র, মিষ্টভাষী তরুণ, পান খায় না, সিগারেট খায় কদাচ কখনও। দীর্ঘকালের পরিচয়ে সব খবরই খুঁটিয়ে নিতে পেরেছে বিপাশা। আয় কম, খুবই কম। লোয়ার ডিভিসন ক্লার্ক, সব জড়িয়ে দেড়শোর বেশি হয়ত পায় না—কিন্তু তাতে কি, বিপাশার আয় তো রইলই। বিপাশা তো আর এখনই চাকরি ছাড়ছে না। দু'জনের আয়, ছোট্ট সংসার তাদের চলে যাবে না? খুব যাবে। না-ই বা রইল সেখানে প্রাচুর্যের সমারোহ, না-ই বা রইল বাহুল্য বিলাসোপকরণ। তারা চায় ছোট একটু নীড় বাঁধতে, উপকরণের সমস্ত দৈন্য যেখানে আন্তরিকতায় পূরণ করবে; যেখানে অভাব অভাব বলেই বোধ হবে না;

পরস্পরের প্রতি প্রেম যেখানে সীমাহীন অনন্ত-মানস-আকাশের দিকচক্র-রেখাকে জ্যোতির্ময় ক'রে রাখবে।

আর এ বস্তুটির কোন অভাব হবে বলে বিপাশা মনে ক'রে না। গত ন'-মাস ধরে দেখেছে সে বিজয়কে। ভাল ক'রেই দেখেছে, বাজিয়ে নিয়েছে। তার চোখে দিনের পর দিন যে পূজা, যে স্তুতি দেখেছে, তা আর কারুর চোখে কখনও দেখেছে ব'লে মনে পড়ে না। সে চাহনিতে নতুন ক'রে সম্ভ্রমবোধ জেগেছে বিপাশার মনে, নূতন মূল্য খুঁজে পেয়েছে নিজের।

ওদের পরিচয়ের সূত্রটা একটু বিচিত্র।

কবিতা লেখার অভ্যাস বিপাশারও ছিল এককালে। এখন ইস্কুলের পরিচালনা সংক্রান্ত সহস্রবিধ কাজে এবং পরীক্ষার খাতার তলায় (শিক্ষকতার অভিশাপ এই খাতা।) সে অভ্যাস বোধ করি, একেবারেই চাপা পড়ে গিয়ে-ছিল। হঠাৎ সেই উপলক্ষেই ওদের পরিচয় হয়ে গেল। পাড়ার ছেলেরা হাতে লেখা মাসিক বার করত, তারাই বিপাশাকে করেছিল সম্পাদিকা। অর্থাৎ ওকেই দেখে দিতে বা শুধ্‌রে দিতে হ'ত রচনাগুলো। এর ভেতর কে একজন যোগাড় করেছিল বিজয়ের একটি কবিতা। বিজয় নাম-করা কবি (তাদের কাছে অন্ততঃ, অনেক সাপ্তাহিক ও দৈনিক কাগজে ইতিমধ্যে বিজয়ের কবিতা ছাপা হয়েছে), তার কবিতা নেহাত সৌজন্যের খাতিরেই দেখতে দেওয়া হয়ে-ছিল বিপাশাকে। বিপাশাও কেবলমাত্রই কৌতূহলভরেই চোখ বোলাতে গিয়ে-ছিল কিন্তু দেখতে গিয়ে কেমন মনে হ'ল যে বক্তব্যটা অসম্পূর্ণ রয়ে গেছে—সে আর দুটো লাইন জুড়ে দিলে তার সঙ্গে। শোভন ব'লে যে ছেলেটি আসত লেখা দিতে ও নিতে—তাকে বলে দিলে, 'বিজয়বাবুকে একবার দেখিয়ে নিও, আমার মনে হয় এ পংক্তি দুটো থাকা দরকার। অবশ্য উনি যদি আপত্তি করেন তো সে কথা আলাদা—'

বিজয় আপত্তি করে নি, বরং সে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিল। ঐ দুটি লাইন যোগ দেওয়াতে কবিতাটি অনেক বেশি সুন্দর, অনেক বেশি সার্থক হয়েছিল ব'লে তার ধারণা। সে ব্যাকুল হয়ে উঠল বিপাশার সঙ্গে পরিচিত হবার জন্য। এমন অসাধারণ যার মনীষা—না জানি সে নিজে কেমন।

সুযোগও মিলল শীগগিরই। পাড়ায় সরস্বতী পুজো উপলক্ষে একটি

সাহিত্য সভা হ'ত। সেবার বিজয়কে আমন্ত্রণ করা হয়েছিল কবিতা পড়তে। হয়ত তার মধ্যে বিজয়ের নিজেরই উদ্যোগ কিছু ছিল—অন্ততঃ বিপাশার তাই বিশ্বাস। বিপাশাও উপস্থিত ছিল সেই সভায়। সভা ভাঙতে কে যেন আলাপ করিয়ে দিয়েছিল ওদের। আনন্দে, লজ্জায়, স্তুতিতে যেন গলে পড়েছিল বিজয়।

'আপনি এত ভাল বোঝেন—এত ভাল হাত আপনার—কবিতা লেখেন না কেন? উঃ, কি ভাল যে আপনি লেখেন তা আপনি জানেন না। আপনি—আপনার মতো জিনিয়াস্ লেখা ছেড়ে দিলেন?'

'কে বললে ছেড়ে দিয়েছি?…ইস্কুলের রিপোর্ট লিখতে হয় না? মেয়েদের নোটস্ লিখতে হয়। আরও কত কি। আর সময় কোথায় বলুন, পৃথিবীতে কবিতা নেই, সাহিত্য নেই, আছে শুধু খাতা। কোয়ার্টার্লি, হাফ ইয়ার্লি, য়্যানুয়াল—কতগুলো পরীক্ষা জানেন? হাজার হাজার খাতা—খাতার সমুদ্র। সে সমুদ্রে কবিতালক্ষ্মী কোথায় তলিয়ে গেছেন।

ম্লান হেসেছিল একটু বিপাশা।

বিজয় কণ্ঠস্বরে জোর দিয়ে বলেছিল, 'ভয় নেই। অত সহজে তলাতে তাঁকে আমি দেব না। আমিই আবার ফিরিয়ে আনব। খাতা-সমুদ্র থেকে লক্ষ্মী আবার উঠবেন। এমন শক্তি অপব্যয় হ'তে দেওয়া পাপ, তা জানেন?'

'কে জানে! শক্তি আছে তাই তো জানি না। আজ আপনার মুখেই প্রথম শুনছি।…'

দৃষ্টিতে একটা ব্যথাতুর অবসন্ন আগ্রহ ফুটে ওঠে বিপাশার।

বিজয় বলে, 'দেখুন আমার অপরাধ যদি না নেন তো একটা আর্জি পেশ করি।'

'আমার কাছে আবার কি আর্জি?'

'সেই দিন থেকে আমি সুযোগ খুঁজছি আপনার সঙ্গে পরিচিত হবার। বাসনা এমনি একান্ত হ'লেই বুঝি ভগবান প্রসন্ন হন—তাই আজ মিলে গেল সে সুযোগ। আমি—আমি আপনার কাছে চাট্টি কবিতা দিয়ে আসতে চাই, সময়মতো যদি দেখে দ্যান। সত্যিই আপনার সময়মতো—মানে যেদিন খুশি। কোন তাড়া নেই!'

'কবিতা দেখে দেবার খুব লোক খুঁজে বার করেছেন যা হোক, কথাটা বেশি চেঁচিয়ে বলবেন না, লোকে হাসবে।'

'না না—ওসব কথাতে আমাকে ভোলাতে পারবেন না। আমি আপনার প্রতিভা চিনেছি। হয়ত আপনার চেয়ে বেশিই চিনেছি···এই অনুরোধটি আপনাকে রাখতেই হবে।'

'কী বলছেন যা-তা। মিছিমিছি অপ্রতিভ করছেন আমাকে—।'

কিন্তু এই একান্ত প্রিয়দর্শন তরুণটির সান্নিধ্য বোধ করি তাকেও সেদিন অকারণে উল্লসিত করেছিল। এ পরিচয়ের এইখানেই না পরিসমাপ্তি ঘটে—সে আকুলতা ওর তরফেও কম ছিল না হয়ত। সুতরাং আর দু'-একবার অনুরোধের পর তাকে রাজী হ'তেই হয়েছিল।

সেই সূত্রপাত। কবিতাগুলি সযত্নেই দেখে দিয়েছিল বিপাশা। ছন্দের ত্রুটি, প্রকাশভঙ্গীর দৈন্য—আরও নানা দুর্বলতা, তাকে দেখিয়ে বুঝিয়ে দিয়েছিল সে। বিজয় বিস্মিত, অভিভূত হয়ে গিয়েছিল, কৃতার্থ হয়েছিল সে। গোড়া থেকেই শ্রদ্ধা ও বিস্ময়ের রঙীন চশমায় বিপাশাকেও অপরূপ ব'লে মনে হয়েছিল, তার রূপের দৈন্য ওর চোখে পড়ে নি।

বিস্ময়ের ওপর বিস্ময়। বিজয়ের একটি কবিতা—কতকটা লীলাচ্ছলেই—ইংরেজীতে অনুবাদ ক'রে দিয়েছিল বিপাশা। বিজয় গোপনে সে অনুবাদটি নিজের মূল রচনা হিসেবে পাঠিয়েছিল প্রথম শ্রেণীর একটি ইংরেজী দৈনিকে। যথাসময়ে, বরং একটু তাড়াতাড়িই সেটি ছাপা হয়ে গেল। বিজয় ডাকে গুটিকতক টাকাও পেলে। যার ইংরেজী রচনা ইংরেজ পরিচালিত কাগজে ছাপা হয়—সে খুব সাধারণ ইংরেজী জানে না, অসাধারণ দখলই আছে তার মানতে হবে।

শ্রদ্ধা থেকে প্রেমই বোধ করি সবচেয়ে দ্রুত এবং সহজে আসে। সুতরাং বিজয় যে-একদা আবেশবিহ্বল কণ্ঠে বিপাশার পাণিপ্রার্থনা করবে, এতে বিস্ময়ের কিছু নেই।

এবং প্রাথমিক দু'একটি নিতান্তই তুচ্ছ আপত্তির পর বিপাশাও যে সম্মত হবে—সেটাই তো স্বাভাবিক।

মহা সমারোহে বিবাহ হয়ে গেল বিপাশার।

সমারোহই একটু হ'ল। প্রাথমিক বীতরাগ, আকাঙ্ক্ষা এবং হতাশা কেটে গেলে বিপাশার বাবা-মার মধ্যে সাধারণ বাবা-মা জেগে উঠলেন। নিজেদের ক্ষতি যখন অবশ্যম্ভাবী, তখন তা মেনে নিতে খুব বেশি গোলমাল করলেন না তাঁরা, তাঁরা সেকেলে মানুষ, পাত্রের আয় নিয়েও মাথা ঘামালেন না। সুশ্রী, স্বাস্থ্যবান, সচ্চরিত্র পাত্রের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে হচ্ছে—বরং খুশীই হয়ে উঠলেন ক্রমশঃ। বিজয়ের চাহিদা কিছু না থাকলেও ধার-দেনা করেই তাঁরা জামাইকে এটা-ওটা দিতে চাইলেন। বিজয়ের বাবা-মা নেই, দাদা-বৌদির সঙ্গে সে এতকাল ছিল। এবার ওকে নতুন বাসা নিতে হ'ল। কারণ প্রথমতঃ তাঁরা অসবর্ণ বিয়ে সমর্থন করলেন না, দ্বিতীয়তঃ তাঁদের বাসা নিতান্তই ছোট, সেখানে দুটি পরিবারের থাকা অসম্ভব।

ছাত্রীদের কল্যাণে বিপাশার বাসার অভাব হ'ল না। শহরতলীতে একটি ছোট ফ্ল্যাট মিলল অপেক্ষাকৃত কম দরেই। আশি টাকা ভাড়া কিন্তু সেলামী অগ্রিম কিছুই লাগল না। ভাড়াটা শুনে অবশ্য বিজয়ের মুখ শুকিয়ে গিয়েছিল—বিপাশা বললে, 'তুমি ওসব নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছ কেন? সংসার তো আমার।'

বিপাশার বাবা খাট, বিছানা, চেয়ার, টেবিল, ড্রেসিং টেবিল, আলমারী—অনেক জিনিস কিনে দিলেন। এ ছাড়া বাসনকোসন গৃহস্থালীর খুঁটিনাটি বহু জিনিস দিয়ে ওদের সংসারটি সুন্দর ক'রে সাজিয়ে দিলেন। জামাইকে ঘড়ি, বোতাম আংটি কিছুই দিতে ত্রুটি করলেন না। বিজয় অনেক আপত্তি করেছিল। কিন্তু বিপাশার মা বললেন, 'সে কি বাবা, কত সাধনার ধন তুমি আমার, আমার খুকীর বর—তোমাকে দেব না তো কাকে দেব বলো। দিতে তো ইচ্ছে করে দুনিয়াসুদ্ধ উজাড় করেই—কী বলব মরমে মরে আছি তাই।'

বিবাহ রেজিস্ট্রি ক'রে হওয়ার পর বিশুদ্ধ হিন্দু মতেও হ'ল একবার। লোকজনও বিস্তর খাওয়ালেন বিপাশার বাবা। এমন কি নতুন বাসাতে গিয়ে এঁরাই উদ্যোগী হয়ে বৌভাতের আয়োজনেও ত্রুটি রাখলেন না। এমন জামাই হ'ল, পাঁচজনকে দেখাবেন না?

এর পর কয়েকটি দিন কাটল ওদের স্বপ্নের মধ্য দিয়ে। তখন বিপাশার

গ্রীষ্মের ছুটি চলেছে, বিজয়ও ছুটি নিয়েছিল মাসখানেকের জন্যে···জীবনে যে এত সুখ, এত চরিতার্থতা আছে তা বিপাশা কোনদিন কল্পনাও করে নি। তার মনে হ'ল এতদিনের দীর্ঘ প্রতীক্ষা সার্থক হয়েছে। উমা পেয়েছিলেন তাঁর তপস্যার ফল—সে বুঝি তপস্যার অধিক ফল পেয়েছে। ছোটবেলায় সে শিবপূজা করেছিল—চিরন্তন হিন্দু নারীর মতো তারও মনে হয়—বুঝি সে সেই শিবপূজারই ফল পেয়েছে।

তারপর দু'জনেরই ছুটি ফুরোল একদিন। সেই সঙ্গে ওদের এক মাসের গৃহস্থালীও শেষ হ'ল। বাড়ি-ভাড়া, দিন-রাতের লোক একটি তার মাইনে—হাজারো খরচ। গত এক মাসের হিসাব ছিল না, কিন্তু মোট কতটা টাকা তাদের তহবিলে ছিল তার হিসাব ছিল। দেখা গেল যে উৎসবের খরচ ছাড়াও তাদের সাড়ে তিনশো' টাকার মতো খরচ হয়েছে। অথচ ওদের দুজনের আয় মিলিয়ে সাড়ে তিনশো' টাকার একটু বেশি।

বিপাশা বিজয়ের দিকে তাকিয়ে বললে, 'খরচ কমাতে হবে।'

বিজয় সমর্থন করলে, 'হ্যাঁ। তার আগে একটা প্ল্যান করা দরকার। এ মাসে হিসাবটা রেখো ঠিকমতো।'

বিপাশা চলে আসার আগে ওর বাবা ওকে শুনিয়েই নিজেদের খরচ কমাবার একটা হিসাব করছিলেন। তার ভেতর ঝিয়ের মাইনে আর দুধের খরচটা বাহুল্য ব'লে ধরা হচ্ছিল। অথচ সে জানে যে বাবা মা কেউই দুধ ছাড়া থাকতে পারেন না, খোকার পক্ষে তো অপরিহার্য। সে মাকে ব'লে এসেছিল, 'দুধের আর ঝিয়ের মাইনে আমি দেব মা। যেমন ক'রে পারি দেব। এই বয়সে ঝি ছাড়ালে তুমি বাঁচবে না।'

অর্থাৎ চল্লিশটা টাকা—খুব কম হ'লেও।

সে মাসে হিসাব রেখে এবং হিসাব ক'রে চলা সত্ত্বেও দেখা গেল যে তারা ঘাটতি বাজেটে চলেছে। বিজয়ের মুখে দুশ্চিন্তা ফুটে উঠলো। বিপাশার মুখে লজ্জা।

ছেলেবেলা থেকে পড়াশুনো নিয়েই সে থেকেছে—ঘর-সংসারের খবর বিশেষ রাখে নি। এখন দেখা যাচ্ছে জীবনের বহিরঙ্গে যতই কৃতিত্ব এবং পটুতা থাক—এদিকে সে নিতান্তই অপটু। ঝিয়ের উপরেই তাকে বেশি নির্ভর করতে

হয়, গৃহস্থালীর কাজ সে কিছুই জানে না। সুতরাং অপব্যয় ও অপচয়ের শেষ থাকে না। ক্রমশ বিজয় অপ্রসন্ন হয়ে ওঠে।

তার ওপর ঝিটিও তেমন চালাক-চতুর নয়। বিপাশা অবশ্য তার হয়ে সাফাই দেয়, 'চালাক চতুর হ'লে চোরও হ'ত। তাতে তোমার লোকসান বেশি।' কিন্তু বিজয় তা মানতে পারে না। বিশেষ ক'রে সন্ধ্যার সময় এক-একদিন অফিস থেকে ফিরে এসে যখন দেখে, বিপাশা তখনও বাড়ি ফেরে নি (ইস্কুলের নানা কাজ, কমিটি মিটিং, ইন্স্পেক্টার অফিসে যাওয়া—বিবিধ ও বিচিত্র কাজ থাকে তার—প্রায়ই), ঘরদোর নোংরা হয়ে পড়ে রয়েছে, সকাল-বেলা বিপাশার ছেড়ে যাওয়া শাড়িখানা তখনও ঘরের মেঝেতে পড়ে, জল-খাবার তৈরী নেই—তখন চিত্তের অপ্রসন্নতা বেড়ে যায় আরও। বৌদির হাতের সাজানো-গোছানো পরিচ্ছন্ন গৃহস্থালীর সঙ্গেও তুলনা না ক'রে পারে না সে—

পরের মাস থেকে বিজয়কে একটা ট্যুইশ্যনী যোগাড় করতে হ'ল। বিপাশই বেশি দিচ্ছে সংসারে—বিজয় সেজন্য একটু লজ্জিতই বোধ করে, অপব্যয়ের জন্যে তিরস্কার করতে গিয়েও কেমন জোর পায় না। কিন্তু তার বিদ্যা-বুদ্ধি সামান্যই, টিউশ্যনীর ক্ষেত্রে সে মূল্য সম্বন্ধে আবার সচেতন হতে হয়। দুটি ছেলেমেয়েকে দু' ঘণ্টা পড়িয়েও পঁচিশ টাকার বেশি আয় হয় না।

বিপাশা সে কথার উল্লেখ করে না, শুধু বলে, 'তুমি আবার এসব ঝামেলা নিতে গেলে কেন। দরকার বুঝলে আমিই একটা টিউশ্যনী করতুম, আমার তবু অভ্যাস আছে, অতটা অসুবিধে হ'ত না—'

কিন্তু তাতেই যেন বিজয়ের কান মাথা গরম হয়ে ওঠে, সে বেশ একটু খোঁচার সঙ্গেই বলে, 'হ্যাঁ, তুমি টিউশ্যনী করলে মোটা টাকা পেতে তা জানি —তবে আমিই বা সবটা তোমার ওপর চাপিয়ে বসে থাকি কেমন ক'রে বলো। কাঠবিড়ালীর সাগর বাঁধার প্রচেষ্টা বা ঐ রকম একটা কিছু মনে ক'রেই ক্ষ্যামা ঘেন্না করো আর কি!'

বিপাশা চুপ ক'রে যায়। হয়ত ব্যথাই পায় মনে মনে।

ঠিক এক বৎসরের মাথায় বিপাশার একটি মেয়ে হলো।

মোটে এক বৎসর কিন্তু তাতেই ক্লান্ত হয়ে পড়েছে বিজয়। যে কবিতাকে

আশ্রয় ক'রে ওদের পরিচয়, সে কাব্যচর্চার আর অবসর নেই জীবনে। সংসার তো শুধুই ঝঞ্ঝাট। প্রেম? তাও তোআজ বিড়ম্বনায় পরিণত হয়েছে।…আজ আর বিপাশার দিকে তাকাতে ইচ্ছা করে না বিজয়ের। পথেঘাটে অসংখ্য সুশ্রী তরুণীর লুব্ধ দৃষ্টি দীর্ঘনিঃশ্বাসই জাগায় মনে। মাইনাস্ সিক্স চোখের পাওয়ার, মাথার চুলে প্রায় চক্‌চকে টাক—প্রাণপণেও সেটা অবশিষ্ট চুল দিয়ে ঢাকা যায় না। মুখে মেচেতা, চামড়ায় রুক্ষতা, হাতে-পায়ে পুরুষের মতো শিরাবাহুল্য, ললাটে চিরস্থায়ী রেখা—দেখে দেখে সেই প্রশ্নটাই জাগে যেটা বিবাহের আগে ওর জাগে নি। বয়সের প্রশ্ন। আজ আর সেটা করবারও সাহস নেই। অনুমান করতেও প্রবৃত্তি হয় না—কথাটা মনে জাগবার সঙ্গে সঙ্গে জোর ক'রে মনকে অন্য প্রসঙ্গে নিয়ে যায় সে।

তবু যৌবন এবং রূপটাই হয়ত বড় কথা নয়।

বিদ্যাবুদ্ধি মনীষার জন্য সেটাকেও হাসি মুখে মেনে নিতে পারত বিজয়। কিন্তু প্রতিদিনের জীবনে এই বিশৃঙ্খলা, সংসার-পরিচালনায় এই অপটুতা—এ আর সহ্য করতে পারে না সে। সে নিজেও অপটু, তবে নিজের মনকে এই ব'লে সে সান্ত্বনা দেয় যে তার পটু হবার কথা নয়, সংসারের দিকটা দেখবার জন্যেই পুরুষ গৃহিণী আনে ঘরে। কথাটা একদিন মনান্তরের মুখে বিপাশাকে সে ব'লেও ফেলেছিল। তার উত্তরে বিপাশা যা বলেছিল সেটা খুব শ্রুতি-সুখকর নয়। সে বলেছিল, 'পুরুষ সাংসারিক বিষয়ে নিজের অপটুতা যে কৈফিয়তে ঢাকে—সে কৈফিয়ত আমারও আছে। আমি পুরুষের মতোই রোজগার করি—।'

আরও যা বলতে পারত নেহাত সৌজন্যের খাতিরেই বলে নি। বলতে পারত যে, 'অনেক পুরুষের চেয়ে বরং বেশীই করি।' সেটা যে বলে নি, এজন্যে বিজয় কৃতজ্ঞ।

কিন্তু কৈফিয়ত যা-ই হোক, সত্যটা অস্বীকার করবার উপায় থাকে না। প্রতি মাসেই 'ডিফিসিট বাজেট'—ঘাটতি। ফলে ভয়াবহ দেনা মুখ হাঁ ক'রে সামনে এসে দাঁড়ায় একদিন। মাঝে একটা টিউশ্যনী বিপাশাও নিয়েছিল কিন্তু তারপরই ওর এমন শরীর খারাপ হয়ে পড়ল যে ইস্কুলেও ছুটি নিতে হ'ল। ডাক্তার বললেন, 'পরিপূর্ণ বিশ্রাম।' তার সঙ্গে বিবিধ ঔষধ এবং পথ্যের ব্যবস্থা

ক'রে গেলেন।

টাকা কই? শুকনো মুখে বিজয় সেদিন তাকিয়ে বসেছিল আলমারীর আয়নাটার দিকে। ওদের বিয়ের যৌতুক। বিপাশার মুখের দিকে তাকাতেও সাহস হয় না। বিপাশার ইস্কুলে এবং বিজয়ের অফিসে যতটা সম্ভব দেনা করা আগেই হয়ে গেছে। বন্ধু-বান্ধবদের কাছ থেকে—যেখানে যেখানে পাওয়া সম্ভব—তাও বোধকরি আর বাকী নেই। অন্ততঃ বিজয়ের তো সহজে মনে পড়ে না।

বিপাশাও চেয়ে ছিল জানলা দিয়ে বাইরে। রূঢ় কথা তার মুখে আসে বৈকি! খুবই আসে। কিন্তু বয়োকনিষ্ঠ তার এই সুদর্শন স্বামীকে আঘাত দিতে তার মনে লাগে সত্যিই। তাছাড়া বিয়ের আগে এ কথাগুলো বরং তারই বেশি ভাবা উচিত ছিল।

সে আস্তে আস্তে দু'হাত থেকে দু'গাছা চুড়ি খুলে দিয়ে বলেছিল, 'এগুলোই না হয় বরং—'

বিজয় মাথা হেঁট ক'রে বসেছিল অনেকক্ষণ, তবু—উপায়ই বা আর সেদিন ছিল কী?

কিন্তু সেটা তো সেদিন সূচনা মাত্র।

সন্তান হওয়ার সহস্রবিধ খরচা; তার পরও এক মাস ধরে বিপাশার নানারকম শরীরের গোলমাল। ঋণ বেড়েই গিয়েছিল চারিদিকে ভয়াবহ রকমের।

অবশেষে একদিন বিপাশাকেই কথাটা পাড়তে হ'ল, 'হ্যাঁ গো—সামনের সোমবার তো ইস্কুলে যেতেই হবে, ছুটি আর আমার একদিনেরও পাওনা নেই, এবার না গেলে তো মাইনে কাটবে!'

তখনও কথাটা বুঝতে পারে নি বিজয়, স্ত্রীর দিকে চেয়ে উদ্বিগ্নকণ্ঠে বলেছিল, 'তোমার শরীরটা কি? মানে যেতে পারবে?'

'সে যেমন ক'রেই হোক যেতে হবে। কিন্তু সে কথা তো হচ্ছে না। মেয়ের কী হবে?'

'মেয়ে!' আকাশ থেকে পড়েছিল বিজয়।

'হ্যাঁ। আর একটি তো লোক চাই অন্ততঃ। মেয়ে কে দেখবে? কাজুর

মা অত পারবে না। ঘন্টায় ঘণ্টায় ঘড়ি ধরে খাওয়ানো, নাওয়ানো, ঘুম পাড়ানো, অত সময়ও ওর নেই।'

'তাই তো। আর একটা লোক মানে অন্তত কুড়ি টাকা আরও—।'

'না। আরও ষাট টাকা অন্ততঃ। খাওয়া-পরার খরচাটা ধরছ না কেন?'

বিজয় স্তম্ভিত হয়ে বসে থাকে। এ সমস্যার তো কোন কূলকিনারাই নেই কোথায়ও। সে আর কীই বা করতে পারে।

বিপাশাই একটু কেশে গলাটা সাফ ক'রে নিয়ে বলে, 'দ্যাখো, আমি একটা কথা ভাবছিলুম। আমি যদি দিনকতক মার ওখানে গিয়ে থাকি তো কী হয়? মানে যতদিন না খুকীটা বড়সড় হয়। তাহ'লে এই বাড়তি লোক রাখার খরচা থাকে না। ওখানে ওকে মা-ই দেখতে পারবেন। তুমি না হয় কিছুদিন ওখান থেকেই খাওয়াদাওয়া সারতে। তাহ'লে কান্নুর মাকেও দরকার হয় না। এধারে দেনাটাও একটু হাল্‌কা হয়ে আসত ততদিনে—?'

অকস্মাৎ অন্ধকার সমুদ্রে সূর্যোদয় হয় যেন। বিজয় বিপুল আলো দেখতে পায়। সে সোৎসাহে বলে, 'তারই বা দরকার কি? মিছিমিছি এই আশি টাকার বাড়িটা টেনে। মালপত্রগুলো কোনমতে ও বাড়িতে গুঁজে রাখতে পারবে না? আমি না হয় একটা মেসেই থাকতুম বছর খানেক। অনেকটা খরচ কমে তাহ'লে। আরও একটা টিউশ্যনী নিতে পারি আমি। দেনাটা মোটামুটি শোধ ক'রে আনতে পারা যায়।'

বিপাশাও কি একটু উৎসাহ বোধ করে?

সে ব'লে, 'তা মন্দ নয়। দেখি মাকে বলে। ধরবে তো? হ্যাঁ, তাহ'লে খানিকটা সাবস্ট্যানসিয়াল খরচা কমে যায় বটে।'

সেই ব্যবস্থাই হ'ল। মালপত্র নিয়ে বাপের বাড়ি গিয়ে উঠল বিপাশা। বিজয় বেশ ভাল মেসই পেয়েছে একটি। তবে হয়ত তাকে বেশিদিন মেসে থাকতে হবে না। দাদা প্রায়ই বলছেন, 'কী দরকার মিছিমিছি শরীরটা নষ্ট ক'রে। আড্ডা যখন আছেই একটা—।' বিজয় কথাটা ভাবছে।...

এক বছর অবশ্য কেটে গেছে বহুকাল। বিপাশা কিন্তু কোন উচ্চবাচ্য করে না। বিজয়ও কথাটা তোলে নি। বহুকাল পরে সে একটু নিশ্চিন্ত হয়েছে। আবার কবিতা লিখতে শুরু করেছে দু'একটা। মিছিমিছি অশান্তি এবং

দুশ্চিন্তাকে ঘাড় পেতে নিতে তার অন্ততঃ কোন তাগিদ নেই।

মেয়ে?

হ্যাঁ, মেয়েটাকে গিয়ে মাঝে মাঝে দেখে আর এটা-ওটা দিয়ে আসে বৈকি। তবে বিপাশার সঙ্গে বড় একটা দেখা হয় না। কারণ রবিবার ছাড়া বিপাশাকে ধরা যায় না। রবিবারে আবার বিজয়ের সময় হয় না। সাহিত্য সভা বা সাহিত্য বৈঠক একটা না একটা থাকেই।

বিজ্ঞান ও বাস্তব

খবরটা সব কাগজে বেরিয়েছিল। এখানকার তো বটেই—ভারতের অন্য প্রান্তেরও প্রধান প্রধান কাগজে এই শোচনীয় মৃত্যু-সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে।

অশেষ সিকদারের নাম শুধু কলকাতা বা পশ্চিবঙ্গেই নয়, সারা ভারতেই সুপরিচিত, এমন কি ইউরোপ বা আমেরিকার শিশু-ব্যাধি-চিকিৎসক মহলেও বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি তাঁর নাম জানেন। এ বিষয়ে যেখানেই বড় বড় আলোচনা-সভার অনুষ্ঠান হয়, সেখানেই তাঁর ডাক পড়ে।

বিশেষ ক'রে বছর দুই আগে—জড়বুদ্ধি বা হাবা, যাকে ইংরেজীতে 'মঙ্গোলিয়ান ইডিয়ট' বলা হয়—তাদের চিকিৎসা সম্বন্ধে' তাঁর ক'টি প্রবন্ধ বা বিজ্ঞানের ভাষায় 'পেপার' প্রকাশিত হওয়ায় অনেকেই এ বিষয়ে নতুন ক'রে ভাবতে বা গবেষণা করতে শুরু করেছেন, তাতেই বিশ্বের বৈজ্ঞানিক মহল তাঁর সম্বন্ধে বেশি ক'রে সচেতন হয়েছেন।

প্রতিষ্ঠা, যশ এবং অর্থও—গত ক' বছরে পসার এত বেড়ে গিয়েছিল যে তাঁর নিজস্ব গবেষণার ব্যাপারে অসুবিধা হচ্ছিল। যথেষ্ট পেয়েছেন অশেষ সিকদার এই বয়সে। এই তো মোটে চুয়াল্লিশ বছর বয়স—এরই মধ্যে এত সম্মান ক'জন চিকিৎসক পান। গৃহে সুন্দরী ভার্যা, বিদুষী, তিনি নিজেও কোন দুরারোগ্য ব্যাধিতে ভুগছিলেন না—তবে এ কাজ কেন করতে গেলেন? এ পাগলামি ছাড়া কি! এই আত্মহত্যাটা!

আর এত বড় ডাক্তার, তিনি তো যে কোন তীব্র বিষ খেয়ে মরতে

পারতেন, বাসের সামনে লাফিয়ে পড়ে ঐ ভাবে চাকার তলায় থেঁতলে মরার কি কারণ থাকতে পারে?

এই অবোধ্য বা অকারণ ঘটনাটার কথা—একটা মহৎ সম্ভাবনাময় জীবনের শোচনীয় অকাল পরিসমাপ্তির কথা একদিন ক'টা খবরের কাগজে প্রকাশিত হয়েই জনসমাজের মনোযোগ থেকে বিদায় নিল।

কারণটা ঠিক কেউ জানে না; জানবেও না হয়ত কোনদিন—কেবল এই বর্তমান লেখক ছাড়া। অশেষ সিকদারের কোন নিকট-আত্মীয় ছিল না। মা বাপ ওঁর শৈশবেই গত হয়েছেন, যে মামা মানুষ করেছিলেন তিনি অশেষ ডাক্তারী পাস করার পরই মারা গেছেন; তাঁরও কোন ছেলে নেই, একটি মেয়ে। সে বিলেতে থাকে। থাকার মধ্যে আছে শুধু অশেষের স্ত্রী গার্গী। ওদেরও এতাবৎ কোন সন্তান হয় নি। অশান্তির কারণ ঐখানেই।

গার্গী লেখাপড়া জানা মেয়ে, সেও বিজ্ঞানের ছাত্রী। কিন্তু সেও মানুষ। অশেষ এতই কর্মব্যস্ত এবং তার কর্মক্ষেত্র এতটাই বিস্তৃত—চিকিৎসা, নিজের পড়াশুনো, গবেষণা, সেজন্যে একাধিক হাসপাতালের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে হয়েছে—কনফারেন্সে যাওয়া, বক্তৃতা দেওয়া, প্রবন্ধ লেখা—নানা দেশে ছুটো-ছুটি করা, এর মধ্যে স্ত্রীকে সঙ্গ বা সাহচর্য দেবার সময় থাকে না বেশির ভাগ দিনই।

খ্যাতি যত বেড়েছে, গার্গী ততই দূরে সরে গেছে। এই দূরত্বে সেতুবন্ধন করতে পারত একটি বা দুটি সন্তান থাকলে।

গার্গী আধুনিক মেয়ে, সে নিজে এগিয়ে গিয়ে নিজেকে পরীক্ষা করিয়েছে—দেখা গেছে তার গর্ভধারণের ক্ষমতায় কোথাও কোন ত্রুটি নেই। তখন অশেষকেও পরীক্ষা করিয়েছে গার্গী, প্রমাণ হয়েছে স্বামীই বন্ধ্যা।

গার্গী স্বামীকে ভালবেসেছিল, নির্ভেজাল সে ভালবাসা। তাই ভবিষ্যৎ কি জানলেও তা নিয়ে কোন অশান্তি করে নি।

তবে তার বৈজ্ঞানিক মন এটুকু বুঝেছিল যে মন থেকে হতাশা দূর করার বড় উপায় হচ্ছে সর্বদা কাজে ব্যস্ত থাকা।

তাই কিছুদিন পরে এক বেসরকারী কলেজে লেকচারারের কাজ নিয়েছিল।

কিন্তু ভাগ্য ওকে শান্ত বা সহজ হ'তে দেবে না বলেই যেন বদ্ধপরিকর।

এই চাকরিই শেষ পর্যন্ত অশান্তির কারণ হয়ে দাঁড়াল। এই চাকরি করার মধ্যে যে হেতুটা নিহিত, সেটা বুঝতে বুদ্ধিমান লোকের অসুবিধে হবে কেন? এবং যতই অশেষ কথাটা নিয়ে ভাবেন, ততই মনের মধ্যে কোথায় একটা কাঁটা খচখচ ক'রে ওঠে। আর তার ফলে বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়।

না, এ বিরূপতা স্ত্রীর ওপর নয়, নিজের ওপরই। যাকে বলে অপরাধী বিবেক, তাই।

গার্গীর নিঃসন্তান জীবনের শূন্যতা অন্যভাবে পূরণ হ'তে পারত, অশেষ যদি ওকে একটু বেশীক্ষণ সঙ্গ দিতেন। কিন্তু সে চিন্তাটাকে একেবারেই মনে উঠতে দিলেন না অশেষ। কারণ কাজটা ওঁর নেশা। প্রতিষ্ঠার নেশা, সার্থকতার নেশা।

নেশা যেমনই হোক—তা কি মদ, কি রেস, আর কি সাফল্য, যশ—নেশায় পেয়ে বসলে মানুষ অন্য কোন কথা, আর কারও কথা ভাবতে পারে না।

নিজের সাহচর্য দেবার চিন্তাকে মন থেকে সরিয়ে রেখে সন্তানের কথাই ভাবতে লাগলেন অশেষ।

প্রথমে প্রস্তাব তুলেছিলেন—একটি পোষ্য নেওয়ার জন্যে। কোন অনাথ আশ্রম কি হাসপাতাল থেকে অবাঞ্ছিত সন্তান এনে মানুষ করলে কি হয়?

গার্গী রাজী হয় নি।

অশেষ তবুও অনেক বুঝিয়েছেন, যুক্তি দেবার চেষ্টা করেছেন কিন্তু গার্গীকে রাজী করাতে পারেন নি। শেষ অবধি সে বলেছে, 'ও তুমি যতই বলো, পরগাছা কখনও জোড়া লাগে না। তা ছাড়া, কুড়নো ছেলেকে মানুষ করতে আমার ঘেন্না করবে হয়ত, পুরোপুরি আপন করার চেষ্টাও হয়ত করব না।'

তারপরই এই নতুন কথাটা মাথায় গেল অশেষের। কৃত্রিম উপায়ে গর্ভ-সঞ্চার করার কথাটা। বৈজ্ঞানিক উপায়ে মেয়েদের গর্ভ সঞ্চার করা সম্ভব হচ্ছে। সে সন্তান নির্বিঘ্নে জন্মাচ্ছে, বড়ও হচ্ছে।

পাশ্চাত্য দেশের এ প্রচেষ্টা এ দেশেও শুরু হবে বৈকি। এখানকার একজন বাঙালী বৈজ্ঞানিক এ দেশেও নির্বিঘ্নে এই দুঃসাধ্য সাধন করেছেন।

আস্তে আস্তে বিস্তর ভনিতা ক'রে স্ত্রীর কাছে কথাটা পাড়লেন অশেষ।

প্রস্তুতি হিসেবে বহু সংবাদপত্রে 'কাটিং' ও প্রবন্ধের 'অফপ্রিন্ট' সংগ্রহ করেছেন—সেগুলিও পকেট থেকে বার করলেন।

গার্গী শান্ত হয়ে শুনেছিল এতক্ষণ। তার মুখের অবিচল নৈর্ব্যক্তিক ভাব দেখে অশেষই বরং কিছুটা থতিয়ে গিয়ে চুপ করলেন।

কাটিংগুলো ওর হাতে দিতে যাবেন—গার্গী ওঁর হাতটা ঠেলে সরিয়ে দিয়ে বলল, 'ও সব আমার দেখা, পড়েওছি অনেক। কিন্তু আমার ক্ষেত্রে প্রশ্ন, আমি কার সন্তানের মা হব?'

অশেষ বিব্রত হয়ে উঠলেন। আমতা আমতা ক'রে বললেন, 'না, মানে সেটা একটু—মানে খোঁজখবর নিয়ে সংগ্রহ করতে হবে।'

'সে ক্ষেত্রে তো সেই একই প্রশ্ন থেকে যাচ্ছে। সে কেমন লোক, তার বংশপরিচয় কিছুই জানব না। চেনা লোক হ'লেও যে জানা লোক হবে তার কোন মানে নেই। একটা মূর্খ কি নির্বোধ কি বদলোকের সন্তান গর্ভে ধারণ ক'রে জীবনটা আরও বিড়ম্বিত করব। তাকে মানুষ করতে গিয়েও বার বার মনে হবে—এ তোমার সন্তান নয়, তখন মনে একটা বিতৃষ্ণা দেখা দেবে হয়ত। না, ওতে আমার মন সায় দেবে না।'

তারপর একটু থেমে বলে, 'পরপুরুষের সন্তান দেহে প্রবেশ মানেই তো সতীত্ব নষ্ট হওয়া। আমি ব্রাহ্মণের মেয়ে, বাবা নামকরা লোক ছিলেন, বিখ্যাত পণ্ডিতবংশে মার জন্ম—তাঁদের কাছে শিক্ষা আমার, ও ছেলে কোলে নিতে আমার গা ঘিনঘিন করবে, নিজেকে অপবিত্র মনে হবে।'

তবুও খুব সহজে হাল ছাড়েন নি অশেষ। অনেক যুক্তি দেবার, দৃষ্টান্ত দেবার চেষ্টা করেছেন—কিন্তু গার্গী কোন কথাতেই কান দেয় নি। শেষে বিরক্ত হয়ে বলেছেন অশেষ, 'তোমরা যতই বিজ্ঞান পড়ো আর আধুনিক হও—এখনও সেই রঘুনন্দনের যুগে থেকে গেছো। পৃথিবী তারপর অনেক এগিয়ে এসেছে।'

গার্গী ওর স্বামীকে চেনে। বোঝে যে এই ব্যাপারটা তার মাথায় এমন ভাবেই দৃঢ়মূল হয়ে রয়েছে যে, অন্য কোন প্রস্তাব কি অন্য কোন পথের কথা ভাবারও আর শক্তি নেই।

এটাও যে তার নেশা। বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা। ছোটদের হাতে নতুন খেলনার মতোই তাঁর উত্তেজনা আর আগ্রহের সৃষ্টি করেছে।

তবু ক্রমাগত যুক্তিতর্ক অনুরোধ মিনতির ফলে গার্গীর মন একটু ভিজে আসছে কি ? অন্তত অশেষের তাই মনে হয়েছিল।

সেদিন কলেজ থেকে ফিরতে একটু দেরি হয়ে গিয়েছিল গার্গীর।

দেরি কলেজে হয় নি, কলেজ থেকে বেরিয়ে ন্যাশনাল লাইব্রেরী ঘুরে আসতেই অনেকটা সময় গেছে। শ্রাবণের অপরাহ্ণও ম্লান হয়ে সন্ধ্যার আবছায়া ঘনিয়ে এসেছে।

বাড়িতে চাবি দেওয়া ছিল। ওদের দিনরাতের যে লোকটি আছে—কম্‌বাইণ্ড-হ্যাণ্ড, সে দেশে গেছে। একটা ঠিকে ঝি আছে, বাসন মাজার, সে-ই ঘরদোর পরিষ্কার ক'রে এবং বসে থেকে ওদের খাওয়া হয়ে গেলে সে বাসনও মেজে দিয়ে গেছে।

অশেষ অবশ্য দুপুরে—সেটা প্রায়শ বিকেলই হয়ে যায়—একবার বাড়ি আসে।

গার্গী অন্যমনস্কভাবে ব্যাগ থেকে চাবির গোছা বার করতে করতে দরজার দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল, হঠাৎ একেবারে পাশেই একটা মানুষের উপস্থিতি টের পেয়ে চমকে উঠল।

যেন ছায়ার মধ্যে, ছায়ার সঙ্গে মিশে দাঁড়িয়ে ছিল লোকটা। পুরুষমানুষ যে, সেটা প্রথমেই বোঝা গিয়েছে।

লোকটি মনে হল নিঃশব্দে স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে ওরই অপেক্ষা করছে।

ভয় পাবারই কথা। নতুন পাড়া। অভিজাত প্রতিবেশী অধিবাসী—ছেলেরা পথে খেলবে, কি কর্তারা আপিসফেরত রকে বসে আড্ডা দেবেন এমন লোক কেউ নেই এখানে। এমনিতেই নির্জন, এখন এই সন্ধ্যের সময়টা প্রায় জনহীনই থাকে রাস্তাটা। ও একা, মহিলা।

চমকে বোধ করি অস্ফুট একটা শব্দ ক'রে উঠল গার্গী।

যে ছেলেটি দাঁড়িয়েছিল—ছেলেটিই, তা পরে ভাল ক'রে তাকাতেই বোঝা গেল—ওর অবস্থা বুঝে নিয়ে তাড়াতাড়ি বলে উঠল, 'আমি। আমি

মধু—মধু লাহিড়ী।'

চেহারা দেখারও দরকার নেই, মধুর গলাই যথেষ্ট পরিচিত। তবে চেহারাটাও, এবার চেয়ে দেখতে, ভাল ক'রে চোখে পড়ল। মধু লাহিড়ী যে তাতে কোন সন্দেহ নেই। এ চেহারা বাঙালীর ঘরে খুব সুলভ নয়। বলিষ্ঠ সুগঠিত দেহ।

'এসো। এসো। কী ব্যাপার! এমন ভাবে এখানে দাঁড়িয়ে চুপচাপ? আমি চমকে উঠেছি একেবারে। এসো, ভেতরে এসো। কোন খারাপ খবর-টবর নয় তো?'

ভেতরে এসে আলো জ্বালল গার্গী। মধুও এ বাড়ির সব ঘরদোর জানে—সে বাইরের দরজা বন্ধ ক'রে দিয়ে ভেতরে আসতে আসতে বলল, 'না, না, খারাপ নয়, বরং ভাল খবর আছে। তা আপনার এত দেরি? আমি তো হতাশ হয়ে পড়েছিলুম, ফিরেই যেতাম আর একটু হ'লে।'

বড় আলোটায় এবার ভাল ক'রে তাকিয়ে দেখল গার্গী। প্রায় মাস ছয়েক পরে দেখছে ওকে, কিন্তু এই ক' মাসে মধু আরও সুন্দর হয়ে উঠেছে। দেহ আরও বলিষ্ঠ, আরও সুগঠিত।

গার্গী পাখা খুলে দিয়ে বলল, 'বসো, বসো। ঠাণ্ডা কিছু খাবে? তবে যা ঘেমেছ একটু বসে নাও আগে। এর ওপর ঠাণ্ডা শরবৎ খাওয়া ঠিক নয়।'

'না না, ঠিক আছে।' মধু বেশি সৌজন্য না ক'রে গার্গীর দিকে একটা চেয়ার এগিয়ে দিয়ে নিজে সামনেরটায় বসে পড়ে।

মধু গার্গীদের কলেজের ছাত্র। বিনত ও লেখাপড়ায় আগ্রহী বলে সব অধ্যাপকেরই প্রিয় ছিল। তবে লেখাপড়া বেশিদূর এগোতে পারে নি। দারিদ্র্যের জন্যেই বি-এস-সি পড়তে পড়তেই কলেজ ছেড়ে দিতে হয়। বাড়িতে মা বোন আর একটা ছোট ভাই—তিনটি পোষ্য। কিছু উপার্জনের চেষ্টা না করলেই নয়। মা একটা দেড়শো টাকার মতো উইডো পেনশন পান, তা থেকে নব্বুই টাকা বাড়িভাড়া দিতেই চলে যায়।

এই অবস্থা দেখে গার্গীই ছেলেটার কিছু করা যায় কিনা, একটু দেখতে বলেছিল অশেষকে।

অশেষ যা পারতেন তা তখনই ক'রে দিলেন। তাঁর চেম্বারে রুগীদের স্লিপ

লিখিয়ে নেওয়া, পর পর তাদের ডেকে দেওয়া, ডাক্তারের হাতের কাছে যন্ত্র-পাতি এগিয়ে দেওয়া, প্রয়োজনমতো টর্চ ধরা—এই সব কাজ। এর জন্যে একেবারেই আড়াইশো টাকা মাইনে ব্যবস্থা করলেন।

তাতে উপবাসটা বাঁচল। কিন্তু পড়াশুনো? সেটা একটা বড় বেদনার ব্যাপার ছিল মধুর কাছে।

আজ সেই খবরই দিতে এসেছে মধু। কী একটা সুযোগ পেয়ে সাহেবই এক ধনী পেশেন্টের বাড়ি সকালে একটা টুইশানী ক'রে দিয়েছেন। (মধু অশেষকে সাহেব বলেই উল্লেখ করে), ক্লাস নাইনের ছেলেকে পড়াতে হবে, দেড়শো টাকা মাইনে। সন্ধ্যেতে পড়াতে পারলে আর একটা ভাল কাজ পাওয়া যেত ঐ বাড়িতেই কিন্তু সন্ধ্যেবেলা অশেষের চেম্বার আছে, মধুর সময় হবে না।

তবে এও যথেষ্ট। কাজটা ওর পক্ষে কিছুই নয়। শুধু বিজ্ঞানের বিষয়-গুলো পড়ানো, আর অঙ্ক। ওর কাছে ছেলেখেলা। এই বাড়তি টাকাতে ও নিজের পড়াশুনোর চেষ্টা করতে পারে আবার। সেই পরামর্শই চাইতে এসেছে —কোনমতে কি ওকে আবার কলেজে ঢুকিয়ে নিতে পারেন না মিসেস সিকদার?

গার্গী একদৃষ্টে ওর প্রসন্ন উজ্জ্বল মুখের দিকে চেয়ে ছিল, এখন একটু হাসির চেষ্টা ক'রে আস্তে আস্তে বলল, 'কিছু করা শক্ত। খুবই শক্ত। তুমি তো কিছু কিছু জানো য়্যাডমিশানের ব্যাপারটা। অনেক বাধা। হাউএভার, যদি ক'রে দিতে পারি—আমাকে কি দেবে?'

আনন্দে আগ্রহে সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে মধু—আবেগে স্থির থাকতে পারে না বলে, বোধ হয় নিজের অজ্ঞাতেই, গার্গীর একটা হাত নিজের দু'-হাতে চেপে ধরে। বলে, 'বলুন কি চান। তবে আমার আর কি সাধ্য, কতটুকু সাধ্য। আর যা সাধ্য তাও তো আপনারই দান। আপনার ঋণের কোন শেষ হয় না। দুমুঠো খেতে পাচ্ছি যে আমরা, সেও তো আপনারই দয়ায়।'

হাতটা আস্তে ছাড়িয়ে উঠে দাঁড়াল গার্গী। বলল, 'আচ্ছা, সে হবে। চলো, ভেতরে চলো। এবার কিছু খাও, মুখ শুকিয়ে গেছে তোমার।'

'কিন্তু আমাকে এখন তো চেম্বারে যেতে হবে, সাহেবের আসবার

সময় হয়ে এল।'

'সে হবে এখন। সব দিন কি আর ঠিক সময় যাওয়া হয়ে ওঠে। বাসে দেরি হয় না? চলো দেখি, জামাটা খুলে পাখার নিচে মেলে দাও, ঘাম বসছে নিশ্চয়।'

একরকম যেন জোর ক'রেই ভেতরের ঘরে নিয়ে যায় গার্গী।

অশেষের দৃষ্টি প্রায়শই অদৃশ্য বস্তুতে আবদ্ধ থাকে, নিজের কর্ম ও চিন্তা-কল্পনার সঙ্গে যুক্ত কোন ব্যাপারে মন আবদ্ধ থাকে বলে স্ত্রীর দিকে নজর দিতে পারেন না। সে আছে, সে তো থাকবেই।

তবু, একদিন তাঁরও নজরে পড়ল অবস্থাটা। গার্গীর চেহারার পরিবর্তনটা।

একটু উদ্বিগ্ন হয়েই জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমার কি শরীর খারাপ লাগছে বুলু?'

বুলু গার্গীর একটা ডাকনাম।

গার্গী বেশ প্রশান্ত কণ্ঠেই প্রতিপ্রশ্ন করল, 'কেন?'

অশেষ আর একটু ভাল ক'রে লক্ষ্য করলে বুঝতেন শান্ত কণ্ঠস্বরের মধ্যেও সামান্য একটু কৌতুকের আভাস আছে।

'এই—মানে কেমন যেন মুখটা শুকনো দেখাচ্ছে, চোখের কোণে কালি। খুব ক্লান্তও লাগছে।'

ওঁরা তখন বসে চা খাচ্ছিলেন। কেটলি থেকে আর একটু লিকার কাপে ঢেলে নিয়ে গার্গী বলল, 'তুমি তো ডাক্তার, তুমি বুঝতে পারছ না—কী হয়েছে?'

একটা গভীর ভ্রূকুটি দেখা দিল অশেষের কপালে। একটা কি কুটিল অথচ অচিন্ত্য সন্দেহ। না না, তা কেমন ক'রে হবে। সব রকম পরীক্ষা তো হয়েই গেছে। তা ছাড়া গত তিন-চার মাসের মধ্যে তেমন কোন কারণও তো ঘটে নি।

তাই আবারও বিহ্বল কণ্ঠে প্রশ্ন করেন, 'তার মানে?'

'আঃ! তুমি বড্ড ভাল হয়ে যাচ্ছ দিন দিন। তার মানে ম্যাম ক্যারিয়িং।

ডাঃ নন্দীর সঙ্গে এনগেজমেণ্ট করেছি। একবার দেখিয়ে নেব সব—'

'যা! কী বলছ যা-তা! না না, এ ঠাট্টার কথা নয়। সত্যিই তা হলে ডাঃ নন্দীকে দেখানো উচিত।'

'এবং আমি সত্যিই দেখাবো। তবে তুমি যা ভাবছ তেমন কোন উদ্বেগের কারণ নেই। আমি মোটেই ঠাট্টা করি নি। যা বলেছি সত্যিই বলেছি।'

দেখতে দেখতে সেই হেমন্তের দিনেও অশেষের কপালে ঘাম জমে ওঠে। তিনি যেন একটু চেঁচিয়ে উঠতে চান, 'তুমি কি আমাকে নিয়ে ফান্ করছ? অপমান করতে চাও? তেমন কোনো অকেসান তো ঘটে নি এর মধ্যে!'

'হ্যাঁ, গত চার মাসের মধ্যে সে সময় তুমি পাও নি। তবে এও তো জানো, সে অকেসন ঘটলেও এ ঘটনা ঘটত না। তুমিই তো বলেছিলে অন্য উপায়ের কথা।'

'কিন্তু—সে, সে তো তার অনেক আয়োজন। আমি জানলুম না, এমন একটা কাজ হয়ে গেল!'

'ঠিক তোমার ও প্রোসেসে যেতে চাই নি বলেই তোমাকে জানানো হয় নি। আমি তো বলেছিলুম অজানা ভবিষ্যতের দিকে পা বাড়াবো না। বাকী জীবনটাকে জিওপার্ডাইজ করতে রাজী নই আমি। অজ্ঞাতপরিচয় লোকের শিশু আমি মানুষ করতে পারব না। এ একটি পরিচিত স্বাস্থ্যবান ভদ্র শিক্ষিত মানুষের সন্তান।'

অশেষ কি একটু তোতলা হয়ে যান? কথা আটকে যায় যেন। 'ভদ্র, শিক্ষিত, স্বাস্থ্যবান—সে কে? আমার চেনা কেউ?' এবার আর ধৈর্য থাকে না তাঁর।

'নামটা না-ই বা শুনলে। কী হবেই বা। এর আগেও তার সঙ্গে কোন সম্পর্ক ছিল না, পরেও নেই, ভবিষ্যতেও কোনদিন থাকবে না।'

'তাই বলে—তাই বলে—ওঃ, এই তোমার বড় বড় কথা! সতীত্ব, বংশ, মা বাপের শিক্ষা—'দুই চোখ রক্তবর্ণ হয়ে ওঠে অশেষের। রগের শিরা দুটো দড়ির মতো ফুলে ওঠে, দু কষে ফেনার মতো কি জমে—

গার্গী কিন্তু আগের মতোই অবিচলিত কণ্ঠে উত্তর দেয়, 'আঃ! তোমরা যতই বিজ্ঞান পড়ো, আর যতই আধুনিক গবেষণার বাহাদুরী নাও—এখনও

সেই রঘুনন্দনের যুগেই থেকে গেছ। পৃথিবীটা অনেক এগিয়ে এসেছে। ওদেশে হলে এই তুচ্ছ ঘটনা নিয়ে কেউ মাথাই ঘামাত না।'

কথাটা যেন কেটে কেটে বসে অশেষের সর্বাঙ্গে।

আর শুনলেন না, শুনতে পারলেন না অশেষ। অন্ধের মতো হাতড়াতে হাতড়াতে পাগলের মতো ছুটে বেরিয়ে গেলেন বাড়ি থেকে। ঠিক সেই সময়েই ঐ বাসটা কাছে এসে পড়েছিল। তাই আর মৃত্যুর অন্য কোন উপায়ের কথা ভাবেন নি, অন্য কিছু ভাবার মতো ধৈর্যও ছিল না।

বাদশাই মেজাজ

বাদশা মুখুজ্যের আসল নাম হল ভুবনমোহন, ভুবন বলেই ডাকবার কথা। অন্য নামেও ডেকেছেন কেউ কেউ—চার মেয়ের পর ছেলে, সকলেরই আদরের। বাবা খোকা বলে ডাকতেন, মা ডাকতেন বাপীসোনা—ইত্যাদি। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বাদশা নামটাই টিকে গিছল। এ নাম ওকে দেন ঠাকুর্দা। সে ওঁর মেজাজ দেখে বা উনিই বাদশা নামের যোগ্য হবার চেষ্টায় মেজাজখানা ঐ রকম ক'রে তুলেছিলেন—ইংরেজিতে যাকে বলে খ্যাতির যোগ্য হওয়া—তা আজ আর জানার উপায় নেই। মোদ্দা কথা, এই বাদশা নামটা যে ওঁর স্কুলে, কলেজে, চাকরি ক্ষেত্রে, পরে ব্যবসায়ী জগতে, এমনকি আত্মীয়-মহলেও চালু হয়েছিল, সে কতকটা ওঁর মেজাজের জন্যেই।

তাই বলে সে মেজাজ যে এই মৃত্যুকালে—এমনকি বলতে গেলে মৃত্যুর পরও—বজায় থাকবে, সেই দাপট ও সেই প্রচণ্ড ক্রোধ—তা কে জানত।

ইস্কুলে হেডমাস্টারের হাত থেকে বেত টেনে ফেলে দেবার ফলে—হেড-মাস্টার নাকি বিনা দোষে, ভাল ক'রে খোঁজ না নিয়েই একটা লাজুক ছেলেকে বেত মারতে গিছলেন—বাবার কাছে গুণে গুণে চব্বিশ ঘা বেত খেতে হয়েছিল। কলেজের এক প্রফেসর ফাঁকি দিতেন এই অপরাধে সর্বজনসমক্ষে তাঁর কান মলে দিয়ে কলেজ থেকে বেরিয়ে আসতে হয়। তারপর নিজেই খুঁজে পেতে হাঁটাহাঁটি ক'রে এক বিলিতী ফার্মে চাকরি যোগাড় করেন। কাজের লোক আর সত্যবাদী বলে উন্নতিও যথেষ্ট হয়েছিল—কিন্তু সেখানেও

এক সাহেব একজন বেয়ারাকে লাথি মারতে, এক ঘুষিতে তার নাক ফাটিয়ে দিয়ে সে চাকরিও খোয়াতে হয়।

তখন ওঁর বাবার আর সহ্য হয় নি। বলেছিলেন, 'তোমার মতো গোঁয়ার-গোবিন্দর দ্বারা কিছু হবে না। আমিও তোমাকে বসিয়ে চিরকাল খাওয়াতে পারবো না। তোমার যা মেজাজ, চাকরি করতে পারবে না। পুঁজিও নেই যে ব্যবসা করবে, পথের মোড়ে গিয়ে গামছা ফিরি করো গে।'

ছেলে তার অভ্যস্ত মেজাজে উত্তর দিয়েছিল, 'কী ফিরি করব সে আমি বুঝব, তার জন্যে তোমাকে মাথা ঘামাতে হবে না। আর তুমি জন্ম দিয়েছ, তুমিই মানুষ করেছ—মেজাজ যদি হয়ে থাকে তো সে তোমাদেরই দোষ। খাওয়াতে তুমি বাধ্য, এ ক'বছর চাকরি ক'রে অনেক টাকা এনে দিয়েছি, নিজে আলাদা জমাই নি। তবে এও বলে দিচ্ছি, তিন মাসের মধ্যে আমি আবার রোজগার শুরু করব—নইলে এ শহর ছেড়েই কোথাও চলে যাবো।'

তিন মাসের মধ্যেই রোজগার শুরু করেছিলেন অবশ্য। জমির দালালী, বাড়ির দালালী, হ্যাণ্ডনোট ও হুণ্ডীর দালালী, ইনসিওরেন্সের এজেন্সী—এতেই যথেষ্ট রোজগার হচ্ছিল, হাতে টাকা আসতে গেলেন শেয়ার মার্কেটে। সেখানেও ভাগ্যের জোরে ধুলো-মুঠো ধরে কড়ি-মুঠো পাচ্ছিলেন। তবে বাদশা জানতেন যে, এখানেই লোকে যেমন রাজা হয়, তেমনি একদিন ফকির হয়ে বেরিয়ে আসে। বেশ কিছু টাকা হাতে আসতেই তিনি হঠাৎ একদিন সকলকে চমকে দিয়ে ও-পর্ব চুকিয়ে দিলেন। যে টাকা হাতে এসেছিল, তাতে এবার বড় ধরনের বাণিজ্য ও শিল্পে মন দিলেন।

সেদিকেও সার্থকতার অন্ত ছিল না। অন্ত ছিল না মেজাজেরও। এই তো কিছুদিন আগেই—একটা কি ছোট কারখানার কর্মচারীরা ওঁকে ঘেরাও করেছিল। উনি রাগ করেন নি, বকাবকি করেন নি ; বলেছিলেন, 'বাবাসকল, তোমাদের কি মনে হয় আমি এ ব্যবসা থেকে অনেক রোজগার করছি, তোমাদের পেট মেরে? বেশ তো, এক কাজ করো, তোমাদের মধ্যে তো অনেকেরই সাত-আটশো টাকা মাইনে আছে—আমি তো কিছু খাটি, আমাকে কত দেবে তোমরা, হাজার? টাকাটা আমার, তার সুদ তো আছে। কাগজ কলম আনো, আমি তোমাদের হাতেই এ কারখানা ছেড়ে দিচ্ছি, তোমরা যা

নাও তাছাড়াও যা লাভ হয় বেঁটে নাও, আমাকে হাজার টাকা মাসে শুধু দিও। ব্যাঙ্কে যা ব্যালেন্স আছে, তাও তোমরা নাও। অবশ্য দেনা করতে পারবে না, যন্ত্রপাতি কিছু বেচতে পারবে না। এক বছর ছাখো, তবে এর পর যদি আমাকে ফিরিয়ে দিতে আসো, আমার সামনে সবাইকে নাকখত দিতে হবে।'

তা নাকখত নাকি দিতে হয়েছিল, সবাইকে না হোক, দলের চাঁইদের।

অবশ্য মেজাজের বিষয়ে বাদশা মুখুজ্যে পক্ষপাতহীন। এ মেজাজের আঁচ থেকে ছেলেমেয়েরাও রেহাই পায় নি।

তাঁর ছেলেমেয়ে চারটি। ছেলেরা লেখাপড়া শিখেছে, মেয়েদের ভাল বিয়ে হয়েছে। তবু বাদশা যখন দেখলেন তাদের হাত এবার ওঁর যথাসর্বস্বের দিকে এগোচ্ছে—তখন নিজমূর্তি ধরলেন। সুবিধের মধ্যে স্ত্রী গত হয়েছিলেন, নইলে হয়ত এতটা ঠিক পেরে উঠতেন না, কারণ এই একটা জায়গায় তাঁর ছুর্বলতা কিছু ছিল। স্ত্রী ছিলেন ছুর্দিনের সঙ্গিনী, চাকরি ছাড়ার পর যখন প্রাণপণে যুদ্ধ করতে হয়েছে সংসার খরচের জন্মে, বাবার কাছে কথার ঠিক রাখার জন্মে, তখন স্ত্রী রাজলক্ষ্মী কোন অনুযোগ তো করেনই নি, বরং উৎসাহ ও আশা যুগিয়েছেন।

সংঘাতটা শুরু হ'ল রাজলক্ষ্মীর মৃত্যুর পরই অবশ্য। শ্রাদ্ধশান্তি চুকে যেতে ছুই মেয়ে জানতে চাইল, তার মা-র নিজস্ব কি কি আছে—গহনা, বাড়ি, কোম্পানীর কাগজ ইত্যাদি।

'যা-ই থাক না, তোদের কি?' বাদশা শুধোন।

'বাঃ, মার সম্পত্তি তো আমাদেরই প্রাপ্য।'

সঙ্গে সঙ্গেই বড় ছেলে পিছনে দাঁড়িয়েছিল, বললে, 'সেদিন আর নেই মেস্তি, এখন মা-বাবার সব সম্পত্তিতেই ছেলেমেয়ের সমান অধিকার।'

'চোপ!' যেন গর্জন করে উঠলেন বাদশা। তারপর বললেন, 'তোমাদের যে এত আইনের জ্ঞান হয়েছে, তা জানতুম না। তা ভালই—যা বোঝাবার আদালতকে বোঝাও গে, সেখান থেকে ডিক্রি নিয়ে এসে দখল করো। তবে তার পূর্বে—ক্লিয়ার আউট অব মাই হাউস! চব্বিশ ঘণ্টা সময় দিলুম, তারপর যেন তোমাদের মুখ না দেখি। এতগুলো দারোয়ান পুষছি মাগনা নয়।

বাইরের আপদ যেমন ঠেকাতে পারে, তেমনি ঘরের আপদও ঝেঁটিয়ে তাড়াবে।'

তারপর বললেন, 'ছেলেদের জন্যে আমি স্টোর রোডের বাড়ি ছেড়ে দিচ্ছি, একসঙ্গে থাকতে পারো থাকবে, না হয় অন্য ব্যবস্থা করবে। মেয়েরা যে যার বাড়ি চলে যাক।'

আবারও বললেন, 'আমিও বাদশা, তোমাদের মতো অত আইন না জানলেও কিছু জানি—এমন ব্যবস্থা করা আছে, যাতে তোমাদের গর্ভধারিণীর যা কিছু আমাতে অর্শাবে। আর আমি ? না, আমাকে মেরেও কোন সুবিধে যাতে না হয় সে ব্যবস্থাও করেছি।'

এইটে, মানে শেষের খবরটা অবশ্য মিথ্যে। এতটা আগে ভাবেন নি। এবার ভাবলেন। ওঁর সব কাজেই তড়িঘড়ি। যতগুলো কারখানা আর কারবার ছিল তা সব লিমিটেড ক'রে ফেললেন। বড়গুলো আগেই করা ছিল, এখন প্রত্যেকটারই পুরনো বিশ্বাসী কর্মীদের শতকরা উনপঞ্চাশ ভাগ শেয়ার ভাগ ক'রে দিলেন, তারা হ'ল ডিরেক্টার। উনি ম্যানেজিং ডিরেক্টার। শর্ত রইল যে, অধিকাংশ ডিরেক্টারের ভোটে ম্যানেজিং ডিরেক্টার নির্বাচিত হবে ওঁর পরে।

অর্থাৎ ছেলেরা কিছু শেয়ার পেলেও কর্তৃত্বটা সহজে পাবে না। ছেলেদের চেয়ে ঐ কর্মচারীদের ওপর তাঁর বেশি বিশ্বাস ছিল।

এর পর উইল করলেন। ছেলেদের জন্যে নিজের শেয়ার ও স্টোর রোডের ঐ বাড়িটা, মেয়েদের একখানা করে বাড়ি। এছাড়া যা থাকবে সব রামকৃষ্ণ মিশন পাবে। পুরনো ভৃত্যদের জন্যে উইলে ব্যবস্থা রাখলেন না। সেই সময়ই পাঁচ হাজার টাকা ক'রে সবাইকে দিয়ে দিলেন।

এর পরই এই অসুখ।

যমে মানুষে টানাটানি বলে—এখন যমে ডাক্তারে লড়াই।

দেখার লোক ছিল বৈকি। পুরনো বন্ধু দু-একজন এখনও বেঁচে আছেন, আছে বিশ্বস্ত ও পুরস্কৃত কর্মচারীর দল। বন্ধুদের মধ্যে একজন আছেন উকীল, তিনিই চিরদিন এ সংসারে কর্তৃত্ব ক'রে এসেছেন, কর্তার সর্বাধিক প্রিয় বন্ধু। তিনিই এসে চিকিৎসা ও আনুষঙ্গিক সমস্ত ব্যবস্থার হাল ধরেছিলেন।

ছেলেরা ও মেয়েরা—জামাই-বৌমার দলও,—ছুটে এসেছিল সবাই, গুরুতর অসুখের খবর পেয়েই। লিভারের অবস্থা খারাপ, সেই সঙ্গে কিডনীর গোলমাল। ব্লাডসুগার বেশী ছিলই। বুকের অবস্থা এইসব কারণেই দুর্বল। অর্থাৎ বাঁচার আশা কম।

ছেলে-মেয়েরা এসেছিল অনেক আশা নিয়ে। তারাই এসে সেবা ও চিকিৎসার হাল ধরবে অর্থাৎ অনাবশ্যক (বাঁচবেন না সে তো বোঝাই যাচ্ছে, সুতরাং গুচ্ছের খরচ ক'রে লাভ কি ?) বেশি খরচ না হয় সেটা দেখবে এবং বাড়িতে কি আছে কাগজপত্র, হিসেব, টাকাকড়ি, মার গহনা—তারও তদারকি করবে। কিন্তু এসে অবস্থা দেখে দমে গেল। পুরনো কর্মচারীরাও আজকাল আর মালিক-পুত্রদের ভয় পায় না, তাও যদি বা তাদের ওপর চোটপাট করা যেত—উকীল কাকাকে ভয় দেখানো যাবে না। দেখা গেল তাঁর হাতেই সব চাবি আর কাগজপত্র, টাকাকড়ি চাবির মধ্যে।

কাজেই অনাবশ্যক খরচ হতেই লাগল। ডাক্তারের পর ডাক্তার—যন্ত্রপাতি, য়্যাংলো-ইণ্ডিয়ান নার্স, অক্সিজেন—অর্থাৎ এলাহি ব্যাপার। তবু বড় ছেলে একবার মৃদুকণ্ঠে অর্ধ-স্বগতোক্তি করতে গেল, 'বাবা আচ্ছন্ন হয়ে আছেন তাই, নইলে এত খরচ কিছুতে করতে দিতেন না।'

'সেই জন্যেই তো করছি। চিরকাল চিনির বলদের মতো টাকা রোজগার ক'রে গেল—তার জন্যে কিছুই খরচ হবে না ? আর আচ্ছন্ন তো সবসময়ে নেই বাবা, সকালের দিকে তো বেশ জ্ঞান থাকে। দেখছেন, বুঝছেন, মনে হচ্ছে খুশীই হয়েছেন।···এর চেয়ে বেশি জ্ঞান থাকলে তোমাদেরই বরং অসুবিধে হ'ত—'

অগত্যা বসে বসে বাবার প্রতি টান ও ভালবাসার প্রতিযোগিতা ছাড়া আর কি করবার আছে ? কে কত বেশি ভালবাসে, কে আগেই টের পেয়েছিল যে, বাবার আর বেশি দিন নেই, কাকে মা স্বপ্ন দিয়েছেন যে, 'বাবার অসুখ—তোরা দেখগে যা'—এইসব কথাই নিরন্তর ফিসফিস ক'রে (অথচ পিতার শ্রুতিগম্যভাবে) আলোচনা হতে লাগল। আশা যে, যদি বাবা কিছুটা অন্তত শোনেন, বোঝেন ও একটু 'নরম' হন। বলা তো যায় না, এ যা মানুষ, ভাল হয়েও উঠতে পারে। সেক্ষেত্রে উইলটা বদলানোও অসম্ভব নয়।

এই আশার জন্যেই পিতৃভক্তি ও স্নেহ কার অধিক এ নিয়ে চাপা গলায়

কথা-কাটাকাটি, রেষারেষি—এমন কি কটূক্তি পর্যন্ত চলতে লাগল।

এবং শেষ পর্যন্ত সত্যিই মিত্রদের মুখে ছাই দিয়ে ভালই হয়ে উঠলেন বাদশা মুখুজ্যে। কিছুদিন আগেই ডাক্তাররা যাঁর সম্বন্ধে মন্তব্য করেছিলেন যে, 'আমাদের আর কিছু করার নেই, এখন ভগবান ভরসা—নাথিং শর্ট অফ মিরাক্‌ল্ কুড্ সেভ হিম।···আমরা শুধু একটু রিলিফ দেবার চেষ্টা করতে পারি এখন'—সেই লোকই যে উঠে-বসে খরচের হিসেব দেখতে চাইবেন কে জানত।

একটু সুস্থ হয়েই বাদশার প্রথম কাজ হ'ল পুত্র-কন্যাদের বিতাড়ন। পরিষ্কার বলে দিলেন, 'বেশি যদি ক্যাওটোপনা করার চেষ্টা করো, যা দিয়েছি তাও পাবে না, কেটে পড়ো।'

তারপর একটু সবল হয়ে ওঠার পর ভাবতে লাগলেন, কোথাও একটু চেঞ্জে যাবেন। ডাক্তাররা বলেছে, উকীল বন্ধু বলেছে, মায় রাত্রে যে নার্সটি থাকত (সে সকালের সিস্টারের মতো মিঃ মুখার্জী না বলে মেসোমশাই বলে ডেকে বাদশার চিত্ত জয় করেছিল, বাদশা তাকে প্রাপ্য টাকা ছাড়াও একটা হাল্‌কা হার প্রেজেন্ট করেছেন) সেও বার বার বলেছে আপনি এখানে থাকলে দিন-রাত বিরক্তির কারণ ঘটবে, এ বয়সে তাতেই শরীর খারাপ করবে সবচেয়ে বেশি। তাছাড়া কলকাতার হাওয়া একদম ভালো নয়। কোথাও গিয়ে কিছু-দিন বিশ্রাম নিন। একটা বিশ্বাসী সার্ভেন্ট নিয়ে সমুদ্রের ধারে কিংবা পাহাড়ে চলে যান, মাস দুই চেপে থাকুন। একটু দূরে কোথাও যান, উটি কি কোদাই-কানাল কি ডালহাউসী—যেখানে চেনা লোক বিরক্ত করতে পারবে না, অথচ ডাক্তার-টাক্তারের সুবিধে আছে।'

পরামর্শটা মনে লেগেছে, তবে সবটা নয়। ঐসব ফ্যাশনেব্‌ল জায়গায় নয়। গেছেন কোথাও কোথাও—দার্জিলিং, সিমলে—কেবল 'ফোতো'দের ভিড়, তাদের চালচলন দেখলে হাড় জ্বলে-যায় ওঁর। না, যেতে হ'লে নিভৃতে কোথাও যাবেন। পাড়াগাঁ অঞ্চলে কোথাও, অথচ একটু স্বাস্থ্যকর হয়—এমন জায়গায়।

জন্মে পর্যন্ত শহরে, শহরে অরুচি ধরে গেছে। এক-আধবার কাজের জন্যে

পাড়াগাঁয়ে যেতে হয়েছে—সে অবশ্য কাছাকাছি—হাওড়া, হুগলী, বর্ধমান, বীরভূম—তখন মনে হয়েছে, এই সব জায়গায় ক'দিন এসে থাকবেন কিংবা একটা বাড়ি ক'রে রাখবেন—তার পরে আর হয়ে ওঠে নি।

এইবার সেই সাধটা মিটিয়ে নিলে কি হয়?

কিন্তু কথাটা ভাবার সঙ্গে সঙ্গেই প্রশ্ন ওঠে, কোথায় যাবেন? কোন একটা লোক না থাকলে, কোন সূত্র ধরে না গেলে—হঠাৎ কোথাও যাওয়া যায় না। হুম ক'রে চলে যেতে পারেন, উঠবেন কোথায়?

ওঁর বিভিন্ন কারখানার কর্মচারীরা আছে অনেকে, ঐসব অঞ্চলে বাড়ি, বস্তুত লোক সংগ্রহ করতেই ওঁকে যেতে হ'ত—কিন্তু তাদের কাউকে বললে তারা এত ব্যস্ত হয়ে পড়বে এবং ভবিষ্যতে সুবিধা আদায়ের জন্যে এত যত্ন করবে—না। সে অসহ্য লাগবে, হয়ত রাগারাগি ক'রে চলে আসবেন।

তবে?

ভাবতে ভাবতে হঠাৎ মনে পড়ে যায় কানাইয়ের মেয়ের কথা।

কানাই ওঁদের বাড়ির পুরনো পুরোহিত ছিলেন। সাধারণ 'অল্পবিদ্যায় শাঁখে ফুঁ' গোছের পুরুত তবে মানুষটি ভাল বলে বাদশা তাঁকে স্নেহের চোখে দেখতেন। কানাই মারা গেছেন, তাঁর ছেলেকে উনি নিজের বাল্‌ব্‌-এর কারখানায় কাজ শিখিয়ে চাকরি ক'রে দিয়েছেন, মেয়ের বিয়ে দিয়েছেন।

কানাই উদুরীতে ভুগে মারা যান। তখন মেয়েটি অনূঢ়া, কোনমতে ক্লাস টেনে পর্যন্ত পড়ার পর বাপের সেবা ও সংসারের হাঁড়ি ঠেলায় লাগতে হয়েছিল। দেখতে মাঝারি, তবে বেশ শান্ত ধরনের হাসিখুশি মেয়ে, যা দু-একবার দেখেছিলেন. ভাল লেগেছিল বাদশার। ছোট ছেলের সঙ্গে বিয়ে দেবার কথাও ভেবেছিলেন, পরে মনে হ'ল—ছেলে ওকে হয়ত হীন চোখে দেখবে, মেয়েটা সুখী হবে না। ছেলের আশা ছিল, সে বড়লোকের মেয়ে বিয়ে করবে। ক'রে এখন মজা টের পাচ্ছেন বাছাধন!

কানাই মৃত্যুর আগে ওঁকে ডেকে পাঠিয়ে দু হাত ধরে বলে যান, বাদশা যেন তাঁর মেয়েটার সদ্‌গতি করেন। খুব ভাল পাত্রে দরকার নেই, কে তাদের সঙ্গে পাল্লা দেবে, তত্ত্বতাবাশ করবে—উনি যেন কানাইদের সমান ঘরে একটি

সৎ পাত্র দেখে বিয়ে দিয়ে দেন।

সে অনুরোধ রেখেছিলেন বাদশা। খোঁজ ক'রে একটি অল্প লেখাপড়া জানা ছেলে, সবে রেলের চাকরিতে ঢুকেছে, কাঁদীর কাছে কিছু জমিজমাও আছে—এমনি যতদূর জানা যায় স্বভাব-চরিত্র ভাল—দেখে দাঁড়িয়ে থেকে বিয়ে দিয়েছেন। বাহুল্য করেন নি—কানাইয়ের কথা স্মরণ ক'রেই, তবে গা সাজানো গহনা—হালকা অবশ্যই—ছেলের ঘড়ি, বোতাম, আংটি আর হাজার টাক নগদ, এক বছরের তত্ত্বতাবাশ বাবদ ছেলের বাবার হাতে আরও এক হাজার টাকা ধরে দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়েছেন।

তারপর তিনি আর খবর নেন নি। কিন্তু সে মেয়েটা, শৈল, সে নিয়েছে। দু-তিনবার জামাইকে সঙ্গে ক'রে এনে দেখা ক'রে গেছে। মেয়ে হতেও দেখিয়ে গেছে। প্রতিবারই অনুনয়-বিনয় ক'রে গেছে, 'আপনার এ মেয়ের বাড়ি এক-বার পায়ের ধুলো দেবেন না জ্যাঠামশাই?'

এখনও প্রতি পূজায় চিঠি দেয়, তাতেও ঐ কথা লেখা থাকে। তবে আর কিছু নয়। এ তাবৎ কোন কিছু চায় নি, একদিনের জন্যেও।

শৈলর কাছেই যাবেন নাকি? খবর না দিয়ে হঠাৎ গিয়ে হাজির হবেন একলা? ই আই আরের (নতুন নাম বাদশা ব্যবহার করেন না) গ্র্যাণ্ড কর্ড লাইনে কী একটা ছোট স্টেশনে থাকে ওরা, জামাই এখন স্টেশন মাস্টার সেখানকার। শৈল লিখেছিল পাহাড়ে জায়গা, বেশ স্বাস্থ্যকর। ইঁদারার জল হজমি ওষুধের চেয়েও ভাল।

যত ভাবেন, তত ভাল লাগে কথাটা। চাকর নয়, ওঁর নিজের যে ছোকরা টাইপিস্টটি আছে, তাকে নিয়ে যাবেন। (চাকর নিয়ে গেলে চাল দেখানো হবে) তবে তাকেও রাখবেন না। সেখানে অবস্থা বুঝে হয় ফিরে আসবেন, নয়তো ছেলেটিকে ফেরত পাঠাবেন। একাই থাকবেন কিছুদিন।

সেই মতোই ব্যবস্থা হ'ল। একটি মাত্র স্যুটকেস ও একখানা গায়ে দেবার চাদর নিয়ে একদা নামলেন সে স্টেশনে। জামাই শচীন প্ল্যাটফর্মেই ছিল, সে ওঁকে দেখে এতদিন পরেও চিনতে পারল। প্রথমটা একটু অবাক হয়ে গিছল, যেন চোখকে বিশ্বাসই করতে পারছে না—তারপরই ছুটে গিয়ে পায়ের ধুলো নিল—তারপর হাঁকডাক ক'রে একটা খালাসীকে ডেকে তার হাতে দুজনের

স্যুটকেস, ছোট্ট বেডিংটা চাপিয়ে নিজেই কোয়ার্টারে নিয়ে গেল ওঁদের—টিকিটবাবুকে কণ্ট্রোলের দিকে কানটা রাখতে বলে।

আর শৈল। সে যে কি করবে—কী করলে এই রাজ-অতিথির উপযুক্ত অভ্যর্থনা হয় ভেবেই পায় না। তার মধ্যেই স্বামীকে বাজারে পাঠাল মাংসের খোঁজে, খালাসীকে পাঠাল সামনে মাহাতোদের বাগান থেকে কিছু সব্জির জন্যে। দুধ দোয়াই ছিল। বাদশার পা ধুইয়ে দিয়ে ঘরের মধ্যে বসিয়ে দুধ, লুচি, আলু ভাজা, আগের দিনের ঘরে তৈরী ক্ষীরের নাড়ু এনে সাজিয়ে দিল বাদশা আর তাঁর সঙ্গী পরেশের সামনে একটা ছোট টেবিলে।

বাদশা তো হেসেই খুন। বলেন, 'সত্ত মরণের দোর থেকে ফিরে এলুম, লুচি খাব কি রে। দুধটা বরং খাচ্ছি, মুড়ি, চিঁড়ে কিছু নেই ?

'চিঁড়ে বাজারে পাওয়া যাবে, এই স্টেশন বাজারেই। তবে সে তত সরেশ নয়। মুড়ি আমি নিজে ভাজব আজ বিকেলে জ্যাঠামশাই। আমি জানি, এখানের চালে অত ভাল হবে না। তবু খেতে পারবেন। না হয়ত আমি শিলে গুঁড়িয়ে ক্ষীর দিয়ে মেখে দেব।'

সত্যি সত্যি মেয়েটা আর তার বর যে এমন একটা কাণ্ড বাধিয়ে তুলবে তা বাদশা ভাবেন নি। যেটি সবচেয়ে ভাল ঘর, দক্ষিণ খোলা, সেইটিতে নতুন তোশক পেতে ফরসা ধবধবে বিছানা পাতা হ'ল। হাতের কাছে জলের ব্যবস্থা, ঘরে পরার জন্যে একজোড়া চটি—এইটে আনতে মনে ছিল না বাদশার—জল খাবার একটা নতুন তেপায়া, টুলের ওপর নতুন কুঁজো, জানলায় ফুল। কোনটাই যেন এদের নজর এড়ায় না। পরেশকেও একদিনে ছাড়ল না ওরা, জোর ক'রে ধরে রাখল। দুজনে মিলে জঙ্গলের মধ্যে একটা বাঁধ থেকে মাছ ধরে আনল, এদিক-ওদিক দেখানোর ব্যবস্থা—পরেশ রীতিমতো জমে গেল জামাই শচীনের সঙ্গে। একদিনের জন্যে এসে সাতদিন কাটিয়ে গেল।

বাদশাও রইলেন বেশ কিছুদিন। বনে-জঙ্গলে-গ্রামে ঘেরা নির্জন জায়গা, কাছেও ছোটখাটো পাহাড় বা টিলা আছে, দূরে দিগবলয়ে পাহাড়ের সার। কাছাকাছি ছোট নদীও আছে। বাঙালী কম, এ-দেশী লোক এসে সাধারণ কথাবার্তা বলে চলে যায়। কলকাতার বাঙালীদের মতো দিন-রাত টাকা-পয়সা,

জিনিসের দাম এই সব আলোচনা নিয়ে থাকে না। সম্ভোগের উপকরণ অল্প, মাছ সব দিন মেলে না, সে অভাব মাংস, মুরগী দিয়ে পুষিয়ে দেয় শৈল। ফল, সব্‌জি টাটকা, ঘরে দুটো গরু—শৈলর শখ এটা, নিজে সব কন্না করে, এখন দুটোই অনেক দুধ দিচ্ছে, দই, ক্ষীর, ছানা—ছানার মিষ্টি পায়েস কিছুরই অভাব নেই। কুয়ার জলটা সত্যিই ভাল। যা খান, সব হজম হয়ে যায়। আজকাল একটা বাঁশের লাঠি কাটিয়ে নিয়ে সকাল বিকেল বেড়াচ্ছেনও অনেকখানি ক'রে।

যেন মনে হয় স্বপ্নের মধ্যে দিয়ে দিন কাটছে। ছেলে-বৌ, মেয়ে-জামাই, ব্যবসা, শেয়ার মার্কেট, বাড়িভাড়া, মামলা-মোকদ্দমা সে যেন কোন্ সুদূর অতীতের কথা, বোধ হয় পূর্ব জন্মের। সেখানে ফেরার কথা যদি বা মনে আসে কখনও, যেন ব্যাকুল হয়ে দু'হাতে চিন্তাটাকে ঠেলে সরিয়ে দেন বাদশা।

একটা কথা কোন পক্ষেই কখনও ওঠে না—সে হ'ল টাকা-পয়সার কথা। এই যে এদের বাড়ি এতদিন এমন রাজসমাদরে আছেন, এদের অনেক খরচ হচ্ছে, তা দেখেও কোনদিন বাদশা খরচের কথা তোলেন না। প্রথমটা যেন একটু পরীক্ষা করতেই চেয়েছিলেন, এরা নিজেরা তোলে কিনা, বা এই সমাদর —টাকা না দিলেও—কমে কিনা। মাস দুই কাটার পরও যখন আদর বা আগ্রহের কিছুমাত্র ঘাটতি দেখা গেল না—তখন সে কথা তুলতে আর সাহসে কুলোল না। মনে হ'ল, এদের টাকা দিতে গেলে এদের অপমান করা হবে; এরা দুঃখ পাবে।

শৈলর না হয় কৃতজ্ঞতার কারণ আছে, কিন্তু শচীন যেন পুত্রাধিক আপন হয়ে গেল। মনে হ'ল, দীর্ঘকাল পরে সে এক যথার্থ আপনজন পেয়েছে, কোন রকম আদর-যত্ন ক'রেই তাই যেন মন উঠছে না। আর ছেলে দুটোও কি তেমনি। কোথা থেকে খুঁজে খুঁজে কার বাগান থেকে পাকা পেয়ারা নিয়ে আসছে, নরম না হ'লে দাদু খেতে পারবে না বলে, কোথা থেকে একজন নাজনা ডাঁটা নিয়ে আসছে খুঁজে খুঁজে, ভুইকোঁড়, এক বেলা ধরে রোদে পুড়ে দূর ঝরনা থেকে গামছা ছাঁকা দিয়ে চুনো মাছ নিয়ে আসে দাদু বাটিচচ্চড়ি খাবে বলে। বাদশার চোখেও জল এসে যায় এক-একদিন।

তবু যেতেই হবে। চিরদিন এখানে থাকা চলবে না। এদের হয়ত

আপত্তি হবে না—কিন্তু ওঁর নিজেরই বিবেকে লাগে। এরা সাধ্যের অতীত খরচা করছে। এদের ভবিষ্যৎ আছে, ছেলেদের মানুষ করতে হবে। ওঁর নিজেরও বিপুল বিত্ত ছড়িয়ে আছে। এবার গিয়ে গুটোতে হবে। বাড়ি-ঘর যাকে যা দেবার দিয়ে মাত্র হাজার কতক টাকা ভরসা করে দূরে কোথাও গিয়ে থাকবেন, বিশ্বাসী একটি ভৃত্য নিয়ে। তাকে যা দেবার আগেই দিয়ে দেবেন। যা ব্যাঙ্কে থাকবে তারই সুদে দুটো মানুষ কোনমতে খেয়ে-পরে থাকবেন। আড়ম্বর আর বিলাসে ওঁর অরুচি ধরে গেছে, ঐশ্বর্য এবং স্বার্থকতাতেও।

যাওয়ার প্রস্তাবেই মহা গণ্ডগোল বাধিয়ে দিল শৈল। শচীন আর ছেলেরাও তাতে যোগ দিল ক্রমশ। এখন যাওয়া হতেই পারে না, অসম্ভব। এই চেপে শীত পড়ার সময়—এখনই তো শরীর ভাল হবে। জ্যাঠামশাই তো ব্যবসাপত্রের ব্যবস্থা ক'রেই এসেছেন। বলছেন, রোজগারে আর কোন রুচি নেই, তবে এত তাড়া কিসের। এখানে কি অসুবিধে হচ্ছে, একটু বলুনই না। ছোট ছেলেটা বলল, 'ইস্ গেলেই হল! পা ভেঙে দোব না!'

সুতরাং আরও এক মাস আটকে গেলেন।

তবে আর যে থাকবেন না, কোনমতেই না, সে নোটিশও দিয়ে রাখলেন। মাস কাটার মুখে শৈল অবুঝের মতো কান্নাকাটি শুরু ক'রে দিল।

কিন্তু এবার আর কোন কথা শুনলেন না বাদশা। প্রচণ্ড ধমক দিলেন। শেষে ভয় দেখালেন যে, এমনধারা করলে উনি আর জীবনে ওদের মুখ দেখবেন না, আর কখনও আসবেন না।

তাতেই কিছুটা কাজ হ'ল। ফেরার আগের দিন বিকেলে আর বেড়াতে বেরোলেন না বাদশা, ওদের ডেকে নিজের ঘরে বসালেন। ঝি 'বর্তন মলে' দিয়ে গেছে, ছেলেরা গেছে ইস্কুলে খেলতে। বাড়িতে কেউ নেই, হঠাৎ কেউ এসে পড়বে সে সময়ও এটা নয়। সে আসে সন্ধ্যার পর। বাইরের দিকের দরজা বন্ধ।

শৈল আর শচীনকে নিজের দু'পাশে চৌকিতে বসিয়ে দু'জনের পিঠে হাত দিয়ে বললেন, 'মা শৈল, বাবা শচীন, তোমাদের কাছে যে শান্তি আর সুখ পেয়েছি, এতখানি জীবনে তা আর কোথাও পাই নি। তবু চলে যাচ্ছি এই

জন্যে, এই সম্পর্কটা যেন না নষ্ট হয়। মরবার সময় যদি খবর পাস তোরা ছুটে যাস, কিংবা আমিই যদি পারি এখানে এসে মরব। তোদের কিছু খরচ দেবার কথা কখনও তুলি নি—তোদের খরচ দিতে চাইলে তোদের সেবা-যত্নের অপমান করা হ'ত। শোন্, টাকা আমি সঙ্গে এনেছিলুম, নগদ তিন হাজার টাকা। তার এক পয়সাও খরচ হয় নি। যদি কোন দরকার থাকে তো বল্ এখনই দিচ্ছি। শচীন জমি কিনবে বলেছিল আপিস থেকে ধার নিয়ে। সে সব টাকা দিতে পারি। সে তোদের ইচ্ছা, আমি কিছু বলব না। আমার এদাস্তে কেমন যেন মনে হচ্ছে টাকায় বড় অশান্তি।'

তারপর একটু থেমে বললেন, 'আর ঐ স্যুটকেসের মধ্যে পুঁটুলি বাঁধা আছে তোর জেঠিমার কিছু গহনা। সব আনি নি। কিছু আমার বিশ্বাসী পুরনো কর্মচারীদের দিয়ে দিয়েছি আগেই। তবু যা আছে একশো ভরির কম নয়, বরং বেশিই হবে। এখনকার হিসেবে প্রায় ২ লাখ টাকা দাম সোনারই। তোর জন্যই এনেছিলুম মা শৈল। ভেবেছিলুম, যদি ভাল লাগে তোকেই দিয়ে যাবো। ত্যাখ্, একথা কাউকে বলব না, কেউ জানবে না। আমি একটা নিজে হাতে চিঠি লিখে যাবো যে, এ চোরাই মাল নয়, আমি স্বেচ্ছায় সজ্ঞানে দিয়েছি। কিন্তু আমি জোর করব না, পীড়াপীড়ি করব না। ত্যাখ্, কী করবি?'

শৈল একবার স্বামীর মুখের দিকে চাইল, দেখল তার কপালে ঘাম জমে উঠেছে এই শীতেও। সে আর দ্বিধা করল না। বলল, 'না, জ্যাঠামশাই, ও থাক। এ আমরা বেশ আছি, সুখে না হোক, শান্তিতে আছি। টাকায় বড় বিষ, সাপের বিষের চেয়েও সাংঘাতিক। কখনও কখনও কাজে লাগে, তবে সে তো সাপের বিষেও ওষুধ হয় শুনেছি। ও থাক। আমরা আপনার সেবা করতে পেরে ধন্য হয়েছি, আমার এ সংসার সে তো আপনারই দান—সে সেবার দাম নাই বা নিলুম।'

'সাবাস বেটি। সাবাস।' উনি পিঠ চাপড়ে দিলেন বারকতক শৈলর। তারপর গাঢ় কণ্ঠে বললেন, 'তুই আমার যথার্থ মা, মা দুর্গা। আর তোদের লোভ দেখাবো না। তবে একটা কাজ আমি অলরেডি ক'রে ফেলেছি. আমার অ্যাটর্নীকে লিখে পাঠিয়েছি ছেলে দুটোর নামে পঞ্চাশ হাজার টাকা ব্যাঙ্কে জমা থাকবে। ঈশ্বর না করুন, শচীনের যদি ভাল-মন্দ কিছু হয়, এই টাকার

সুদে ওদের পড়াশুনো চলবে। নয় তো গ্রাজুয়েট হবার পর টাকাটা সুদে-আসলে ওদের হবে—ইচ্ছে করলে কারবার করতে পারবে কিংবা বিলেত-টিলেত যেতে ইচ্ছে করলে যাবে। এতে আর 'না' বলিস না মা, এ তো তোদের দিচ্ছি না। তবে এখন এসব কথা ওদের জানাস না, বিগড়ে যাবে।'

পরের দিন সকালের ট্রেনে একটা ফার্স্ট' ক্লাস কামরায় তুলে দিয়ে ওরা কাঁদতে কাঁদতে ফিরে এল। শচীন শুধু বলল, 'আফটার অল, তুমি ভালই করেছ, আমি একটু লোভে পড়ে গিয়েছিলুম—তুমি সে দুর্বলতা থেকে বাঁচিয়েছ।'

শৈল শুধু ওর হাতটার ওপর একটু চাপ দিল।

এই স্টেশন ছাড়ার পরই একটা ছোট নদী পড়ে। খোলা ব্রীজ। বাদশা জানতেন, প্রস্তুত হয়েই ছিলেন। গাড়ি ব্রীজে উঠতেই উনি কাঁধঝোলাটা থেকে পুঁটুলিটা বার করে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন নদীর জলে।

আর একটি মাত্র আরোহী ছিল গাড়িতে, অপেক্ষাকৃত অল্পবয়সী—সে আর কৌতূহল চেপে রাখতে পারল না। প্রশ্ন করল, 'কী ফেললেন দাদু?'

'কিছু না। তোমার দিদিমার কিছু স্মৃতি এতদিন বয়েছি, এবার জলে দেওয়াই উচিত—মরার সময় তো হ'ল।'

রক্তকমল

সিপাহীবিদ্রোহের আগুন যখন ভারতবর্ষের পূর্ব থেকে পশ্চিমে ছড়িয়ে পড়েছে তখনও শ্রীনানা ধুন্ধুপন্থ বা নানা সাহেব তাঁর মন স্থির করতে পারেন নি। প্রথম আগুন জ্বলেছে বাংলা দেশে—মার্চ মাসে। তারপর এপ্রিল গেছে, মে গেছে—তখনও নানা সাহেব ইংরেজদের বন্ধু সেজেই বসে আছেন। ১০ই মে মীরাটে, ১১ই মে দিল্লীতে আগুন জ্বলল—২১শে থেকে ২৩শে মে'র ভেতর বুলন্দ শহর, এটোয়া, মৈনপুরী সর্বত্র সে আগুন লেলিহান শিখা মেলে ছড়িয়ে পড়ল—তবু অশীতিপর বৃদ্ধ সেনাপতি হুইলার ভাবছেন যে কানপুরে বিশেষ কিছু হবে না। আর হ'লেও—নানা সাহেব আছেন, ভয় কি! এতই নিশ্চিন্ত

ছিলেন তিনি যে ওরা জুন নিজের কাছ থেকে ৫০টি সৈন্য এবং দুজন সেনানী পাঠিয়ে দিলেন লক্ষ্ণৌতে, লরেন্সকে সাহায্য করার জন্য।

হুইলার সাহেবের এত বড় ভুল করার কোন কারণ ছিল না। কারণ তার দুদিন আগেই পয়লা তারিখে গঙ্গার বুকের ওপর এক নৌকোতে যে বৈঠক বসে তাতে নানা সাহেব বিদ্রোহীদের কথা দেন যে তিনি তাদের দলে যোগ দেবেন, তাদের অধিনায়কত্ব করবেন—এবং তার বদলে তারা তাঁকে পেশোয়া ব'লে স্বীকার করবে। এইটেই স্বাভাবিক—কারণ তাঁর প্রাপ্য গদি যে ইংরেজরা বলতে গেলে গায়ের জোরে কেড়ে নিয়েছে, নানা সাহেব তা ভুলবেন কি ক'রে? বাজীরাও গদীচ্যুত হয়েও আট লাখ টাকা ক'রে বার্ষিক ভাতা পেতেন সেটাও নানার অদৃষ্টে জোটে নি। সেজন্যে তিনি আজিমুল্লা খাঁকে বিলাত পর্যন্ত পাঠিয়েছিলেন, সেখানে নালিশ করতে, এবং সে লোকটি ওঁর সত্তর লাখ টাকা খরচা ক'রে 'শুধু-হাতে' ফিরে এসেছে। এসব কোন কথাই নানা সাহেবের বিস্মৃত হওয়া সম্ভব নয়। সুতরাং তাঁর বাইরের মিষ্ট আচরণে ভোলা ইংরেজের কোনমতেই উচিত হয় নি। অবশ্য ওঁদের সে ভুল ভাঙল শীগগিরই।

নানা প্রকাশ্যেই এবার বিদ্রোহীদের দিকে যোগ দিলেন। তাও প্রথমটা মনে করা গিয়েছিল বিপদের হাওয়াটা পশ্চিমমুখোই যাবে—কারণ সিপাহীরা সকলেই দিল্লীর পথ ধরেছিল, নানাও হয়ত সেদিকেই যেতেন। কিন্তু আজিমুল্লা খাঁ প্রভৃতি সবাই বোঝালেন যে দিল্লীতে বাহাদুর শা সম্রাট, সেখানে নানা সাহেবের স্থান কোথায়? তাঁবেদার সেনাপতি মাত্র। তার চেয়ে এখানেই তিনি রাজা হয়ে বসুন—স্বাধীন পেশোয়ারূপে পেশোয়া বংশের সমস্ত গৌরব আবার ফিরিয়ে আনতে পারবেন। কথাটা নানা সাহেবের মনে লাগল। তিনি সিপাহী-দের অনেক বুঝিয়ে,—শেষ পর্যন্ত সবাইকে একটা ক'রে সোনার বালা গড়িয়ে দেবেন প্রতিশ্রুতি দিয়ে, কানপুরে ফিরে এলেন—এবং ৬ই জুন রাত্রেই হুইলারের ব্যূহ লক্ষ্য ক'রে প্রথম গোলা ছুঁড়লেন। ৭ই থেকে শুরু হ'ল রীতি-মত আক্রমণ।

হুইলার সাহেব কি একটা বোকামি করেছিলেন! তিনি ইংরেজদের কোষাগার এবং অস্ত্রাগার—তোষাখানা আর তোপখানা সবকিছু ছেড়ে এক ফাঁকা মাঠে এসে মাত্র দু'হাত উঁচু মাটির দেওয়াল তুলে এক অদ্ভুত গড় বানিয়ে-

ছিলেন। ঐ দুটি অত্যন্ত মূল্যবান গুদাম রক্ষকগণের ভয়ে তুলে দিয়েছিলেন পরম মিত্র নানা-সাহেবের ওপর। ফলে কয়েক লক্ষ টাকা এবং গোলা বারুদ সমস্ত গিয়ে পড়ল সিপাহীদের হাতে। এদের না আছে তেমন অস্ত্র, না আছে খাদ্য, না আছে পিছন দিয়ে পালাবার কোন পথ। একটি মাত্র কুয়া—তাও ফাঁকা জায়গায়। জল আনতে গেলেই শত্রুর কামান থেকে 'পুষ্প বৃষ্টি' হয়।

তবু হুইলার হতাশ হন নি। প্রতিদিন অসংখ্য লোক মরতে লাগল, নারী শিশু কেউ বাদ গেল না। খাদ্য আসতে লাগল ফুরিয়ে; একটু পরিষ্কার জল মেলে না—তবুও হার মানবেন না তাঁরা, এই প্রতিজ্ঞা।

প্রথমটা নানা ভেবেছিলেন এই দু'শো আড়াই শো লোক তাঁদের তোপের সামনে ফুঁয়ে উড়ে যাবে। কিন্তু অত সহজে কাম ফতে হ'ল না। তখন বিপদ বুঝে তিনি অন্য চাল চাললেন। লোক দিয়ে বলে পাঠালেন যে টাকাকড়ি ও অস্ত্রশস্ত্র যদি ওঁরা সিপাহীদের হাতে সঁপে দিতে রাজী থাকেন এবং আত্মসমর্পণ করেন তাহ'লে ওঁদের নির্বিঘ্নে এলাহাবাদ পর্যন্ত পৌঁছবার ব্যবস্থা ক'রে দেবেন।

ইংরজেদের তখন সঙ্গীন অবস্থা। ওঁর সেই শর্তই মেনে নিলেন। ২৭শে জুন উভয়পক্ষের কামানই নীরব হ'ল। কথা হ'ল ২৭শে ভোরবেলা ইংরেজরা এই অবরোধ ত্যাগ ক'রে নৌকোয় চাপবেন। কতকগুলি নৌকোও ভাড়া করা হ'ল, ওঁদের দেখিয়ে দেখিয়ে তাতে কিছু কিছু রসদও ভরা হ'ল। কতকগুলো নৌকোয় কোন আচ্ছাদন ছিল না—তাতেও খড় এবং ঘাস দিয়ে অস্থায়ী চালা তোলা শুরু হয়ে গেল। তিনজন ইংরেজ সেনানী গিয়ে নিজে চোখে এসব দেখে এলেন। ওধারে নানা সাহেব তাঁর তিনজন বিশস্ত অনুচর এঁদের এখানে পাঠিয়ে দিলেন, তারা রইল জামিন হয়ে—নানা সাহেবের সদাচরণের। তার বদলে হুইলার সাহেব সেই রাত্রেই তাঁর অবশিষ্ট কামান এবং টাকাকড়ি যা ছিল সব নানা সাহেবের লোকের হাতে তুলে দিয়ে নিশ্চিন্ত।

এ পর্যন্ত বেশ সহজেই কাটল।

কিন্তু গোল বাধল যখন শেষ রাত্রিতে কর্তাদের আসল মতলবটা সিপাহীদের কাছে জানানো হ'ল।

কথা ছিল কানপুরের সতীচৌরা ঘাট থেকে ইংরেজরা নৌকোয় উঠবেন। এই ঘাটটিই কাছে পড়ে। কিন্তু সে সুবিধা নানা সাহেব দেখেন নি। তিনি দেখেছিলেন যে এ ঘাটের দুদিকে উঁচু পাড় আছে আর সে পাড়ে আছে অসংখ্য ঝোপ-ঝাড়। ঘাটের ওপরে এক শিবের মন্দিরও আছে, সে মন্দিরেও লুকিয়ে থাকা যায়। নানা হুকুম দিলেন দু'দল সিপাহী গিয়ে এইসব ঝোপে-ঝাড়ে লুকিয়ে থাকবে, দু-একটা হালকা কামানও বসানো হ'ল জায়গা বুঝে। এছাড়া নদীর ওপারে বহুদূর পর্যন্ত—যেখানে যেখানে হতভাগ্য অসহায়ের দল আশ্রয়ের জন্য যেতে পারে সর্বত্রই—সিপাহী এবং কামান সাজানো হ'ল।

সিপাহীদের কিন্তু যখন জানানো হ'ল যে কাল সাহেবরা নৌকোয় চাপলেই তাদের ইঙ্গিত করা হবে এবং ইঙ্গিত মাত্র তারা কামান এবং বন্দুক চালাবে ঐসব অসহায় শরণাগত পলাতকদের ওপর—তখন বেশ একদল সিপাহী, বিশেষত ব্রাহ্মণরা বেঁকে বসল।

তারা বললে, 'এ যে বিশ্বাসঘাতকতা। এর ভেতর আমরা নেই!'

প্রথমটা কর্তারা খুব হম্বিতম্বি করলেন, ভয় দেখালেন—কিন্তু তারা অটল। সাহেবদের কথা দেওয়া হয়েছে যে নিরাপদে নৌকোয় চড়ে এলাহাবাদ পর্যন্ত যেতে দেওয়া হবে—সে কথা রাখতেই হবে। তারা সিপাহী, লড়াই করতেই শিখেছে—খুন করতে নয়।

তখন নানা সাহেব নিজে এলেন।

বুঝিয়ে বললেন, যে শত্রুর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করায় দোষ নেই। তা ছাড়া ওরা বিধর্মী, ওদের সম্বন্ধে আমাদের ধর্মের শাস্ত্রবাক্য প্রয়োগ করারও কোন কারণ নেই। 'মারি অরি পারি যে কৌশলে!'—এই কথাটাই সর্বদা স্মরণ রাখা দরকার।

তার পরও যখন দেখলেন যে, সিপাহীরা যথেষ্ট গলল না, তখন মোক্ষম অস্ত্রটি ছাড়লেন, নিজের গলার পৈতে দেখিয়ে বললেন, 'আমি ব্রাহ্মণ এবং রাজা, আমি তোমাদের বলছি এতে কোন পাপ হবে না, যদি হয় তো সে পাপের ভার আমি বহন করব। তোমাদের ভয় কি?'

এবার সিপাহীরা নিশ্চিন্ত হ'ল।

ইতিহাস বলছে যে, এর পর আর কোন সিপাহী প্রতিবাদ করে নি। পরের দিন প্রত্যুষে নিরস্ত্র, আহত, শরণার্থীদের ওপর নির্মমভাবে গুলিবর্ষণ করেছে তারা, আগুন ছুঁড়ে ছুঁড়ে নৌকো জ্বালিয়ে দিয়েছে—এমন কি যারা সাঁতরে পার হয়ে যাচ্ছিল তাদেরও পিছু পিছু গিয়ে গুলি চালিয়েছে, জলের ভেতরেই।

অতগুলি লোকের ভেতর মাত্র তিন-চারজন ইংরেজ শেষ পর্যন্ত বাঁচতে পেরেছিল।

কিন্তু এ কথা কি ঠিক বিশ্বাস হয়?

ভারতীয়—যারা রাজা বা নবাব নয়, যাদের ব্যক্তিগত স্বার্থ সামান্যই—তাদের মধ্যে কি এমন কেউ ছিল না যে প্রতিবাদ করে এই নিষ্ঠুরতার, শেষ পর্যন্ত বেঁকে দাঁড়ায়?

আমার তো এ কথা বিশ্বাস হয় না।

আমি তো স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি একজন ব্রাহ্মণ—দীর্ঘদেহ বলিষ্ঠ সিপাহী একজন—মানল না ব্রাহ্মণরাজার এ অনুশাসন। সে প্রথমটা বোঝাবার চেষ্টা করল তার সহকর্মীদের—তারপর একসময় হতাশ হয়ে তার হাতের অস্ত্র নামিয়ে রেখে নিঃশব্দে বেরিয়ে এল দলের মধ্য থেকে এবং নিশীথ রাত্রির অন্ধকারে বাইরের জনারণ্যে মিশে গেল।

তার নাম?

তার নাম ধরা যাক্—দেবকীনন্দন।

দেবকীনন্দন অতিকষ্টে সিপাহী ও নাগরিকদের ভীড় থেকে বেরিয়ে এল। অপেক্ষাকৃত নির্জন একটা স্থানে গিয়ে এক শিবমন্দিরের বাঁধানো চত্বরে বসে পড়ল।

আজ তার মন বড় বেশি নাড়া পেয়েছে।

আজ মনে পড়ছে ওর ছেলেবেলার কথা। ওর বাবা গঙ্গানন্দন ছিলেন সাগ্নিক ব্রাহ্মণ, নিত্য হোম-পূজা না ক'রে জল খেতেন না। পৈতের হোমের আগুন নেভেনি কখনও—সেই আগুনেই চিতা জ্বলেছে তাঁর। তিনি কখনও মিছে কথা বলতেন না—শত বিপদে পড়লেও না। ওকে বলতেন, 'বেটা আমাদের এই কলির ব্রাহ্মণদের সবই গেছে—আছে শুধু সত্য। এইটেকে

বজায় রেখো। বাইরের লোকের সঙ্গে তো নয়ই—নিজের মনের সঙ্গেও কখনও কোন প্রতারণা ক'রো না। সে আরও বেশী মিথ্যাচরণ।'

গঙ্গানন্দন পূজাপাঠ আর ক্ষেতি নিয়ে থাকতেন। কিন্তু দেবকীনন্দনের সে জীবন ভাল লাগে নি। সে বাড়ি থেকে চলে এসে ফৌজে যোগ দিয়েছিল।

সেই থেকেই সে সিপাহী।

সত্যনিষ্ঠ এবং নির্ভীক ব'লে চিরকাল সে ইংরেজ অফিসারদের প্রিয়পাত্র ছিল। কোন কোন ইংরেজ পরিবারের সঙ্গেও ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ হয়ে গিয়েছিল এই দীর্ঘ দিনে।

আজ তার চাল্লিশ বছর বয়স। সে ফৌজে ঢুকেছে ষোল বছরে।

দু'যুগ হয়ে গেল সে ইংরেজদের চাকরী করছে।

বিদ্রোহ করেছিল? হ্যাঁ—বিদ্রোহী দলে যোগ দিয়েছিল ঠিকই।

তার কারণও ছিল কিছু কিছু।

প্রথমত ধর্মের কথা। তাকে বোঝানো হয়েছিল যে ইংরেজ কৌশলে তাদের ধর্ম নষ্ট করতে চায়। এই কৌশলের কথাটাতেই ঘৃণা বোধ হয়েছিল তার। দেবকীনন্দন ইংরেজদের শ্রদ্ধা করত—ওরা সহজে মিছে কথা বলে না দেখে। আজ সে শ্রদ্ধা মাটিতে লুটিয়ে পড়ল।

তবু তো ওরা—ওদের দল শেষ পর্যন্ত বিশ্বাসঘাতকতা করে নি।

ওদের ৫৩নং রেজিমেণ্ট শেষ অবধি হুইলার সাহেবের ঐ মাটির গড় ঘিরে রেখেছিল—সেবা দিয়ে, বিশ্বস্ততা দিয়ে। অকস্মাৎ মতিচ্ছন্ন হল হুইলারের—একমাত্র যে সিপাহী দল বিশ্বস্ত ছিল, তাদের ওপরই গুলি চালাবার হুকুম দিলেন। ওরা নিশ্চিন্ত হয়ে তখন রুটি পাকাতে ব্যস্ত, কেউ বা সবে আহারে বসেছে—শুরু হ'ল গুলি।

সেদিন ঘৃণা—হ্যাঁ ঘৃণাই বোধ হয়েছিল দেবকীনন্দনের। এমন বিশ্বাস-ঘাতকতা যারা করতে পারে, তাদের পক্ষে সবই সম্ভব। তারা কৌশলে ধর্ম নেবার চেষ্টা করবে, তাতে আর আশ্চর্য হবার কি আছে!

সেদিন তাই সে অপর সিপাহীদের সঙ্গে যোগ দিয়ে ইংরেজদের কোষাগার লুঠ করতে বা তাদের ওপর গুলি চালাতে দ্বিধা করে নি।

কিন্তু আজ এ কি হচ্ছে?

স্বাধীনতার স্বপ্ন দেবকীনন্দনের ঘুচেছে অনেক দিনই, সে বুঝেছে যে—এইভাবে লুঠতরাজ ক'রে কোন দল কখনও দেশ শাসন শিখতে পারে না। শুধু তো ইংরেজ নয়—সে লুঠের মোহ তাদের দিয়ে নিরীহ স্বদেশবাসীদেরও যে সর্বনাশ করাচ্ছে। তা ছাড়া পরে সে বুঝেছে যে চারিদিকের বিশ্বাস-ঘাতকতায় উদ্‌ভ্রান্ত বৃদ্ধ হুইলার ভুল খবর পেয়েই তাদের ওপর গুলি চালাবার হুকুম দিয়েছিলেন, ইচ্ছা ক'রে অনিষ্ট করেন নি। এ ক'দিন ওরা যে বীরত্ব, যে দুঃসাহসিকতার পরিচয় দিয়েছে তাতে যুদ্ধ-ব্যবসায়ী দেবকীনন্দনের শ্রদ্ধা বেড়েই গেছে। হ্যাঁ—রাজত্ব করার মতো গুণ দিয়েই ভগবান ওদের পাঠিয়েছেন।

সেই লোকদের কাছে শপথ ক'রে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়ে তাদের সঙ্গে এই রকম বিশ্বাসঘাতকতা করা?

না, শুধু সিপাহী কেন—যে কোন জোয়ান, যে হাতিয়ার ধরতে পারে—তার পক্ষেই এ কাজ চরম লজ্জার। হাত থেকে তার আগে হাতিয়ার ফেলে দেওয়া উচিত।

দেবকীনন্দন অনেকক্ষণ পর্যন্ত এইভাবে বসে রইল। তারপর হঠাৎ উঠে পড়ল।

এর কি কোন প্রতিকার করা যায় না?

হ্যাঁ,—করবে সে, অন্তত চেষ্টা করবে। বিশ্বাসঘাতকতার প্রতিকার করবে সে বিশ্বাসঘাতকতা দিয়ে। পাপ? এতে কোন পাপ আছে বলে সে মনে করে না।

দেবকীনন্দনের পরনে তখনও সিপাহীর বেশ। সুতরাং হুইলারের অবরোধে ঢোকবার কোন অসুবিধাই হ'ল না। লক্ষ্য ক'রে দেখল যে জন-দুই এদেশী লোক, খুব সম্ভব কোন সাহেবের প্রাক্তন খানসামা হবে—আমিনুউদ্দীনের খোশামোদ করছে ভেতরে যাবার জন্য। ওকে কেউ কোন প্রশ্নই করলে না। আজ সন্ধির সুযোগ পেয়ে বহু সিপাহীই ভেতরে এসেছে, খোঁজ খবর নিচ্ছে—পুরানো মনিবদের। স্বয়ং আজিমুল্লা এখানে রয়েছেন—নানার বিশ্বস্ততার প্রত্যক্ষ প্রতিভূ।

তখন ভোরের বেশী দেরি নেই। মুক্তির প্রত্যাশায় অধীর হয়ে উঠেছে

সকলে। গোছগাছ শুরু হয়ে গেছে।

একজন অপরিচিত সাহেবকে সামনে পাওয়া গেল। তাঁর কাছেই খোঁজ চাইলে দেবকীনন্দন। কর্ণেল উইলিয়াম্‌স্‌? কে জানে তিনি কোথায়—তাঁর মেমসাহেব ঐ যে, ঐ সামনের ঘরটাতে আছেন।

ঘরে ঢুকতে গিয়েও খানিক ইতস্ততঃ করলে দেবকীনন্দন। তারপর মনে জোর এনে একরকম মরীয়া হয়েই ঢুকে পড়ল।

'মেমসাহেব চিনতে পারেন?'

'কে—দেওকীনন্দন না? এসো এসো।'

মিসেস্‌ উলিয়াম্‌স্‌ হাসিমুখে এগিয়ে এলেন, 'কেমন আছ দেওকীনন্দন?'

এঁর কাছে বিশেষ ক'রে আসার কারণ আছে বৈ কি।

দেবকীনন্দন তখন এঁদের দলেই অর্থাৎ ৫৬নং রেজিমেণ্টে ছিল। একদিন দেশ থেকে খবর এল যে ওর মেয়ে ভীষণভাবে পুড়ে গেছে—বাঁচার কোন আশাই নেই। গাঁয়ে ছিল একজন বৈদ্য—তাঁর হাতুড়ে চিকিৎসায় আরও খারাপ হয়েছে। বড় মেয়ে, বাপ-মার প্রথম সন্তান। দেবকীনন্দন রোকা পেয়ে উদ্‌ভ্রান্তের মতো ব্যারাকের মাঠে ঘুরে বেড়াচ্ছিল, দূর থেকে দেখতে পেয়ে এই উইলিয়াম্‌স্‌ সাহেবই তাকে ডেকে পাঠান।

'কী হয়েছে বলো তো দেওকীনন্দন? চোখ ছলছল করছে তোমার, পাগলের মতো হাবভাব? ব্যাপার কি?'

উত্তরে দেবকীনন্দন কেঁদে ফেলেছিল।

ওর মুখ থেকে সব শুনে উইলিয়াম্‌স্‌ ব্যারাকের সাহেব ডাক্তারকে খুঁজে বার করেন। তাঁকে ব্যাপারটা বুঝিয়ে ব'লে অনুরোধ করেন দেবকীনন্দনের গ্রামে যেতে একবার। উইলিয়াম্‌স্‌-এর অনুরোধ এড়াতে না পেরে সে সাহেব ডাক্তার ঘোড়ায় চেপে কাঠফাটা রোদের মধ্যে ষোল ক্রোশ রাস্তা পেরিয়ে দেবকীনন্দনের গাঁয়ে গিয়েছিলেন। তাই সে যাত্রা ওর মেয়ে বেঁচেছিল—নইলে বাঁচবার কোন আশাই ছিল না।

সে কৃতজ্ঞতা দেবকীনন্দন আজও ভোলে নি।

কিন্তু এখন আর কুশল প্রশ্নের সময় নেই। সে মিসেস্‌ উইলিয়াম্‌স্‌-এর কথার জবাব না দিয়ে এদিক ওদিক চেয়ে গলা নামিয়ে বললে, 'মেমসাহেব,

দোহাই আপনার, হুইলার সাহেবকে বুঝিয়ে বলুন যেন উনি নানা সাহেবের ফাঁদে পা না দেন। নানা সাহেবের মতলব ভাল নয়—ঝোপ-ঝাড়ে উনি কামান সাজাচ্ছেন, কাল আপনারা যে মুহূর্তে নৌকোয় পা দেবেন সেই মুহূর্তে শুরু হবে গোলা আর গুলি। এ কাজ করবেন না মেমসাহেব।'

মিসেস্ উইলিয়াম্স্ স্থিরভাবে বসে রইলেন খানিকক্ষণ, তারপর বললেন, 'এখন আর কোন উপায় নেই দেওকীনন্দন। আমাদের নতুন কামানগুলো, টাকাকড়ি সব নানা সাহেবের লোকের হাতে দেওয়া হয়ে গেছে। এখন এখানে থাকা মানে নিশ্চিত মৃত্যু। তা ছাড়া আমরা এমনিও আর পারছিলাম না। এভাবে আর কিছুদিন চললে হয়ত আমাদের আত্মহত্যাই করতে হ'ত। কিন্তু তুমি যে আমাদের সত্যিকার উপকার করতে এসেছিলে তা আমরা ভুলব না কখনও—তুমি যা বলছ তাই যদি সত্যি হয় তো মৃত্যুর সময় এই আশ্বাস নিয়েই চোখ বুজব যে পৃথিবীতে সবাই বিশ্বাসঘাতক নয়—এখনও এখানে মানুষ আছে।'

দেবকীনন্দন ঘাড় হেঁট ক'রে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল বহুক্ষণ। তারপর একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে আবারও মিসেস্ উইলিয়াম্স্‌কে একটা সেলাম জানাল। সে হয়ত তারপর তেমনি নিঃশব্দেই বেরিয়ে আসত যদি না মিসেস উইলিয়াম্স্ ওকে একটু দাঁড়াতে বলতেন।

'একটু দাঁড়াও দেওকী—এক মিনিট।'

দেবকীনন্দন ঘুরে দাঁড়াল, ওঁর মুখের দিকে উৎসুক দৃষ্টিতে চেয়েও রইল কিন্তু কোন প্রশ্ন করল না।

মিসেস্ উইলিয়াম্স্ও ওকে আর কোন কথা না ব'লে ডেস্কের কাছে গিয়ে একটা কাগজে খস্‌খস্ ক'রে দু'লাইন কি লিখলেন—তারপর কাগজটা এনে ওর হাতে দিয়ে বললেন, 'দেওকানন্দন, আমরা মরব এটা হয়ত ঠিকই—কিন্তু ইংরেজের হাত থেকে তোমার নানাসাহেব অব্যাহতি পাবে না। এ বিশ্বাস-ঘাতকাতার দাম তাকে বা তার দলের লোককে শোধ করতেই হবে। সে দিনটা তোমাদের বড় দুর্দিন। তেমন দিন যদি আসে এবং তুমি কখনও কোন ইংরেজের হাতে বিপদে পড়ো তো—এই কাগজখানা দেখিও, অবশ্য ছাড়া পাবে। ভাল ক'রে রেখে দাও এখানা। বেঁচে থাকলে তোমার ঋণ শোধ

করবার চেষ্টা করতাম কিন্তু সে আশা তো প্রায় নেই-ই।'

ম্লান একটু হাসলেন মিসেস্ উইলিয়াম্‌স্।

দেবকীনন্দন ওখান থেকে বেরিয়ে এল।

দু-একজন পরিচিত সিপাহীর সঙ্গে দেখা হ'ল, তারা দু-একটি রসিকতা করারও চেষ্টা করলে দেবকীনন্দনের তরফ থেকে কোন জবাব এল না। সে যেন কেমন অন্যমনস্ক, কা যেন গভীর চিন্তায় মগ্ন।

তেমনি আপন মনে ভাবতে ভাবতেই হুইলার সাহেবের গড় থেকে বেরিয়ে এল সে। গড়ই বটে। মনে আছে এটা যখন তৈরী হয় আজিমুল্লা ঠাট্টা ক'রে বলেছিল—'এটার কা নাম দিচ্ছ সাহেব—ন-উমীদ গড়, না নাচার গড়?' যে সাহেবকে বলা হয়েছিল তিনি বলেছিলেন,—'না—বিজয়গড়। ফতেগড়ও বলতে পারো।' হায় রে! গড়ের দেওয়াল পার হবার সময়, কথাটা মনে পড়ে এই দুঃখের মধ্যেও দেবকীনন্দনের মুখে ম্লান একটা হাসি ফুটে উঠল। আজিমুল্লার কথাটাই ঠিক হ'ল তাহ'লে।

হুইলার সাহেবের নাচার গড় থেকে বেরিয়ে রাস্তায় পড়েও দেবকীনন্দন নিশ্চিন্ত হতে পারল না। পথে অত্যধিক ভীড়। কৌতূহলী জনতা—সাহেব মেমদের পরিণতি দেখবার জন্য উৎসুক। তাদের কানে হয়ত তখনও আসল খবর পৌঁছয় নি, তারা শুধু জানে যে সাহেবরা এইবার পালাচ্ছে। তবু যারা এত দীর্ঘকাল এতগুলো লোকের সঙ্গে লড়াই করেছে না খেয়ে না ঘুমিয়ে—তারা না জানি কী ধরনের মানুষ। তাদের একবার কাছাকাছি থেকে দেখা দরকার।

এদের সাহচর্য, ভেসে-আসা এদের কথাবার্তার টুকরো—কিছুই ভাল লাগল না দেবকীর। শেষে কোনমতে ভীড় ঠেলে অপেক্ষাকৃত জনবিরল একটা পথে এসে পড়ল। তারপর সেই পথ ধরেই আর একটু এগিয়ে গিয়ে পৌঁছল গঙ্গার ধারে। এখানটা আরও নির্জন। এদিক দিয়ে বিশেষ লোকজন আনাগোনা করে না—দেবকীনন্দন শান্তিতে একটা নিমগাছের গোড়ায় ঠেস দিয়ে মাটির ওপরই বসে পড়ল।

অন্ধকার তামসী রাত্রি। এপার ওপার কিছুই বোঝা যায় না। এমন কি গঙ্গাও বোঝা যেত না—যদি না চলতি দু-একটা নৌকোর আলো দেখা যেত।

সেই আলো নৌকোর গতিবেগে আন্দোলিত ঈষৎ-তরঙ্গিত গঙ্গার জলে প্রতিবিম্ব জাগিয়েছে—তাইতে বোঝা যাচ্ছে শুধু যে সবটাই অন্ধকার সীমাহীন শূন্যতা নয়—দেবকীনন্দন যেখানে বসে আছে তার নিচে দিয়ে বয়ে চলেছেন পুণ্যসলিলা, সকল কলুষনিবারিণী, শান্তিদায়িনী জাহ্নবী…

এ জীবন শেষ করার এক অপূর্ব সুযোগ।

লোভ? লোভ হয় বৈ কি!

দেবকীনন্দনেরও লোভ জাগল বহুবার। কিন্তু সে লোভ সে শেষ পর্যন্ত সম্বরণ করল। এতে হয়তো নিজের মুক্তি পাওয়া যায়। কিন্তু সে তো কেবল নিজেই পালাতে চায় না—সে চায় তার সহকর্মীদের হয়ে, তার জাতির হয়ে প্রায়শ্চিত্ত করতে। এখন এভাবে মরলে তার চলবে না।

দেবকীনন্দন সেইখানেই স্থিরভাবে বসে রইল।

ক্রমে ভোর হ'ল। দূরে সতীচৌরা ঘাটের কর্মব্যস্ততা এখান থেকেই বোঝা যাচ্ছে। সারারাতই সেখানে কাজ হয়েছে, তার আভাস পেয়েছে দেবকীনন্দন। এখন আরও বেশি। কতকগুলো নৌকোতে ছই ছিল না—ঘাস পাতা দিয়ে ছই ক'রে দেওয়া হচ্ছে, পাছে মেমসাহেবদের রোদে কষ্ট হয়। তোলা হচ্ছে জলের কলসী ও আটার বস্তা, চিনি, মাখন আরও কত কি!

অর্থাৎ ছলনার আয়োজনে যেন কোথাও কোন খুঁত না থাকে। কলে পড়বার আগের মুহূর্তেও মূষিক না বুঝতে পারে যে ওটা জাঁতিকল—এখনই তার পা চিরকালের মতো লৌহ-কঠিন নির্মম দাঁতে আটকে পড়বে।

বাহবা আজিমুল্লা খাঁ।

এসব তুচ্ছাতিতুচ্ছ তথ্যের দিকে আজিমুল্লা ছাড়া কারুর সাধ্য নেই যে নজর রাখে!

দেবকীনন্দনের মুখে একটা বিচিত্র ম্লান হাসি ফুটে উঠল।

এই বুদ্ধি যদি তুমি কাজের মতো কাজে খরচ করতে! তাহ'লে তোমার সত্যিকার উন্নতি হ'ত!…

একটু একটু ক'রে বেলা বাড়তে লাগল।

সতীচৌরা ঘাটে ভীড় জমছে ক্রমশঃ।

সাহেব মেমরা এসে পৌঁছতে লাগলেন।

কেউ বা ডুলিতে, কেউ বা পালকীতে, কেউ কেউ বয়েল গাড়িতে।

সুস্থ সবল খুব কম লোকই আছে, যারা আছে তারা হেঁটে আসছে।

অতদূর থেকে মুখভাব ঠাওর হয় না—তবে ওদের কর্মব্যস্ততা দেখে বুঝতে পারে দেবকীনন্দন যে ওদের বেশির ভাগ লোকই নিশ্চিন্ত, মুক্তির আনন্দে মশগুল। যেন কয়েক ঘণ্টা পরে ওরা সত্যিই পাবে মুক্তি, পাবে নিরাপদ জীবনযাত্রার সুযোগ-সুবিধা।...

তারপর—

তারপর শুরু হ'ল আসল নাটকটা।

দেবকীনন্দন শিউরে উঠে চোখ বুজলে, দু'হাতে ঢাকলে কান। তবু তার মধ্যে দিয়েই মুহুর্মুহুঃ গুলির শব্দ এবং অসহায় নরনারীর আর্তনাদ কানে আসতে লাগল। তার সঙ্গে কিছু কিছু পৈশাচিক উল্লাসের বিকট হুহুঙ্কার।

চোখের পাতা বোজা আছে। কিন্তু জ্বলন্ত নৌকোর তাপ মুখে এসে লাগতে বাধা কি? তাতেই তো বোঝা যায় কী হচ্ছে সেখানে।

হে গুরু! হে দয়াল! হে শিবশঙ্কর!

এ পাপের না জানি কী ভয়ঙ্কর মূল্য দিতে হবে—দেশকে ও জাতিকে।

সারা দিনই একভাবে বসে রইল দেবকীনন্দন, তারপর সন্ধ্যার কিছু আগে গিয়ে নামল গঙ্গায়।

ততক্ষণে কোলাহল ও আর্তনাদ দুই-ই স্তিমিত হয়ে এসেছে।

আবার গঙ্গার বুকে নেমে আসছে অন্ধকার—শান্তির ছায়া।

অনেকক্ষণ ধরে স্নান করল দেবকীনন্দন।

জলে দাঁড়িয়ে ইষ্টদেবকে স্মরণ করবার চেষ্টা করল—কিন্তু সে ছবি মনে জাগল না। গায়ত্রী পড়তে গেল, তাও যেন ভুলে গেছে আজ।

শুধু চোখের জলে সব ত্রুটি ধুয়ে গেল ওর।

মাথায় ঠাণ্ডা জল পড়তে, চোখের শুকতাও কেটেছে।

দুই চোখের কোল বেয়ে উষ্ণ জল গড়িয়ে পড়ছে শীতল আর্দ্র কপোলে।

মা গঙ্গা—এ কী করলি মা!

তোর জলেই এই এতবড় অনাচার ঘটল?...

অনেক, অনেকক্ষণ পরে দেবকীনন্দন উঠে এল। তারপর এগিয়ে চলল—

ব্যারাকের দিকে নয়, এলাহাবাদ যাবার পাকা সড়কটার দিকে—

কাশী ও এলাহাবাদ কঠোর, নিষ্ঠুর হাতে শাসন ক'রে বিজয়ী ইংরেজ সৈন্য আসছে কানপুরের দিকে। চোখে তাদের জিঘাংসা, ওষ্ঠের কঠিন ভঙ্গীতে প্রতিহিংসা। কানপুরের কাহিনী ইতিমধ্যেই কানে পৌঁছেছে বৈ কি!

তাদের পথের দু'ধারে বহুদূর অবধি লোকালয় শূন্য করে ভারতবাসীরা পালিয়ে গেছে! ইংরেজের সামনে সেদিন কেউ পড়লে রক্ষা পাওয়া মুশকিল।

এমন সময় ও কি?

একজন সিপাহী আসছে না?

শিকারের দিকে ধাবমান ক্ষুধিত নেকড়ের মতোই ছুটে এগিয়ে এল জনা-আষ্টেক ইংরেজ।

'তুমি সিপাহী?'

'হ্যাঁ।'

'তুমি নানা সাহেবের লোক?'

'হ্যাঁ।'

'কানপুরের খবর কি? সত্যি বলো, নইলে—'

'নইলে কি তা আমি জানি সাহেব। কিন্তু সত্যিই বলছি। বোধ হয় একজনও বেঁচে নেই সাহেব-মেমরা। আমরাই বিশ্বাসঘাতকতা ক'রে মেরেছি।'

আর শোনবার সময় হ'ল না।

এমন কি পৈশাচিক কোন দণ্ড দেবার জন্য অপেক্ষা করার মতো ধৈর্যও রইল না। নিমেষে ঝলসে উঠল একজনের তরবারি।

একটি শব্দ না ক'রে পথের ধূলোয় লুটিয়ে পড়ল সিপাহীর দেহ। লাল রক্তে ডেলা পাকিয়ে গেল খানিকটা ধুলো।

ততক্ষণে জেনারেল সাহেব নিজেও পৌঁছেছে।

'এ কি করলে তোমরা!'

'এ যে সিপাহী!'

'কিন্তু সিপাহী যদি, ও লোকটা পালাবার চেষ্টা না করে তোমাদের হাতে

এসে ধরা দিলে কেন?'

তাও তো বটে। সকলে পরস্পরের মুখ চাওয়াচাওয়ি করতে লাগল।

কে একজন বললে, 'ও নিজে স্বীকার করেছে ওর অপরাধ। কানপুরের নৃশংস হত্যাকাণ্ডের কথাও স্বীকার করেছে।'

কঠিন হয়ে উঠল জেনারেলের কণ্ঠস্বর, 'মূর্খের দল! তখনই বোঝা উচিত ছিল যে এ লোকটি সাধারণ সিপাই থেকে কিছু ভিন্ন। মৃত্যু নিশ্চিত জেনে এত সহজে কেউ স্বীকার করে? ছাখো তো ওর কাগজপত্র!'

পকেটে ছিল মিসেস্ উইলিয়াম্‌স্-এর চিঠি। জলে বা ঘামে ভিজে বিবর্ণ হয়ে উঠেছে। তবু তার মর্ম কিছুটা উদ্ধার করা গেল বৈ কি!

জেনারেল সাহেব নীরবে টুপি খুললেন।

সামান্য ক'খানি রুটি

এই মাত্র কিছুদিন আগে—গত জুন মাসের মাঝামাঝি—খবরের কাগজ পড়তে পড়তে চোখে পড়ল, বিহার-সরকার সিপাহী-যুদ্ধের অন্যতম নায়ক কুঁয়ার সিংয়ের স্মৃতিরক্ষার জন্য কয়েক লক্ষ টাকা মঞ্জুর করেছেন। স্থির হয়েছে—জগদীশপুরে ওঁর যে প্রাসাদ এবং প্রাসাদের সংলগ্ন আমবাগান প্রভৃতি—যেখানে ঘোরতর যুদ্ধ হয়েছিল একদা—আপাতত সেই সম্পত্তি সমস্তটাই বর্তমান মালিকদের কাছ থেকে কিনে নেওয়া হবে, যাতে সারা ভারতের লোক ঐ জগদীশপুরের সূত্রে চিরদিন কুঁয়ার সিংয়ের নাম শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করে।

সত্যিই—কুঁয়ার সিং, তাত্যা টোপী, ঝাঁসীর রাণী, আজিমুল্লা খাঁ—এঁরাই তো সেদিন যথার্থ নেতা ছিলেন! এঁদেরই চক্রান্তে, এঁদেরই সুচতুর ব্যবস্থায় একদিন ভারতের একপ্রান্ত থেকে আর-একপ্রান্ত পর্যন্ত আগুন জ্বলে উঠেছিল! নানা সাহেব ছিলেন বটে, কিন্তু তিনি প্রথম দিকটা প্রকাশ্যে কোন কাজ করতে পারেন নি—শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত দু-দিক বজায় রাখতে হয়েছিল তাঁকে। আর যাঁরা এসেছিলেন—তাঁদেরও টেনে আনতে হয়েছিল।...জালে জড়াতে হয়েছিল সুকৌশলে। সে জাল বিস্তার করেছিলেন এঁরা, আর এঁদের বিশ্বস্ত

দু-একজন সঙ্গী।

ভারতের একপ্রান্ত থেকে আর-একপ্রান্ত পর্যন্ত আহ্বান গিয়েছিল এঁদের। পাঞ্জাব আর রাজপুতানা বাদে সারা উত্তর ভারত সেদিন উত্তর দিয়েছিল সে আহ্বানে। সমিধ্ বোধ হয় প্রস্তুতই ছিল, বারুদের স্তূপ ছিল তৈরী—শুধু আগুনের ফুল্‌কি গিয়ে পড়বার অপেক্ষা। কিন্তু সে আগুনের ফুল্‌কিও বড় অদ্ভুত। যে আহ্বান গিয়েছিল এই বিশাল অর্ধ-মহাদেশের একপ্রান্ত থেকে আর-একপ্রান্তে—তার লিপি বড় বিচিত্র! গ্রাম থেকে গ্রামে—শহর থেকে শহরে—কী এমন লিপি গিয়েছিল যা পড়তে যে-কোন ভাষাভাষী, এমন কি সম্পূর্ণ নিরক্ষর লোকেরও কোন অসুবিধা হয় নি?

সামান্য ক'খানি রুটি বা চাপাটি!

এ-গ্রামের একজন দুখানি রুটি নিয়ে গিয়ে পৌঁছে দিল ও-গ্রামে। যার হাতে দেওয়া হ'ল সে কী দেখলে সে রুটির মধ্যে কে জানে—নিশীথরাতের অন্ধকারে চুপিচুপি ছড়িয়ে দিয়ে এল সে বার্তা—আবার হয়তো পরের দিন সকালেই ক'খানি রুটি চ'লে গেল আশেপাশের সমস্ত গ্রামে। পুকুরের মাঝখানে একটা ঢিল ফেললে যেমন তার তরঙ্গ ছড়িয়ে পড়ে চারিদিকে, তেমনি ভাবে দেখতে দেখতে অল্প ক'দিনের মধ্যে খবর চলে গেল বন-মাঠ ডিঙিয়ে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে—'যাত্রা করো, যাত্রা করো যাত্রীদল!…এসেছে আদেশ, বন্দরে বন্ধনকাল এবারের মত হল শেষ।'

প্রায় একশো বছর আগের কথা।

১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দের একেবারে শেষের দিক। পৌষ মাসের শীত উত্তর-ভারতের গ্রামাঞ্চলে যেন টুঁটি টিপে ধরেছে সবাইকার।

বিহারের আরা শহর—বিখ্যাত। আজও বিখ্যাত। হাওড়া থেকে বেরিয়ে ইস্টার্ন রেলপথের যে প্রধান লাইনটা পাটনা হয়ে এলাহাবাদের দিকে এগিয়ে গেছে, তার ওপরই পড়ে 'আরা' স্টেশন। আর তার কাছে 'জগদীশপুর' গ্রাম। বৃদ্ধ জমিদার কুঁয়ার সিংয়ের জমিদারী। সেদিন ঐ জগদীশপুরেরই রাজবাড়ির একান্তে একটা বড় ঘরে মন্ত্রণা-সভা বসেছিল, সন্ধ্যার কিছু পরে। আধো-অন্ধকার ঘর। বাইরের দিকে কোন জানলা নেই—বিহারের কোন

বাড়িতেই তখন জানলা থাকতো না। ভেতরের দিকের একমাত্র দরজাও শীতের ভয়ে বন্ধ। অবশ্য ঝাড়ের অভাব নেই ঘরে, কিন্তু তাতেও তো রেড়ির তেলের বাতি, তাছাড়া ইচ্ছে ক'রেই বোধ হয়—ঝাড়ের সব আলোগুলো জ্বালা হয় নি।

দামী ফরাস পাতা ঘরে। তামাকের ব্যবস্থাও ঢালা। হিন্দু ও মুসলমান হুঁকাবরদাররা ঘন ঘন কল্‌কে পালটে দিয়ে যাচ্ছে। সামনে থালায় পান আর সুপারি-এলাচ। কিমামও আছে। সুগন্ধি তামাক আর পান-মশলার গন্ধে ঘর মৌ-মৌ করছে। তামাক আর রেড়ির তেলের ধোঁয়ায় ঘরের অধিবাসীদের মুখগুলো আব্‌ছা অস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। কথা চলছে ফিস্‌-ফিস্‌ ক'রে। ষড়-যন্ত্রের আভাস সকলকার ভাব-ভঙ্গীতেই।

বহু রাত্রি পর্যন্ত চলল বৈঠক। নিশ্বাস আর ধোঁয়ায় ঘরের বাতাস ভারি হয়ে উঠেছে, সেইসঙ্গে সকলের মনও। তারই মধ্যে অকস্মাৎ প্রবীণ কুঁয়ার সিং উত্তেজনায় প্রায় চেঁচিয়ে উঠলেন একবার—'ভাই সব, মিছিমিছি তোমরা ভাবছো। সব তৈরী আছে—আগুন জ্বাললেই দেখবে যে, বারুদের স্তূপ জমে আছে সামনে। শুধু এখন—আমরাও যে তৈরী, এই খবরটা দেশের ভেতর পৌঁছে দিতে হবে। জানিয়ে দিতে হবে যে, তোমরা প্রস্তুত থাকো।··· কোথাও আগুন জ্বলেছে এই খবরটা পেলেই যাতে তোমরাও জ্বালাতে পারো তোমাদের আগুন।'

উত্তেজনায় গড়গড়ার নলটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিলেন কুঁয়ার সিং। আবার হাঁপাতে হাঁপাতে হাত বাড়িয়ে খুঁজতে লাগলেন ফেলে-দেওয়া সেই নলটা।

আজিমুল্লা খাঁ সামনেই ব'সে ব'সে তামাক খাচ্ছিলেন। এখন সট্‌কাটা মুখ থেকে সরিয়ে একটু হাসলেন:

'কিন্তু খবরটা পাঠাবেন কী ক'রে রাজাসাহেব। গ্রামে গ্রামে ছড়াবার বহু আগেই ঐ শয়তান আংরেজগুলো জেনে যাবে যে।'

কুঁয়ার সিং বললেন, 'সাংকেতিক-লিপি ব্যবহার করতে হবে।'

'কিন্তু সাংকেতিক-লিপি বোঝাবার জন্য আবার লোক চাই যে। গাঁয়ের লোকে বুঝবে কি ক'রে?'

'মুখে-মুখেই খবর পাঠাতে হবে।'

'এত লোক পাওয়া যাবে কি ক'রে ?'

'তাহ'লে এমন একটা কিছু সংকেত ব্যবহার করতে হবে, যা এমনি কিছু বোঝা যাবে না, কিন্তু তার ইঙ্গিতটা সবাই বুঝবে।'

'কিন্তু এমন কী জিনিস আছে যা সবচেয়ে সাধারণ, অথচ সবচেয়ে নিরাপদ—যার ইঙ্গিত সবাই বুঝবে ?' প্রশ্ন করলেন ফৈজাবাদের বিখ্যাত নেতা মৌলভী আহ্‌মদউল্লা।

ও-পাশের আব্‌ছা অন্ধকারের ভেতর থেকে কে যেন ফিস্‌ফিসিয়ে ব'লে উঠল—'চাপাটি।'

'চাপাটি !' বিস্মিত হয়ে ফিরে তাকালেন আজিমুল্লা খাঁ।

'কে, কে ওখানে কথা কইলে ?'

ধোঁয়ার মধ্যে চোখ মেলে ভালো ক'রে তাকাবার চেষ্টা করলেন কুঁয়ার সিং। কেমন একটা অস্পষ্ট সংশয়ের অস্বস্তি বোধ করতে লাগলেন তিনি।··· কে ও লোক ? কোথা থেকে এল ? পরিচিত কেউ তো নয়। গুপ্তচর নয় তো শত্রুর ?

'আজ্ঞে, আমি।'

যে ওপাশ থেকে কথা বলেছিল সে এবার এগিয়ে এল। দীর্ঘদেহ গৌর-কান্তি ব্রাহ্মণ একজন। খাটো বেনিয়ান-কোর্তার মধ্য দিয়ে শুভ্র পৈতার গোছা দেখা যাচ্ছে। কাঁধে একটি গামছা উত্তরীয়ের মতো ফেলা, তার একপ্রান্তে কী-একটা বাঁধা। ললাটে শ্বেতচন্দনের ফোঁটা, তার ওপর বিভূতি-লেপা—এক-দিক থেকে আর-একদিক পর্যন্ত। বিপুল শিখা কাঁধ পর্যন্ত লতিয়ে এসেছে। তার ডগায় একটি ধুতরোর ফুল বাঁধা।

একবারে সামনে এসে আশীর্বাদের ভঙ্গীতে হাত তুলে দাঁড়ালেন তিনি।

'কে, কে আপনি ? এর ভেতর কেমন ক'রে এলেন ?'

'আমি ব্রাহ্মণ—এ-ই আমার পরিচয় জেনে রাখুন। এর বেশি কিছু জানতে চাইবেন না। আপনারা যা সন্দেহ করছেন তা নয়—আমি শত্রুর গুপ্তচর নই। তাছাড়া, গুপ্তচর তারা পাঠাবে কেন ? এ তারা কোনদিন স্বপ্নেও দেখবে না যে, তাদের উচ্ছেদের জন্য এতগুলি প্রতাপশালী লোক ষড়যন্ত্র করছেন। তারা নিশ্চিন্ত আছে।···তাতেও যদি বিশ্বাস না হয় তো—আমি

ব্রাহ্মণ, নিত্য শিবপূজা ক'রে জলগ্রহণ করি, নিত্য যজ্ঞ করি, সেই যজ্ঞ-বিভূতি আমার ললাটে, শিবের প্রসাদী-ফুল আমার শিখায়, আর হাতে সেই উপবীত, আমি শপথ ক'রে বলছি—আমি মনে-প্রাণে আপনাদের দিকেই। এদেশ থেকে ইংরেজ বিতাড়নই আমার জীবনের সবচেয়ে বড় ব্রত। সেই উদ্দেশ্যে নিজের গরজে খুঁজে-খুঁজে এখানে এসেছি। এই একাগ্রতা ও আমার তপস্যা বলেই আপনাদের সতর্ক প্রহরীদের এড়িয়ে অনায়াসে এই মন্ত্রণা-সভায় ঢুকতে পেরেছি। আমাকে আপনারা বিশ্বাস করুন।'

তিনি তাঁর যজ্ঞোপবীত হাতে জড়িয়েই হাত জোড় ক'রে দাঁড়ালেন।

এ শপথ যে হিন্দুর কাছে কতখানি ছিল, তা সেকালে মুসলমানরাও জানতেন আর তাঁরা বিশ্বাসও করতেন। তাই আহ্‌মেদউল্লা তাড়াতাড়ি বললেন, 'বসুন, বসুন। আপনি স্থির হোন। আপনাকে আমরা বিশ্বাস করছি।'

ব্রাহ্মণ বসলেন।

কুঁয়ার সিং বললেন, 'তারপর? আপনি চাপাটির কথা কি বলছিলেন?'

'কিছুই না। ধরুন, গ্রাম থেকে গ্রামে যদি কেউ দু'খানা ক'রে রুটি পৌঁছে দেয়? কে কি ভাববে? কে কি বুঝবে? অথচ এমনি ক'রে আমাদের আহ্বান অব্যর্থ ভাবে পৌঁছোবে লোকের কানে—সবাই প্রস্তুত হয়ে থাকবে।

'কিন্তু ঠাকুর—' আজিমুল্লা একটু কৌতুকের ভঙ্গীতেই বললেন, 'কিন্তু ঠাকুর—আংরেজ যেমন বুঝবে না, তেমনি দেশের লোকও তো বুঝবে না। তারা অবাক হয়ে ভাববে, এ আবার কি? এর মানে কি?'

'তাছাড়া...' অযোধ্যার বিখ্যাত তালুকদার ঠাকুর সিং বললেন, 'তাছাড়া, মুসলমানের রুটি—হিন্দুর কাছে অস্পৃশ্য, ছোটজাতের রুটি ব্রাহ্মণ ছোঁবে না—রুটি পাঠানোর বিপদও আছে। কেউ-কেউ হয়তো এটাকে অপমান বলেই মনে করবেন।'

'না।' ব্রাহ্মণের মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল, 'সে ভয় নেই। খাঁ সাহেব, আপনার কথা ঠিকই—ঠাকুর সিংজীও কিছু অন্যায় বলেন নি, কিন্তু আপনারা নিশ্চিন্ত থাকুন। সে-কথাও আমি ভেবেছি বৈ কি!'

তারপর একটু থেমে, কেমন একরকম চাপা-গলায় বললেন, 'আমার এই

তপস্যা, এই সাধনা আজ থেকে শুরু হয় নি—হয়েছে ঠিক দু-বছর আগে থেকে। আজিমুল্লা খাঁ—আপনি শুনলে অবাক হয়ে যাবেন, আজ ভারতের এমন গ্রাম খুব কমই আছে, যেখানে এই খবর পৌঁছোয় নি যে—ইংরেজদের এখান থেকে তাড়াবার জন্য একটা বিপুল আয়োজন চলছে। সময় যখন কাছে এগিয়ে আসবে, তখন তোমাদের গ্রামে কোথাও থেকে এসে পৌঁছোবে দু-খানি রুটি। সেই চিহ্নই হচ্ছে সাংকেতিক-লিপি—যুদ্ধের আহ্বান। সেই রুটি পেলেই তোমাদের গ্রামের লোকেরা চারিদিকের অন্যান্য গ্রামে আবার সেই রুটি পৌঁছে দেবে—আর প্রস্তুত হবে যার যতটুকু সাধ্য নিয়ে।'

সকলে স্তম্ভিত—কারুর মুখে কোনো কথা নেই। এই সবচেয়ে শক্ত কাজটিই তাহ'লে হয়ে গেছে? কিন্তু কী ক'রে হলো? কে করলে?

সকলের মনের প্রশ্ন মুখ ফুটে করলেন কুঁয়ার সিং: 'কিন্তু এ কে করলে? কারা করলে?'

'কারা নয় সিংজী। বলুন, কে। পাঁচ কান হ'লে আর কোনো কথা গোপন থাকে না। আমিই করেছি এই কাজ, অসম্ভব সম্ভব করেছি। আমি একা সারা ভারত ঘুরে বেড়িয়েছি এই দু-বছর ধরে। গাছতলায় ঘুমিয়েছি, ভিক্ষান্ন নিবেদন ক'রে দিয়েছি ইষ্টদেবতাকে, ঝড় জল হিম রৌদ্র কিছু গ্রাহ্য করি নি। কারণ, এ যে আমার তপস্যা। হ্যাঁ—দু-এক জায়গায় আমার মতো দু-একজনকে পেয়েছি বৈকি, যারা আমারই মতো ইংরেজকে ঘৃণা করে। তারাও আমার কাজের ভার কিছু-কিছু তুলে নিয়েছে নিজেদের হাতে—নইলে কি কাজ শেষ হতো এর ভেতর?'

'কিন্তু এ-কথা আপনার মনে গেল কি ক'রে?' কে যেন প্রশ্ন করলেন।

'লর্ড ডালহাউসি যা করেছেন, তা থেকে অসন্তোষের আগুন জ্বলতে আর বেশি দেরি নেই—এ-কথা কে না জানে মৌলভী জী? আমি শুধু তার অগ্রদূত হয়ে খবরটা পৌঁছে দিয়েছি মাত্র।'

'আপনার কি স্বার্থ—জানতে পারি কি?'

কিছুক্ষণ স্থির হয়ে রইলেন ব্রাহ্মণ। তারপর গামছাটি টেনে কোলে নামিয়ে, খুললেন তাঁর সেই কোণে-বাঁধা পুঁটুলিটি। তা থেকে কী দুটো বস্তু নিয়ে ফেলে দিলেন সকলের সামনে। সকলে অবাক হয়ে তাকিয়ে দেখলেন,

একখানি বহুদিনের শুকনো, প্রায়-গুঁড়িয়ে-যাওয়া বিবর্ণ রুটি, আর একটি শুষ্ক অরবিন্দ, অর্থাৎ শুকনো পদ্মফুল।

সকলে চেয়েই আছেন, কিন্তু বুঝতে পারছেন না।

ব্রাহ্মণ নীচুগলায়, গাঢ়স্বরে বললেন, 'দু বছর আগে চলেছিলাম চন্দ্রনাথ—প্রভুজীকে দর্শন করবো ব'লে। মানসিক ছিল যে, ভিক্ষা করবো না, সঙ্গেও কিছু নেবো না—যদি কেউ ডেকে কিছু দেয় তো খাবো, নইলে খাবো না। বাড়ি আমার গোরখপুর—সেখান থেকে বেরিয়ে মুঙ্গের পর্যন্ত পৌঁছেছিলাম নির্বিঘ্নেই। কিন্তু মুঙ্গেরে গিয়েই এই আগুন জ্বললো—'

বলতে বলতে থেমে ব্রাহ্মণ কিছুক্ষণ চোখ বুজে ব'সে রইলেন। বোধ হয় বলতে কষ্টই হচ্ছিল—সেদিনের সে কাহিনী। একটু পরে সামলে নিয়ে আবার বললেন, 'দুদিন ভাগ্যে কিছু জোটে নি—তিনদিনের দিন চাট্টি আটা দিয়েছিল এক দোকানদার—কিছু জ্বালানি কাঠও। গঙ্গাতীরে এক গাছতলায় ব'সে রুটি তৈরী ক'রে ইষ্টদেবকে নিবেদন করতে যাবো—এমন সময় এক বিঘ্ন। ওধার থেকে ঘোড়ায় চেপে এক সাহেব আর মেম আসছিলেন—সঙ্গে ছিল তাঁদের প্রকাণ্ড এক কুকুর। কুকুরটা আমাকে দেখতে পেয়েই অকস্মাৎ লাফাতে লাফাতে আমার দিকে তেড়ে এল। আমি প্রমাদ গণলাম। সামনেই পাতাতে রুটিগুলো সাজানো, পথে পেয়েছিলাম একটা পদ্মফুল—সেই ফুল আর লোটার গঙ্গাজল নিয়ে সবে তখন ইষ্টকে স্মরণ করেছি—ঐ ফুল আর জল দিয়ে রুটিগুলো তাঁকে নিবেদন করবো—হায়! শুধু যদি সেটাও পারতাম! নিজের ক্ষুধার জন্য ভাবি না—কিন্তু দেবতাও যে দুদিন অনাহারে!…আমি সাহেবের দিকে হাত-জোড় ক'রে চেঁচিয়ে বললাম—সাহেব, ফেরাও, ফেরাও—কুকুরকে সামলাও! কিন্তু সাহেব আর মেম হি-হি করে হাসতে লাগল আমার কাতর প্রার্থনায়! দেখতে দেখতে কুকুরটা এসে মুখ দিল রুটিতে… একটা পায়ে ক'রে পদ্মফুলটা ছুঁড়ে ফেলে দিল দূরে, দেবতার পায়ে-দেবার ফুল—কুকুরের পায়ে লাগল!'

রাগে-দুঃখে-ক্ষোভে ব্রাহ্মণের মুখ রাঙা হয়ে উঠল, চোখের কোলে-কোলে ভ'রে এল জল। একটু থেমে ভাঙা ভাঙা গলায় বললেন, 'এতখানি রাগ সামলাতে পারলাম না। যে তিনটে পাথর দিয়ে উনুনের মতো করেছিলাম,

তারই একটা তুলে ছুঁড়ে মারলাম কুকুরটাকে সজোরে। একবার আওয়াজ ক'রে উঠেই কুকুরটা মাটিতে লুটিয়ে পড়ল ··সাহেবের পেয়ারের কুকুর—ঐ অবস্থা দেখেই সাহেব ছুটে এসে হাতের চাবুকের বাড়ি এলোপাতাড়ি মারতে লাগলেন আমাকে। বুটস্থদ্ধ লাথি মারলেন সজোরে···মুখ কেটে চামড়া ফেটে রক্ত পড়তে লাগল। এখনও সে দাগ আছে। তারপর মারতে মারতে ক্লান্ত হয়ে পড়েই হোক—কিংবা কুকুরটাকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া বেশি দরকার বলেই হোক, একসময় সাহেব থামলেন, ঘোড়া থেকে নেমে কুকুরটাকে কোলে ক'রে নিয়ে চ'লে গেলেন, আমি সেই রক্তাক্ত দেহে অশুচি রুটিগুলোর মধ্যে প'ড়ে রইলাম।'

'আর কেউ ছিল না সেখানে?' সক্রোধে গর্জন ক'রে উঠলেন কুঁয়ার সিং, 'মানুষ ছিল না কেউ সেখানে?'

'ছিল, ভিড়ও হয়েছিল, কিন্তু সাহেব দেখে কেউই এগোয় নি, বরং দু-একজন এসে আমাকেই দোষ দিলে। সিংজী! খাঁ সাহেব! এ-ই সেই রুটি, আর এ-ই সেই পদ্ম। সেদিন সন্ধ্যায় গায়ের জ্বালা জুড়োতে গঙ্গায় নেমে শপথ করেছিলাম যে, এই দুটি জিনিস দিয়েই আমি এর শোধ নেবো। এমন আগুন জ্বালাবো এই সামান্য দুটি তুচ্ছ জিনিস দিয়ে—যে-আগুন নিভোতে লাগবে হাজার হাজার ইংরেজের রক্ত।·· তারপর সেইদিন থেকে আর বাড়ি ফিরি নি। জানতাম যে, বড়লাট ডালহাউসি যা কাণ্ড-কারখানা করছেন তাতে আগুন জ্বলবেই—তাই বেরিয়ে পড়লাম শুধু সেই খবরের জন্যে প্রস্তুত রাখতে দেশকে। সাধুর ছদ্মবেশে ঐ রুটির কথাই ব'লে বেড়িয়েছি এতদিন। আর একটা কথা—ব্যারাকে-ব্যারাকে যখন খবর দেবেন—একটি ক'রে পদ্ম পাঠাবেন। সে-ব্যবস্থাও আমি ক'রে এসেছি।'

কুঁয়ার সিং উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'ব্রাহ্মণ, আপনি একা যা করেছেন, আমরা হাজার লোক লাগিয়েও তা করতে পারতাম না। আপনি আমাদের মহৎ উপকার করেছেন।···আপনি ক্লান্ত, যদি দয়া ক'রে ক-টা দিন এ গরীবের আতিথ্য গ্রহণ করেন তো বাধিত হই।'

'ধন্যবাদ সিংজী।' ব্রাহ্মণও উঠে দাঁড়ালেন। হাত জোড় করে বললেন, 'আপনি আমাকে বিদায় দিন, আমার কাজ এখনও কিছু বাকি আছে।'

তিনি আর দাঁড়ালেন না। নিঃশব্দে সেই নিশীথ-অন্ধকারে যেন ছায়ার মতোই নিমেষে মিলিয়ে গেলেন।

সেই ব্রাহ্মণ তিনদিনের পথ হেঁটে এসে গঙ্গাতীরে পৌঁছলেন। তাঁর গামছায় তখনও বাঁধা আছে সেই রুটি আর পদ্ম। ও দুটি বস্তু আসবার সময় কুড়িয়ে আনতে তাঁর ভুল হয় নি।

গঙ্গার তীরে পৌঁছে সেই চাপাটি আর পদ্ম আগে গঙ্গায় ভাসিয়ে দিলেন, তারপর স্নান ক'রে গঙ্গাজলে দাঁড়িয়েই পিতৃপুরুষের তর্পণ করলেন। আর করলেন—ইষ্টপূজা। সেই থেকে আজ পর্যন্ত উনি ইষ্টপূজা করেন নি। আজ প্রায়শ্চিত্ত শেষ ক'রে নিশ্চিন্ত হয়ে পূজা করলেন। তারপর আস্তে আস্তে গঙ্গার জলেই আরও নেমে গেলেন—আর উঠলেন না। তাঁর কাজ শেষ হয়ে গেছে।*

তাঁতিয়া টোপীর ফাঁসি

গল্পটা আমি শুনেছিলুম মদন মুখুয্যের কাছে। মদন মুখুয্যে কাশীতে আমাদের বাড়ির দোতলায় ভাড়া থাকতেন। তাঁর তখন বাহাত্তর বছর বয়স, বছর পনেরো আগে পেন্‌সন নিয়ে কাশীবাস করতে এসেছিলেন। মদন জ্যাঠামশাই এ গল্প আবার শুনেছিলেন তাঁর বাবার মুখে, তাঁর বাবা মিউটিনীর সময় মাউতে চাকরী করতেন নাকি। কাজেই, এ গল্পের সত্যি-মিথ্যে ঠিক ক'রে বলা আজ শক্ত। কারণ ঘটনাটা ঘটেছিল প্রায় একশো বছর আগে—যাঁরা বলেছেন, তাঁরাও কেউ বেঁচে নেই আজ।

যাই হোক—তবু গল্পটা বলছি এই জন্যে যে মোটামুটি এটা গল্পের মতোই। গল্প হিসেবেই শোনা যাক না।

---

* ইতিহাসে আছে, চাপাটি আর পদ্ম পাঠিয়ে সিপাহী-বিদ্রোহের আসন্ন আভাস জানানো হয়েছিল। কিন্তু কেন এই দুটি বস্তুই পাঠানো হয়েছিল, আর কে তাদের ব'লে দিয়েছিল এই সাঙ্কেতিক জিনিস দুটির অর্থ, সে-সম্বন্ধে ইতিহাসে কোনো উল্লেখ নেই। যেখানে ইতিহাস নীরব, সেখানেই কল্পনার খেলা।

মদন জ্যাঠামশাইয়ের বাবা প্রজাপতি মুখুয্যে মাউতে কাজ করতেন তা আগেই বলেছি; কিন্তু একটা কথা বলা হয় নি এই যে, মাউতে তিনি এসেছিলেন পরে। স্যার কলিন ক্যাম্পবেল যখন ডিসেম্বর মাসে কানপুর দখল করেন তখন তাঁরই হুকুমে একদল কমিসারিয়েট কর্মচারী কানপুর থেকে মাউতে আসেন, সার হিউ রোজ সেখানে যে ঘাঁটি বসিয়েছিলেন—তার কাজ চালাবার জন্যে। কাজেই বিবিঘরের হত্যাকাণ্ড যখন হয় তখনও প্রজাপতি কানপুরে আছেন।

কানপুর গ্যারিসনকে নিরাপদে নৌকো করে এলাহাবাদে চলে যাবার প্রতিশ্রুতি দিয়েও নানা সাহেব পরে তা রাখতে পারেন নি, পাড় থেকে গোলা ছুঁড়ে নৌকাগুলো ডুবিয়ে দেওয়া হয়েছিল—এজন্যে সকলেই সিপাইদের, বিশেষ ক'রে নানা সাহেব ও তাত্যা টোপীকে দোষ দেয়। কিন্তু প্রজাপতি বলতেন যে, ওঁদের কোন দোষ ছিল না। ওঁরা সরল ভাবেই হুইলার সাহেবকে কথা দিয়েছিলেন। কিন্তু ঠিক সেই দিনই এলাহাবাদ থেকে খবর এসে পৌঁছল যে কাশী ও এলাহাবাদে বিদ্রোহী সিপাইদের দমন করবার পর ইংরাজরা সেখানকার বাসিন্দাদের ওপর যে অত্যাচার করেছে তা অকথ্য। কোন মানুষ যে কোন মানুষের ওপর সেরকম অত্যাচার করতে পারে, তা চোখে দেখলেও বিশ্বাস হওয়া শক্ত—কানে শুনলে তো হয়ই না। তবু, একের পর এক লোক যখন বলতে লাগল যে, তারা চোখে দেখেই এসেছে, নিরীহ গ্রামবাসী বা শহরবাসীদের ওপর কী অকথ্য অত্যাচার হয়েছে—বৃদ্ধ বালক স্ত্রীলোক কেউ বাদ যায় নি, তখন সিপাইরা সব ক্ষেপে উঠল প্রতিশোধের জন্য। যারা এ কাজ করছে তাদেরই ভাইবেরাদাররা নিরাপদে চোখের সামনে দিয়ে চলে যাবে? কখনও না। নানা সাহেব ও তাত্যা টোপী অনেক বোঝালেন, বললেন যে তাঁরা ওদের কথা দিয়েছেন সিপাইদের সেনাপতি হিসাবেই—কথার খেলাপ হ'লে বড় অন্যায় হবে ইত্যাদি। তাতে কিছুক্ষণের মতো শান্ত হলো সবাই কিন্তু তাঁতিয়া বুঝলেন এ বাহ্য শান্তি, এর ভিত মোটেই শক্ত নয়।

তবু তখন আর সময় নেই। নৌকো প্রস্তুত, সাহেবরা উঠছে। মেয়েদের ও শিশুদেরও নিয়ে যেতে চায় ওরা। তাঁতিয়া টোপী হঠাৎ বললেন, 'মেয়েরা থাক্।'

হুইলার সাহেব বিস্মিত হয়ে বললেন, 'কেন ?'

তাত্যা বললেন, 'কী জানি, আমি ভাল বুঝছি না। এদের মন ক্ষিপ্ত হয়ে আছে—কি ক'রে বসবে তা কে জানে ? ওঁরা থাকুন, আমি বন্দী ক'রে রাখার নাম ক'রে আটকে রাখছি। সুযোগ বুঝে আমি নিরাপদ স্থানে পাঠিয়ে দেবো।'

হুইলার আর কি বলবেন। বললেন, 'আপনি কথা দিচ্ছেন যে ওদের—'

সে কথা শেষ করতে না দিয়েই তাত্যা বলে উঠলেন, 'নিশ্চয়ই। আমি ব্রাহ্মণ, যতক্ষণ আমার কোন হাত থাকবে, স্ত্রীলোক আর শিশুর ওপর কোন অত্যাচার হবে না।'

তাঁতিয়া নিজে দাঁড়িয়ে থেকে এক নবাবের খালি বাড়িতে মেয়েদের পাঠিয়ে দিলেন ; সিপাইদের বলে দিলেন, 'খুব কড়া নজর রাখবে—খবরদার, কোনমতে না কেউ পালায়।'

তিনি জানতেন যে ঐ ভাবে না বললে সিপাইদের হাত থেকে ওঁদের বাঁচানো শক্ত হবে। সেই থেকে ঐ প্রাসাদটির নাম হয়ে গেল বিবিঘর, যেখানে বিবিরা থাকেন।

এবার সাহেবরা সবাই প্রায় নৌকোয় উঠেছে, কতকগুলো ছেড়ে মাঝ-গঙ্গায় গেছে, কতকগুলো ছাড়ে ছাড়ে, এমন সময় আবার নতুন খবর নিয়ে একদল লোক এল এলাহাদের দিক থেকে—'জানো, এই কুত্তারা কাশীতে কি করেছে ? শিশুদের কেটেছে মার চোখের সামনে, স্ত্রীর চোখের সামনে স্বামীর মুণ্ডু নিয়ে বল খেলেছে—যারা কোনও অপকার করে নি, যারা এ লড়াইয়ের বিন্দুবিসর্গও জানে না, তাদের ওপর এই অত্যাচার। আর তোমরা এই শুয়োরদের সঙ্গে ভদ্র ব্যবহার করছ ?'

ব্যস্। সত্যি-মিথ্যে বিচার করার তখন সময় নেই, অগ্র-পশ্চাৎ কে ভাববে ? চোখের সামনে তখন খুন জেগেছে ওদের। নানা ও তাত্যার ক্ষীণ চেষ্টা সে প্রবল বন্যায় কোথায় ভেসে গেল।

মাত্র চারজন না পাঁচজন ইংরেজ প্রাণ নিয়ে সেদিন পালিয়ে যেতে পেরেছিল। দেখা গেল তাত্যার অনুমানই ঠিক। কিছুক্ষণ পূর্বের শান্তিটা ছিল বাহ্য।

এরপর কিছুদিন না রইল তাত্যার তিলমাত্র অবসর, আর না রইল নানা সাহেবের। আগুন জ্বলেছে কিন্তু অনুকূল বাতাস নেই। সবাই ইংরেজদের দিকে। রাজপুতরা, শিখরা, গুর্খারা, এমন কি মারাঠা-রাজারাও ইংরেজদের সাহায্য করেছেন। জনসাধারণ প্রাণহীন, তাদের যেন কিছুই এসে-যায় না, কে হারল আর কে জিতল সে-খোঁজে! এই দারুণ প্রতিকূলতা ও নিস্পৃহতার সঙ্গে লড়াই করতে হচ্ছে ওঁদের দিনরাত। যাদের জন্যে এবং যাদের নিয়ে এ কাজ করছেন তারাও এর গুরুত্ব বোঝে না। এমন এক এক হঠকারিতা ক'রে বসে যে, সাধারণ লোকের বিরূপতা আরও বেড়ে যায়। এই বিপদের সামনে দাঁড়িয়েও কারুর সঙ্গে কারুর মিল নেই। বিবাদ-বিসম্বাদ লেগেই আছে।

এই ভাবে তাত্যা ক্রমশ চারিদিক থেকে এমন বিব্রত হয়ে উঠলেন যে বিবিঘরের বন্দিনীদের কথা তাঁর মনেই রইল না। কিন্তু যাদের ওপর ভার ছিল ওঁদের পাহারা দেওয়ার, তারা ব্যস্ত হয়ে উঠল। চারিদিকে গৌরব অর্জনের নানা পথ খোলা, নিজেদের কর্তৃত্ব করবার অসংখ্য উপায় চারিদিকে—আর তারা কতকগুলো মেয়েছেলেকে পাহারা দিয়ে এখানে বসে থাকবে? বিশেষতঃ যারা ওদের চিরশত্রু? তাছাড়া খাদ্য-খাবারের যে রকম টান, অতগুলো মেম-সাহেবকে বসিয়ে খাইয়ে লাভ কি?

জমাদার ইন্দ্রপাল সিং রোজ হাঁটাহাঁটি করে, 'গুরুজী, হুকুম দিন, ওদের শেষ ক'রে দিই। আর কতদিন এমন ক'রে আমরা বসে থাকব?'

তাত্যা ওদের বিরুদ্ধ-মনোভাব বুঝে কেবলই দিন পেছিয়ে দেন, 'সময় হলেই বলব ইন্দর পাল—আর দু-দিন সবুর করো।'

অবশ্য অবসর এর ভেতর মেলে নি তা নয়—কিন্তু তাত্যারও তো সহস্র ঝঞ্ঝাট।

এমনি ক'রে হঠাৎ একদিন ১৩ই জুলাই সন্ধ্যাবেলা ইন্দ্রপাল আবার এল। তাত্যা তখন নানা ধুন্ধুপন্থ এবং আরও অন্যান্য প্রধানদের সঙ্গে গুরুতর মন্ত্রণা করছেন। চারিদিকে বিপদ আসন্ন—কাজে ঝাঁপিয়ে পড়লে চারিদিক থেকে যে সব সাহায্য তাঁরা পাবেন ভেবেছিলেন, তার একটাও পাচ্ছেন না, বরং ইংরেজরাই একটু একটু ক'রে শক্তিসঞ্চয় করছে। দুশ্চিন্তার শেষ নেই, কোন-

দিকে পথ দেখতে পাচ্ছেন না—এমন সময়ে ইন্দর পালের সেই একঘেয়ে কথা, 'কী করব বলুন গুরুজী।'

তাঁতিয়া বিরক্ত হয়ে বললেন, 'দোহাই তোমার ইন্দর পাল, আমাদের একটু রেহাই দাও—'

'কথা একটা বলেই দিন না গুরুজী।'

'যা খুশি করো। শুধু আমাকে আর বিরক্ত করো না।'

তারপর সে কথা ভুলেই গেলেন তাত্যা। কিন্তু পরের দিন সন্ধ্যার সময়ই ভয়াবহ খবর এসে পৌঁছল—স্ত্রীলোক শিশু বিবিঘরের প্রায় কেউই বাঁচে নি। সবাইকে হত্যা ক'রে ইন্দ্রপালের লোক এক বিরাট কুয়ার মধ্যে ফেলেছে—শুধু মৃতদেহে সে কুয়া ভর্তি হয়ে গেছে।

তখনই তিনি বিবিঘরে ছুটলেন। সত্যিই ভয়াবহ। ভয়াবহ শুধু নয়—পৈশাচিক সে হত্যালীলা দেখে তিনি শিউরে উঠলেন। ঊর্ধ্ব-আকাশের দিকে চেয়ে ঈশ্বরের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করলেন।

কিন্তু জানতেন যে ক্ষমা নয়—বিচারই আসবে সেখান থেকে। তিনি সিপাইদের দিকে চেয়ে বললেন, 'আর তোমাদের জয়ের কোন আশা রইল না। —এই পাপেই ভারতের স্বাধীনতা সুদূরপরাহত হয়ে গেল।'

প্রজাপতি মুখুয্যে বলতেন, এর পর থেকে তাত্যার মনে একতিলও আর শান্তি রইল না। কাজ করেন, যুদ্ধ করেন, মন্ত্রণা দেন—সবই কলের পুতুলের মতো। কী একটা যেন অন্যমনস্ক ভাব। সর্বদাই যেন কী চিন্তা করেন। বাইরের দিকে কিসের শব্দে যেন কান পেতে থাকেন।

এক একটা পরাজয় হয় আর তাত্যার মুখে অদ্ভুত একটা হাসি ফুটে ওঠে। সূক্ষ্ম, কুটিল সে হাসি—কেউ সে হাসির কোন অর্থ খুঁজে পায় না। বেতোয়ার যুদ্ধ গেল, মোরারের যুদ্ধ গেল, কোটার যুদ্ধ গেল—সর্বত্রই ঐ এক হাসি।

লক্ষ্মীবাই অনুযোগ করেন, ধুন্ধুপন্থ অনুযোগ করেন, আজিমুল্লা অনুযোগ করেন—'যুদ্ধে তোমার মন নেই গুরুজী, এ কি ছেলেখেলা করছ?'

তাত্যা হেসে বলেন, 'যুদ্ধে আমার সত্যিই মন নেই। আমি যে পরাজয়ের দিকেই কান পেতে আছি। এ শুধু কর্তব্য পালন করা বৈ তো নয়! ফল যে

কী হবে তা তো জানিই।'

তারপর সে পরাজয় সত্যিই হলো—চারিদিক থেকে, সর্বতোভাবে। লক্ষ্মীবাঈ মারা গেলেন, নানা সাহেব পলাতক, কুন্‌ওয়ার সিং নিহত, রাও সাহেব ধরা পড়েছেন—বন্ধু বলতে, সহকর্মী বলতে কেউ নেই। সারা ভারত আবার ইংরেজদের হাতে। তবু তাত্যা মাতৃভূমির নামে শপথ করেছেন, দেহে যতদিন প্রাণ থাকবে তিনি চেষ্টা ছাড়বেন না। তাই আশা কিছু না থাকলেও বাইরে আশার প্রদীপ জ্বালিয়ে রেখে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে ঘুরে বেড়ান, এক জমিদারের কাছ থেকে আর এক জমিদারের কাছে। তারা সবাই ওঁকে শ্রদ্ধা করে, গুরুজী বলে—তাই ধরিয়ে দেয় না, কিন্তু সাহায্য ? আর না। তাদের ঢের শিক্ষা হয়েছে। ইংরেজের বিরুদ্ধে আর নয়।

তবু তাঁতিয়া ভেঙে পড়েন না। সে শিক্ষা তাঁর নেই। তিনি জানেন, একটি লোক যদি সত্যই দৃঢ়প্রতিজ্ঞা ক'রে লেগে থাকে তো তাই যথেষ্ট, যে আগুন নিভেছে সে আগুনই আবার জ্বালিয়ে তুলতে পারবে নিজের প্রাণের বহ্নিতে।

কিন্তু এবারে এক নূতন উপসর্গ দেখা দিল। রাত্রে তিনি ঘুমোতে পারেন না। যে বিবিঘরকে প্রায় ভুলে এসেছিলেন এতদিনে, সেই বিবিঘরই আবার নতুন করে তাঁর মনের মধ্যে জেগে উঠল। রাত্রে ঘুমোলেই স্বপ্ন দেখেন সেই বীভৎস দৃশ্য—এমন কি সকালে জাগ্রত অবস্থাতেও, পূজা করবার সময় ধ্যানে বসলে নিজের ইষ্টদেবতার মূর্তির বদলে মনের মধ্যে ভেসে ওঠে বিবি-ঘরের সেই বিকৃত শবদেহগুলি।

তাঁতিয়া বুঝলেন—তাঁর সময় হয়ে এসেছে। আর নয়।

কী করবেন ? আত্মহত্যা ? যুদ্ধ করতে করতে প্রাণ দেবেন ?

না, তাতে তো তাঁর প্রায়শ্চিত্ত হবে না। ইংরেজদের হাতেই তাঁকে শাস্তি নিতে হবে যে।

এই ভাবতে ভাবতেই একদিন গিয়ে উঠলেন সিন্ধিয়ার সামন্ত মানসিংহের কাছে। মানসিংহ বললেন, 'আংরেজরা চারিদিকে সহস্র চর রেখেছে গুরুদেব, এখানে থাকা মোটেই নিরাপদ নয়। পালান।'

'তোমার কাছে একটা অনুরোধ আছে মানসিংহ, শেষ অনুরোধ।'

'ইংরেজদের বিরুদ্ধে যাওয়া ছাড়া যা বলেন তাই শুনব।'

'শুনবে তো?'

'হ্যাঁ—আপনার পা ছুঁয়ে শপথ করছি।'

'তবে আমাকে ইংরেজদের হাতে ধরিয়ে দাও।'

মানসিংহের অনুরোধ উপরোধ অনুনয় কিছুই শুনলেন না তাত্যা। মানসিংহ বললেন, 'আপনি নিজেই ধরা দিন না।'

'না। সে আমি পারব না। ঝাঁসির রাণীর কাছে শপথ আছে। তা ছাড়া তাতে তোমার বিপদ বাড়বে। আর এতে তুমি পাবে পুরস্কার।'

অগত্যা মানসিংহ ইংরেজ কর্তাদের কাছে খবর পাঠালেন, তাত্যা ধরা পড়েছে, তিনিই বুদ্ধি ক'রে ধরেছেন। ওঁরা যেন ব্যবস্থা করেন এখনই।

ইংরেজদের হাজতে গিয়ে তাঁতিয়া বহুদিন পরে শান্তিতে ঘুমোলেন।

শপথের মূল্য

১২৬৪ বঙ্গাব্দের জ্যৈষ্ঠ মাস। এখন যেটাকে উত্তর প্রদেশ বলা হয়—সেই সমস্ত ভূখণ্ডটা জুড়ে সূর্যদেব প্রলয়ঙ্কর অগ্নিবর্ষণ শুরু করেছেন—যেন আগুনের তাণ্ডব চলেছে চারিদিকে।

ফতেপুরের পুলিস সাহেব হিকমৎ উল্লা খাঁ কিছুতেই ঘরে টিকতে পারলেন না তবু। তখনও বেলা চারটে বাজে নি, পথেঘাটে বেরোনো দায়, যাদের একান্ত না বেরোলে নয়, তারাই কেবল বেরিয়েছে, নইলে বাকী সবাই—বন্ধদোর-জানালা এবং খসখসের পরদা—এর ভেতর করেছে আত্মগোপন।

কিন্তু মুশকিল হয়েছে এই, মানুষও আজ চুপ ক'রে বসে নেই। সেও শুরু করেছে আগুন নিয়ে খেলা। সিপাহী বিদ্রোহের আগুন জ্বলেছে, সে আগুন ছড়িয়ে পড়েছে ব্যারাকপুর থেকে মীরাট পর্যন্ত—সেই আগুনেরই স্ফুলিঙ্গ এসে পৌঁছেছে এই ফতেপুরেও। এখানেও জ্বলেছে দাবানল। কিন্তু আগুন যদি শুধু বাইরেটা পুড়িয়েই থামত।

সে আগুন জ্বলেছে আজ প্রবল প্রতাপান্বিত হিকমৎ উল্লা খাঁ সাহেবের বুকেও।

তাই তিনি সূর্যের দাবদাহ উপেক্ষা ক'রে—ছট্‌ফট্‌ করতে করতে বেরিয়ে এলেন ঘর থেকে। বাগানের প্রান্তে বড় নিমগাছটার ছায়ায় মাটির ওপরই থপাস ক'রে বসে পড়লেন। হাতে ছিল একখানা ভেজা গামছা—সেইটেতেই কপাল, মুখ, ঘাড় মুছে নিয়ে মাথায় চাপালেন।

না, স্বস্তি নেই কিছুতেই। ঘরে বাইরে, কোথাও না।

অথচ কয়েকদিন আগেও তো এমন ছিল না। টাকার সাহেবকে তাঁরা যেদিন সকলে মিলে হত্যা—হাঁ হত্যাই করেছিলেন—সেদিন পর্যন্ত তো না। এমন কি তার পরের দিন পর্যন্তও নয়। সেদিনও বিজয়গর্বেই গর্বিত ছিলেন তিনি, সার্থকতার আনন্দে প্রসন্ন ছিলেন। তবে আজ এ কী হ'ল?

টাকার। বিচারপতি টাকার। ঐ লোকটাই যত নষ্টের মূল। বেশ করেছেন তাঁরা লোকটাকে মেরে ফেলে। এখন তার আত্মাটাকে যদি পাওয়া সম্ভব হ'ত তো নখে টিপে মেরে ফেলতেন আবারও। তার জন্য এতটুকু অনুতাপ হ'ত না তাঁর।

বন্ধু। হ্যাঁ, টাকার সাহেব তাঁকে বন্ধুই মনে করতেন। তিনি ছিলেন বিচারপতি, হিকমৎ উল্লা খাঁ ছিলেন পুলিসের বড় সাহেব। দু-জনের হৃদ্যতা হওয়া খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু তাই ব'লে অত বিশ্বাস করার কোন কারণ ছিল না। টাকার একান্ত নির্বোধ ছিলেন—তাই এমনটা হ'তে পারল। তার জন্য হিকমৎ উল্লা খাঁ নিশ্চয়ই দায়ী নন।

খবর তো টাকার সাহেবও পেয়েছিলেন।

দিল্লী, মীরাট, আম্বালা, চারিদিকেই গোলমাল হচ্ছে, একথা টাকারের কানে গিয়েছিল নিশ্চয়ই। নইলে তিনি তাঁর স্ত্রী পুত্র আত্মীয়স্বজন, ফতেপুরের অন্যান্য সাহেব মেমদের এলাহাবাদ দুর্গে পাঠাবেন কেন? আর সংশয় যখন মনে দেখা দিয়েছিল নিজে কী ভরসায় রইলেন ফতেপুরে? ঈশ্বরের ভরসায়! হোঃ, ক্রেস্তানদের আবার ঈশ্বর। কী করলে সে ঈশ্বর! বাঁচাতে পারলে হিকমৎ উল্লা খাঁর দলবলের হাত থেকে?

বিচারপতি রবার্ট টাকারকে সাধারণ মানুষের সঙ্গে তুলনা করলে অবশ্য ভুল করাই হবে। শুধু ধর্মভীরু নন।—একেবারে ধর্মপাগল ছিলেন তিনি।

তিনি বিশ্বাস করতেন যে খ্রীষ্টধর্মে বিশ্বাস করতে না শিখলে ভারতবাসীদের মুক্তি নেই, ওদের ভালর জন্তেই যীশুর বাণী প্রচার করা দরকার। বেচারীরা জানে না কী অমৃত থেকে বঞ্চিত রয়েছে তারা।

তাই তিনি অবসর পেলেই, বা কাছারী থেকে ফিরে প্রত্যহই দেশীয় লোক-জনদের ডেকে বাইবেল পড়ে শোনাতেন, ব্যাখ্যা করতেন যীশুর বাণী। তিনি ভাবতেন এদের উপকারই করছেন, এরা কৃতজ্ঞ থাকবে। আসলে ফল হ'ত উল্‌টো—হিন্দু-মুসলমান সকলেই—সামনে ভয়ে কিছু বলতে পারত-না, কিন্তু মনে মনে বিদ্বেষ পোষণ করত। ধর্ম কেড়ে নেবার ফন্দী বদমাইশ লোকটার।

এদের দলে হিকমৎ উল্লাও ছিলেন।

অথচ তাঁকেই টাকার বিশ্বাস করতেন সবচেয়ে বেশী। যখন প্রথম গোল-মেলে খবর এসে পৌছতে শুরু হ'ল তখনই তিনি হিকমৎ উল্লা খাঁকে ডেকে পাঠালেন, 'হিকমৎ এ কী শুনছি সব। এখানেও কি সব হাঙ্গামা হবে নাকি ?'

'পাগল হয়েছেন! এখানে করবে কে ? এখানে কি সিপাহী আছে ?'

'তা নেই। কিন্তু পুলিস, স্থানীয় লোকজন ?'

'তার জন্তে আমি তো আছি।' আশ্বাস দিয়ে বলেছিলেন হিকমৎ উল্লা।

'তোমার উপর ভরসা রাখতে পারি তো ?'

'খোদা জামিন!'

হাত বাড়িয়ে ওর হাতখানা ধরে অনেকক্ষণ ধরে করমর্দন ক'রেছিলেন টাকার—'ব্যস্! আমি নিশ্চিন্ত রইলুম!'

কিন্তু সবাই ঠিক টাকারের মতো অত সরল এবং ঈশ্বর-বিশ্বাসী নয়। তারা হিকমৎ উল্লা খাঁর শপথের ওপর ভরসা ক'রেও বসে থাকতে পারল না। ভয়ে ভয়ে এসে টাকারকে জানাল যে—হাওয়া ভাল নয়, তারা আর এখানে থাকতে ভরসা পাচ্ছে না।

'বেশ তো, যারা যেতে চাও তারা চলে যাও। আমি ব্যবস্থা ক'রে দিচ্ছি।'

এলাহাবাদে পাঠিয়ে দিলেন সবাইকে। ওঁর নিজের পরিবারের লোকজনও সেই সঙ্গে চলে গেলেন। তাঁরা সবাই ওঁকেও নিয়ে যাবার চেষ্টা করলেন। কিন্তু তিনি একেবারে নিরুদ্বিগ্ন, নিশ্চিন্ত। বললেন, 'পাগল! আমার কাজ ছেড়ে কোথায় যাবো ?'

'কিন্তু আপনি বাঁচলে তো কাজ। কী ভরসায় থাকবেন আপনি?'

'কেন ঈশ্বরের ভরসায়! ঈশ্বরের নামে শপথ করেছে হিকমৎ। সে যদি বা বেইমানী করে, আমি তার ওপর আস্থা হারাব কেন? তোমরা যাও, আমি ঠিক আছি।'

ঠিকই রইলেন তিনি। হিকমৎ উল্লা খাঁ রোজ আসেন, গল্প করেন, বাইবেল শোনেন। শেষে একদিন শোনা গেল সাহেবদের খালি ঘর-দোরে আগুন লাগানো হচ্ছে, লুটপাট শুরু হয়ে গেছে। সারারাত উদ্বেগে কাটালেন টাকার, পরের দিন হিকমৎ কিন্তু এলেন না। তখন টাকার চিঠি লিখে পাঠালেন। এই তো অবস্থা—সরকারী কোষাগার পাহারা দেবার কী হবে? হিকমৎ যেন এখুনি আসেন—একটা পরামর্শ করা দরকার।

এইবার হিকমতের আসল চেহারাটা বেরিয়ে পড়ল।

হিকমত বলে পাঠালেন এখন বড় গরম, এই রোদে তিনি আসতে পারবেন না। বেলা পড়লে আসবেন—এবং স-দলবলেই। কোষাগারের জন্য ভাবনা নেই, ও তো এখন দিল্লীর বাদশা বাহাদুর শার সম্পত্তি। জজ সাহেব বুঝি এখনও জানেন না যে কোম্পানীর রাজ চলে গিয়েছে? তিনি এখন নিজের ভাবনা ভাবুন, তাঁর ঈশ্বরকে স্মরণ করুন তিনি—কারণ তাঁর দিনও ফুরিয়ে এসেছে।

চাকরটা ঠক্ ঠক্ ক'রে কাঁপছিল খবরটা দিতে দিতে। তার চোখে জল।

'সাহেব এখনও বোধহয় সময় আছে। পালান শীগ্‌গির।'

টাকার হাসলেন। ওর পিঠে হাত চাপ্‌ড়ে আশ্বস্ত করলেন। তারপর কাছে যা খুচরো নগদ টাকা ছিল সব দিয়ে, নিজের ঘড়িটি উপহার দিয়ে বললেন, 'পালাও বেটা। আমি ঠিক আছি। তুমি এবার নিজের জান বাঁচাও।'

কাছারী বাড়ির সঙ্গেই ওঁর বাসস্থান। তিনি দোর-জানালা সব বন্ধ করলেন ভাল ক'রে। বন্দুক পিস্তল যা ছিল সবগুলিতে টোটা ভরলেন। সামান্য কিছু আহারও ক'রে নিলেন। তারপর নিশ্চিন্ত হয়ে বসলেন বাইবেল নিয়ে।...

হিকমৎ এক-কথার মানুষ। বেলা পড়তেই তিনি দেখা দিলেন—এবং স-দলবলেই। হৈ হৈ করতে করতে এসে পড়ল প্রায় এক হাজার লোক। তাদের

চোখে রক্ত এবং লুটের নেশা।

'তোমার ভগবানকে স্মরণ করো টাকার সাহেব। শেষের কথাটা ভাবো।' হিকমৎ নিজেই এগিয়ে এসে বললেন।

'কিন্তু তুমি তোমার খোদার নামেও শপথ করেছিলে হিকমৎ উল্লা খাঁ। ঈশ্বর সকলেরই সমান।' বন্ধদোরের ভেতর থেকে টাকার সাহেব জবাব দিলেন।

'হ্যাঁ।' তাচ্ছিল্যের সঙ্গেই হিকমৎ উল্লা খাঁ বললেন, 'কুকুর বেড়ালের কাছে শপথ, তার আবার মূল্য কি? আংরেজ কেরেস্তান কুত্তা ছাড়া কিছু নয়।'

'তবু ঈশ্বর ঈশ্বরই। তাঁর নামটা তো নিয়েছিলে—যার কাছেই নাও। এতটা বেইমানী ক'রো না হিকমৎ। পরকালে তোমাকেও জবাব দিতে হবে।'

'পরকালের এখনও দেরি আছে। ইহকালটা আগে ভোগ করি।'

হিকমৎ ইঙ্গিত করলেন, লোকজন এগিয়ে এসে জানালা দরজা ভাঙতে শুরু করল। টাকার সাহেব এইবার ধরলেন হাতিয়ার। ছাদের একটা কোণ থেকে চালালেন গুলি। অব্যর্থ লক্ষ্য তাঁর। এক-দুই-আট-দশ—। একের পর এক লোক মাটি নিচ্ছে। একে একে ষোলটি লোক ঘায়েল হ'ল। কিন্তু হাজার লোকের ভেতর ষোলটা গেলেই বা ক্ষতি কি! এধারে টাকারের টোটা এল ফুরিয়ে। দোরও ভেঙে পড়ল এইবার। উন্মত্ত আক্রোশে ঢুকে সেই শত শত লোক ঝাঁপিয়ে পড়ল টাকারের ওপর—টুকরো টুকরো ক'রে ফেলল তাঁকে। শেষবারের মতো ঈশ্বরকে স্মরণ করলেন তিনি—'ঈশ্বর ক্ষমা করো।'

বিচারপতি টাকার পরম বিচারপতির দরবারে গিয়ে হাজির হলেন এবার।

না, হিকমৎ উল্লা খাঁ নিজের হাতে আঘাত করেন নি টাকারকে—এটা ঠিক। কিন্তু করলেও অনুতপ্ত হতেন না। কুকুর বেড়ালকে মেরে মানুষ অনুতপ্ত হয় না। বিশেষ যদি সে পোষা কুকুর বেড়াল না হয়। ঠিকই হয়েছে, উচিত শাস্তিই হয়েছে লোকটার। ওদের সবাইকে ভুলিয়ে ক্রীশ্চান করতে এসেছিল, তার উপযুক্ত জবাব দেওয়া হয়েছে। তার জন্যে একটুও দুঃখিত নন তিনি। টাকারকে হত্যা করার পর তাঁর সম্পত্তি লুঠ করতেও তিনিই হুকুম

দিয়েছিলেন বটে—কিন্তু তাতেই বা কি? যাকে প্রাণদণ্ড দেওয়া হ'ল জনসাধারণের বিচারে—তার সম্পত্তিও জনসাধারণে বাজেয়াপ্ত হওয়া উচিত। তাঁর বাড়িতেও এসেছে কিছু। তাতেও এমন কিছু অন্যায় হয় নি। তিনিও কি জনতার একজন নন?

হু-হু ক'রে বইছে আতপ্ত হাওয়া। একেই 'লু' বলে। এ হাওয়া খালি-গায়ে লাগলে ফোসকা পড়ে। এ হাওয়া মানুষের ঘাড়ের রক্ত শুষে নেয়, এ হাওয়া যমপুরীর হাওয়া।

মুখ কি পুড়িয়ে দিয়ে যাচ্ছে হিকমৎ উল্লা খাঁর?

নেশার মতো সর্বশরীর কি ভেতরে ভেতরে টলছে তাঁর? কাঁপছে তাঁর হাত-পা? কিন্তু বুকের আগুন যে এর চেয়েও বেশি!

যে আতঙ্ক, যে অকারণ এবং অভূতপূর্ব ভয় তাঁকে ক'দিন ধরে পেয়ে বসেছে, যার বর্ণনা দেওয়া যায় না, যা উপহাসের ভয়ে বন্ধুবান্ধবদের কাছে এমন কি নিজের স্ত্রীর কাছেও বলা যায় না—তার হাত থেকে অব্যাহতি পাবার জন্য তিনি এর চেয়েও ভয়ঙ্কর দাবদাহের মধ্যে জ্বলতে রাজী আছেন।

হে খোদা! যদি এই বিভীষিকা থেকে কোনমতে উদ্ধার পেতে পারতেন শুধু।

ঠিক সাতদিন আগে শুরু হয়েছে। টাকারের মৃত্যুর তিনদিন পর থেকে। দুটোর ভেতর কি কোন যোগাযোগ আছে?

এ-কদিন ধরে তিনি নিজের মনেই প্রবল প্রতিবাদ করেছেন এমন কোন ধারণার। কিন্তু আজ যেন কেমন আর জোর পাচ্ছেন না। ভেতরে ভেতরে ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন।

ছায়ার মতো ফিরছে তাঁর সঙ্গে সঙ্গে।

ঘরে গেলেই দু'পাশে এসে বসবে।

একটি কুকুর আর একটি বেড়াল!

কী ভয়ঙ্কর দেখতে দুটো জীবই! কী কদাকার এবং বীভৎস! কী হিংস্র তাদের চোখের চাহনি! তারা ডাকে না, সাড়া দেয় না, তাড়া করে না, শুধু দু-পাশে বসে শান্ত স্থির দৃষ্টিতে তাঁর দিকে চেয়ে থাকে।

প্রতিকার ? হ্যাঁ—প্রতিকারের চেষ্টা করেছেন বৈকি। লাঠি নিয়ে তাড়া করেছেন, তলোয়ার বর্শা বসিয়ে দিতে চেষ্টা করেছেন ওদের গায়ে—কিন্তু সে অস্ত্র প্রয়োগ ওঁকেই উপহাস করেছে শুধু। শূন্যে অস্ত্র আস্ফালনের মতোই ফল হয়েছে। লাঠি ঘুরে এসেছে—ওদের গায়ে লাগে নি। সজোরে তলোয়ার চালাতে গিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়েছেন নিজেই। ওদের গায়ে লাগে নি কিছু, ওরা নড়েও নি একচুল।

সবচেয়ে মজা—আর কেউই যে দেখতে পায় না।

প্রথম দিনই স্ত্রীকে ডেকে বলেছেন, 'এ কুকুর-বেড়াল ছুটো কোথা থেকে এল ? ছাখো তো—কী বিশ্রী !'

তিনি অবাক হয়ে বলেছেন, 'কুকুর-বেড়াল আবার কোথা থেকে পেলে ? খোয়াব* দেখছ নাকি ?'

'কী আশ্চর্য—দেখতে পাচ্ছ না ? এই যে—'

আরও অবাক হয়ে বিবিজী উত্তর দিয়েছেন, 'কী হ'ল কি তোমার ? মাথা খারাপ হয়ে গেল নাকি ?' সত্যি সত্যিই উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছেন তিনি। সুতরাং চুপ ক'রে যেতে হয়েছে।

এ ভয়টা হিকমতেরও হয়েছে বৈকি।

সত্যিই কি মাথা খারাপ হয়ে গেল তাঁর ?

কিন্তু কই ? আর তো কোথাও কোন গোলমাল নেই। ক'দিন ধরে শহর লুট হয়েছে, তার হিসাবপত্র ঠিক ঠিক বুঝে নিয়েছেন তিনি। ট্রেজারী বা কোষাগারের টাকা নিজের বাড়িতে এনে তুলেছেন, তাতেও কোন ভুলচুক হয় নি। নীল সাহেব কাশীকে শায়েস্তা ক'রে এলাহাবাদের কাছাকাছি এসে পড়েছেন খবর পেয়ে কানপুরে আজিমুল্লা খাঁর কাছে সাহায্য চেয়ে চিঠি লিখেছেন—সব কাজই তো চলেছে ঠিক ঠিক। সবাই তাঁর বুদ্ধির তারিফ করেছে, সকলে মেনে নিয়েছে তাঁকে নেতা ব'লে।

তবে ? এ কি দুর্বলতা তাঁর ?

মজা এই—দিনের বেলা শুধু ঘরের ভেতর গেলেই ওদের দেখতে পাওয়া

* স্বপ্ন।

যায়। কাজের টেবিলে, শোবার ঘরে—সর্বত্র। বাইরে ওরা আসে না—দিনের বেলায় অন্তত। কিন্তু রাত্রে বাইরে শুলেও নিস্তার নেই, ঠিক দুটি দুপাশে এসে বসবে। ক'রাত ঘুম নেই তাঁর। চোখের পাতা বুজোতেও ভয় করে—যদি জানোয়ার দুটো এসে বুকে চেপে বসে? গত তিন চার দিন শোবার চেষ্টাও ছেড়ে দিয়েছেন। কাজের ছুতো ক'রে পথে পথে ঘুরে বেড়ান। চোখের কোলে কেন এমন গভীর কালির দাগ, চোখ দুটো কেন এমন রক্তবর্ণ—সে কৈফিয়ৎ দিতে হয় না, ঐটুকু তবু সুবিধা হয়।

তন্দ্রায় অবশ হয়ে আসছে শরীর। আঃ।

গরম হাওয়া—? তা হোক হিকমৎ এখানে শুয়েই ঘুমোবেন।

কিন্তু ঘুম হ'ল না।

অকস্মাৎ তন্দ্রার মধ্যেই বজ্র গর্জনের মতো কানে দুটি সামান্য শব্দ এসে পৌঁছল। 'মিঁউ'—আর 'ঘেউ'।

চম্‌কে লাফিয়ে উঠে দাঁড়ালেন। ঐ তো—আজ তো এই দিবালোকেই, জ্যৈষ্ঠের এই তীব্র রোদের মধ্যেই দেখা যাচ্ছে—ঐ তো। দুটিতে শান্ত ভাবে তাঁর মুখের দিকে চেয়ে বসে আছে।

কী সাংঘাতিক দৃষ্টি ওদের। কী অবিশ্বাস্য ঘৃণা ওদের চোখেমুখে।

অয়্ খোদা। এ কী করলে। তিনি তো কোন অপরাধ করেন নি—একটা কাফেরকে মেরেছেন মাত্র। পাপের শাস্তিই দিয়েছেন বলতে গেলে। তবে? ঈশ্বরের নামে শপথ ক'রে শপথ ভেঙেছেন? কিন্তু কুকুর বেড়ালের কাছে আবার শপথ করার মূল্য কি?

আবারও চম্‌কে উঠলেন তিনি।

হ্যাঁ—কথাটা তিনিই বলেছিলেন বটে—। টাকার সাহেবও জবাব দিয়েছিল, ঈশ্বর ঈশ্বরই।···

হিকমৎ উল্লা পাগলের মতো ছুটে গেলেন কুয়াতলায়। বালতিটা নামিয়ে জল তুললেন এক বালতি। হড় হড় ক'রে মাথায় ঢাললেন সবটা। অসহ্য রোদে বাড়িশুদ্ধ সবাই দরজা-জানলা বন্ধ ক'রে ঘুমোচ্ছে, কেউ টেরও পেলে না।

আঃ। মাথাটা কি ঠাণ্ডা হ'ল?

চোখ মুখ মুছে ফেললেন গামছায়। তাকালেন ভাল ক'রে। সে ছুটো আছে কি? নেই। আপদ গেছে। অতিরিক্ত গরমেই বোধ হয়—আর মনের মধ্যে কদিন কথাটা দিনরাত তোলাপাড়া ক'রেই—

হিকমৎ সুস্থ বোধ করলেন খানিকটা। আবার নিমগাছটার দিকে চললেন। ঐ ছায়াতে বসে একটু ঘুমিয়ে নিতে হবে, নইলে শরীর আর টিকবে না। সত্যিই পাগল হয়ে যাবেন তিনি।

কিন্তু—। দু-চার পা এগিয়েই পিছনে একটা অশরীরী উপস্থিতি যেন অনুভব করলেন। কে যেন, কারা যেন চলেছে তাঁর সঙ্গে সঙ্গে। পিছন ফিরে তাকালেন। তারাই তো—অমোঘ নিয়তির মতো নিঃশব্দে সঙ্গে সঙ্গে আসছে।...

পাগলের মতো চিৎকার ক'রে উঠলেন হিকমৎ উল্লা খাঁ।...

ছুটে বেরিয়ে পড়লেন নিজের বাগান থেকে। রাস্তায় পড়েও থামতে পারলেন না। ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে চললেন। পিছন ফিরে দেখবারও সাহস হ'ল না তাঁর—তারা আসছে কি না আসছে।...

রোদ পড়ে আসছে তখন। বাইরের বহ্নিতাণ্ডব যেন এবার পরিশ্রান্ত হয়ে পড়েছে। দু-একজন ঘরের বাইরে বেরোতে শুরু করেছে। দোকানীরা এক-আধজন ঝাঁপ খুলেছে দোকানের। তারা অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল। কী হল কি কোতোয়াল সাহেবের! বাড়িতে কারুর অসুখবিসুখ হ'ল না কি? কিন্তু বিস্ময়ের ঘোরটা কাটিয়ে প্রশ্ন করতে করতে কোতোয়াল সাহেব দূরে গিয়ে পড়লেন—কোন প্রশ্নই তাঁর কানে যাচ্ছে না। কারণ তিনি ছুটছেন, ছুটছেন, —যেন পিছনে কোন আততায়ী তাঁকে তাড়া করেছে, প্রাণভয়ে তিনি ছুটছেন।...

অবশেষে একসময়ে তাঁকে থামতে হ'ল। কলিজার দম ফুরিয়ে এসেছে, বুকে যেন হাপরের পাড় পড়ছে। আর নিঃশ্বাস নিতে পারছেন না। ভারী শরীর—এতখানি ছুটে আসাই তো তাঁর উচিত হয় নি।

কিন্তু এ কি—?

এ কোথায় এসে পড়েছেন তিনি ? এ যে কাছারী বাড়িতে এসে থেমেছেন একেবারে !

দোর জানলা ভাঙা—চারিদিক হা-হা করছে। আসবাব-পত্র সব লুঠ হয়ে গেছে। কতকগুলো কাঠ্‌রা বাইরে এনে আগুন লাগানো হয়েছিল, তার ছাই পড়ে আছে এখনও। শ্মশানের মতো মনে হচ্ছে বাড়িটা।

আশ্চর্য ! এবার আর পিছনে নয়। ওঁর নির্মম সহচর দুটি এবার চলেছে তাঁর আগে আগেই। যেন পথ দেখিয়ে চলেছে তাঁকে। ঐ তো ফিরে ফিরে ইঙ্গিত করছে—

অভিভূতের মতো, মন্ত্রমুগ্ধের মতো আচ্ছন্নভাবে এগিয়ে চললেন—পুলিস সাহেব হিকমৎ উল্লা খাঁ। ভেতরের দুটো বড় বড় ঘর পেরিয়ে সিঁড়ি দিয়ে উঠে গেলেন নিঃশব্দে।

উঃ ! কী একটা দুর্গন্ধ ! ও—ঐ যে সিঁড়ির কোণটাতে এখনও ক'খানা হাড় পড়ে আছে। শিয়াল কুকুরে ছেঁড়াছেঁড়ি করেছে কতদিন ধরে কে জানে, মেদ প্রায় সবই গেছে, কঙ্কালের গায়ে লেগে আছে দু-এক টুকরো পচা মাংস। তারই এত গন্ধ।

তবে কি এটাই টাকার সাহেবের দেহ ? কে জানে ! আজ আর চেনার তো কোন উপায় নেই !

সেদিকে একদৃষ্টে চেয়ে থাকতে থাকতে হিকমৎ উল্লা খাঁর মনে হ'ল কঙ্কালটা কথা বলছে। এ ওঁর কল্পনামাত্র—মাথা-গরমের কল্পনা—বার বার বোঝাতে লাগলেন মনকে, তবুও যেন কান পেতে রইলেন।

কী বলছে কবন্ধটা ?

'খোদা জামিন !'

কিন্তু কার কণ্ঠস্বর এ ? এ তো হিকমৎ উল্লারই গলা। এইখানে এই বাড়িতে দাঁড়িয়েই যেন কথাগুলো বলেছিলেন তিনি। হ্যাঁ—এই মাত্র ক'দিন আগে।

চিৎকার ক'রে উঠলেন হিকমৎ। প্রাণপণ আর্তনাদের মতো।

খালি বাড়িতে কেমন একটা ভয়াবহ ধ্বনির তরঙ্গ তুলে প্রতিধ্বনিত হ'তে লাগল শব্দটা।

পাগলের মতো চারিদিকে তাকিয়ে দেখলেন কোতোয়াল সাহেব।

একখানা তলোয়ার পড়ে আছে পাশেই। হয়ত এইটে দিয়েই ওরা মেরেছিল টাকারকে। টাকারের বন্দুক নিয়ে চলে গেছে লুটেরার দল—তলোয়ারখানা ফেলে গেছে। রক্তমাখা তলোয়ার।

ও কি! কুকুর বেড়াল ছুটো এখনও যায় নি। ইঙ্গিত করছে তলোয়ারটার দিকেই! ছুটে গিয়ে তুলে নিলেন তলোয়ারখানা, পাগলের মতো ঝাঁপিয়ে পড়লেন ঐ ছুটো শয়তানের ওপর। কিন্তু আজও ব্যর্থ হ'ল সে আস্ফালন, শূন্যে আঘাত করার মতো নিজেই মুখ থুবড়ে পড়লেন।

মনে হ'ল আজ এই প্রথম—কুকুর বেড়াল ছুটো হেসে উঠল, তাঁকে বিদ্রূপ ক'রেই!

আর সহ্য করতে পারলেন না কোতোয়াল সাহেব—

সেই তলোয়ার ঘুরিয়ে নিজের বুকেই বসিয়ে দিলেন—আমূল।

'আয়্ খোদা! মাফ্ করো এবার। দয়া করো!' অস্ফুটকণ্ঠে এই কথা ক'টা বলতে বলতে লুটিয়ে পড়ল হিকমৎ উল্লা খাঁর দেহ।

'খোদা জামিন!' আবারও একটা শব্দ উঠল যেন কঙ্কালটার মুখগহ্বর থেকে। সেই সামান্য শব্দও বহুক্ষণ ধরে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হ'তে লাগল খালি কাছারী বাড়িটার শূন্য ঘরে ঘরে।

এক রাত্রি

গাঙ্গুলী মশাইএর বৈঠকখানায় রোজই সন্ধ্যেয় আমাদের আড্ডা বসত। তাস, পাশা, দাবা যেদিন যা খুশি খেলা হ'ত, আর বৌদির হাতের তৈরী কচুরী, সিঙ্গাড়া, গোটা দিয়ে মাখা মুড়ি কিম্বা মরিচ ও ঘি মাখা চিঁড়ে ভাজা খাওয়া হ'ত। কমিসরিয়েটে কাজ ক'রে ভদ্রলোক পেন্সন নিয়ে দেশে এসে বসেছেন। ছেলেপুলে নেই—কাজেই পয়সারও অভাব নেই। আমাদের খাইয়ে এবং নিজেরা খেয়ে যে কদিন ফুর্তিতে কাটিয়ে দেওয়া যায়—এই ছিল তাঁর মনের ভাব।

আশু রক্ষিত, গোষ্ঠ হালদার আর নিতাই পাকড়াশী বুড়োদের মধ্যে এই তিনজন আর ছোকরাদের মধ্যে আমি, সুশীল আর ইন্দু-আমরা নিয়মিত

যেতুম। এ ছাড়াও দু-চারজন ক'রে অনিয়মিত অতিথি প্রায়ই জমত। ওটা যেন আমাদের নেশার মতো হয়ে গিয়েছিল।

সব দিনই যে খেলা হ'ত তা নয়, এক-একদিন গল্পও হ'ত—গাঙ্গুলী মশাই কত দেশ বেড়িয়েছেন সেখানকার গল্প—তাঁর সেই সব বিচিত্র অভিজ্ঞতা আমাদের খুবই ভাল লাগত। তাই পরশুদিন সন্ধ্যে না হ'তে হ'তেই বৃষ্টি নামল ব'লে আমরা সব ধরে পড়লুম, গল্প শোনাতে হবে। বৃষ্টি কি একটু আধটু ? সে যেন প্রলয় ঘনিয়ে এল একেবারে। যেমন তুমুল বৃষ্টি তেমনি আকাশের ডাক, সঙ্গে সঙ্গে একটু ঝড়ও। শীগগির যে থামবে সে রকম কোনও সম্ভাবনাই দেখা গেল না।

ঘরের মধ্যে দোর জানালা বন্ধ ক'রে মুড়িসুড়ি দিয়ে আমরা ক'টি লোক বসে আছি, সামনে মুড়ির থালা আর গরম বেগুনি, বৌদি পাশের ঘরে বসে স্টোভে ভেজে মাঝে মাঝে দিয়ে যাচ্ছেন—এই তো গল্পের সময়!

গাঙ্গুলী মশাই একখানা আলুর বড়ায় কামড় দিয়ে বললেন, 'গল্প আর কি বলব, সব গল্পই তো তোমরা শুনে ফেলেছ। যে গল্পটা শোন নি সেইটেই আজ শোনাব। কে জানে কেন আজ কেবল অসিত মিত্তিরের কথাটাই মনে পড়ছে।'

একটু নড়েচড়ে—বেশ জাঁকিয়ে বসে গাঙ্গুলীমশাই শুরু করলেন—

তোমাদের মনে আছে বোধ হয় আমি ১৯১০ সালে প্রথম মীরাটে বদলী হই। ওখানে চার বছর থাকবার পর ১৯১৪ সালে লড়াই বাধতে পিণ্ডিতে চলে যাই। মীরাটের কথা তোমাদের বহুবার বলেছি, কাজেই সে সব কথায় এখন আর দরকার নেই। গল্পটাই আরম্ভ করি।

ওখানে গিয়ে পর্যন্ত অসিত মিত্তিরের কথা শুনেছি। লোকটা আগে নাকি কমিসারিয়াটে কাজ করত, পেন্সন নিয়ে মীরাটেই আছে—পাঁড় মাতাল, পেন্সন পাবার পরের দিনই পেন্সনের টাকা ফুরিয়ে যায়, এমনি অবস্থা। ওখানে যে ক'ঘর বাঙালী আছে তাদের সাহায্যেই কোনও রকমে পেটে ভাত যায়। বহুবার ওর পেন্সন বন্ধ করার কথা উঠেছে কিন্তু ও নাকি মিউটিনির সময়ে অনেক সাহেবের প্রাণ বাঁচিয়েছিল ব'লে ওপরওয়ালা সাহেবেরা পেন্সন বন্ধ করতে দেয় নি। এই সব শুনতুম।

শুনেছিলুম ঐ পর্যন্ত, লোকটিকে দেখিও নি, দেখবার কৌতূহলও ছিল না। ওখানে যাবার মাস তিনেক পরে একদিন সন্ধ্যের সময় বাড়িতে বসে আছি, চাকর এসে খবর দিল একটি বাঙালী বাবু দেখা করতে চায়। একটু আশ্চর্য হলুম, কেন না আমার বন্ধুবান্ধবদের সকলকেই চাকরটা চিনত—তাছাড়া আর বাঙালী কে এখানে আছে, আর কেনই বা আসলে? যাই হোক—বললুম এখানে নিয়ে আয়।

একটু পরেই লোকটি এসে ঘরে ঢুকল। অত্যন্ত বুড়ো, দেখলে-মনে হয় যেন আশী নব্বই বছর বয়স হবে। পরে শুনেছিলুম মোটে পঁচাত্তর, মদ খেয়ে খেয়ে ঐ রকম হয়েছে। রোগা লম্বা চেহারা, এককালে হয়ত সুন্দরই ছিল কিন্তু অত্যাচারে এখন কিছু অবশিষ্ট নেই। মুখের দাড়ি গোঁফ কামানোর অভ্যাস আছে কিন্তু বোধ হয় দশ-বারোদিন কামানো হয় নি। কাপড় আর ছেঁড়া শার্ট দুটোই এত ময়লা যে দেখলে গা বমি-বমি করে। এধারে, ঐ রকম ভিখিরীর হাল হ'লে কি হয়, ছেঁড়া শার্টের ফাঁক দিয়ে একছড়া সোনার হার চিক্ চিক্ করছিল।

আগন্তুক লোকটি হাত তুলে নমস্কার ক'রে বলল, 'প্রাতঃপ্রণাম গাঙ্গুলী-মশাই। আমি অসিত মিত্তির, নাম নিশ্চয়ই শুনেছেন। মাতাল বলে আমার একটা খ্যাতি আছে।'

লোকটার নির্লজ্জ ধৃষ্টতায় অবাক হয়ে গেলুম। এই তাহ'লে অসিত মিত্তির! বহু কু-খ্যাত!

চেয়ারটা দেখিয়ে বললুম, 'বসুন। কি দরকার আপনার?'

অসিত বলল, 'আমার নাম যখন শুনেছেন, তখন সবই শুনেছেন। বড় অভাব, মাসের শেষ হয়ে এল বুঝতে পারছেন তো? কিছু দিতে হবে।'

আমার সারা অঙ্গ জ্বলে গেল। একটু ঝাঁঝের সঙ্গেই বললুম, 'কেন? মদের দাম?'

অসিত হেসে বলল, 'আজ্ঞে না। পরের পয়সায় মদ খাই না। পেন্সনের টাকা পেয়ে কিছুদিন মদ খাই; ঘরের জিনিস পত্তর যতদিন কিছু ছিল তাও বেচে মদ খেয়েছি। তার পর যখন কিছুই থাকে না তখন ভিক্ষে করি প্রাণধারণের জন্য। ওতে শুধু ভাতই হয়, মদ খাওয়া হয় না। সকলেই আমাকে জানেন,

দয়া ক'রে বুড়ো মানুষকে দেনও কিছু কিছু। আজ হাতে কিছুই ছিল না, সমস্ত দিন ও কর্ম হয় নি। আপনার নাম শুনেছিলুম, ভাবলুম যখন তিন মাস এসেছেন তখন আমার কথা সবই শুনেছেন নিশ্চয়। নতুন লোকের কাছে টপ ক'রে যাই না—নিজের খ্যাতিটা শোনবার অবসর দিই।'

লোকটা বেশ সপ্রতিভ ভাবেই কথাগুলো বলে যাচ্ছিল। রাগ বেশিক্ষণ রাখতে পারলুম না। হেসে বললুম, 'একটু চা খাবেন?'

সে হাত জোড় করে বলল, 'তা হ'লে তো হাতে স্বর্গ পাই। কতদিন খাই নি।'

চাকরকে ডেকে বাড়ির মধ্যে থেকে কিছু খাবার আর এক পেয়ালা চা আনতে বলে দিলুম। তারপর ওকে জিজ্ঞাসা করলুম, 'থাকেন কোথায়?'

সে বলল, 'যেখানে হোক। একটা ঘর আছে, অনেকদিন ভাড়া দিই নি কিন্তু বাড়িওলা দয়া ক'রে থাকতে দেয়। যেদিন মাত্রা বেশি হয় সেদিন নর্দমায় পড়ে থাকি, আর ফিরতে পারি না। মাসের শেষে মদ যখন জোটে না, তখন সেখানে গিয়ে রাত্রে শুই। শীতকালে তারাই একখানা কম্বল দেয় আবার ফিরিয়ে নেয়, নইলে হয়ত বেচে মেরে দেব।'

বললাম, 'আপনার আত্মীয়স্বজন কেউ নেই?'

ততক্ষণে খাবার এসে পৌঁছেছে, সে খেতে খেতে বলল, 'কোথা পাব বলুন? মা তো আমার ছেলেবেলাতেই মারা গেছেন। একটা ভাই ছিল সেও অনেক দিন গেছে। তা ছাড়া তারা বাঙলায় থাকত।'

'বিয়ে করেন নি?'

অসিত গম্ভীর ভাবে বলল, 'না। তারই প্রতীক্ষায় আছি। সে অনেক কথা —একদিন বলব এখন।'

কথাটা ঘুরিয়ে অন্য কথা পাড়লুম, 'কিছুই নেই বলছেন কিন্তু গলার হার ছড়াটা কি সোনার নয়?'

চায়ের পেয়ালা নামিয়ে রেখে বলল, 'খাঁটি সোনার। কিন্তু ও সোনার হার বেচে মদ খাবার মতো মাতাল অসিত মিত্তির কোনও দিনই হবে না। তিপ্পান্ন বছর আগে এ হার একজন গলায় পরিয়ে দিয়েছিল, মরবার আগে কেউ আমার গলা থেকে খুলতে পারবে না, দেহে প্রাণ থাকতে কাউকে খুলতে দেব না...

শুনবেন সে সব কথা ?'

আমি সাগ্রহে সম্মতি দিলাম। বুড়ো মানুষ—কিছুক্ষণ স্থির হয়ে বসে যেন সব মাথার ভেতর গুছিয়ে নিল, তারপর বলতে শুরু করল—

তখন আমার বাইশ বছর বয়স, মীরাটে আমি বদলি হয়ে আসি যখন। আমিও এলুম আর মিউটিনীও বাধল। এখন যা মীরাট দেখছেন তিপ্পান্ন বছর আগে মীরাটের চেহারা ছিল অন্য রকম। চওড়া রাস্তা একটাও ছিল না বললেই হয়। এখন ক্যান্টনমেন্টের দিকটা অনেকটা ভদ্রলোকের মতো হয়েছে, তখন ওখানকার অবস্থাও খারাপ ছিল। অত্যন্ত নোংরা শহর এই মীরাট। তবু আমাদের ভাল লাগত। পিণ্ডি কিংবা অমৃতসরের চেয়ে এখনও অনেকের মীরাট ভাল লাগে।

মিউটিনির সময় আমরা যে কজন বাঙালী ছিলুম আমাদের যে সে কি অবস্থা তা মুখে বোঝাবার নয়। "রামে মারলেও মারবে আর রাবণে মারলেও মারবে" একটা কথা আছে না ? আমাদের ঠিক সেই মারীচের দশা। সিপাইরা সন্দেহ করত আমরা ইংরেজের দলে আর ইংরেজরা মনে করত যে আমরা সিপাইদের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করেছি। নিরপেক্ষ থাকবারও যো নেই, সিপাইদের কাছে প্রমাণ করতে হবে যে আমরা তাদের দলে আর ইংরেজদের কাছে প্রমাণ করতে হবে যে আমরা প্রাণপণে সিপাইদের বিরুদ্ধে চক্রান্ত করছি। কখন যে কার কাঁচা মাথাটি কাটা যায় তার ঠিক ছিল না।

শেষে আমরা যে কজন বাঙালী ছিলুম একত্র থাকবার ব্যবস্থা ক'রে নিলুম। মরি তো একসঙ্গে মরব আর যদি আত্মরক্ষা করতে পারি, একত্রে থাকলেই তা করা সম্ভব হবে।

আগেই বলেছি আমার তখন বাইশ বছর বয়স, চেহারাটাও ছিল জোয়ান মতো (সুপুরুষ বলেও একটা খ্যাতি ছিল) আর বুকে সাহসও ছিল অসীম। বিপদকে খুব কমই ভয় করতুম। সেইজন্যে সাহেবরা আমাকে ভালবাসত খুব, কাজকর্ম তখন তো একরকম বন্ধ কিন্তু গোরাদের খাবার যোগানোটা লুকিয়ে লুকিয়ে করতেই হ'ত, তা নইলে ওদের কোনও উপায় ছিল না। এ কাজে অবশ্য পয়সাও খুব ক'রে নিয়েছে সকলে ; মিউটিনীর পর প্রাণ নিয়ে যেসব বাঙালী দেশে ফিরে যেতে পেরেছে, তারা দস্তুরমত টাকা নিয়েই ফিরেছে।

একদিন আমাদের ইমিডিয়েট সুপিরিয়র হলস্টন সাহেব আমাকে ডেকে বললেন, অসিত একটি কাজ করতে হবে যে।

আমি বললুম, বল সাহেব কি করতে হবে?

সাহেব বললেন, আমার স্ত্রী লুসী কানপুরে তার ভাইয়ের কাছে ছিল জান তো? ওর ভাই পরশু মরে গিয়েছে, লুসী অনেক কষ্টে প্রাণ নিয়ে পালিয়ে এসেছে। একটা জেলের বাড়ি লুকিয়ে আছে। ক্যান্টনমেণ্ট থেকে সোজা উত্তর দিকে গিয়ে হুসেন শাহী সড়ক বলে যে রাস্তাটা খালের ধার পর্যন্ত চলে গিয়েছে সেই রাস্তা ধরে যাবে। খালের ধারে ভগবান জেলের ঘর খুঁজে বের ক'রো—তাকে এই আংটিটা দেখালেই বুঝতে পারবে। আর লুসীকে এই চিঠিটা দিলে সে বুঝবে যে তোমাকে আমি পাঠিয়েছি তাকে আনবার জন্যে। পারবে তাকে আমার কাছে এনে দিতে?

বুকটা আমার একবার কেঁপে উঠল। তারপর জোর ক'রে সাহস এনে বললুম, পারব।

সাহেব বললেন, ভাল ক'রে ভেবে দেখ, সিপাহীদের অবরোধের মধ্যে দিয়ে যেতে হবে, আর সব চেয়ে শক্ত কথা—আনতে হবে। ভগবান অনেক কষ্টে এসে আমায় খবর দিয়ে গেছে কিন্তু সে সঙ্গে আনতে সাহস করে নি। চারিদিকে শত্রু, তার মধ্যে দিয়ে মেমকে নিয়ে আসা—বুঝছ তো, তুমিও যাবে সে-ও যাবে? কি বলো, সাহস হয়? পারবে?

আমি বললুম, আমার দেহে প্রাণ থাকতে মেম সাহেবের কোন অনিষ্ট হবে না, আর তাঁকে এনে পৌঁছে দেবই। তাঁকে যদি নিয়ে আসতে না পারি সাহেব তাহ'লে আমিও ফিরব না।

সাহেব সন্তুষ্ট হয়ে আমার সঙ্গে শেকহ্যাণ্ড করলেন। বললেন, আমি জানি তোমার মতো চতুর এবং সাহসী আর কেউ নেই মীরাটের মধ্যে। তাই সকলের মধ্যে থেকে তোমায় বেছে নিয়ে আমার নিজের প্রাণের চেয়েও যা দামী তারই ভার দিলুম। এই নাও, চিঠি আংটি আর এই পিস্তল। পিস্তলটা কাছে রেখো, দরকার হ'তে পারে। তুশোটা টাকাও রাখো, যদি প্রয়োজন হয় ঘুষ দেওয়া চলতে পারে। ফিরে এলে হাজার টাকা পাবে। কখন যাবে?

আমি সেলাম ক'রে বললুম, সন্ধ্যার সময়।

বাড়ি ফিরে এসে কিছু খেয়ে নিলুম। তারপর কাপড়ের মধ্যে খাকি হাফ-প্যান্ট একটা পরে নিয়ে জামা ঝুলিয়ে দিলুম। কেননা দৌড়বার দরকার হ'লে কাপড়ে বড় অসুবিধে হয়। তারপর টাকা দুশো' কোমরবন্ধের মধ্যে গুঁজে দিলুম। পিস্তলটি নিয়েই বড় মুশকিলে পড়েছিলুম, কেননা তখন এখনকার মতো অত ছোট রিভলবার পাওয়া যেত না। যাই হোক, কোন রকমে গুছিয়ে-গাছিয়ে নিয়ে সন্ধ্যের একটু আগেই বেরিয়ে পড়লুম।

শহর যেন শ্মশান হয়ে গিয়েছিল। ঘর বাড়ি ভাঙা, পচা মড়ার গন্ধ, বারুদের গন্ধ আর মধ্যে মধ্যে গুলির শব্দ—সে যেন এক বীভৎস ব্যাপার। রাস্তায় বেরোলে প্রাণে আতঙ্কের সঞ্চার হ'ত। খানিকটা দূরে গিয়েই জন-কতক সিপাহীর পাল্লায় পড়লুম, প্রশ্ন হ'ল, কোথা যাচ্ছ?

বললুম, ভাইয়ের কাছে যাচ্ছি, বড় ব্যায়রাম ওর।

প্রশ্ন হ'ল, ভাই কোথা থাকে?

জবাব দিলুম, হুসেন শাহী সড়কে।

তবু তারা ইতস্তত করতে লাগল। একজন প্রস্তাব করলে যে আমার সঙ্গে লোক দেওয়া হোক, মিথ্যা কথা প্রমাণ হ'লে আমায় মেরেই ফেলবে। আমি সোৎসাহে সম্মতি দিয়ে বললুম, বেশ তো, তাই চল না, আমিও খানিকটা নিরাপদে যেতে পারি তাহ'লে। তখন তারা রাস্তা ছেড়ে দিয়ে বলল, আচ্ছা যাও—।

দুধারে সিপাইদের তাঁবু দেখা যাচ্ছে। তার মধ্যে দিয়ে আবছায়া অন্ধকারে যতটা সম্ভব সতর্ক হয়ে চলেছি, চারিদিকে চোখ রাখতে হচ্ছে। মধ্যে মধ্যে যেন পথের মধ্যে থেকে ফুঁড়ে উঠছে সঙ্গীনের খোঁচা, আর সেই প্রশ্ন—কোথায় যাচ্ছি!

যে রকম অবস্থা, তাতে বেশ বুঝলুম, এ পথ দিয়ে ফেরবার চেষ্টা করাও বিড়ম্বনা। উপায় কি? মনের মধ্যে ক্রমত ভাবতে ভাবতে চললুম। কোনও পথটাই যথেষ্ট নিরাপদ বলে মনে হয় না। কিন্তু কথা দিয়েছি যখন তখন আর বৃথা ভেবে কি হবে?

হুসেন শাহী সড়কের মোড়ে পৌঁছেও বিলক্ষণ বেগ পেতে হয়েছিল। ওরা অত সহজে ভোলে নি। বলে, কোথায় তোমার ভাই থাকে, কার বাড়ি, সঙ্গে

যাব। আমি 'চল' বলতে ছুটো সিপাই সঙ্গে যেতেও লাগল। আমি বাইরে খুব সাহস দেখিয়ে বুক ফুলিয়ে যাচ্ছিলুম বটে কিন্তু মনে মনে প্রমাদ গণছিলুম। তবে খানিকটা গিয়ে, বোধ হয় আমার ধাঁজ-ধরন দেখে তাদের মনে বিশ্বাস এল, তারা আপনিই ছেড়ে দিয়ে চলে গেল।

এ রাস্তাটা অপেক্ষাকৃত নির্জন ও নিরাপদ। একটু জোরে চলে আধঘন্টার মধ্যেই খালের ধারে গিয়ে পৌছলুম। তখন বেশ অন্ধকার হয়েছে। একটা লোককে সামনে দেখে জিজ্ঞাসা করলুম, ভগবান জেলের বাড়ি কোথায় ?

সে একটু ইতস্তত করে সন্দিগ্ধভাবে ভগবানের বাড়িটা দেখিয়ে দিল। আমি তার হাতে একটা টাকা দিয়ে ভগবানের বাড়ি হাজির হলুম। তার হাতে আংটি দিতে সে পিদিমের আলোয় আংটিটা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে নিয়ে সামনের দোরটা বেশ ক'রে বন্ধ ক'রে দিল। তারপর নানা ঘর ঘুরে—সম্ভবত সেটা তাদের গোয়ালঘর—পেছনের একটা ঘরে নিয়ে গিয়ে হাজির করল। ঘরের মধ্যে একটা খাটিয়ার ওপর বসে ছিল,—লুসী হলস্টন।

আমি লুসীকে এই প্রথম দেখলুম। উনিশ-কুড়ি বছর বয়স, এবং অপূর্ব সুন্দরী। সে রূপ এক হাজার মেয়েছেলের মধ্যেও নজরে পড়ে। পোশাকটা বদলাবার অবকাশ হয় নি ব'লে একটু ময়লা এবং মুখেও অনেকদিন পাউডার পড়ে নি, সুতরাং তার স্বাভাবিক রূপই আমার নজরে পড়ল এবং মুগ্ধ হলুম।

চিঠিখানা পড়ে সে একটু মিষ্টি হেসে আমার দিকে হাত বাড়িয়ে দিলে। আমিও শেকহ্যাণ্ড করলুম। সেই আমাদের প্রথম স্পর্শ। তারপর জিজ্ঞাসা করল, কখন আমরা বেরোব ?

আমি বললুম, এখনই বেরোব কিন্তু তার আগে আমি ভগবানের সঙ্গে একটু পরামর্শ করতে চাই।

ভগবানকে ডেকে বললুম, বাপুহে যে পথে এসেছি সে পথে তো যাওয়া অসম্ভব। অন্য কোনও পথটথ আছে কিনা বলতে পারো ?

ভগবান অনেক ভেবেচিন্তে বললে, আমার বাড়ির উত্তর দিকে এই যে বনটা দেখছেন এটা খালের ধার দিয়ে অনেকটা গেছে। এর মধ্যে একটা সরু পায়ে-হাঁটা পথ আছে বটে, সেটা দিয়ে গেলে ছাউনীর দিকে অনেকটা এগিয়েও যেতে পারবেন কিন্তু তারপর শহরে পড়তেই হবে।'

পড়তেই যদি হয়, কি আর করা যাবে বলো। বরং তাহ'লে এখনই বেরিয়ে পড়া যাক।

ভগবান বলল, চলুন আমি খানিকটা পর্যন্ত পথ দেখিয়ে দিচ্ছি। কিন্তু আলো জ্বেলে তো যেতে পারবেন না। বনের মধ্যেও সিপাইদের তাঁবু আছে। আলো দেখলে ওরা সন্দেহ করবে।

আমি বললুম, দেশলাই আছে সঙ্গে, বাতিও আছে। দরকার হয় জ্বেলে নেব। এখন অন্ধকারেই চলব।

সে-ও অভয় দিয়ে বলল, রাস্তা প্রায় সোজাই চলে গেছে।

লুসীকে সঙ্গে নিয়ে ভগবানের পিছু পিছু বেরোন হ'ল। দুর্গা স্মরণ ক'রে অন্ধকারের মধ্যে দারুণ বিপদে ঝাঁপিয়ে পড়লুম, যা করেন তিনি।

অতি সন্তর্পণে ভগবান দোর খুলে বাইরে এলো, আমরা ওর পিছনে পিছনে যতটা সম্ভব নিঃশব্দে বেরিয়ে পড়লুম। একটুখানি গিয়েই বন আরম্ভ হ'ল। বনের মধ্য দিয়ে যে সঙ্কীর্ণ পায়ে-হাঁটা পথের সরু রেখা চলে গিয়েছে সেইটে দেখিয়ে দিয়ে ভগবান ফিরে গেল। আমরাও সেই পথ ধরে চলতে শুরু করলুম।

একে কৃষ্ণপক্ষের রাত তায় ঐ নিবিড় বন, সূচীভেদ্য অন্ধকার কাকে বলে তা বেশ বুঝতে পারলুম। একটু গিয়েই লুসী হোঁচট খেয়ে একটা গাছের উপর গিয়ে পড়ল। আমি তখন ওর দিকে হাতটা বাড়িয়ে দিয়ে চুপিচুপি বললুম, না হয় আমার হাত ধরুন।

সে একটু ইতস্তত ক'রে আমার হাতে হাত দিয়ে আমার সঙ্গে সঙ্গে হাঁটতে লাগল। এত নরম ওর হাত যেন একমুঠো শিউলি ফুল। ভয়ে একটু কাঁপছিল, অল্প অল্প ঘাম তাতে—সে হাতে হাত দিতে ভয় হয়।

মিনিট পাঁচেক ঐ ভাবে চললুম। যতদূর সম্ভব নিঃশব্দে যাচ্ছিলুম। আমি আগে আগে একটু বেঁকে, সে আমার হাত ধরে পিছু পিছু। আমি হাতড়ে হাতড়ে বনের মধ্যে পথ দেখছিলুম, কেননা এত অন্ধকার যে লুসীর সাদা পোশাকটা পর্যন্ত দেখতে পাওয়া যাচ্ছিল না, পথ তো দূরের কথা। সহসা একটা কি ঠিক আমার পাশে সরসর করে নড়ে উঠল। ভয়ে আমারও বুকের রক্ত ঠাণ্ডা হয়ে এসেছিল, লুসী কিন্তু একেবারে আমার হাতটা জড়িয়ে

ধরল। একটুখানি স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে বুঝলুম যে ওটা কোন বন্য জন্তু কিংবা ইঁদুর হবে, তখন আবার চলতে আরম্ভ করলুম।

এবার চলা কিন্তু একটু মুশকিল হ'ল, কেন না লুসী একেবারে আমার ডান হাত আঁকড়ে ধরে যাচ্ছিল সুতরাং পাশাপাশিই যেতে হচ্ছিল অথচ পাশাপাশি চলবার মতো সে পথ নয়। তবুও যেতে লাগলুম যতটা সম্ভব ওকে ভাল পথে রেখে নিজে ডালপালার আঘাত খেতে খেতে।

কে ওকে সেই প্রথম দেখাতেই আমায় বিশ্বাস করতে শেখালে জানি না কিন্তু সে ঐ নিশীথ রাত্রে গাঢ় অন্ধকার বনপথে আমাকেই একান্ত নির্ভর মনে ক'রে একেবারে আঁকড়ে ধরেছিল। তখনকার কথা আমার বেশ মনে আছে, এত কাছে কাছে চলেছি যে প্রায়ই আমি তার নিশ্বাসের উষ্ণতা অনুভব করছিলুম আমার মুখের উপর, খুব নরম হাতের স্পর্শ আমার বাহুতে।

মিনিট দশেক যাবার পর ডান দিকে বনের মধ্যে একটা আলোর রেখা দেখা গেল। মনে পড়ল ভগবানের কথা, বনের মধ্যেও সিপাইদের তাঁবু আছে। একটু দাঁড়িয়ে ইতস্তত করলুম, তারপর জামার মধ্যে থেকে পিস্তলটা বার ক'রে বাগিয়ে ধরে আবার আস্তে আস্তে চলতে শুরু করলুম।

ঈশ্বরের ইচ্ছায় সেখান থেকে কোনও বিপদই এল না। মিনিট দশেকের মধ্যেই আমরা সেই আলোর ক্ষীণ রেখাটিকে ফেলে এগিয়ে চলে এলুম। কিন্তু বিপদ এল অপ্রত্যাশিত ভাবে—সহসা পায়ের কাছে কি একটা সরসর ক'রে উঠল। এত কাছে শব্দটা যে লুসী ভয়ে একটা অস্পষ্ট শব্দ ক'রে উঠল। আমারও মনে হ'ল শব্দটা সরীসৃপ জাতীয় জীবের, তাড়াতাড়ি দেশলাই বার ক'রে একটা কাঠি ধরালুম। যা ভেবেছিলুম ঠিক তাই, একটা সাপ আস্তে আস্তে বনের মধ্যে সরে যাচ্ছিল। লুসী আরও ভয় পেল, একেই পথশ্রমে সে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল, এরপর ভয়ে যেন ভেঙে পড়ল। ওর কপালে গলায় ঘাম দেখা দিল, আমার হাতের ওপরে ভারটা যেন ক্রমেই বেশি মনে হ'তে লাগল। ওর ভয় দেখে অগত্যা আমি বাতিটা জ্বালিয়ে নিয়ে আবার চলতে লাগলুম।

অন্ধকার বনের মধ্যে বাতির আলো বহুদূর যায়—তার প্রমাণ পেলুম একটু গিয়েই। একটা গাছের বাঁক ফিরেই গিয়ে পড়লুম দুই সিপাই-এর সামনে। দুজনের হাতেই বন্দুক। মেম সাহেব, বিশেষত সুন্দরী দেখেই সিপাই দুটো

উল্লাসে চিৎকার ক'রে উঠল এবং দু-পা এগিয়েও এল। এক মুহূর্ত বোধ হয়— আমি একটু হতভম্ব হয়ে পড়েছিলুম কিন্তু বিপদের গুরুত্ব বেশি ব'লেই কর্তব্যটা চট ক'রে মাথায় এসে গেল। বাতিটা টপ্ ক'রে মাটিতে ফেলে দিয়েই পা দিয়ে মাড়িয়ে নিভিয়ে দিলুম, তারপর লুসীকে একরকম মাটি থেকে তুলে নিয়ে গাছের ফাঁকে সরে গেলুম। আলো থেকে হঠাৎ অন্ধকারে এসে সিপাই দুটো ঘাবড়ে গেল। হাতড়ে হাতড়ে একটা একেবারে আমার হাতের কাছে এসে পড়ল। আমি পিস্তলের বাঁটটা দিয়ে তার মাথায় আঘাত করলুম। পিস্তলের শব্দে লোক এসে পড়বে বলে গুলি করতে পারলুম না। কিন্তু ওতেই কাজ হ'ল, একটা শব্দ ক'রে লোকটা মাটিতে পড়ে গেল খুব সম্ভব মৃত অবস্থায়। বাকী সিপাইটা ঐ আওয়াজ পেয়ে বন্দুকটা বাগিয়ে ধরে এগোতে যাচ্ছিল, আমি পেছন থেকে ওকে ধাক্কা দিয়ে মাটিতে ফেলে দিলুম। তারপর ওরই বন্দুকের কুঁদোয় ওকে অজ্ঞান করলুম। লুসী ইতিমধ্যে মূর্ছা যাবার মতো হয়েছিল, ওর অর্ধ-অচৈতন্য দেহটা প্রায় টানতে টানতে ধরে এগিয়ে চললুম।

বনের সীমা প্রায় পেরিয়ে এসেছিলুম। বনের মধ্যে লুকোবার জায়গা ছিল, বনই অপেক্ষাকৃত নিরাপদ, শহরে পড়লে যে কি অবস্থা হবে তাই ভেবে আমার মাথা খারাপ হবার যোগাড় হ'ল।...এবং সে আশঙ্কা যে খুব অমূলক নয় তা একটু পরেই বেশ বুঝতে পারলুম। কারণ দূর থেকে একটা হৈচৈ শব্দ শোনা গেল এবং সঙ্গে সঙ্গে কামানের গম্ভীর আওয়াজ। হয় সিপাইরা ক্যান্টনমেণ্ট আক্রমণ করেছে, নয়ত গোরারাই সিপাইদের আক্রমণ করেছে। যাই হোক, আমরা খুব নিরাপদ নয়, কারণ সকলেই এ সময় সতর্ক, জাগ্রত।

লুসীকে বললুম, মনে একটু সাহস আনুন মিসেস হলস্টোন। এ সময় ভয় পেলে চলবে না, তাতে বিপদ বাড়বে।

লুসী যেন নিজেকে একটা প্রাণপণ নাড়া দিলে। তার মিষ্টি গলার আওয়াজও শোনা গেল, আমি প্রাণপণে চেষ্টা করছি, মিস্টার মিটার।

বনের পথ ছেড়ে একটা মাঠ—মাঠের মধ্যে দিয়ে একটা কাঁচা রাস্তা গিয়ে একেবারে শহরের মধ্যে পড়েছে। মাঠের মধ্যে পড়ে আমাদের দস্তুরমত সাবধান হ'তে হ'ল, কেননা বনের আবরণ আর রইল না। লুসী যত দূর সম্ভব নিজেকে গোপন ক'রে আমার সঙ্গে প্রায় মিশে চলতে লাগল। ওর মুখটা আমার

কাঁধের আড়ালে লুকিয়ে রাখল, তা ছাড়া আর উপায় ছিল না।

মেঠো পথ পার হয়ে যেমন পাকা সড়কে উঠতে যাব, হঠাৎ পাশের একটা ঘরের দোর খুলে একটা লোক বেরিয়ে এল। সে লোকটার হাতে একটা মাটির পিদিম, সে লুসীর ভয়ার্ত মুখ দেখে চিৎকার ক'রে উঠল, 'আরে এ যে মেম সাহেব!'

মুহূর্তের মধ্যে পিস্তলটা বের ক'রে ওর মুখের সামনে ধরলুম, সে ব্যাটা যেন একটু অভিভূত হয়ে উঠল, তারপরেই পিদিমটা মাটিতে ফেলে ছুটে গিয়ে দোর বন্ধ ক'রে দিলে। এবারেও আমি শব্দ হবার ভয়ে গুলি করতে পারলুম না। সে কিন্তু সেই সুযোগে বাড়ির অন্য দিকের দোর দিয়ে বেরিয়ে রাস্তায় পড়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে লাগল। বুঝলুম যে, সিপাইদের খবর দিতে গেল। আর রক্ষা নেই।

লুসী সভয়ে আমাকে প্রশ্ন করল, কি হবে মিস্টার মিটার?

ওকে সান্ত্বনা দিয়ে বললুম, ভয় পাবেন না। আমার দেহে প্রাণ থাকতে আপনার কোনও ভয় নেই।

ওকে অভয় দিলুম বটে, এবং সেও একান্ত নির্ভয়ে আমায় জড়িয়ে ধরল কিন্তু আমি নিজে মনে মনে বিশেষ সান্ত্বনা লাভ করতে পারলুম না।

খানিকটা বড় রাস্তা ধরে যাবার পরই বুঝলুম আমার আশঙ্কা সত্যে পরিণত হ'ল। দূরে একদল সিপাহী মার্চ ক'রে আসছে, তাদের মশালের আলোয় ব্যাপারটা খুব পরিষ্কার হ'ল। আমাদের পূর্বের বন্ধুটি যে ওদের সংবাদ দিয়েছেন, তাতে কোনও সন্দেহ নেই। কিন্তু এখন উপায় কি?

লুসী বলল, ফিরে যাওয়া যাক্—

আমার কান কিন্তু তখন লুসীর বীণানিন্দিত-কণ্ঠের দিকে ছিল না, খুব পেছনে বড় আর একদল ফৌজ মার্চ ক'রে আসছে, তারই পদধ্বনি ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে উঠল। আমি চারিদিকে একবার চেয়ে নিলুম। দুদিকে মাঠ, মাঠের মধ্য দিয়ে ছুটে পালাতে গেলেও ওদের নজরে পড়ব এবং সে সময় যে গুলি-বৃষ্টি শুরু হবে, সে কথা ভাবতে মোটেই ভাল লাগছিল না। অথচ দাঁড়িয়ে ভাববারও বিশেষ সময় নেই, ওরা এসে পড়ল ব'লে।

সহসা নজর পড়ল পায়ের তলায়। শহরের বড় জল নিকাশের নালাটা বয়ে

গেছে ঠিক নিচে দিয়ে এবং রাস্তাটা ঠিক রাখবার জন্য একটা প্রকাণ্ড খিলানের ওপর কালভার্ট তৈরী করা হয়েছে। নিজের কর্তব্য স্থির করতে দেরি হ'ল না। লুসীকে বললুম ভয় পাবেন না, মিসেস হলস্টোন, দু'দিকে শত্রু এসেছে বটে, কিন্তু আমরা ওদের ফাঁকি দেব। আসুন, এই কালভার্টটার নিচে যাই।

লুসীর ঠোঁট কাঁপল কিন্তু ভয়ে গলা দিয়ে স্বর বেরোল না। বেশি দেরি হ'লে সিপাইদের নজর পড়তে পারে বলে তাড়াতাড়ি ওকে নিয়ে নিচে নেমে গেলুম। তখন জল বেশি নেই, পাঁকও অনেক শুকনো। খিলানের নিচে কত কি জন্তু বাসা করেছিল, তারা এই আকস্মিক উপদ্রবে কলরব ক'রে উঠল। কিন্তু তখন আর কোনও উপায় নেই। খিলানটা উঁচু হ'লেও এত উঁচু নয় যে দাঁড়ানো যায়, কোনও রকমে কষ্ট ক'রে দাঁড়ালুম।

দৈবক্রমে দুদল সিপাই ঠিক পোলের উপর এসেই মিলিত হ'ল। তাদের গোলমালের মধ্যে এটা বেশ বুঝতে পারলুম যে, রীতিমত একটা লড়াই আসন্ন। পেছনের বড় দল যাচ্ছে ক্যান্টনমেন্ট লুঠ করতে এবং ছোট দলকেও ডাকছে সঙ্গে যেতে, ক্যান্টনমেন্টের গোরারা নাকি অন্যত্র বিশেষ ব্যস্ত আছে, এই ঠিক অবসর।

এই সব বলা-কওয়া চলেছে এমন সময় দূরে আর একটা হৈচৈ শোনা গেল। তার কারণও শীঘ্র বুঝলুম, একটা ছোট গোরা-পল্টন আসছে, হয়ত সিপাইদের ষড়যন্ত্র আগেই তাদের কানে গেছে।

কতক সিপাই পোলের ওপর থেকে খানিকটা এগিয়ে গেছে এমন সময় গোরারা এসে পড়ল। রীতিমত লড়াই বাধল দুদলে, মুহুর্মুহুঃ গুলি বৃষ্টি হ'তে লাগল। মৃত দেহের তো কথাই নেই, পোলের ওপর থেকে গড়িয়ে গড়িয়ে পড়তে লাগল। তলোয়ার ও সঙ্গীন দুই-ই ব্যবহার হচ্ছিল বুঝলুম, কেন না একটা কাদামাখা মুণ্ডু গড়াতে গড়াতে এসে ঠেকল আমার পায়ে, আর একবার একখানা হাত ছিটকে এসে পড়ল। আমাদের ডাইনে বাঁয়ে যেন রীতিমতো মড়ার পাহাড় হয়ে উঠল। আহতদের আর্তনাদ, যুধ্যমানদের পৈশাচিক চিৎকার আর গুলির শব্দ—সে যেন আমাদের নরক বাস।

কিন্তু স্বর্গের সন্ধানও একটু ছিল বৈকি।

লুসী এই সব কাণ্ড দেখে সোজাসুজি দু হাতে আমার গলা জড়িয়ে ধরে আমার কাঁধে মুখ লুকিয়ে কাঁদতে শুরু ক'রে দিলে। ওর দেহ ঠকঠক ক'রে কাঁপছিল—সারা দেহ ঘামে ভিজে উঠেছিল; ভয়ে এলিয়ে পড়েছিল। আমি অভয় স্বরূপ বাঁ হাতে ওকে জড়িয়ে ধরে রইলুম—আর ডান হাতে ধরা রইল পিস্তল। গাঙ্গুলীমশাই, সেই আমার জীবনে প্রথম মা ছাড়া অন্য রমণীর স্পর্শ—সেই শেষ! সে আমার জীবনের অমৃতক্ষণ। ওর উষ্ণ নিঃশ্বাস আমার গালে এসে লাগছিল। ওর মাথার সুগন্ধী চুল আমার মুখে চোখে এসে পড়ছে, ওর বক্ষস্পন্দন আমার বুকে অনুভব করছি। এত কোমল সে তনুলতা, ভয় হয় বোধ হয় যে-কোনও মুহূর্তে ভেঙে পড়বে। চারিদিকে যে এত বীভৎসতা তবু আমার মনে হ'ল যে এ ক্ষণের আর তুলনা নেই। এ রাত্রি অনন্ত রাত্রিতে পরিণত হোক। এ যুদ্ধ যদি সারা জীবন না থামে তো আপত্তি নেই।

সেই ভাবে বোধ হয় ঘণ্টাখানেক কাটল। সিপাইরা দলে ভারী ছিল বলে সহজেই সে যাত্রা গোরাদের হারিয়ে দিলে। তারপর চলল হৈ হৈ করতে করতে ওদের পিছু পিছু। খানিকটা নিস্তব্ধ থাকবার পর একটু নিরাপদ মনে হ'ল। তখন আস্তে আস্তে ডাকলুম, মিসেস্ হলস্টোন এইবার যেতে হবে যে। সাড়া এল না। তখন ওকে ঝাঁকানি দিয়ে দেখলুম লুসী মূর্ছা গেছে। উপায়? তখন আর ভাববার সময় ছিল না। পিস্তলটা কোমরে গুঁজে দু হাতে ওকে বুকে তুলে নিলুম, তারপর বাইরে এসে ওকে বহন ক'রেই রাস্তা চলতে শুরু করলুম। লুসীর দেহ খুব হাল্কা, কিন্তু ভারী হ'লেও বোধ হয় কষ্ট হ'ত না। তখন রাস্তা একেবারে নির্জন হয়ে গেছে। আকাশের দিকে চেয়ে দেখলুম ফরসা হ'তে খুব বেশি দেরি নেই। একটু জোরে পা চালিয়ে দিলুম—কেন না ভোরের আগেই পৌঁছতে হবে।

খানিকটা চলবার পরই সামনের দিক থেকে ঘোড়ার পায়ের শব্দ শোনা গেল। আমি তাড়াতাড়ি একটা গাড়ির আড়ালে লুকিয়ে দাঁড়ালুম। কিন্তু তার দরকার ছিল না, দেখলুম চার-পাঁচজন ইংরেজ অফিসার ঘোড়ায় চড়ে এই দিকে আসছেন। আমি তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এসে ওদের পথ জোড়া ক'রে দাঁড়ালুম। একজন চট্ ক'রে একটা দেশলাই জেলে ফেলল, আর একজন হ্যালো ব'লে নেমে পড়ল। দেশলাইএর আলোয় চিনতে পারলুম হলস্টোন।

হলস্টোন বললেন, তোমাকেই খুঁজছিলুম মিস্তির, কিন্তু একি ?

আমি বললুম, ভীষণ বিপদের মধ্যে পড়ে মেমসাহেব অজ্ঞান হয়ে পড়েছেন, উপায় নেই দেখে আমি বয়ে আনছি—

হলস্টোন একবার ভ্রূকুটি ক'রে আমার দিকে চাইলেন, তারপর তাড়াতাড়ি আমার হাত থেকে লুসীর অচৈতন্য দেহটা তুলে নিয়ে ঘোড়ায় চাপালেন। শুষ্ককণ্ঠে একটা ধন্যবাদ দিয়ে বললেন, কাল সকালে ক্যান্টনমেন্টে দেখা করো তোমার টাকা পাবে—

হায় রে মানুষের ঈর্ষা! কত সামান্য কারণে ঈর্ষা আসে, সকল কৃতজ্ঞতা নষ্ট করে—তাই ভাবি। লুসীর একখানা হাত তখনও আমার গলা জড়ানো ছিল।

আমার জীবনের সমস্ত উদ্দেশ্য যেন এক মিনিটে ফুরিয়ে গেল। আমি মাতালের মতো কোনক্রমে বাসায় এসে শুয়ে পড়লুম। পরের দিন টাকা আনতে যাই নি। বিকেলে হলস্টোন চাকর দিয়ে ডেকে পাঠিয়ে টাকা দিলেন। ঐ পর্যন্ত, মুখ গম্ভীর ক'রে রইলেন।

তিন-চারদিন পরে সন্ধ্যাবেলায় ক্যান্টনমেন্ট থেকে বেরুব ব'লে একটা নিরাপদ রাস্তা খুঁজছি এমন সময় পিছন থেকে ডাক এল, 'অসিত!'

চমকে ফিরে দেখি, লুসী। ও আমাকে ইশারা ক'রে ডেকে নিয়ে গেল একটা বড় গাছের তলায়। সেইখানে একটা বেঞ্চি পাতা ছিল, সেইটে দেখিয়ে বলল, ব'সো।

তখন আকাশ বেশ অন্ধকার হয়ে আসছে, তবুও আমি একবার চারিদিক চেয়ে নিয়ে বসলুম। ভেবেই পাচ্ছিলুম না এর অর্থ কি। লুসী সহসা একেবারে আমার কোলের উপর এসে বসে গলা থেকে এই সোনার হারটা খুলে ফেলে আমার গলায় পরিয়ে দিল। তারপর অশ্রুজড়িত গলায় বলল, মিঃ হলস্টোন দু-তিন দিনের মধ্যে এখান থেকে চলে যাবার ব্যবস্থা করেছেন। লুকিয়ে যাবেন, তখন আর দেখা হবে না ব'লে তোমায় খুঁজছিলুম, অসিত, আমি যাচ্ছি বটে কিন্তু আবার ফিরে আসব তোমার কাছে।

আমি কি উত্তর দেব ? আমার গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে এসেছিল।

লুসী বলল, আমায় কি তোমার কিছু বলবার নেই? একবার অন্তত লুসী বলে ডাকো আমায়।

হায় রে, সে জানে না যে ঐ নামে ডাকবার জন্যে আমার গলা আকুলি-বিকুলি করছে। কম্পিত কণ্ঠে বললুম, লুসী, আমি তোমায় ভালবাসি, একথা বলার কি অধিকার আমার আছে?

লুসী বলল, আছে। ও অধিকার সব সময়েই থাকে। কিন্তু তার চেয়ে ঢের বেশি অধিকার নিয়ে আমি ফিরে আসব তোমার কাছে, অসিত, তুমি ততদিন অপেক্ষা করতে পারবে তো?

আমি বললুম, লুসী, মরণের দিন অবধি আমি তোমার জন্য অপেক্ষা করব।

অন্ধকারের মধ্যে থেকে ডাক এল লুসী!

লুসী ত্বরিৎপদে দাঁড়িয়ে বলল, চললাম, বিদায়।

তারপর যেন সেই আঁধারেই মিলিয়ে গেল।

গাঙ্গুলীমশাই, এই দেখুন সেই গলার হার। হয়ত সে বেঁচে নেই। হয়ত পালাতে গিয়ে পথে সিপাহীদের হাতে পড়েছে। হয়ত অন্ধ ঈর্ষায় হলস্টোনই তাকে খুন করেছে। এমনি মারা যাওয়াও বিচিত্র নয়। তবু আমি অপেক্ষা করব। সকলকে বলা আছে মরণের পরে আমাকে যেন সমাধি দেওয়া হয়, আর এই হার এমনিই গলায় থাকে। আজও আমার অপেক্ষা করার শেষ হয় নি, মরণের পরও আমার সমাধি অপেক্ষা করবে, যদি লুসী ফিরে আসে।...

গাঙ্গুলীমশাইয়ের গল্প যখন শেষ হ'ল তখন আকাশ বেশ পরিষ্কার হয়ে গেছে।

উপস্থিতি

বিকাশের আর্থিক অবস্থা খুব সচ্ছল না হ'লেও তার প্রথম ছেলের অন্নপ্রাশনে বোন চারটিকে বাদ দিতে পারলে না। অনেকগুলি বোনের একমাত্র ভাই হিসাবে বাল্যে ও কৈশোরে তাদের ওপর যথেষ্ট অত্যাচার করেছে—ওর বাবা-মা প্রকাশ্যেই মেয়েদের বঞ্চিত ক'রে সব চেয়ে ভাল জিনিসগুলি ওকে দিয়েছেন,

সমস্ত কিছু স্বাচ্ছন্দ্য এবং আরামে তারই অধিকার, এটা ক্রমশ তারও বিশ্বাস হয়ে গিয়েছিল ; তবু সেই সব অতীত দিনগুলির বিস্মৃত ইতিহাস বোনেদের প্রতি প্রীতি ভালবাসাও কোন্ অলক্ষ্যে জমিয়ে রেখে গেছে ওর মনের গহন গহ্বরে। বিকাশ তাই বোনদের বাদ দিয়ে কোন উৎসব আনন্দের কথা আজও ভাবতে পারে না।

স্ত্রী নির্মলা আপত্তি তুলেছিল বৈকি।

'এই বাজার! ঠাকুরঝিরা তো একা আসবেন না—রোজ দুধই লাগবে চার সের ক'রে। চাল তো ব্ল্যাকে পাঁচসিকে ক'রে সের হয়ে গেছে—কত খরচ করবে তুমি? তাছাড়া এই তো মোট চারখানি ঘর, ছেলেমেয়ে, চ্যাঁ ভ্যাঁ—পারবে সইতে?'

'তা আর কি করা যাবে বলো? এই তো প্রথম কাজ আমাদের। তাদেরও আমি একটি মাত্র ভাই, কী মনে করবে বলো? তাহলে এ আয়োজনই বন্ধ করতে হয়।'

নির্মলা বেশি জোর দিতে পারে নি, কারণ তার নিজের দুটি বোনকে ইতিমধ্যেই টাকা পাঠিয়ে দেওয়া হয়ে গেছে এখানে আসার জন্যে। তবু তো বিকাশের বোনদের কাউকেই রাহা-খরচা দিতে হবে না।

বিকাশের দিদি থাকেন এলাহাবাদে, মেজ বোন অলকা নাগপুরে, সেজ বোন জ্যোতি পূর্ণিয়ায় এবং ছোট বোন মায়া খড়্গপুরে। অর্থাৎ চারজন চার-দিকে। কিন্তু বিচিত্র কারণে ওরা চারজনে একই দিনে এবং দুটি বোন অলকা ও মায়া একই ট্রেনে এসে পৌঁছল। তার ফলে উল্লাসের যে হুল্লোড় উঠল সে-দিন তা অবর্ণনীয়। তবু রক্ষা ওরা সব ছেলেমেয়ে নিয়ে আসে নি, প্রত্যেকেই দু-একটি ক'রে বাড়িতে রেখে এসেছে। মায়ার একটি মাত্র মেয়ে, সেটিকেও সে নিয়ে আসে নি, শাশুড়ীর হেফাজতেই আছে।

তা হোক আনন্দের রেশটা দুপুর থেকে শুরু ক'রে প্রায় সারাদিনই চলল। এমন কি নির্মলাও সে আনন্দে যোগ না দিয়ে পারে নি। এ ক'দিনের জন্যে একটি ঠাকুর রাখা হয়েছিল, তাকে সব বুঝিয়ে দিয়ে সে সন্ধ্যার পর অতিরিক্ত এক কেত্‌লি চা নিয়ে এসে বসেছিল এদের সঙ্গেই ভেতরের চওড়া বারান্দাটায়।

পুনর্মিলনের প্রাথমিক উচ্ছ্বাসটা কমে গেছে তখন, তখন শুধু চলেছে দু-একটা খুচরো আলাপের ফাঁকে ফাঁকে পরস্পরের দিকে তাকিয়ে ভগ্নীপতিদের আর্থিক অবস্থার একটা আভাস পাবার চেষ্টা। সতীর নতুন জড়োয়া দুল আর মুক্তোর কণ্ঠী হয়েছে। তা অবশ্য হ'তে পারে—স্বাধীনতা পাবার পর ওঁর স্বামী একটা খুবই বড় গোছের কি চাকরি পেয়েছেন। অলকার স্বামী কি সব যেন ব্যবসা করে, তার অবস্থার হদিশ পাওয়া শক্ত। অলকার গায়ে মূল্যবান গহনা এবং বাক্সে সিল্কের শাড়ির অভাব নেই কিন্তু তার কোনটাই খুব আধুনিক নয়। জ্যোতির বর প্রফেসর, আর্থিক অবস্থা খুব ভালো নয়, তবু তার স্বামী যে বিদ্বান—আর সে-হিসেবে এদের সকলের চেয়েই বড়, এ-কথাটা আকারে-ইঙ্গিতে সর্বদাই প্রকাশ করতে চায় সে। মায়ার স্বামী রেলের কারখানার ফোরম্যান; সে এরই মধ্যে বার-চারেক বলেছে, 'যতই বলো আজকাল মেকানিক্যাল লাইনেই পয়সা, এটা হল গে যন্ত্রের যুগ।'

চায়ের কেত্‌লি শেষ হয়ে গেছে ইতিমধ্যে। নানা প্রসঙ্গ ছুঁতে ছুঁতে আর্থিক সঙ্গতির কথাও উঠে পড়ে। সতী কি একটা বড়মানুষী দেখাতে গিয়ে জ্যোতির কাছে ঠোকর খায়। জ্যোতি বলে, 'দিদি, বড় জামাইবাবু যতই মাইনে পান, আজকালকার দিনে সংসার খরচাও তো কম নয়।...চুরির পয়সা বা ঘুষের পয়সা না হ'লে জড়োয়া গয়না গায়ে দেওয়া যায় না—এটা তোমাকেও মানতে হবে।'

ব্যাপারটা দারুণ অপ্রীতিকর হয়ে উঠত যদি না এরই ভেতর বিকাশ নিচে থেকে উঠে আসত। বিকাশ এসে বড় মিটসেফ্‌টায় ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে সস্মিত মুখে বোনদের লক্ষ্য করে। বোধ করি এদের মুখের চেহারায় মানসিক দুর্যোগের আভাস পেয়েই অন্য প্রসঙ্গ পাড়ে, 'আজ অনেক দিন পরে যেন আমরা সেই ছেলেবেলায় ফিরে গেছি, না? সব্বাই একসঙ্গে—কতকাল পরে।'

'সব্বাই' শব্দটায় একটু বেশি জোর দেয় কি বিকাশ?

হয়তো দেয়। উপস্থিত সকলকার চোখেই যেন বেদনার ছায়া ঘনিয়ে আসে।

সতী দীর্ঘশ্বাস ফেলে একটা, 'সব্বাই আর কই বলো—। মণি যে এমন ক'রে—'

মণি!

মণিই নেই। মায়ার ঠিক ওপরের বোন মণি। বিয়ের সব ঠিকঠাক, আগের দিনে রাত্রে স্টোভ ধরাচ্ছিল সতীর খোকার দুধ গরম করবে বলে। পাশে ছিল স্পিরিটের বোতল, কখন খোকা হামাগুড়ি দিয়ে গিয়ে বোতল ফেলে দিয়েছে তা কেউই লক্ষ্য করে নি। চোখের নিমেষে খোকাকে তুলে ধরেছে মণি কিন্তু নিজেকে বাঁচাতে পারে নি। রেশমের শাড়ি জ্বলে উঠেছে মুহূর্তের মধ্যে।…দিশাহারা সতী কী করবে বুঝতে না পেরে এক বালতি ঠাণ্ডা জল ঢেলে দিয়েছিল। তার ফল যা হবার তাই হ'ল—হাসপাতালে গিয়ে মোটে এক ঘণ্টা বেঁচে ছিল বেচারী।

কিন্তু…

অকস্মাৎ সবাই চমকে ওঠে।

এ কি? সতী আর নির্মলার মধ্যে এই ফাঁকটা এতক্ষণ ছিল কি? এরা সবাই কাছাকাছি ঘেঁষাঘেঁষি ক'রে, চায়ের কেত্‌লি আর কাপগুলোকে কেন্দ্র ক'রে গোল হয়ে বসেছিল। তার মধ্যে কোন ফাঁক তো ছিল না। রাখা সম্ভবও নয়—বালিগঞ্জের বাড়ি, ওপরের দালানে এত স্থান নেই যে ছড়িয়ে বসবে। এতদিন পরে সকলে মিলেছে, দূরে দূরে বসবার ইচ্ছাও ছিল না কারুর। এতবড় একটা ফাঁক তো তার মধ্যে ছিল না, ঠিক পুরো একটি মানুষের বসবার মতো ফাঁক!

কেউই মনের কথা কাউকে জানায় না, কিন্তু ঐ এক প্রশ্নই জাগে সকলের মনে। কে বসেছিল এখানে? কোথায় গেল? কখন গেল?

তাছাড়া, তাছাড়া কেমন যেন ওদের মনে হচ্ছিল যে সব্বাই, সব্বাই ওরা মিলেছে এখানে, অনেক দিন পরে। মণি যে ওদের মধ্যে নেই, কই সে কথা তো এতক্ষণ কারও মনে পড়ে নি!

অথচ মণি যে ছিল না, এটাও তো ঠিক। কোথা থেকে আসবে সে! বেচারী মণি, সে-ই সব চেয়ে সুন্দর ছিল ওদের মধ্যে। আর সেই শুভ্র সুন্দর তনুদেহ কবেই ছাই হয়ে গেছে লেলিহান চিতাবহ্নিতে!

তবে কেন ওদের এমন মনে হ'ল? এই পরিপূর্ণতা-বোধ কোথা থেকে এল ওদের মনে?

ক্রমশ বিকাশের মাথাতেও চিন্তাটা জাগে। ও যখন এল, প্রথম এসে এখানে দাঁড়াল, তখন শূন্যতাটা ছিল কি বৈঠকের মধ্যে ? মনে তো হয় না।

আর কে ছিল ? কেউই তো এদিকে নেই। নির্মলার ভাইবোনেরা এখনও এসে পৌঁছয় নি। তারা কাল আসবে। পিসিমা নিচে আছেন, তিনি নিচেই থাকেন, এতখানি সিঁড়ি ভাঙা তাঁর পক্ষে সম্ভবও নয়; তাঁর বিষম হার্টের অসুখ।

তবে ?

আর গেলই বা কোথা দিয়ে! কাউকে যেতেও তো দেখা যায় নি!

প্রচণ্ড একটা হাই তুলে অস্বস্তিকর নীরবতা ভাঙে বিকাশ।

'দিদি, ফর্দ-টর্দগুলো দেখলে হ'ত না ? বাজার কি এল না এল—'

জ্যোতি একেবারে উঠে দাঁড়ায়, 'তাই চলো দিদি—। সত্যি সব দেখা উচিত ছিল এতক্ষণে—'

সবাই নেমে আসে নিচে। নিমন্ত্রিত ব্যক্তিদের ফর্দ নিয়ে বসে সবাই। কাকে কাকে বাদ দেওয়া সম্ভব, কাকে কিছুতেই বাদ দেওয়া চলবে না—এই নিয়ে আবার তর্ক বেধে ওঠে। বোনের দল নিজের নিজের শ্বশুরবাড়ির সম্ভ্রম রক্ষার জন্য সজাগ হয়। শুধু মায়া উঠে যায় ওপরের ছাদে, মণির কথা মনে পড়ে যেন কান্না পায় ওর।

রাত্রে আবার খেতে বসে সকলে একসঙ্গে। বিকাশের খাওয়া হয়ে গিয়েছিল ছেলেপুলেদের সঙ্গেই। ছেলেদের ঘুম পাড়িয়ে রেখে এসে গভীর রাত্রিতে এরা পাঁচজন খেতে বসল। নির্মলা আর চার বোন। আহারের চেয়ে গল্পগুজবেই যেন বেশি ঝোঁক—সুতরাং সত্যিসত্যিই যখন খাওয়া শেষ করে এরা উঠে দাঁড়াল তখন রাত বারোটা বেজে গেছে, থমথম করছে রাত।

ঝি বসে বসে ঢুলছিল, এরা আঁচাতে উঠে তাকে ডেকে দিলে, সে এঁটো বাসন ঘরে তুলে রেখে দালান ধুয়ে শুতে যাবে। ওর আর ঠাকুরের খাওয়া ইতিমধ্যেই শেষ হয়ে গিয়েছিল।

হঠাৎ ঝি চেঁচিয়ে উঠল, 'বৌদি!' কতকটা যেন আর্তনাদের মতো তার আহ্বান।

'কী রে হরির মা ?' নির্মলা ব্যস্ত হয়ে এগিয়ে আসে।

'তোমরা কজন খেলে বলো তো বাপু ?'

'তোর কি ঘুমের ঘোরে সব গুলিয়ে গেল নাকি ? আমরা পাঁচজনই তো বাকী ছিলুম, আর কজন খাবে ?'

ততক্ষণে আরও ছুজন এসে গেছে। হরির মা নিঃশব্দে আঙুল দিয়ে এঁটো থালাগুলোর দিকে দেখিয়ে দিলে, ছখানা থালা, ছজনের খাওয়ার চিহ্ন স্পষ্ট।

বহুক্ষণ কারও মুখ দিয়ে কথা বেরোল না। অনেকক্ষণ পরে নির্মলা শুধু বলে উঠল, 'সে কি !' তারপর কতকটা যন্ত্রচালিতের মতোই সে আঙুল দিয়ে নিজেদের একবার গুনে নিলে। যেন এ রকম ভুল হওয়াও সম্ভব।

ছটা থালা, বারোটা বাটি। সব থালাতেই আহারের চিহ্ন স্পষ্ট। মাছের কাঁটা, ডালের বাটিতে অবশিষ্ট ডাল, রুটির টুকরো—ভুল হবার কোন কারণই নেই।

ততক্ষণে নতুন ঠাকুরও এসে দাঁড়িয়েছে।

'ঠাকুর, তুমি ক-থালা খাবার দিয়েছ ?' নির্মলা প্রশ্ন করে।

'কেন বৌদি, পাঁচ থালা।'

বলতে বলতেই তারও নজর পড়ল।

'সে কি !...আপনারা তো পাঁচজনই। পাঁচ থালাই তো বেড়েছি মনে হচ্ছে।'

হরির মা বলে, 'তা ছাড়া ও নতুন মানুষ, যদি ভুল ক'রে দিয়েই থাকে, খেয়ে গেল কে ?...বলি বাইরের লোক, চোর-টোর কেউ আসে নি তো ? ছুর্গা ছুর্গা !'

'দূর পাগল ! আমরা এতগুলো লোক বসে খেলুম, অন্য কেউ এলে টের পেতুম না ?'

সতী বলে ওঠে, 'আগের এঁটো বাসন ছিল না তো ?'

'না তো। আমি সকড়ি পেড়ে ধুয়ে মুছে পরিষ্কার ক'রে দিয়েছিলুম।'

নির্মলা হেঁট হয়ে দেখে বলে, 'বাসন তো আমাদেরই—'

নিচে একটা গণ্ডগোলের আভাস পেয়ে বিকাশ নেমে এল।

'কী হয়েছে, ব্যাপার কি ?'

সব শুনে প্রথম তারই মুখ শুকিয়ে উঠল। আশ্চর্য এই যে, সন্ধ্যার ঘটনাটা তারই আগে মনে এল। এরা এত বিস্মিত হয়েছিল যে অন্য কিছু ভাববার কোন কারণ আছে তা কারও মাথায় যায় নি।

'যাকগে, এখন এই এত রাত্তিরে আর অত গবেষণায় কাজ নেই। চলো সব শুয়ে পড়বে।…রাত প্রায় একটা বাজে। বাসন তো আর চুরি যায় নি— নিশ্চয় কোথাও কোন ভুল হয়েছে—'

বিকাশ এক রকম জোর ক'রেই ওদের ঠেলে ওপরে নিয়ে গেল।

দোতলার বড় ঘরটাতে বিকাশ শোয়, সে ইচ্ছা ক'রেই বোনদের সে-ঘর ছেড়ে দিয়ে পাশের ছোট ঘরে গেছে। এ ঘরে খাটের ওপর শুয়েছে জ্যোতি, ওর কোলের মেয়ে আর মায়া। নিচে যে বড় বিছানাটা পড়েছে তাতে পাশাপাশি বহু বালিশই পড়েছে—নির্মলা, অলকা, সতী আর বাকী সব ছেলেমেয়ে।

রাত্রে শুয়েও কিছুক্ষণ ভোজন-পর্বের ধাঁধা নিয়ে আলোচনা চলেছিল বৈ কি। সুতরাং ভোরে ওঠবার ইচ্ছা থাকলেও সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে একটু বেশি। ছটা নাগাদ জ্যোতির মেয়ে একটা বড় গোছের অপকর্ম ক'রে ফেলায় ওরই ঘুম ভেঙে গেল সকলের আগে। সে মেয়ের কাঁথা প্রভৃতি সামলে তাকে কোলে তুলে নিয়ে একটা হাই তুলে নিদ্রাতুর দৃষ্টিতে নিচের দিকে তাকাল। তখনও ঘুমে তার চোখ যেন জুড়ে আসছে। আর একটু ঘুমোতে পারলে বাঁচে সে। এই তো এত ছেলেমেয়ে এখনও ঘুমোচ্ছে, তার মেয়েরই যত রাজ্যের বদভ্যাস !…কিন্তু—

ও কি !

হঠাৎ যেন একটা প্রচণ্ড ধাক্কা খেয়ে জ্যোতির ঘুম ছুটে গেল। সমস্ত জড়তা চোখের নিমেষে কেটে গিয়ে সোজা হয়ে বসে নিচের বিছানাটার দিকে ভাল করে চেয়ে দেখল।

সার সার পাশাপাশি বালিশ, সব বালিশেই মাথা আছে কেবল নির্মলা আর সতীর মধ্যে একটা বালিশ খালি। সেখানে একজন লোকের শোবার

মতো স্থানও শূন্য। যেন এই মাত্র কে উঠে গেছে।

কিন্তু কে গেল?

ঐ তো দরজা ভেতর থেকে বন্ধ। ছেলেমেয়েদের দিকে তাকিয়ে ভাল করে গুনল জ্যোতি, মিলিয়ে নিল সাবধানে। সবাই-ই তো আছে। নির্মলার এপাশে তার খোকাও ঘুমোচ্ছে। তবে, তবে—?

জ্যোতি অধ্যাপকের স্ত্রী। মনোভাব দমন করবার কিছু শিক্ষা সে এতদিনে পেয়েছে। মেয়েকে কোলে ক'রেই যতটা সম্ভব নিঃশব্দে দোর খুলে বেরিয়ে এল। বিকাশ তখন সবে উঠে দাঁত মাজছে। ওকে দেখেই হাসি হাসি মুখে কি একটা বলতে যাচ্ছিল কিন্তু জ্যোতির মুখের চেহারাটা দেখে সে হাসি মিলিয়ে গেল।

'দাদা শোন।'

'কী রে?'

নিজের ঠোঁটের ওপর আঙুল চেপে ধরে ওকে চুপ করতে ইঙ্গিত করে জ্যোতি। তারপর তেমনি ইশারা ক'রেই দেখায় ঘরের দিকটা। ওর সঙ্গে সঙ্গে ঘরে ঢুকেই বিকাশ বুঝতে পারে ব্যাপারটা। বিবর্ণ, পাণ্ডুর হয়ে ওঠে তার মুখ।

মিনিট পাঁচেক সময় লাগল নিজেকে সামলে নিতে। তারপর বিকাশ হৈ-চৈ চেঁচামেচি ক'রে সকলকে তুলে দিলে। সে চেঁচামেচি ও হাসাহাসিতে, শয্যার সেই শূন্য স্থান আর কারুর চোখেই পড়ল না।

*

তবু কথাটা চাপা রইল না এটাও ঠিক।

বিকাশ বললে চুপি চুপি নির্মলাকে। জ্যোতি বললে তার দিদিকে। দুপুরের আগে বড়রা সবাই জানতে পারলে কথাটা।

নির্মলা শুষ্ক মুখে বলল, 'আজ বাদে কাল শুভ কাজ—এ কি অলক্ষণ বলো তো। তুমি বাপু আজই ভট্টচায্যিকে ডেকে একটা কিছু তুলসী-টুলসী দেওয়াও। আর তো মোটে একটা দিন বাকি—'

বিকাশ উড়িয়ে দেয় কথাটা, 'হ্যাঁ—তুমিও যেমন। কোথায় না কি, আমি অমনি ভট্‌চায্‌কে ধরে তুলসী দেওয়াই। এই বাজারে নাহোক দশ-পনেরো

টাকা খরচা।'

'কিন্তু এ কি ব্যাপার তা ছাখো।'

'ব্যাপার ছাই। হয়তো কারও হুষ্টুমি কি আর কিছু—'

উড়িয়েই দেয় কথাটা বিকাশ, যদিও মনের মধ্যে জোর পায় না। কখন চুপি চুপি বাইরে গিয়ে একটা ছোট লোহা এনে পরিয়ে দেয় জ্যোতির ছোট মেয়েটার হাতে। আর সকলকারই ছেলেমেয়ের হাতে ওটা ছিল, শুধু অধ্যাপকের স্ত্রী ব'লে জ্যোতিই ওসব কুসংস্কারকে প্রশ্রয় দেয় নি। আজ কিন্তু দাদার এই কাণ্ডটা দেখেও দেখল না সে।

বিকেলের দিকে নির্মলার হুই বোন এবং ছোট ভাই এসে পড়াতে আরও একচোট হৈচৈ হ'ল। সে হাসি-হুল্লোড় এবং চেঁচামেচির মধ্যে সকালের আতঙ্ক কোথায় মিলিয়ে গেল।

কেবল সতী নিশ্চিন্ত হ'তে পারে নি। হুপুরে সকলে ঘুমোলে ওর মনে হ'ল যে আরও হুটো পান সংগ্রহ ক'রে আনা দরকার। তখন আর কাউকে ডাকাডাকি না ক'রে নিজেই নেমে গেল নিচে, ভাঁড়ার ঘর থেকে আর হু খিলি পান আনবে বলে। নামবার মুখে সিঁড়ির বাঁকে বড় ধাপটাতে পা দিতেই ওর মনে হ'ল ঠিক পিছন দিক থেকে কে যেন চুপিচুপি বলে উঠল, 'খোকাটাকে নিয়ে এলি নে কেন দিহু, কতদিন দেখি নি।'

ভয়ে পাথর হয়ে গিয়েছিল হাত-পা। শুধু শক্তি ছিল না বলেই চেঁচিয়ে উঠতে পারে নি।

পরিষ্কার মণির গলা। এ গলা সতীর ভুল হবে না।

পা-পা করে আবার উঠে এসে প্রায় অজ্ঞান হয়ে পড়েছিল সে। তারপরই এরা এসে পড়ায় আর কাউকে বলা হয় নি।

এরই মধ্যে ঠিক সন্ধ্যার আগে আর একটি ঘটনা ঘটল।

নির্মলা খোকাকে হুধ খাওয়াবে বলে হুধের বাটি ঘরের মেঝেতে নামিয়ে রেখে বাইরে গিয়েছিল ঝিনুক আনতে। খোকা তখন ছোট ঘরের মেঝেতে শুয়ে খেলা করছে। তখনই অবশ্য ফিরে যাওয়া হয় নি, সতীর ছোট ছেলেটা অলকার ছেলের চুলের মুঠি চেপে ধরে হাতে কামড় দেওয়ায় একটা কুরুক্ষেত্রের সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল বলে মিনিট-তিনচার দেরি হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু কোন

মতে ওদের ছাড়িয়ে দিয়ে ভেতরে এসে দেখলে দুধের বাটি খালি।

তবে কি—বেড়ালে খেয়ে গেল ? না কি আর কেউ ? কৈ, কেউ তো আসে নি এদিকে। বেড়ালও নেই কোথাও।

তবে ?

ছেলের দিকে চাইতেই নির্মলার নজর পড়ল পেটটাও বেশ উঁচু উঁচু। তাড়াতাড়ি হেঁট হয়ে মুখ শুঁকে দেখলে—দুধেরই গন্ধ। শুধু তাই নয়, কোলে তুলে নিয়ে ছুটে বেরিয়ে আসতে আসতে এক ঝলক দুধ তুলেও দিল সে।

এবার আর সঙ্কোচ বা লজ্জার কারণ রইল না। মেয়ে-মজলিশ বসে গেল। সতীর কথাও শোনা গেল। পিসিমা এতক্ষণ পর্যন্ত কিছুই শোনেন নি, তিনি সব শুনে বললেন, 'কি সর্বনাশ! তোরা এখনও চুপ ক'রে আছিস ? কী রে তোরা! সাহস বলিহারি যাই তোদের! আমি তখনই বৌকে বলেছিলুম যে মেয়েটা অপঘাতে ম'ল একটা গয়া-টয়ার ব্যবস্থা কর্—সে শুনলে না, খোকা তো শুনবেই না, ওরা হ'ল সায়েব মানুষ। এখন হ'ল তো!'

সর্বসম্মতিক্রমে স্থির হল যে কাল নান্দীমুখে বসবার আগেই অন্তত নারায়ণকে একশ আটটি তুলসী দেওয়াতে হবে ভট্‌চাযকে দিয়ে। বিকাশও আর আপত্তি করতে সাহস করল না।

সকলেরই গা ছম্‌ছম্ করছে কিন্তু কে জানে কেন মায়ার ভয়ের চেয়ে দুঃখই হচ্ছে বেশি। বেচারী মণি। কত সাধ-আহ্লাদ কত কামনা অসম্পূর্ণ রেখে যে সে বিয়ের আগের দিন চলে গেল! সে বেঁচে থাকলে আজকের দিনে কত আনন্দই করত! তারও তো সাধ যায়, ওদের সঙ্গে বসে হুল্লোড় করতে, সবাই মিলে বসে চা খেতে, শুতে, গল্প করতে। নির্মলার ছেলে তো তারও ভাইপো, প্রথম ভাইপো। তাকে যদি দুধ খাওয়াবার শখ হয়েই থাকে তো দোষ দেওয়া যায় না মণিকে। আর সতীর খোকা—তার জন্যেই প্রাণটা গেল বেচারীর, তার ওপর টানও স্বাভাবিক। এরা যে কেন এত ভয় পাচ্ছে, মায়া তা বোঝে না।

কান্না পাচ্ছিল মায়ার—মণির কথা মনে ক'রে। সে এক সময় এদের মজ-লিশ থেকে উঠে নিঃশব্দে ছাদে চলে গেল। পরিশ্রম নেই কিন্তু ক্লান্তিতে পা

অবসন্ন। কোনমতে দেহটাকে টেনে টেনে নিয়ে যায়।

অন্ধকার ছাদ। তবু ভয়ের কোন কারণ নেই, আশেপাশে বহু বাড়ির ছাদেই মানুষ আছে। আলো জ্বলছে সব বাড়িতে। এক ফালি রাস্তায় আলো এসে পড়েছে ওদের চিলেকোঠার দেওয়ালেও।

অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল মায়া একভাবে। ভাবতে লাগল মণির কথাই। দু-বোন ওরা পিঠোপিঠি। খুব ভাব ছিল দুজনে, একসঙ্গে খাওয়া বসা শোওয়া সব? তবু এখন যেন সতীর দিকেই টান্‌টা বেশী মণির। অদ্ভুত কারণে একটু সূক্ষ্ম অভিমান-বোধও হয় মায়ার।...

পেছনে কে এসে দাঁড়িয়েছে কখন, টের পায় নি মায়া। একেবারে তার উষ্ণ নিঃশ্বাস গালে লাগতে চমকে উঠল সে। কে?

কৈ, কেউ তো নেই।

কিন্তু নিঃশ্বাসটা স্পষ্ট, ভুল হবার কোন কারণ নেই।

পা দুটো যেন আরও দুর্বল বোধ হচ্ছে, ভেঙে দুমড়ে পড়তে চাইছে হাঁটু দুটো। হাতটা মুখে তুলতে গেল, পারলে না। বড় বেশী কাঁপছে।

সহসা হু-হু ক'রে কেঁদে ফেললে মায়া, 'ছোড়দি ভাই, কেন আমাদের ভয় দেখাচ্ছিস্ এমন ক'রে? তুই চলে যা—বড্ড ভয় করছে। তুই থাকিস নে এখানে। আমরা কি করেছি তোর?'

এবার আর একটা নিঃশ্বাস পড়ল কোথায়। বেশ বড় গোছের দীর্ঘ নিঃশ্বাস, শব্দ ক'রেই পড়ল। সে নিঃশ্বাসের উষ্ণ বাষ্প যেন সর্বাঙ্গে এসে লাগল মায়ার। এত গরম কেন? মনে হচ্ছে যেন গরম বাতাসের হল্‌কা একটা। ওকে সে বাতাস ঢেকে আচ্ছন্ন ক'রে দেবে নাকি?

কী বিষ আছে এ নিঃশ্বাসে কে জানে। মায়ার যেন আর নড়বার শক্তিও থাকে না। সেই নিঃশ্বাসের শব্দ ওর শ্রুতির মধ্যে ক্রমশই যেন বাড়ে, যেন ঝাঁ-ঝাঁ ক'রে বাজতে থাকে কি কানে। দুই চোখের পাতা বুজে আসে একটু একটু ক'রে। দৃষ্টির সামনে হল্‌দে বিন্দু অসংখ্য; মহাশূন্যে অসংখ্য খদ্যোতের মতো ঘুরে বেড়াচ্ছে চারিদিকে।

আর কোন বোধ রইল না ওর। এ নিঃশ্বাস কি সারা আকাশে ছড়িয়ে পড়ল নাকি? শহরের শব্দ কৈ? দিদি—

টের পাওয়া গেল অনেক খোঁজাখুঁজির পর রাত এগারোটা নাগাদ। তখনই ডাক্তার এল। আরও বড় ডাক্তার ডাকা হ'ল পরের দিন। সন্ধ্যার দিকে হাসপাতালেও নিয়ে যাওয়া হ'ল। কিন্তু মায়ার জ্ঞান আর ফিরে এল না।

যে দিন অন্নপ্রাশন হবার কথা ছিল তার পরের দিন সন্ধ্যার সময় মায়া অজ্ঞান অবস্থাতেই তার শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করল।

অতৃপ্ত

অতিকষ্টে বাসা ঠিক হ'ল। এই বাজার...যেখানে রাশি রাশি য়্যাড্ভান্স এবং সেলামী দিয়েও লোকে বাড়ি পায় না সেখানে যে এত সহজে ঠিক হবে তা অনিলা ভাবেন নি। বিশেষতঃ মফঃস্বল থেকে চিঠি দিয়ে। তা সুরেশ খুব কাজের ছেলে এটা মানতেই হবে—ওপর নিচে সাতখানা ঘর এই বাজারে ভাড়া মোটে আশিটি টাকা। অবশ্য এত ঘরের প্রয়োজন নেই অনিলার—এত ভাড়া দেওয়াও খুব কষ্টকর কিন্তু সুরেশ তাঁকে চিঠিতেই বুঝিয়ে দিল যে এখন বিয়ের সময় এত বড় বাড়িই ওঁদের দরকার, নইলে আবার কোথায় ইস্কুলবাড়ি কোথায় কি—এই সব করতে ছুটতে হ'ত। তাও এখন গরমের ছুটির সময় নয় —দু তিন দিন ছুটি দেখে তার মধ্যে বিয়ের দিন ফেলা বিষম অসুবিধা। তার চেয়ে বিয়ে চুকে গেলে তিনি যদি নিচের তলাটা ভাড়া দিতে চান তো ভাড়াটের অভাব হবে না। চাইকি ভাড়াও তাঁর অনেকখানি লাঘব হবে। চাই কি—তেমন তদ্বির করলে বিনা ভাড়াতেই থাকতে পারবেন তিনি।

যুক্তিটা মনে লাগল অনিলার। তাছাড়া অত বাছতে গেলে এখন তাঁর চলবে না। সামনে মেয়ের বিয়ে। পাকিস্তান থেকে এসে তিনি ভাগলপুরে ভগ্নিপতির যে বাসায় উঠেছেন তা তাঁদের পক্ষেই পর্যাপ্ত নয়, অনিলা ও তাঁর তিন মেয়ে এসে পড়ায় বিষম কষ্ট হচ্ছে। মুখে অবশ্য দিদি কিছুই বলেন নি কিন্তু কষ্ট তো অনিলা নিজের চোখেই দেখতে পাচ্ছেন। তাছাড়া এখান থেকে বিয়ে দেওয়া একেবারে অসম্ভব—পাত্রপক্ষও সেকথা বলে দিয়েছে। তারা বলেছে এখানে আসতে গেলে পঁচিশটি লোকের আসা-যাওয়ার গাড়ি ভাড়া দিতে হবে

সেকেণ্ড ক্লাসের। আর সেই যখন আসতে হবেই কলকাতায়—

অবশ্য পাড়াটা ভাল নয় নাকি। জামাইবাবু বললেন, 'বাবা, সুরেশ আর বাড়ি পেলে না, একেবারে সোনাগাছির ধারে।'

পরে আবার উনিই বললেন, 'অবশ্য করবেই বা কি। কলকাতায় বাড়ি পাওয়া আজকাল যা হাঙ্গামা। আর শুনেছি আজকাল ওপাড়া থেকে ওসব উঠিয়ে দিয়েছে—এখন বহু ভদ্রলোকই ওখানে বাস করে। তবে বাড়ি খুব পুরনো হবে তা বলে রাখছি। ঐ হ'ল খাস বনেদী কলকাতা। আদিম কলকাতাও বলতে পারো···একশ বছরের কম বোধ হয় কোন বাড়িই নেই। ···যাক্···দুর্গা বলে এই শুভকাজটা তো সারো, তারপর দেখা যাবে। আর একটা বাড়ি দেখেশুনে নিলেই হবে।'

অনিলা বিদেশে মানুষ। বিহারে ওঁর জন্ম, বিয়ে হয়েছিল বর্মায়। সেখান থেকে ওঁর স্বামী কুষ্টিয়ার কাছে (ঐখানেই ওঁদের পৈতৃক বাড়ি ছিল) জমি-জমা কিনে বিরাট বাড়ি তৈরী করেন। ইচ্ছা ছিল রিটায়ার ক'রে দেশে এসে বাস করবেন। তাঁর সে সাধ মিটল না বটে—কারণ তার আগেই তিনি মারা গেলেন—কিন্তু তাঁর ইচ্ছাটা অনিলা ভোলেন নি। বর্মার বাড়ি-ঘর বেচে কিনে একাই দেশে এসে উঠেছিলেন। অবশ্য ঠিক সময়েই উঠেছিলেন, আর কিছু দেরি হ'লে নিরাপদে আসতে পারতেন না। যুদ্ধ বেধে গিয়েছিল প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই।

দেশ থেকেই তিনি তাঁর সপত্নীকন্যার বিয়ে দেন সুরেশের সঙ্গে। সুরেশ আলিপুরের উকীল···বাগবাজার অঞ্চলে বাড়ি; বস্তুত এখন অভিভাবক বলতে সুরেশই ওঁর ভরসা। ওঁর নিজেরও তিনটি মেয়েই বড়···সর্বশেষ সন্তান ছেলে, সেটি এই সবে বছর দশেকের।

দুর্ভাগ্যের সঙ্গে যুঝে যুঝে অনিলা অনেক শক্ত হয়েছিলেন বৈকি। চারটি মেয়ে নিয়ে দেশে এসে উঠে অনেক বিপদেই তো পড়েছিলেন, শক্ত না হলে কাটিয়ে উঠতে পারতেন না। বিধবার হাতে কিছু টাকা বা সম্পত্তি আছে জানলে সবাই তা ফাঁকি দিয়ে নেবার জন্য ব্যস্ত হয়ে ওঠে। আত্মীয়রাই তার মধ্যে প্রধান। যত নিকট আত্মীয় তত বেশী শত্রু হয় তখন। অনিলাকে একা

সেই সব প্রতিকূলতার সঙ্গে যুঝতে হয়েছিল। কিন্তু এমনই ভাগ্য সমস্ত বিরুদ্ধতাকে জয় ক'রে যখন সবে একটু নিশ্চিন্ত হয়েছেন—পাকিস্তান হয়ে গেল ওঁর দেশ। উনি ব্যাপারটা কি হবে অনুমান ক'রে কতক কতক বিক্রী করতে শুরু করেছিলেন কিন্তু সব হস্তান্তর করা হয় নি। কোন মতে গহনাপত্র টাকাকড়ি নিয়ে যে পালিয়ে আসতে পেরেছেন এই ঢের। জমিজমা, বাড়ি, মায় আসবাব-পত্র পর্যন্ত সবই ফেলে রেখে আসতে হয়েছে।

সুতরাং—যা বলছিলুম, কলকাতা সম্বন্ধে কোন ধারণাই নেই অনিলার—এই প্রথম তিনি এলেন। তবু যে অবস্থা এ'সে দেখলেন বাড়ির ঠিক এমনটা তিনি আশঙ্কা করেন নি, জামাইবাবুর মুখে পাড়ার প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে সতর্কবাণী শোনা সত্ত্বেও না।

সুরেশও একটু অপ্রতিভ হ'ল। তার খুব বেশি দোষ ছিল না অবশ্য, সে আশা করেছিল ওর শাশুড়ী এবং শালীরা স্টেশন থেকে সোজা তাদের বাড়িতে গিয়েই উঠবেন তারপর স্নানাহার ক'রে সুস্থ হয়ে বিকেলের দিকে ওদের নতুন বাসার দিকে যাবেন। ততক্ষণে ওদের চাকর মালপত্র নিয়ে সেখানে গিয়ে বাড়িটা ধুয়ে মুছে কতক মালপত্র গুছিয়ে রাখতে পারবে। অর্থাৎ বাসাটা চলন-সই হয়ে উঠবে।

কিন্তু অনিলার মধ্যে সেকালের হাওয়াও কিছু ছিল। ওঁদের কতকগুলো আভিজাত্যের আইন আছে, তাতে জামাই-বাড়ি যাওয়া নিষেধ। তিনি কিছুতেই রাজী হলেন না যেতে। বললেন, 'ওদের নিয়ে যেতে চাও নিয়ে যাও কিন্তু আমাকে আর ও অনুরোধ ক'রো না বাবা। আমি বরং রামটহলকে নিয়ে গিয়ে বাড়িঘর গুছিয়ে ফেলি, ওরা সেই সন্ধ্যের সময় চলে আসবে'খন। টেঁপুর সঙ্গেই আসতে পারবে।' টেঁপু অর্থাৎ ওঁর স্বামীর প্রথম পক্ষের কন্যা, সুরেশের স্ত্রী। অনিলাই ওকে মানুষ করেছেন—নিজের মেয়ে বলেই মনে করেন।

তাই হ'ল। সুরেশের ভাইও ছিল স্টেশনে। তার সঙ্গে মেয়েরা চলে গেল। উনি, সুরেশ আর রামটহল মালপত্র নিয়ে এসে উঠলেন উত্তর কলকাতার একদা-জমজমাট এখন-মৃতপ্রায় এই বিশেষ অঞ্চলের বাড়িটিতে।

কিন্তু এ কী অবস্থা!

কতকাল যে এ বাড়িতে কেউ ঢোকে নি তা বলা শক্ত। উঠোনে বহু

দিনের আবর্জনা জমে জমে বৃষ্টির জলে তার ওপর বড় বড় আগাছা জন্মে গেছে। ঘরগুলোর দোর জানলা খোলা হা হা করছে। ঘরে চুন পড়া দূরে থাক, এর আগের ভাড়াটেরা বহুকাল আগে চলে গেছে, তাদের পরিত্যক্ত সে সব জঞ্জালও সাফ করা হয় নি। কোন কোন ঘরের মেঝের উপরেই ঘাস ও অশথ চারা গজিয়ে উঠেছে, জানলার কপাটে রেলিংএ রং করা হয় নি বোধ হয় বাড়ি তৈরী হবার পর থেকে একবারও। সেগুলো ভাল ক'রে বন্ধ হয় না—কোন কোন জায়গায় পাল্লা ঝুলে পড়েছে, কব্জার বন্ধন শিথিল ক'রে।

কিছুক্ষণ স্তম্ভিত হয়ে সেদিকে তাকিয়ে থেকে অনিলা বললেন, 'এ কোথায় আনলে বাবা, এ যে ভূতের বাড়ি।'

সুরেশ মাথা চুলকে বললে, 'তাই তো মা। বাড়িওয়ালার সব সারিয়ে-সুরিয়ে আমাকে চাবি পৌঁছে দেবার কথা ছিল। কাল সকালে ওর লোক দিয়ে যখন চাবি পৌঁছে দিলে তখন আমি আদালতে বেরুচ্ছি। তারপর আর সময়ও হয় নি। তাছাড়া আমি একবারও ভাবি নি যে এমন ক'রে ঠকাবে আমাকে। লোকটা মাতাল বটে—তবু, এগুলো তো বাড়ি ভাড়া দেওয়ার সাধারণ নিয়ম।'

'তা বটে বাবা, তোমার আর দোষ কি? কিন্তু এই বাজারে এতকাল এ বাড়ি খালিই বা আছে কেন?'

'একে তো এসব পুরনো পাড়ায় কেউ আসতে চায় না, তায় বাড়ির এই দশা! সেই জন্যেই বোধ হয় ভাড়াটে জোটে নি। বাড়িওয়ালাও তো দেখছেন কেমন···মদ খেয়ে পড়ে থাকে, বাড়িঘর সারালে তো লোকে পছন্দ করবে।'

তা বটে।

অনিলা একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে কাজে লেগে গেলেন। রামটহল দেহাত থেকে আমদানী করা বিহারী চাকর···খাটতে পারে, এখনও ফাঁকি দেবার কৌশলটা শেখে নি। কিছুক্ষণের মধ্যেই চলনসই হয়ে উঠল বাড়ি ঘর···যদিও রামটহল দুটো বিছে এবং একটা সাপ মারল আবর্জনা স্তূপের মধ্যে থেকে, সে-জন্যে আতঙ্ক একটা থেকেই গেল সুরেশের। সে লজ্জিতভাবে বার বার অনিলাকে প্রতিশ্রুতি দিল যে কালই অন্তত চুনকাম করার ব্যবস্থা সে নিজেই ক'রে দেবে। আর বাড়িওয়ালাকে দেখে নেবে সে একবার! পাজী নচ্ছার বদমায়েশ!

বিয়েটা পর্যন্ত নির্বিঘ্নে চুকে গেল। তাড়াহুড়োর মধ্যে কোনমতে ওপরের ঘরগুলোর চুন ফিরিয়ে চলনসই ক'রে নেওয়া হয়েছিল। নিচেটা করবার সময় হয় নি। সুরেশ বলেছিল, 'বিয়েটা চুকে যাক···একটা ভাড়াটে ঠিক করি, তখন করিয়ে নিলেই হবে। কিন্তু এখানে যে ভাড়াটে হঠাৎ ঠিক হওয়া শক্ত তা এই কদিন কলকাতা এসেই অনিলা বুঝেছেন। সরু গলি · দিনের আলো গলিতে পাওয়া যায় সারাদিনে চার পাঁচ ঘণ্টা। পাড়ার বাড়িগুলো কোনটাই একশো বছরের কম হয়—জামাইবাবু যা বলেছেন—এ বাড়িও সেই দলে। মোটা মোটা দেওয়াল ভিজে স্যাঁতস্যাঁত করছে, কেমন একটা চাপা ভ্যাপ্‌সা গন্ধ, নিচের ঘরগুলোয় আলো-বাতাসও বিরল। এতে কে আসবে মোটা টাকা ভাড়া দিয়ে?

অনিলা বললেন, 'ও বন্ধই থাক্‌। আমার এতগুলো ঘরে দরকার কি? ওর পেছনে আর খরচ করতে চাই না।'

সুরেশ কেবল তাঁকে আশ্বাস দেয়, 'আপনি বোঝেন না মা। লোকে মাথা গুঁজে দাঁড়াবার মতো স্থান পাচ্ছে না, এখন কি অত বাছবিচার করবার সময়?'

'তা হোক বাবা। আমার আর লাভ ক'রে দরকার নেই। তুমি বরং তাড়াতাড়ি একটা অন্য বাড়ি ছাখো। দুখানা ঘর হ'লেই আমার বেশ চলে যাবে—'

বিরস মুখে সুরেশ বলে, 'ভাল বাড়ি পাওয়া কি অত সোজা মা! দেখি—'

কিন্তু তাড়া কোন পক্ষেই খুব বেশি দেখা যায় না। ওরা একরকম ভালই আছে, অন্তত পথে তো দাঁড়িয়ে নেই, এই ভেবে সুরেশ গড়িমসি করে। আর অনিলাও খুব বেশি তাড়া দেন না—কারণ ওপরের ঘরগুলোয় আলো-বাতাস মন্দ নেই। বাস করাটা একেবারে অসম্ভব নয়।

হয়ত এমনিই চলত, যদি না তাড়াটা অপ্রত্যাশিত ভাবে অন্য জায়গা থেকে আসত।

টেঁপিরা যে কদিন ছিল—বাড়িটা তবু সরগরম ছিল কিছু, ওরাও চলে যেতে নিচের তলাটা একটু গা-ছমছমে হয়ে উঠল। কাজেই রামটহল যখন

এসে জানাল যে ওর চৌকিটা ধরে রাত্রে কে যেন নাড়া দেয়, অনিলা হেসেই উড়িয়ে দিলেন। নিচে একা থাকতে ওর ভয় করে—আসল কথাটা তাই। নানারকম কল্পনা করে সে।

কিন্তু একদিন আর উড়িয়ে দেওয়া চলল না।

হঠাৎ নিচে কে হৈ-চৈ ক'রে চেঁচিয়ে উঠতে অনিলা মধ্যরাত্রে উঠে এসে দেখলেন ভারী তক্তপোশসুদ্ধ কাত ক'রে রামটহলকে কে ফেলে দিয়েছে। সব নিচে রামটহল, তার উপর বিছানা, তার উপর তক্তপোশ। এই সবে রামটহল বেরিয়ে এসেছে সেই স্তূপের মধ্যে থেকে।

অনিলা ছেলেবেলা থেকে বিদেশে ঘুরছেন, তাঁর সাহস কম নেই। তাঁরও কেমন একটা খটকা লাগল। তবু তিনি বোঝাতে চেষ্টা করলেন যে, স্বপ্ন-সঞ্চরণ বলে এক রকম রোগ আছে, তাতে ঘুমের মধ্যেই উঠে রোগী নানারকম অদ্ভুত অদ্ভুত কাজ ক'রে বেড়ায়।

রামটহল তার জবাবে সোজা কথাটাই বলল, 'মা, আমি ও চৌকী আমার পিঠের উপর ফেলব কি ক'রে?'

তাও বটে।

রামটহল হাত জোড় ক'রে বলল, 'মা আমাকে ছুটি দাও। এ বাড়ি থাকলে আমি মরে যাব।'

অনিলা বললেন, 'বেশ তো, তুমি না হয় আজ থেকে দোতালাতেই শোও। ভাঁড়ার যে ঘরে থাকে সে ঘরে তো ঢের জায়গা—'

রামটহল প্রবল বেগে ঘাড় নাড়ল। এ বাড়ির সংস্পর্শে আর না। নেহাৎ গুরুবলে প্রাণটা বেঁচে গেছে। আবার সেই বিপদে যায় কেউ?

অনিলার অনেক অনুনয়ে-বিনয়ে শেষ পর্যন্ত সে এই বন্দোবস্তে রাজী হ'ল যে সারাদিন সে কাজ করবে, সন্ধ্যার পরও আলোটালো জেলে কিছুক্ষণ না হয় থাকবে কিন্তু রাত্রে এখানে সে থাকবে না কোনমতেই। বিডন স্ট্রীটে তার এক দেশোয়ালীর খাবারের দোকান আছে, সেইখানেই রাত্রে শোবে—আবার ভোরে আসবে।

অগত্যা রাজী না হয়ে উপায় কি?

সুরেশকে চিঠি লিখে ব্যাপারটা জানালেন অনিলা। সে এসে দেখা করে

বলে গেল, 'ব্যাটা মেড়ো ভূত, তার আর কত ভাল হবে। একেবারে খাঁটি দেহাতী ধরে এনেছেন। যা হোক—দু-চারটে দিন চালিয়ে নিন। আমি বাড়িও দেখছি আর চাকরও যদি একটা পাই—'

এর দিন-তিনেক পরেই রেখা ফিরল শ্বশুরবাড়ি থেকে। তার পরের শনিবার যথারীতি অনিলা নিমন্ত্রণ ক'রে আনালেন জামাইকে। আমোদ-আহ্লাদে হাসি-তামাসায় বহু রাত হয়ে গেল। খাওয়া-দাওয়া সেরে ওদের শুতে পাঠিয়ে নিচের দোর দিয়ে এসে যখন অনিলা শুতে গেলেন তখন রাত একটা বাজে।

তবু ওঁর ঘুম এল না কিছুতেই। কেন তা বুঝতে পারেন না। হাড়ভাঙা খাটুনি গেছে সারাদিন, এক হাতে সব কিছু করতে হয়েছে, ভাল ভাল খাবার তৈরী করেছেন জামাইয়ের জন্যে। তবু কেন ঘুম আসে না?

ঘণ্টাখানেক এপাশ ওপাশ ক'রে বিরক্ত অনিলা উঠে পড়লেন। মাথায় বোধ হয় একটু জল দেওয়া দরকার। সারাদিন আগুন-তাতে থেকে মাথা গরম হয়ে উঠেছে। কিন্তু দরজা খুলে বাইরে বেরোতেই যে দৃশ্য তাঁর চোখে পড়ল তাতে তিনি অবাক। রেখা তার ঘরের বাইরে চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে আছে। দোরটাও ভেজানো, তারই একটা কপাটে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে রেখা।

তবে কি জামাই কোন কারণে রাগ ক'রে বার ক'রে দিয়েছে রেখাকে? প্রথমেই মনে হ'ল ওঁর। কিন্তু সে যে অবিশ্বাস্য। ওঁদের যুগ হ'লেও না হয় সম্ভব হ'ত। তাছাড়া কন্যা-জামাতার অসাধারণ প্রণয়ের ইঙ্গিতই তিনি পেয়েছেন এ কদিনে।

তবে?

নিশ্চয়ই রেখাই রাগারাগি ক'রে বেরিয়ে এসে দাঁড়িয়ে আছে।

এ সব আবার কি। মেয়ের ওপর রাগ হ'ল অনিলার। তিনি চাপা গলায় ডাকলেন, 'এই, শোন্ এদিকে।'

কিন্তু রেখা নিশ্চল। সাড়াও দিলে না।

'ও আবার কি ঢং! রাতদুপুরে কেলেঙ্কারী।' চাপা গলাতেই তর্জন করেন অনিলা, 'শুতে যা না, কী হচ্ছে কি।'

ঐ দিকেই এগোন তিনি। কারণ বারান্দাটা কোণাকুণিভাবে ওঁর ঘরের

সামনে থেকে সমকোণে বেঁকে ঐ ঘরের সামনে দিয়েই দোতলায় কলঘরের দিকে গেছে। কিন্তু তিনি যত এগোন রেখাও তত পেছোয়। বিরক্তি বেড়ে যায় অনিলার। বুড়ো হাতী মেয়ের এ সব কী আদিখ্যেতা। অবশ্য হাসিও পায় —কোথায় পালাবে সে, ওদিকে তো বাথরুমেই শেষ। বেরোবার কোন দরজাও নেই।

'এই পোড়ারমুখী, শোন্ না, হ'ল কি তোর?'

সাড়া নেই। ততক্ষণে সে ঢুকে গেছে বাথরুমে।

অনিলা একটু দ্রুতপদেই যান। বাথরুমের দরজাটা ভাল ক'রে খুলে হাত বাড়িয়ে সুইচটা টিপে দেন।

কিন্তু কোথায় কে! বাথরুম একেবারে শূন্য।

ছোট্ট বাথরুম, কোনদিকে আর কোন পথ নেই নির্গমনের—বারান্দাও এত সংকীর্ণ, গেলে ওঁকে ধাক্কা মেরেই যেতে হবে। মেয়েটা গেল কোথায়?

অথচ তিনি তো স্পষ্টই দেখেছেন রেখাকে। মুখটা অবশ্য ভাল ক'রে দেখা যায় নি কিন্তু সেই গঠন, সেই নীল রঙের শাড়ি, তেমনি দাঁড়িয়ে থাকবার ভঙ্গী—

মাথায় জল দেওয়া হ'ল না। পা পা ক'রে পিছিয়ে এসে—যা করতে নেই শাশুড়ীকে, তাই করলেন—জানলা দিয়ে উঁকি মেরে দেখলেন ঘরের মধ্যে। আলো নেভানো তবু রাস্তার গ্যাসের আলোর একটা রেখা ঘরের দেওয়ালে এসে পড়ে বিছানাটা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে—দেখলেন, তাঁর কন্যা-জামাতা পরস্পরকে জড়িয়ে অগাধে ঘুমোচ্ছে।

মৃদু ঠেলা দিয়ে দেখলেন দরজাও বন্ধ ভেতর থেকে।

তবে কি—তবে কি রামটহলের অনুমানই—। অজ্ঞাত একটা আতঙ্কে মন পূর্ণ হয়ে উঠল। ফিরলেন নিজের ঘরের দিকেই—কিন্তু ওদিকে মুখ ফেরাতেই চম্‌কে চেয়ে দেখলেন তাঁর ঘরের সামনে তেমনিভাবে সেই মেয়েটি স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ঠিক রেখার মতোই দেখতে—যেমন একটু আগে দেখেছেন।

যত বড় সাহসীই হোন, এবার অনিলা অনুভব করলেন যে তাঁর পা কাঁপছে, সর্বাঙ্গ উঠেছে ঘেমে।

তবু—ওঘরে তাঁর যথাসর্বস্ব···দুই মেয়ে ও ছেলে ঘুমোচ্ছে। মরীয়া হয়ে

তিনি এগোলেন, মুখে অস্ফুটস্বরে রামনাম জপ করতে করতে—

মেয়েটিও এক পা এক পা ক'রে পিছিয়ে এক সময় মিলিয়ে গেল।

নতুন জামাইকে কিছু এসব কথা বলা যায় না। সুরেশকে ডেকে পাঠিয়ে বলতে সে হেসে বললে, 'এ আমি তখনই ভেবেছিলাম মা। যতই হোক মেয়ে-ছেলে তো. রামটহলের কথাটা যখন কানে গেছে তখন ভূত দেখবেনই একদিন না একদিন। আসলে সারাদিন খাওয়া-দাওয়া হয় নি—আগুন-তাতে কেটেছে, একটু—কী বলব—হিস্টিরিয়ার মতো হয়েছিল আর কি। আচ্ছা—আমি উঠে-পড়ে লাগছি একটা বাড়ির জন্যে—'

এই বিদ্রূপটা দারুণ লাগল অনিলার। তিনি আর কিছু বললেন না। ঘরে একটা ক'রে প্রদীপ জ্বালিয়ে রাখার ব্যবস্থা করলেন। পাঁচ-বাতির বাল্‌ব আনতে পারলেই ভাল হ'ত কিন্তু তাতে একটা পয়েন্ট টানতে হবে। কে করে সে সব হাঙ্গামা?

দিন তিনেক পরে কিন্তু আবার তাঁর ঘুম ভেঙে গেল। চোখ মেলে দেখলেন আলোটা নিভে গেছে, কিন্তু তখনও বাইরের আকাশে জ্যোৎস্নার আভাস থাকাতে একেবারে নিরন্ধ্র অন্ধকার জমাট বাঁধে নি ঘরে।

কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে মনে হ'ল, উঠে আলোটা জ্বালা উচিত। না হয় সারারাত ইলেকট্রিক আলোই জ্বলুক।

কিন্তু ওঠবার আগেই এক কাণ্ড ঘটল।

ওধারের জানলা দিয়ে রাশি রাশি পেঁজা তুলো এসে ঘরে ঢুকতে লাগল বাতাসে। প্রচণ্ড ঝড়ের মুখে যে ভাবে আসে তেমনি সজোরেই উড়ে আসতে লাগল…অথচ…অনিলা কান পেতে শোনেন—বাইরে কোথাও বাতাসের শব্দ পর্যন্ত নেই, ঝড় তো দূরের কথা। অনিলা ভয়ে অভিভূত হয়ে চেয়েই রইলেন খানিকটা, তারপর সন্তানদের বিপদ স্মরণ ক'রে যেন অকস্মাৎ মরীয়া হয়ে উঠলেন, একটা আর্ত চাপা চিৎকার ক'রে লাফিয়ে উঠেই সুইচটা টিপে দিলেন।

ছেলে মেয়েরা শান্ত ভাবেই ঘুমোচ্ছে, বাতাস নেই, তুলো আসাও বন্ধ হয়েছে। ঘরে বাইরে প্রকৃতি শান্ত ও স্তব্ধ।

আলো জ্বালার সঙ্গে সঙ্গেই ভয়ও চলে যায়। অনিলার মনে হয় আগা-গোড়া কি স্বপ্নই দেখছেন তিনি? একটু হাসেনও বোধ হয় অপ্রতিভভাবেই··· আপন মনেই। কিন্তু তারপরই কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন···ঐ তো বিছানার চার পাশে পেঁজা কাপাস তুলো ছড়ানো। হাতে করে ছুঁতে ভরসা হয় না বটে ···কিন্তু চোখে যতটা দেখা যায় তাতে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই।

বাকী রাতটা সেই এক ভাবেই জেগে কাটিয়ে দেন অনিলা। শুতেও ভরসা হয় না—পাছে চোখ বুজে আসে তন্দ্রায়। মনে মনে স্থির করেন ভগ্নীপতি রাগই করুন আর যাই-ই করুন ভাগলপুরেই ফিরে যাবেন তিনি। ছেলে-মেয়েরা ইস্কুলে এখনও ভর্তি হয় নি, গরমের ছুটির পরই হবে এমনি কথা আছে। এ ক্ষেত্রে একেবারে ভাগলপুরে গিয়েই ভর্তি ক'রে দেবেন। কলকাতার মোহে আর কাজ নেই।

মেয়েদের কিন্তু ভরসা ক'রে কিছু বলতে পারেন না। তুলোগুলো নিজেই ঝাঁট দিয়ে ফেলে দেন। দিনের আলোর সঙ্গে সঙ্গে সাহসও ফিরে আসে অনেকটা। রামটহলকে পাঠান পুরোহিতের কাছে, যে পুরোহিত রেখার বিয়ে দিয়েছিলেন···তাঁকে ডাকিয়ে এনে ফরমাস দেন তিনটে রাম-কবচের। মোটা প্রাপ্তিযোগের সম্ভাবনায় হৃষ্ট পুরোহিত তিনদিন সময় নিয়ে চলে যান।

কিন্তু কবচ পৌঁছবার আগেই একটা অঘটন ঘটে গেল···

অপরাহ্নের সঙ্গে সঙ্গেই ওঁরা ছাদে উঠে বসেছেন। রান্নার কাজ সেরে ফেলেন অনিলা বেলাবেলিই—রামটহল বাসনমাজা শেষ ক'রে নিচের কলতলায় স্নান করছে। এই সময় এসেছে সুরেশ, আদালতের ফেরত ওদের খবর নিতে।

রামটহল ওকে দেখেই আঙুল দিয়ে ছাদের দিকটা দেখিয়ে দিলে। অর্থাৎ সবাই ওখানে। সুরেশও ঘাড় নেড়ে জুতো খুলে ওপরে উঠে গেল। ডাকবার প্রয়োজন নেই, ছাদে উঠে সবাইকে চমকে দেবে···এই উদ্দেশ্য। কিন্তু দোতলায় উঠেই দেখল শোবার ঘরের চৌকাঠ ধরে রেখা দাঁড়িয়ে আছে, হাসি হাসি মুখে।

সন্ধ্যা তখনও হয় নি। ছাদে দিনের আভাস এখনও লেগে—আলো জ্বালবার তখনও দেরি আছে, এমনি সময় সেটা। তবু একটা ঘোর ঘনিয়ে

এসেছে পুরোনো বাড়ির দেওয়ালের খাঁজে খাঁজে। কিন্তু এমন অন্ধকার হয় নি যে ঝাপ্‌সা হয়ে যায় দৃষ্টিটা—সুরেশ ভাল ক'রেই দেখল রেখাকে। সামনে থেকে পুঙ্খানুপুঙ্খ দেখা হয়ত নয়···তবু পরিচিত মূর্তির সমস্ত রেখা ও ভঙ্গী সে মিলিয়ে পেয়েছে সেই দেখাতেই।

'কী গো···মেজগিন্নী যে! তুমি একা এখানে? বিরহে ম্লান হয়ে দাঁড়িয়ে? ···আমার পায়ের আওয়াজে কর্তার আওয়াজ বলে ভুল করেছিলে বুঝি?'

রেখা কথা কইল না। মনে হ'ল একটু হাসল সে।

কথা কইতে কইতেই এগিয়ে যায় সুরেশ। রেখাও পিছিয়ে ঘরে গিয়ে ঢোকে।

'কথা কইছ না যে! আশাভঙ্গের ঝালটা আমার ওপর পড়ল নাকি? আমি কি করব বলো, আমার ওপর রাগ ক'রে কি হবে? আরে, গেলে কোথায়? উবে গেলে নাকি?'

সত্যি তো···কোথায় গেল রেখা?

কোথাও তো নেই। ঘরে তিনটে ট্রাঙ্ক আর পাতা বিছানা। দড়ির আনলায় দু-একখানা কাপড়। এমন আসবাব নেই যে তার আড়ালে লুকোবে।

এই প্রথম একটা খট্‌কা লাগল সুরেশের। তবু সে হাত বাড়িয়ে সুইচটা টিপে দিল। না, রেখার চিহ্নও নেই কোথাও। অথচ এই একটা দরজা··· বেরোবার কোন দ্বিতীয় পথও তো নেই।

অব্যক্ত অস্ফুট একটা শব্দ ক'রে সিঁড়ি দিয়ে লাফিয়ে ছাদে উঠল সুরেশ।

ছাদে সবাই ওরা বসে আছে। একটা থালায় মুড়ি মাখা তেল দিয়ে, মেয়েরা গোল হয়ে বসে খাচ্ছে। অনিলা একটু দূরে বসে কি সেলাই করছেন।

'রেখা!' প্রায় আর্তনাদ ক'রে ওঠে সুরেশ।

'কী জামাইবাবু? কী হয়েছে?'

'তুমি কি এইখানেই ছিলে এতক্ষণ? না, নিচে ছিলে?'

'না তো—আমি তো এখানেই আছি।'

চোখের নিমেষে অনিলা উঠে দাঁড়ান।

'সুরেশ, বাবা, একবার নিচে চলো তো! জরুরী কথা আছে।'

ইঙ্গিতটা বুঝতে পারে সুরেশ, নিজেকে সামলে নিয়ে নেমে আসে নিচে।···

অনিলা হেসে প্রশ্ন করেন, 'আজ তাহ'লে নিজে চোখেই দেখলে বাবা ?'

সুরেশ হেঁট হয়ে ওঁর পা ছুঁয়ে বলে, 'আমাকে মাপ করুন মা। আজই চলুন আমার ওখানে। আমি কাল যেমন ক'রে হোক বাড়ি খুঁজে আপনাকে তুলে দেব। মালপত্র এমনিই থাক্...'

অনিলা বলেন, 'দেড় মাস আমি ঘর করছি বাবা ওর সঙ্গে, একদিনে কী এসে যাবে। তুমি কালই ব্যবস্থা ক'রো, তাহলেই আমি নিশ্চিন্ত হই।'

'ছি ছি! কী অপরাধ করেছি মা, যদি বিপদ-আপদ হ'ত কিছু! ইস্!'

অনুতাপের শেষ থাকে না সুরেশের।...

সুরেশ আবারও অসাধ্যসাধন করল। ঢাকুরিয়া অঞ্চলে একটা ছু-কামরা বাড়ি খুঁজে বার করল সে রাতারাতি।

পরের দিন লরী ডেকে যখন মালপত্র তোলা হচ্ছে, সামনের বৃদ্ধ খাবারওলা এক পা এক পা ক'রে এগিয়ে এল সদরের মধ্যে। অনিলা দাঁড়িয়ে মালের তদারক করছিলেন। খাবারওলা জোড়হাতে তাঁকে এক নমস্কার ক'রে বলল, 'চললেন মা...আবার কিছুকালের জন্যে নিশ্চিন্দি।...যাহোক আপনার বুকের পাটা মা, এই বাড়িতে তবু দেড় মাস কাটালেন তো! আর কেউ পারে নি!'

অনিলা যেন আঁধারে কূল দেখতে পান।

'তুমি জানতে বাবা?'

'জানতুম বৈকি মা। আমি কি আজকের লোক। চল্লিশ বছরের দোকান আমার। আমি ও ঠাকরুনটিকে জ্যান্ত দেখেছি যে!'

সুরেশ রুষ্ট কণ্ঠে বলল, 'তুমি জানতে তবু বলো নি আমাদের?'

'আপনারা যে জানতেন না তাই বা কেমন ক'রে জানব বাবু। এ পাড়ার তো সবাই জানে। আমি ভাবলুম যে জেনে শুনেই নিয়েছেন সাহস ক'রে। আপনারা একেলে লেখাপড়া-জানা লোক, আপনাদের বোধ হয় পেত্নীও ভয় করে।' ওষ্ঠে চাপা বিদ্রূপের হাসি বুড়োর।

অনিলা ইঙ্গিতে ওকে একপাশে ডেকে আনেন।

'ব্যাপারটা কি বাবা বলো তো?'

'ব্যাপার কি জানেন মা...দত্তমশাই মানে এখন যিনি মালিক, ওনার দাদার

ভাগে ছিল এ বাড়ি। তিনিই থাকতেন এখানে। পুলিসে কাজ করতেন—মদ আর মেয়েমানুষ ক'রে ক'রে সে চাকরি যায়, তবু অভ্যাস ছাড়তে পারেন নি। টাকার লোভে ঐ ভালমানুষের মেয়েটাকে বিয়ে করেন কিন্তু ফিরে তাকান নি কোন দিন ওর দিকে। বেচারা একা থাকত। আগে এক ঠিকে ঝি কাজ ক'রে দিয়ে যেত—তিন মাসের মাইনে বাকী পড়ায় সেও ছেড়ে দিল। ভাড়াটে টিকত না, এমনই সুনাম ছিল কর্তার। শেষে বৌটা না খেয়ে খেয়ে অসুখে পড়ল—পড়েই আছে, আটদিন বাবুর পাত্তা নেই। কি করতে আসবে মা, সোনারত্তি তো রাখে নি গায়ে।…শেষে যেদিন এল, দরজা ভেঙে ভেতরে ঢুকতে হ'ল—দেখে কতদিন ম'রে পড়ে আছে, পিঁপড়েতে অর্ধেক খেয়ে শেষ করেছে। কোনমতে বাকী দেহটা তুলে তো পুড়িয়ে দিলে—না শ্রাদ্ধ না কিছু। কিছুদিন পরে ভাইকে বাড়ি বেচে দিয়ে কর্তা উধাও হলেন কিন্তু ঠাকরুনটি সেই থেকে রয়েই গেলেন। অনেক ভাড়াটে এসেছে মা, কেউই তিন দিনের বেশি থাকতে পারে নি। এবার আপনাদের এতদিন থাকতে দেখে ভাবলুম যে বুঝি ঠাকরুন কোথাও গেছে।'

তারপর একটু দম নিয়ে বলল, 'শুধু কি ভাড়াটের ওপর উপদ্রব মা? এক দিন হয়তো কুল্‌ফি-বরফওলাকে ডেকে বসল, আবার কোনদিন বা বাসন-উলীকে। সকলে নিশ্চিন্ত হয়ে ঢোকে—পোড়ো দেখে ভেতরে ঢুকে ব্যাপারটা বুঝে চিৎকার করতে করতে বেরিয়ে আসে। একদিন একটা নাপ্‌তিনীকে ডেকেছে তার তো দাঁতকপাটি লেগে একেবারে যায় যায় অবস্থা। অতি কষ্টে তার জ্ঞান করি। এই আমার এক চাকরি।'

অনিলা স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। হতভাগিনীর অন্তরের অতৃপ্ত তৃষাটা যেন তিনি দেখতে পাচ্ছেন পরিষ্কার।

অনেকক্ষণ পরে তিনি বললেন, 'একটা কাজ করতে পারবে বাবা।'

'কেন পারব না মা—বলুন।'

'তুমি একটি ব্রাহ্মণ ডেকে এই ভিটেতে তুলসী দেওয়াতে পারো?'

'আপনি কেন দেবেন মা, যার বাড়ি তার যদি হুঁশ না হয়—'

'তা হোক বাবা। তাতে দোষ নেই। এই বারোটা টাকা রাখো। আমাদের তো এখনও ভাড়া দেওয়া আছে। চাবি তোমার কাছেই রাখো। আমার

জামাই এসে খবর নিয়ে যাবেন'খন—যদি বেশি লাগে তো তাও দেবেন। দোহাই বাবা, এই কাজটি করিয়ে দাও।'

'আচ্ছ তাই হবে মা। আপনার জন্যেই ওর আত্মাটা বোধ হয় এতকাল বসে ছিল।'...

অনিলা বেরোবার আগে বাড়িটার দিকে তাকিয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলেন। এতকাল ছিল ভয়—আজ যাবার আগে অভাগিনীর জন্যে মায়াই বোধ হয় তাঁর। অপরিসীম বেদনায় মনের ভেতরটা যেন টনটন করতে থাকে।

রহস্য

রাণু বৌদি আর আমি প্রায় সমবয়সীই ছিলুম। ওঁর যখন বিয়ে হয় তখন আমার বয়স ছিল সতেরো-অঠোরো, ওঁর ষোল-সতেরো। হয়ত সেই জন্যেই আমাদের দু'জনের অত সহজে ভাব হয়ে গিয়েছিল।

ওঁর বিয়ে থেকেই শুধু নয়—বিয়ের আগে থেকেই ওঁকে দেখছি। দূর সম্পর্কের পিসতুতো ভাই, তারই বিয়ে—তাতে আমাদের অত জড়িয়ে পড়ার কথা নয় কিন্তু কেষ্টদার ওদিকে আর আপনার লোক কেউ ছিল না। পিসীমা বিধবা মানুষ, ছেলেও তেমন রোজগার করে না, সুতরাং পাত্রী পাওয়া তখনকার দিনেও দায় ছিল। যদি বা পাত্রী একটা পাওয়া গেল তো সমস্যা দাঁড়ালো, দেখতে যায় কে? পিসীমা নিজে যেতে রাজী নন, ছেলেকেও পাঠাতে চান না—ওপক্ষে তেমন আর কেউই নেই যে যায়। আমার দাদাদের খোশামুদি ক'রে দেখলেন, তাঁরাও ব্যস্ত। ছিল তাঁর এক বেকার ভাগ্নে, তারও আকৃতি-প্রকৃতি ভাল নয়। নেশাখোরের মতো ধরন-ধারণ তার। তবু তাকেই পাঠাতে হ'ল বলে মায়ের অনুমতি নিয়ে আমাকে পাঠালেন তার সঙ্গে। যুক্তি দিলেন, 'একটা অন্ততঃ মানুষের মতো চেহারার লোক তো যাওয়া চাই, নইলে তারা মনে করবে কি? ভদ্রলোক বলে বুঝতেই পারবে না যে।'

অবশ্য বিনয় বজায় রেখেও এটা স্বীকার করতে বাধা নেই, চেহারাটা আমার খুব সুন্দর না হ'লেও ভদ্রলোকের মতোই ছিল—তাছাড়া খুব লম্বা-

চওড়া গড়নের জন্যে সেই বয়সেই মুরুব্বি মুরুব্বি দেখাত।

সুতরাং গেলুম। অজ পাড়াগাঁয়ে গরীবের ঘর। চালে খড় নেই, পরনে বস্ত্র নেই, এমন অবস্থা—কিন্তু তারই মধ্যে রাণুবৌদি বেরিয়ে এলেন পঙ্কের মধ্যে পঙ্কজার মতো—যেন গোবরের রাশির মধ্যে সহস্রদল পদ্ম ফুটে উঠল।

বয়স অল্প হ'লেও একবার মাত্র সেদিকে তাকিয়ে এটা বুঝতে পারলুম যে এখানে আর সংশয়ের কোন অবসর নেই। তবু হয়ত একটু হাতে রেখে বলা উচিত ছিল কিন্তু তখনও অত বুদ্ধি হয় নি—ঝাঁ ক'রে বলে বসলুম, 'মেয়ে আমাদের পছন্দ, আপনারা কাল গিয়ে পাত্র দেখে কথা পাকা ক'রে আসুন।'

বাইরে বেরিয়ে পিসীমার ভাগ্নে রমানাথদা আমাকে ছুশো তিরস্কার করলেন —'তুমি যে ফট্ করে কথা দিয়ে এলে, মামীমা যদি নিজে দেখতে চান, যদি পছন্দ না করেন? তা ছাড়া ওটা দেখায়ও খারাপ—বরপক্ষ কি আর এক কথায় রাজী হয়ে যাওয়া ভাল?'

এসব ঘোর-প্যাঁচ বুঝি না তখন—সুতরাং চুপ ক'রে রইলুম, তবে এটুকু জোর তখনও মনে ছিল যে পিসীমাই দেখুন আর যে-ই দেখুন, পছন্দ হবেই! বাড়ি ফিরতে পিসীমা নানা রকম জেরা করতে লাগলেন, তাঁকেও সেই কথা বললুম, 'এ মেয়ে যদি পছন্দ না হয় পিসীমা, তাহ'লে নিজে হাতে আমার কানটা কেটে ফেলবেন, কিচ্ছু বলব না।'

পিসীমারও তখন অত বাছ-বিচার করার উপায় ছিল না, তিনি আমার ওপর ভরসা করেই কথাবার্তা পাকা ক'রে ফেললেন। রমানাথের একটু খুঁত-খুঁতুনি ছিল কিন্তু কিসের যে আপত্তি তাও পরিষ্কার ক'রে বলতে পারল না। এমন কি বিয়ের কথা যত পাকা হয়ে এল ততই সে যেন সরে দাঁড়াতে লাগল (বিয়ের পর কনে দেখে আমার দাদারা বলাবলি করেছিলেন—কানে গিয়েছিল যে—ওটা ওর স্রেফ ঈর্ষা)—ফল হ'ল এই যে বিয়ের সব কথাবার্তা এমন কি বাজার-হাট পর্যন্ত সমস্ত ভার আপনা থেকেই আমার ওপর এসে পড়ল। এক কথায় আমিই এক ছোটখাটো বরকর্তা হয়ে উঠলুম।

সেই ভাবেই বিয়ে অবধি চলল। বর-যাত্রার আগে আমার হাতেই পিসীমা টাকাকড়ি সব দিয়ে দিলেন, বর-যাত্রীদের আগ্‌লে নিয়ে যাবার ভারও পড়ল আমার ওপর।

পরে শুনেছিলুম রাণুবৌদির মুখে যে, কথাটা নাকি ওদের বাড়িতেও ছড়িয়ে পড়েছিল এবং তা নিয়ে হাসাহাসি আলোচনার শেষ ছিল না। একটি অকালপক্ক ছেলেই যে এ পক্ষের অভিভাবক এবং সে যে উৎকট গাম্ভীর্যের সঙ্গে তার নবলব্ধ মর্যাদা বজায় রাখবার চেষ্টা করছে, এ কথাটা জেনে ওদের কৌতূহল ও কৌতুকের অন্ত ছিল না। বোধ হয় কতকটা সেই জন্মে বিয়ের রাত থেকেই রাণুবৌদিকে আমার সঙ্গে কথা বলাতে পেরেছিলুম এবং ফেরবার পথে স্টীমারে ও ট্রেনে রীতিমতো ভাবই হয়ে গেল। তাঁর নাকি একটি দেওরের শখ ছিলই মনে মনে, আমাকে পেয়ে তিনি বাঁচলেন।

এ বাড়িতে বেশি লোক ছিল না, পিসীমা, কেষ্টদা আর পিসীমার এক বুড়ী জা। সুতরাং এখানেও রাণুবৌদির আশ্রয় হয়ে উঠলুম আমিই—এমন কি যে সব কথা সমবয়সী ননদ ও জা'দের কাছেই বহু কষ্টে সঙ্কোচ দমন ক'রে বলে, সে সব কথাও এখানে আমাকে ছাড়া বলবার কেউ ছিল না। বিয়ের চার-পাঁচটা দিন কিছু কিছু আত্মীয় সমাগম হয়েছিল কিন্তু তার মধ্যেও তেমন কেউ আপনার লোক হবার মতো ছিল না। বিয়ের পর যখন ঘর-বসত করতে এলেন তখন তো কেউই নেই। সুতরাং অন্তরঙ্গতা একমাত্র আমার সঙ্গেই তাঁর গড়ে উঠল।

রাণুবৌদির একটা পরিচয় অল্পদিনের মধ্যেই পেয়ে আমি একটু অবাক হয়ে গেলুম। গরীবের ঘরের মেয়ে, তায় চিরকাল অজ পাড়াগাঁয়ে মানুষ, লেখাপড়ার কথা সেখানে কল্পনা করাই চলে না। বাড়িতেই সামান্য একটু বাংলা লেখাপড়া শিখে,.বোধ হয় খুব বেশি হবে তো পঁচিশ-ত্রিশখানা উপন্যাস পড়েছেন এ পর্যন্ত—চেয়েচিন্তে, অনেক কষ্টে। কিন্তু তবু এমন অদ্ভুত একটা রোমান্টিক মানসিক গঠন ছিল ওঁর, যা শহরের শিক্ষিত মেয়েদের মধ্যেও কম দেখেছি।

তেমনি উলটো ছিল কেষ্টদা। লেখাপড়া মোটেই শেখে নি (ছেলেবেলায় বাপ মরলে যা হয়), কোন্ এক ইলেকট্রিকের দোকানে সামান্য কী এক চাকরি করত—মিস্ত্রীদের সংসর্গে শুধু মুহুর্মুহুঃ বিড়ি খেতেই শিখেছে, কোন রকম সূক্ষ্ম মনোবৃত্তির ধার ধারত না সে। কথা ছিল অত্যন্ত কাঠখোট্টা ধরনের। চেহারাটাও দড়িপাকানো গোছের—রসিকতা যে দেশে থাকে সে

দেশ দিয়েই বোধ হয় হাঁটে নি কখনও। রসিকতার চেষ্টা করলেই পিসীমা বলতেন, 'চুপ কর্ চুপ কর্—কথা তো নয়, যেন মধুর কলসীতে জোড়া জোড়া লাথি পড়ছে।' অর্থাৎ কেষ্টদা ও রাণুবৌদি অন্তরে বাহিরে একেবারে বেমানান ছিলেন।

অবশ্য রাণুবৌদি এ সব দিকে খুব চাপা ধরনের মানুষ ছিলেন—তবু এক-একদিন আমার কাছে না বলে পারতেন না। এক-একদিনের আশাভঙ্গের ইতিহাস বলতে বলতে তাঁর চোখ ছলছলিয়ে আসত, কোন কোন দিন জলও পড়ত দু-চার ফোঁটা। সবচেয়ে অসহ্য ছিল তাঁর কাছে ঐ বিড়িটা—রাগ ক'রে বলতেন, 'কী ক'রে খায় ভাই ঐ পোড়া জিনিস, মুখের এক হাতের মধ্যে তিষ্ঠোতে পারি না,—এমন দুর্গন্ধ!' অথচ কেষ্টদার দারুণ নেশা, এমন কি রাত্রে কোন কারণে অল্পক্ষণের জন্য ঘুম ভেঙে গেলেও একটা বিড়ি খেয়ে নেওয়া চাই।

আরও তাঁর কাল হয়েছিলুম বোধ হয় আমিই। তখন তো অত বুঝতুম না, কলেজ লাইব্রেরী থেকে কবিতার বই এনে দিতুম, উপন্যাস চেয়ে এনে দিতুম লাইব্রেরী থেকে। ওঁর রোমান্টিক মনটিকে আমার খুব ভাল লাগত, তাই তাকেই বিকশিত হ'তে দেবার সুযোগ খুঁজতুম সব দিক দিয়ে—। হয়ত তা না হ'লে একদিন তিনি তাঁর স্বামীর সঙ্গেই খাপ খাইয়ে নিতে পারতেন।

কে জানে!

এখন মনকে প্রবোধ দিই যে, সবই তাঁর অদৃষ্ট, নইলে এমন হবে কেন?

ছ'মাস এখানে কাটাবার পর রাণুবৌদি বাপের বাড়ি গেলেন। তাঁর বাপ-মায়ের ঠিক সে অবস্থা ছিল না কিন্তু পিসীমাই এক রকম জোর ক'রে পাঠালেন। রাণুবৌদি যে এখানে একটু একটু ক'রে শুকিয়ে উঠছিলেন এটা তিনিও লক্ষ্য করেছিলেন, যদিও কারণটা ঠিক অনুমান করতে পারেন নি। তিনি ভেবেছিলেন ছেলেমানুষ, বহু দিন বাপ-মায়ের কাছ-ছাড়া, ভাই-বোনদের ফেলে এসেছে—মন কেমন করছে বোধ হয়। যাক্—দুদিন ঘুরে আসুক।

ওখানে গিয়ে তিনি প্রথম যে চিঠি দিয়েছিলেন আমাকে, তা নিতান্তই মামুলি। হাতের লেখা কদর্য, অসংখ্য ভুলে ভর্তি, অর্ধেক শব্দ লেখা হয়েছে,

অর্ধেক হয় নি। তবু তারই মধ্যে একটু কবিত্ব করার চেষ্টা ছিল দেখে আমি তার একটা খুব ভাল জবাব দিলুম (অন্তত আমার তাই বিশ্বাস)। আমিও তখন তরুণ, কবিত্ব করার শখ আছে অথচ ক্ষেত্র নেই, এতদিন এমন কেউ বিদেশে ছিল না যাকে একটা ভাল ক'রে চিঠি দিতে পারি—সুতরাং এই প্রথম সুযোগের ভাল রকমই সদ্ব্যবহার করেছিলুম, বলা বাহুল্য।

তার ফল কিন্তু ভাল হ'ল না। অবশ্য ঠিক তারই ফল কিনা জানি না—এবার রাণুবৌদি আমার কলেজের ঠিকানায় এক দীর্ঘ চিঠি দিলেন—একেবারে প্রেমপত্র। বটতলার সাহিত্য ধরনের লেখা, উচ্ছ্বাসে ভর্তি—অত্যন্ত কাঁচা পাড়াগেঁয়ে সেকেলে প্রেম নিবেদন। কিন্তু তবু তার মধ্যে একটা জিনিস বুঝতে দেরি হ'ল না যে, এর প্রত্যেকটি কথা তাঁর বুকের রক্ত দিয়ে লেখা—অনেক-দিনের নিরুদ্ধ অন্তরবেদনা আজ সমস্ত সঙ্কোচের বাঁধ ভেঙে বেরিয়েছে।

আমি কিন্তু এ চিঠি পেয়ে সেদিন বিরক্ত হয়েছিলুম। হয়ত বা একটু ভয়ও পেয়েছিলুম। এ কী ঝামেলায় জড়ালুম, এই একটা আশঙ্কা মনে মনে—এবং অত্যন্ত মধুর একটা সম্পর্কের কদর্য পরিণতির সম্ভাবনায় বিরক্তি—এই ছিল বোধ হয় তখনকার ঠিক মনোভাব। তা ছাড়া আমার তখন যা বয়স তাতে মাংসলোলুপতা খুব স্বাভাবিক নয়, অন্তত আমাদের আমলে ছিল না—এমনি একটু মধুর আন্তরিকতা, বন্ধুত্বের সম্পর্ক, একটু বিশ্বাসের আদানপ্রদান, এইটিই ছিল বাঞ্ছনীয়। সৌন্দর্যবোধ এবং নিজের বক্তব্য শোনাবার একটা ভাল শ্রোতা পেয়েও খুশী ছিলুম মনে মনে, বরং বলা যায় তাতেই খুশী ছিলুম, এমন সময় এই বিপত্তি।

পরবর্তী জীবনে বাংলাদেশের-পক্ষে-দুর্লভ-সৌন্দর্যের অধিকারিণী একটি কিশোরীর কাছ থেকে অমন প্রেমপত্র পেলে নিজেকে হয়ত ধন্য বলে মনে করতুম, কিন্তু কে জানে কেন, সেদিন তা পারি নি।

প্রথমটা ভেবেছিলুম যে একটা কড়া জবাব দিয়ে ঠাণ্ডা ক'রে দেব—কিন্তু তারপরে ভেবে দেখলুম যে মানুষটা অত্যন্ত বুদ্ধিমতী, কঠিন ভাবে নীরব থাকলেই ধৃষ্টতার উপযুক্ত জবাব হবে, আমার মনোভাব তার বুঝতে বাকী থাকবে না। শুধু শুধু কঠিন কথা বলতে গিয়ে নিজেকেই খানিকটা আহত করা হবে হয়ত।

তাই করলুম। না রাম না গঙ্গা—কোন চিঠি নয়।

দিন-পনেরো পরে আবার একটা চিঠি এল। কলেজের ঠিকানাতেই এবং খামে, কিন্তু চিঠি মাত্র তিন ছত্র—'আমাকে ক্ষমা ক'রো, হঠাৎ আবেগের বশে চিঠি লিখে ফেলে পর্যন্ত শান্তি নেই মনে। আমাকে অন্তত তুমি ঘেন্না ক'রো না—আমার আর কেউ নেই।'

কী জানি কী রকম একটা বিরূপ মনোভাব হয়েছিল, সে চিঠিরও জবাব দিলুম না।

এর দিন-কতক পরেই রাণুবৌদি ফিরে এলেন। আগে হ'লে তিনি পৌঁছবার আগেই আমি পৌঁছে যেতুম—কিন্তু এবার গেলুম তিন দিন পরে। গিয়েও পিসীমার সামনেই দু-একটি কুশল প্রশ্ন ক'রে পাঁচ মিনিটের মধ্যে উঠে পড়লুম। পিসীমা অবাক হয়ে প্রশ্ন করলেন, 'তোর কী হ'ল রে?'

'ভীষণ লেখাপড়ার চাপ যে পিসীমা, দুদিন পরেই তো পরীক্ষা।'

'তা বটে।' পিসীমা বলে উঠলেন, 'ও কথাটা মনে ছিল না।'

কিন্তু আসল কথাটা যে বোঝবার সে ঠিক বুঝল, পাথরের মতো স্তব্ধ হয়ে বসে রইল, মাটির দিকে চেয়ে।

এর তিন-চার দিন পরেই খবর পেলুম রাণুবৌদির জ্বর হয়েছে। হওয়াও বিচিত্র নয়, অসময়ে যা বর্ষা গেল তিনদিন, নিশ্চয়ই ঠিকে ঝি ওদের কামাই করেছে—ভিজে ভিজে কাজ করতে হয়েছে বৌদিকেই। ঠাণ্ডা লেগে সর্দিজ্বর, ও আপনিই ভাল হবে।

আরও তিনদিন পরে খবর পেলুম জ্বর ছাড়ে নি—পিসীমা ডাক্তার আনিয়েছেন। সুতরাং উদ্বিগ্ন হবার কথা—পিসীমার হাতে সামান্য টাকাকড়ি ছিল বটে, নইলে শুধু কেষ্টদার আয়ে ওদের সংসার চলত না, তবু চট্ ক'রে সর্দিজ্বর হ'লেই ডাক্তার ডাকবার মতো পর্যাপ্ত পয়সা নিশ্চয়ই ছিল না। ডাক্তার ডাকা হয় এসব সংসারে রোগ বাঁকা দাঁড়ালেই। একবার যাওয়া দরকার।

বিকেলে মা-ও বললেন, 'একবার খবর নিয়ে আয় রে, শুনছি আজ দুজন ডাক্তার এসেছিলেন, এরই মধ্যে কী এমন হ'ল?'

গিয়ে দেখি রাণুবৌদি অজ্ঞান অচৈতন্য। পাড়ার ডাক্তারই আর একজন ডাক্তার এনেছেন—তিনি ওবেলা জ্বরের ওপরই কুইনাইন ইনজেক্‌শান দিয়ে গেছেন, নাকি খারাপ টাইপের ম্যালেরিয়া।

আরও হুদিন পর পর গেলুম, রাণুবৌদি এর ভেতর একবারও চোখ খুললেন না, জ্ঞান হওয়া তো দূরের কথা। আমি ভাল বুঝলুম না। মনটায় বড় কষ্ট হ'ল—মনে হ'ল হয়ত মনকষ্টেই এই অসুখটা করেছে। স্কলারশিপের কিছু টাকা জমানো ছিল হাতে, তাই দিয়ে একদিন কাউকে কিছু না বলে এক বড় ডাক্তার এনে হাজির করলুম। আমার কেমন সন্দেহ হয়েছিল যে এ হুজন ডাক্তার চিকিৎসাটা ঠিকমতো করতে পারছেন না। বড় ডাক্তার এসে সেই সন্দেহই প্রকাশ করলেন। তখন ধরা পড়ল হয়েছে খারাপ টাইপের টাইফয়েড, চিকিৎসা চলছে ম্যালেরিয়ার, তার ফলে রোগ আরও বেঁকে দাঁড়িয়েছে।

এর পর তিন-চারদিন ভাল ক'রেই চিকিৎসা চলল। এমন কি কেষ্টদাও কিছু টাকা ধার ক'রে আনলেন কোথা থেকে, কিন্তু কিছুতেই কিছু হ'ল না। ডাক্তারবাবু বললেন, 'এমন অদ্ভুত ধরনের রুগী আমি এর আগে আর দেখি নি। নেচার খানিকটা লড়াই করে, তবেই ওষুধে ফল হয়—কিন্তু এর নেচার কিছুই করছে না। বাঁচবার একটা ইচ্ছা থাকে সকলকার প্রবল—এর কিছুমাত্র নেই সে ইচ্ছে। একে কী ক'রে বাঁচাব ? এ যেন মরতেই চায়।'

শেষের দিন বিকারও ছিল না, শুধু ধুক্ ধুক্ করছিল বুকটা। তার আগের দিন বিকারের ঘোরে শুধু বার বার বলেছিলেন, 'আমি কী এতই খারাপ—যে তুমি কথা পর্যন্ত কইলে না ? আর তুমি, তুমি কি এতই ভাল!'

কেউ বুঝল না, কিন্তু আমি বুঝলুম। হায় রে, একবারও যদি জ্ঞান হ'ত!

রাণুবৌদি, আমি হয়ত তোমাকে বিনাদোষে শাস্তি দিয়েছিলুম কিন্তু তুমিও তো অবিচার কম করলে না আমার ওপর! বিনাদোষে আমার মাথায় এতখানি অনুতাপের বোঝা চাপিয়ে দিয়ে গেলে!

গল্পের এইখানেই শেষ হবার কথা। কিন্তু তা হ'ল না। এবারের ব্যাপারটা আরও যেন জটিল হয়ে উঠল।

প্রথম প্রথম দুঃখ একটু হয়েছিল বৈকি।

কিন্তু অল্প বয়স, সারা জীবন সামনে পড়ে, এসব দুঃখ দীর্ঘস্থায়ী হবার কথা নয়। আশা ও আদর্শের বিরাট পথ সামনে, আত্মবিশ্বাসের অন্ত নেই। তুচ্ছ রাণুবৌদি আর তাঁর অভিমান—তাঁর স্মৃতি পর্যন্ত কোথায় তলিয়ে গেল। শুধু তাঁর বিয়ের ছবি থেকে যে এনলার্জ-করা ছবিটা ঘরে টাঙিয়েছিলুম প্রথম শোকের সময়, কখনও কখনও কোন 'কর্মহীন দীর্ঘ অবকাশে' বা কাজের ফাঁকে ধুলো-পড়া অবহেলিত সেই ছবিখানার দিকে চোখ পড়লে রাণুবৌদির কথা মনে হ'ত। সেই এক মুহূর্তই, তারপর কোথায় কি, আবার নিজের স্বপ্নে, নিজের সাধনায় ডুবে যেতুম।

এম. এ. পড়ছি যখন, সিক্স্‌থ্‌ ইয়ারে এক বান্ধবীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা বেড়ে উঠল হঠাৎ। আমি ভাল ছাত্র, সুতরাং আমার নোটও ভাল, সেই নোট নিতে এবং পড়াশুনো বুঝে নিতে জয়ন্তী আমার বাড়িতে আসতে শুরু করেছিল কিছুদিন ধরেই। সহপাঠিনী, তায় বইখাতা নিয়ে লেখাপড়ার কথাই আলোচনা হয়, সুতরাং কোন পক্ষের অভিভাবকই এর মধ্যে আপত্তিকর কিছু খুঁজে পান নি। বিশেষত জয়ন্তী আমার মাকে মা বলত, তাঁর কাছ থেকে কেড়ে বিগড়ে আবদার ক'রে নিজের মেয়ের মতোই খাবার খেত, রান্নাঘরে আড্ডা দিত ঘণ্টার পর ঘণ্টা—তার আচরণে সংশয়ের অবকাশমাত্র ছিল না। ইদানীং পরীক্ষা এগিয়ে আসতে সে দুপুরবেলা বই-খাতা বগলে সোজা আমার তেতালার ঘরে চলে আসত বটে কিন্তু যাবার সময় নিচে একটু আড্ডা দিয়ে যেতে তার ভুল হ'ত না। সবাই খুশী ছিলেন, স্নেহের চোখেই দেখতেন মেয়েটিকে—

এই ভাবে ঘনিষ্ঠতা বাড়তে বাড়তে পড়ার সঙ্গে গল্প, মনের কথা বলা ইত্যাদি চলত। বন্ধুত্বের সম্পর্ক থেকে আরও অন্তরঙ্গ সম্পর্কের দিকে এগিয়ে চলল মনোভাবটা। আমার যে সেদিকে খুব সতর্কতা ছিল এমনও বলা যায় না —কারণ মেয়েটিকে আমার ভালই লেগেছিল।

অন্তরের সেই কতকটা স্বেচ্ছাকৃত অসতর্কতার অবসরে এক দারুণ গ্রীষ্মের মধ্যাহ্নে হঠাৎ একদিন সংযম হারালুম আমরা দুজনেই—গরমের দিনে এই-রকম ক্লেদ ও স্বেদের মধ্যেই বোধ হয় মানসিক অধঃপতনটা সহজ হয়ে ওঠে—

জয়ন্তীকে এক হাতে জড়িয়ে টেনে নিলুম একেবারে বুকের মধ্যে, সে-ও কোন বাধা দিল না, বরং আবেশে তার দুই চোখ বুজে এল, গাল দুটিতে কে যেন আবীর ঢেলে দিলে। কিন্তু যেমন মাথা হেঁট ক'রে তার মুখের কাছে মুখ এনেছি, হয়ত উদ্দেশ্য ছিল চুম্বনেরই, সহসা দেখলুম যে-মুখ আমার সামনে নিমীলিত নেত্রে আদরের প্রত্যাশায় বিকশিত—সে মুখ জয়ন্তীর নয়, বহুদিন আগেকার দেখা আর একখানা মুখ—রাণুবৌদির। পরিষ্কার এবং স্পষ্ট—আবেগকম্পিত থরোথরো জয়ন্তীর ঠোঁট দুটি কোথায় মিলিয়ে গেছে, তার জায়গায় রাণুবৌদির সেই অতি-পরিচিত পাতলা লাল ঠোঁট দুটি বিদ্রূপের হাসিতে অপরূপ হয়ে উঠেছে।

চমকে ছেড়ে দিলুম জয়ন্তীকে। বোধ হয় সে পড়েই যেত। কোনমতে সামলে নিলে নিজেকে, ততক্ষণে কতকটা প্রকৃতিস্থও হয়েছে সে—হয়ত কিছু ক্ষুণ্ণও, বই-খাতা গুছিয়ে নিয়ে একটি কথাও না কয়ে গম্ভীর মুখে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। তার কি হ'ল—রাগ, অভিমান, অপমানবোধ না লজ্জা, সঙ্কোচ—কিছুই জানি না কিন্তু তারপর থেকে সে আর আমি বাড়ি থাকতে আসে নি একদিনও। নানা ছুতোয় কৈফিয়তের দায় এড়িয়ে গেছে।

অথচ আমিও তাকে সোজাসুজি খুলে কিছু বলতে পারলুম না। বলবই বা কি, নিজেই বুঝতে পারলুম না ঘটনাটা কি হ'ল। দৃষ্টিবিভ্রম না মস্তিষ্ক-বিকৃতি, আজও ঠিক করতে পারি নি।

এরপর আরও কিছুদিন কাটল। ইতিমধ্যে জয়ন্তীর বিরহও বিস্মৃতিতে পরিণত হ'তে বসেছে।

এম. এ. এবং ল পাস করে মুন্সেফের চাকরি নিয়ে গেছি মফস্বলের এক শহরে।

অবিবাহিত এবং সচ্চরিত্র এমন একটি পাল্‌টি ঘরের ছেলেকে (হয়ত সুশ্রীও) হাতের কাছে পেয়ে এস. ডি. ও. বা মহকুমা-হাকিম সাহেব হঠাৎ তাঁর বাংলোতে ঘন ঘন নিমন্ত্রণ করতে লাগলেন। তখনও বিয়ে করি নি, মায়ের অনুরোধ নানা অজুহাতে এড়িয়ে গেছি কিন্তু তাই বলে ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা ক'রে তো বসি নি। বিয়ে করব এটা মনে ঠিকই ছিল সুতরাং হাকিম সাহেবের

মনোভাব বুঝেও সতর্ক হওয়ার কোন কারণ খুঁজে পেলুম না। বিশেষত ললিতা দেখতেও খুব খারাপ নয়, ইন্টারমিডিয়েট পড়ছে, ভাল গান গাইতে পারে, বুদ্ধিমতী, চটপটে মেয়ে। হাকিম সাহেবের স্ত্রী ইচ্ছে ক'রেই আমাদের নিভৃত আলাপের অবকাশ দিতেন। আমি তা বুঝেও আপত্তি করতাম না। বিদেশে এমন একটি মেয়ের সাহচর্য ভালই লাগে—বিশেষত যেখানে কোন কুফলের সম্ভাবনা নেই। বিয়ে যখন করতেই হবে একদিন—তখন মন্দ কি?

একদিন হাকিম সাহেবের গাড়িই নিজে চালিয়ে নিয়ে গেছি নদীর ধারে, শহর থেকে মাইল চারেক দূরে, সঙ্গে ললিতা। অপরাহ্নের রক্তমেঘে নদীতীরের নির্জন তটভূমি অপূর্ব হয়ে উঠেছে, সেখানে গেলে সহজ মানুষও মাথা ঠিক রাখতে পারে না। পারিপার্শ্বিকের সে স্বপ্নময় আবেশ লেগেছিল ললিতাকেও। আস্তে কথা বলতে শুরু করল, দৃষ্টিও মুগ্ধ হয়ে এল। অবশেষে এক সময় তাকে টেনে নিলাম খুব কাছে, তার তনুলতা এলিয়ে পড়ল আমার বুকে, তার মাথা ও কাঁধের ভার আমার হাতের উপর। তার লজ্জারক্ত ঈষৎ কম্পিত অধরে এবং অর্ধনিমীলিত চোখের পল্লবে যৌবনের পরিপূর্ণ আবেগে প্রথম অক্ষয় প্রণয়-চুম্বন এঁকে দিতে যাব, এমন সময় আবারও ভূত দেখার মতো চমকে উঠলুম। কোথায় ললিতা? আমার চোখের সামনে, খুব কাছে রাণুবৌদির সেই বহু-দিনের বিস্মৃত মুখখানা, চোখে তেমনি কৌতুকের হাসি, ওষ্ঠ দুটি তেমনি বিদ্রূপের ভঙ্গীতে বাঁকানো।

ললিতা পড়েই গেল নদীর ধারে। সে বুঝল না ব্যাপার কি, রাগে ও বিরক্তিতে তার মুখ অন্ধকার হয়ে উঠল। তাড়াতাড়ি তাকে তুলতে গেলাম হাত ধরে, অস্ফুট কণ্ঠে বললুম, 'আমাকে মাপ করো ললিতা, হঠাৎ মাথাটা ঘুরে উঠল'···কিন্তু সে হাত ছাড়িয়ে নিয়ে সোজা গিয়ে গাড়িতে উঠে বসল। ফেরবার পথে নীরবেই ফিরলুম···কেউ কারুর সঙ্গে একটিও কথা কইতে পারলুম না।

বলা বাহুল্য ললিতাকে পাবার আশা আর রইল না। কিন্তু এবার আমার কেমন একটা ভয় হয়ে গেল, বিরক্তও হয়ে উঠলুম নিজের দুর্বল স্নায়ুগুলোর ওপর। এ কী কাণ্ড! এমনি ক'রে জীবনের অমৃত পাত্র বার বার ওষ্ঠের প্রান্ত

পর্যন্ত পৌঁছে অকারণে ফিরে যাবে? একটা ভাল রকম পরীক্ষা করতেই হবে ব্যাপারটাকে।

মনে মনে অস্থির হয়ে উঠলুম। কাজে মন বসে না, আহারে রুচি চলে গেল। দুশ্চিন্তায় ললাটে রেখা দেখা দিল।

কিন্তু আর পরীক্ষা করার সুযোগ কোথায়?

দিন কয়েক ভেবে ভেবে মরীয়া হয়ে উঠলুম। তিনদিনের ছুটি নিয়ে চলে এলুম কলকাতা, তারপর পূর্ব-পরিচিত এক অসচ্চরিত্র বন্ধুকে ধরে বন্দোবস্ত করলুম পতিতালয়ে যাবার। স্থান, কাল এবং পাত্রী ঠিক হ'ল—অত্যন্ত কুণ্ঠা ও ভয়ের সঙ্গে একসময় সেখানে উপস্থিত হলুম। খুবই ঘৃণা ছিল আমার এ ব্যাপারে, অথচ আমি স্বেচ্ছায় সেখানে উপস্থিত হয়েছি, অদৃষ্টের পরিহাস ছাড়া আর কি বলব? তবে দেখলুম বন্ধুবর আমার বেশ একটু রুচিজ্ঞানের পরিচয় দিয়েছে—মেয়েটি ভালই। ঠিক সাধারণ উৎকট 'বাজারে' পতিতাদের মতো নয়। কোনমতে সহ্য করা যায়।

কিন্তু এবারেও—কিছুক্ষণ আলাপের পর ঠিক ঘনিষ্ঠ হবার মুহূর্তে আবারও ফুটে উঠল রাণুবৌদির মুখ। পরিষ্কার স্পষ্ট, প্রত্যক্ষ। সেই হাসি-ভরা দৃষ্টি, সেই বিদ্রূপ মাখানো ওষ্ঠের ভঙ্গী। বোধ হয় একটু চিৎকার ক'রেই, ছুটে বেরিয়ে এলুম সেখান থেকে, তারপর একটা ট্যাক্সি নিয়ে চলে গেলুম একেবারে গঙ্গার ধারে।

কোথায় যাব তা জানি না, শুধু একটু খোলা হাওয়ায় বেড়াতে হবে, এই জানি।

এ কী হ'ল?

এমনি ক'রেই কি রাণুবৌদির অভিশাপ লাগল আমাকে? চিরদিন এই ভাবে সে বোঝা বয়ে চলতে হবে?

শিক্ষিত বলে গর্ব করি, ভূতে বিশ্বাস নেই—অথচ, অথচ এ ব্যাপারটাকে বোঝাই কি ক'রে, এর অর্থ কী, তা কেমন ক'রে জানব?

বহু রাত্রি পর্যন্ত গঙ্গার ধারে ঘুরে বেড়ালুম। মাথা দিয়ে যেন আগুন বেরোচ্ছে, কতবার জল দিলুম থাব্‌ড়ে, তবু মাথা ঠাণ্ডা হয় না।

জীবন কি তাহ'লে এমনি ব্যর্থ হয়েই যাবে, অতৃপ্ত এক নারীর অন্তরের অত্যুগ্র ক্ষুধা এমনি ক'রে জীবনের পরপার থেকেও আমাকে ঘিরে থাকবে? মুক্তি কি নেই কোথাও? রাণুবৌদি, কেমন ক'রে তোমাকে মুক্তি দেব এবং আমিও পাব বলে দাও আমাকে।

চির-জীবন যৌবনের ক্ষুধা নিয়ে আমাকেও এমনি নিঃসঙ্গ জীবন টেনে বেড়াতে হবে? আত্মহত্যা ছাড়া কি পথ নেই কোথাও?

এমনি কত প্রশ্ন মাথায় আসতে লাগল খাপ্‌ছাড়া ভাবে, পাগলের মতো এলোমেলো কত চিন্তা। ক্ষোভে দুঃখে মাথা খুঁড়তে ইচ্ছা হ'ল কঠিন রাজ-পথের ওপর···

তারপর একসময়ে, একেবারে ভোরবেলা, হঠাৎ একটা কল্পনা মাথায় এসে গেল।

ঠিক ঠিক! একবার শেষ চেষ্টা ক'রে দেখি, রাণুবৌদিকে তৃপ্ত করতে পারি কিনা।

উস্‌কো-খুস্‌কো চুল, আরক্ত চক্ষু—মাতাল এবং লম্পট মনে ক'রে ট্যাক্সি-ওয়ালা ডবল ভাড়া চাইল, তবু তাইতেই রাজী হয়ে ফিরে এলুম বাড়িতে। তেতলায় আমার ঘর এখনও খালিই থাকে, চাকরের কাছে চাবি চেয়ে নিয়ে খুলতে বেশি দেরি হ'ল না। দেওয়ালের ওপর থেকে রাণুবৌদির ছবিটা টেনে নিয়ে গিয়ে আবার ট্যাক্সিতে চড়লুম, 'চলো গঙ্গার ধারে, যত জোরে হয়।'

তখনও ভাল ক'রে ফর্সা হয় নি, স্নানার্থীদের ভীড় জমে নি ঘাটে। তবু একপাশ ক'রে গিয়ে বসলুম জলের ধারে, মনে মনে রাণুবৌদিকে স্মরণ করবার চেষ্টা করলুম, বললুম, 'তুমি যেখানেই থাকো, তোমার অতৃপ্ত আত্মা ভগবানের চরণে যেন এবার শান্তি পায়।' তারপর ওঁর সেই ছবিটা মুখের কাছে তুলে ধরে তার অধরের ওপর একটি গাঢ় চুম্বন এঁকে দিলুম। কিন্তু আশ্চর্য এই, ছবির শীতল স্পর্শে মৃতদেহের ওষ্ঠ স্পর্শ করার মতোই অনুভূতি হবার কথা—অথচ তা হ'ল না, যেন মনে হ'ল জীবিত কোন কিশোরীর উষ্ণ চুম্বনের তাপ লাগল আমার ঠোঁটে, গালে কার গরম নিশ্বাসের ছোঁয়া—

অকস্মাৎ একটা বাতাসের শব্দ হ'ল। এক ঝলক দক্ষিণা বাতাস যেন

গঙ্গার বুকের ওপর থেকে ঘুরতে ঘুরতে এগিয়ে এল, মনে হ'ল যে নিঃশ্বাস অনুভব করেছি কিছু আগে, সেই নিঃশ্বাসের উষ্ণতাই আমাকে চারিদিক থেকে ঘিরে আচ্ছন্ন ক'রে ফেলল, তারপর চতুর্দিকে একটা সুগভীর প্রচণ্ড দীর্ঘ-নিঃশ্বাসের শব্দই জাগিয়ে বাতাসটা আবার যেন চলে গেল বহুদূরে, বোধ হয় উত্তরের দিকে, কোন্ অজানা দেশের উদ্দেশে···

আমিও একটা ছোট নিঃশ্বাস ফেলে ছবিখানা ধীরে ধীরে গঙ্গার জলে ভাসিয়ে দিলুম।

শান্তি দাও, শান্তি দাও ভগবান, ওকে এবার শান্তি দাও।···

তারপর থেকে আর রাণুবৌদি কোনদিন দেখা দেন নি।

বিপন্ন

মাত্র দু'দিনের চেষ্টায় রিজার্ভেশান করানো, কোন ভাল ট্রেন আশা করাও বোধ হয় অন্যায়। তবু এটা যে পেয়েছিলাম—মন্দের ভাল বলতে হবে। নইলে আরও মন্থর গাড়িতে যেতে হত। বিশেষ জরুরী কাজ, যেতেই হবে। কোন রকম রিজার্ভেশানের ব্যবস্থা করতে না পারলে বরাত ঠুকে আনরিজার্ভড্ কামরাতেও যেতে হ'ত।

হাওড়া-দিল্লী এক্সপ্রেস—রেলের ভাষায় যার নাম ইলেভ্‌ন্ আপ—তারই একটি তিন তলা স্লীপারে উঠেছি। মালে মানুষে গাদাগাদি, ঠেলাঠেলি, কলহ-বিবাদ। খাঁচার মতো গাড়ি, সঙ্কীর্ণ একটু চলন—তাতে যাত্রী, কুলী, তুলে দিতে আসার লোক—প্রায় পর্ব দিনে কালীঘাটে যাওয়ার মতো অবস্থা। সব চেয়ে অসুবিধা বিপুল মালের তাল সামলানো। আমাদের পাঞ্জাবী ভাইরা সুটকেস ইত্যাদিতে বিশ্বাসী নন, বড় বড় ট্রাঙ্ক ছাড়া কোথাও চলেন না, প্রতি মুহূর্তেই ভয়—কখন বুঝি কোণ লেগে কপালটা কাটবে, কিম্বা, তার চেয়েও বড় ভয়—চশমা ভাঙবে।

চেঁচামেচিরও সীমা নেই। হাঁকডাক সোরগোল। জায়গা বাঁধা বার্থের নম্বর দেওয়া—তবু মাল রাখার স্থান ও পদ্ধতি নিয়ে কদর্য বিবাদ বেধে উঠছে

ক্ষণে-ক্ষণেই। ওঁঠার কথাও, সকলেই এত মাল নিয়ে উঠেছেন—মনে হচ্ছে এটা কোন মালগাড়িরই বড় ওআগন, মানুষগুলো অতিরিক্ত।

এর মধ্যেই—গাড়ি ছাড়ার মাত্র তখন দু-তিন মিনিট বাকী—বিরাট একটা গোলমাল চিৎকার শোনা গেল, এই সময়ের স্বাভাবিক হট্টগোল ছাপিয়েও।

'চোর চোর—পকেটমার। পাকড়ো পাকড়ো। ঐ যে—আরে ও মশাই, ঐ মেয়েছেলেটা—হাঁ ক'রে দেখছেন কি—? মেয়ে-পকেটমার শোনেন নি কখনও ? আরে, ধরো ধরো—দরজা—কী মুশকিল—দু দিকের দরজা সামলাও আগে, বেরোতে না পারে—জলদি—।' ইত্যাদি ইত্যাদি—

ধরা পড়লও মেয়েটি। অল্পবয়সী সুসজ্জিতা তরুণী মেয়ে—যেমন হয়। এখানে কাউকে তুলে দিতে এসেছে, এই কথাই ভেবেছিল সবাই। এই সুযোগই নেয় সাধারণত। য়্যাটেণ্ডেণ্ট নাকি কিছু পূর্বে সাবধানও ক'রে দিয়ে গেছেন। নিজেদের গোলমালে মশগুল যাত্রীরা কান দেয় নি।

কিন্তু মেয়েটি এই অসতর্কতার সুযোগ নিয়েছে পুরোপুরিই। ইতিমধ্যে একটি মেয়েলি ব্যাগ হাতাই করেছে, তাতে নাকি নগদ টাকা ছিল এগারো শ'রও ওপর। এইতেই যদি খুশী হয়ে নেমে যেত তো কোন হাঙ্গামা হ'ত না —ধরা পড়ল এক ভদ্রলোকের পকেট কাটতে গিয়ে। ভদ্রলোকের সঙ্গে যে তিন বছরের একটি মেয়ে ছিল তা অত লক্ষ্য করে নি, বা গ্রাহ্য করে নি—সেই খুকীই বলে উঠেছিল, 'ও কি, বাবার পকেটে হাত দিচ্ছ কেন ? এই—চপ্‌। ভদ্রলোক অবশ্য অত কান দেন নি, মেয়ে দিনরাতই বকছে, কানে স্বরটা গেলে আনন্দ হয়, বক্তব্যে মন দিতে গেলে চলে না—পাশে ছিল একটি ছোকরা, সে শুনেছিল—দেখেছিল—এবং খপ ক'রে হাত চেপে ধরেছিল।

তার পর যা হয়। প্রথমটা খুব চোটপাট মেজাজ দেখাবার তালে ছিল। কিন্তু ব্যাগটায় কী আর কত ছিল বলতে না পারায় সে মেজাজ টিকল না। আর, ব্যাগের মধ্যে যে ভদ্রমহিলার নামে লেখা একটা চিঠি ছিল—তাই বা সে জানবে কী করে।

তার পর অল্প-স্বল্প মার-ধোর—চোর বলে নিশ্চিত জানলেও—মেয়েদের গায়ে হাত তুলতে এখনও সঙ্কোচ বোধ হয় সাধারণ ভদ্রলোকের। অবশ্য—এঁয়ারা আছেন সঙ্গে, পুরুষ ছাড়লেও তাঁরা ছাড়বেন কেন ? বিশেষ দামী

শাড়িখানা তাঁদের অনেকেরই এতক্ষণ চক্ষুশূল হয়েছিল—সে জ্বালাটাও মিটিয়ে নেওয়া দরকার। আর মেয়েদের মনে মেয়েদের সম্বন্ধে দয়ামায়া আছে—এমন অপবাদ বোধ করি শত্রুতেও দিতে পারবে না।

সে যা-ই হোক, কিছু কিছু লাঞ্ছনা-গঞ্জনার পর মেয়েটাকে পুলিসের হাতে দেওয়া হ'ল। সে আর এক হাঙ্গামা। পুলিস—চুরির মামলার একজিবিট হিসেবে ব্যাগটা হাতাবার তালে ছিল, আমরা গাড়িসুদ্ধ হৈ হৈ করে গিয়ে পড়ায়—ভদ্রমহিলা এতটা পথ যাবেন কি করে টাকাগুলো পুলিস হেপাজতে থাকলে, এই যুক্তিতে—শেষ পর্যন্ত তিন-চারজন সাক্ষী রেখে টাকাটা ফেরত দেওয়া হ'ল, ব্যাগটা রইল।

মোদ্দা কথা—ট্রেনটি পাক্কা তিন কোয়ার্টার লেট-এ ছাড়ল। সেইটেই আমাদের কাছে এই ঘটনার প্রত্যক্ষ ফল।

এত রাত্রে খাওয়া-দাওয়ার ঝঞ্ঝাট প্রায় কারুরই নেই, সবাই থিতিয়ে বসা বা বিছানা পাতার কাজে ব্যস্ত—উঠল একটি অনুগ্র পানীয়ওলা (সফ্‌ট্ ড্রিঙ্ককে বাংলায় কী বলবেন ?)। আমাদের প্রায় সামনাসামনি জানলার ধারের তেত্রিশ নম্বর বার্থে ছিলেন একটি তরুণী মহিলা—সম্ভবত একাই যাচ্ছেন—কারণ এতক্ষণের এত চেঁচামেচি হট্টগোলের মধ্যেও লক্ষ্য করেছি একমনে বই পড়ে যাচ্ছেন, দাঁড়িয়ে থাকা গাড়ির ক্ষীণ আলোয়—চোর ধরা পড়বার সময় যা একবার উঠে দাঁড়িয়ে ঘাড় লম্বা ক'রে দেখেছিলেন, সেও বোধ হয় মিনিট পাঁচেক বড় জোর,.তার পরই মার-ধোর পর্ব শুরু হতে বিরক্তিসূচক একটা ভ্রূভঙ্গী ক'রে বসে পড়েছিলেন, আবার বইতে মনোযোগ দেবার চেষ্টা করেছিলেন—তিনি ঐ ঠাণ্ডাজলওলাকে ডেকে একটা পানীয় চাইলেন।

চাইলেন, খেলেনও। তারপর ধীরে-সুস্থে বোতলটা ফেরত দিয়ে বইয়ের দিকে চোখ রেখেই অন্যমনস্কভাবে হাতটা বাড়িয়ে দিলেন হোল্ডঅলের প্রান্তে—গাড়ির খাঁজের দিকে।

কিন্তু সেখানে কিছুই নেই। অবচেতন থেকে হাত সচেতনভাবে সক্রিয় হয়ে উঠল, তবুও কিছু পাওয়া গেল না। এবার বই রাখতে হ'ল। একটু যেন ব্যস্ত হয়েই হোল্ডঅল তুলে দেখলেন, ভেতরে বালিশের তলাটাও ভাল ক'রে

হাৎড়ে দেখলেন—তার পর অস্ফুটস্বরে বলে উঠলেন, 'এ কি, আমার ব্যাগ—?'

কথাটা প্রথম আমারই কানে গিছল।

'সে কি? আপনারও ব্যাগ গেল না কি?'

'না না, যাবে কেন! আমি তো এখান থেকে উঠি নি একবারও—' বলতে বলতে উঠে হোল্ডঅল, বিছানাপত্র ছত্রাকার ক'রে ফেললেন ভদ্রমহিলা।

আরও পাচজন ভীড় ক'রে উঠে এল—নতুন 'মজার গন্ধ' পেয়ে। মামুলি প্রশ্ন বর্ষিত হতে লাগল চারিদিক থেকে, সেই সঙ্গে আনুষঙ্গিক উপদেশও।

ঠিক কোথায় রেখেছিলেন বলুন তো! হোল্ডঅল আর কাঠের খাঁজে?

কতক্ষণ আগে শেষ দেখেছেন ব্যাগটা?

দেখছেন তো দিনকাল! আপনার সামনেই কাণ্ডটা ঘটল। একটু সাবধানে থাকতে হয়।...বালিশের নিচে রাখলেই হত—।

কত ছিল? টিকিট? টিকিটটাও গেল নাকি?

একজন—এক মহিলাই—অস্ফুট অথচ আমাদের শ্রুতিগোচর কণ্ঠে সঙ্গিনীকে বললেন, ব্যাগ ছিল তো য়্যাট অল? না কি, ডবলিউ-টিতে যাবার জন্যে এত অভিনয়?

আমি পকেট থেকে একটা টাকা বার করে জলওলাটাকে বিদায় করলাম। সে অসহিষ্ণু ও রূঢ় হয়ে উঠছিল।

এতক্ষণে মেয়েটার চোখে জল এসে গেছে প্রায়। এমন সময় ওদিক থেকে একটি আধুনিক দীর্ঘকেশ দীর্ঘতর-জুলপি ছোকরা—'এই যে!' বলে হুঙ্কার দিয়ে উঠল, 'দেখুন তো, এইটে কি না।'

দেখা গেল ওদিকের একটা বার্থের নিচে কার একটা স্যুটকেসের পাশে পড়ে রয়েছে।

ছোট হলেও বেশ দামী ব্যাগ, মুখটা খোলা কিন্তু তাতে আসল বস্তুটি নেই। কী ভাগ্যি টিকিটটা পড়ে আছে, আর গণ্ডাকতক খুচরো পয়সা। এখানে এসে বোধ হয় নিজের ওজন নিয়েছিলেন—তার ভবিষ্যদ্বাণী লেখা টিকিটটাও পড়ে আছে ঐ সঙ্গে।

যাঁরা মহিলাটির ব্যাগ হারানো সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করেছিলেন, তাঁরা

লজ্জিত হলেন এবার। সহানুভূতিও যথেষ্ট দেখালেন, উপদেশ বর্ষণেরও অবধি রইল না।

কিন্তু আসল কথাটা অনেকক্ষণ পর্যন্ত মনে পড়ে নি কারও।

সে প্রশ্ন সেই ছোকরাটিই করল, 'আর কোথাও কিছু আছে তো? দিল্লীই তো যাচ্ছেন—টিকিটে যা দেখলুম—ছ' রাত্রির জার্নি—। খাবেনই বা কি? পৌঁছেও তো ট্যাক্সির ব্যাপার আছে।

মেয়েটি এতক্ষণে কিছু ধাতস্থ হয়েছেন, সপ্রতিভভাবে হেসে বললেন, 'না, ট্যাক্সির প্রশ্ন নেই, দিল্লীতে আমার ভগ্নিপতি নিতে আসবেন, তাঁর গাড়ি আছে। এই পথেই যা—। তবে স্যুটকেসের মধ্যে বোধ হয় গোটা পাঁচেক টাকা পড়ে আছে। এখন তো আর কিছু লাগবে না, কালকের দিনটা এক, ঐতেই চালিয়ে নিতে হবে।'

তার পর আমার দিকে ফিরে বললেন, 'আপনি ওকে কত দিলেন যেন? এখন আর স্যুটকেস খুঁজতে পারছি না। কাল সকালে দিলে চলবে তো?'

আমি ও আমার স্ত্রী যথারীতি হাঁ হাঁ ক'রে উঠলুম। ওটা নিয়ে এত ব্যস্ত হচ্ছেন কেন, এ আবার এমন কী একটা ব্যাপার—এই ধরনের কথা বলে তাঁকে শান্ত করলুম।

পরের দিন স্যুটকেস খুলে নোটটা বার করলেন ভদ্রমহিলা। মহিলা না বলে মেয়েটি বলাই উচিত, দিনের আলোয় যা দেখলুম, খুব অল্প বয়স, বাইশ-তেইশের বেশি মনে হয় না, বড় জোর পঁচিশ। কিন্তু আমরা আশপাশের সহযাত্রীরা—কেউ কারও সঙ্গে আলোচনা না ক'রেও যেন স্থির ক'রে ফেললাম, ঐ নোটটা ওকে আর ভাঙাতে দেব না—আমরাই পথের খাওয়া ও জলখাবার চা ইত্যাদির ব্যাপারটা চালিয়ে নেব।

নিলামও তাই। আমি তিনটে ব্রেকফাস্ট আনিয়ে একটা ওকে দিলাম। জোর ক'রেই দিতে হল অবশ্য, প্রবল আপত্তি করল প্রথমটা, বলল, 'এমনি নিতে আর কি, এ যেন মনে হচ্ছে, ভিক্ষে ক'রে খাওয়া—।' আমার স্ত্রীই যথেষ্ট ধমক-ধামক ক'রে সেই ছেলেটি কিছু বাঁকা বাঁকা কথা বলে—সহজ ক'রে আনলেন। দুপুরবেলা—অথবা দুপুরের অনেক আগেই, (পাছে মেয়েটি নিজেই কোন

মীল অর্ডার দেয়)—আমাদের সামনের মাড়োয়াড়ী ভদ্রলোকেরা তাঁদের সঙ্গের পুরী, ডালপুরী, আচার, মিঠাই, ফল—দুখানা কাগজের প্লেট বোঝাই ক'রে সামনে সাজিয়ে ধরে দিলেন। মেয়েটিও নেবে না, ওরাও ছাড়বে না। এক রকম কাকুতি মিনতি ক'রেই গছাতে হ'ল ভদ্রলোকদের। মেয়েটি শেষ পর্যন্ত আরক্ত মুখে নিল—তার সত্যি কথাটাও তখন আর কেউ মানতে রাজী হ'ল না যে এত খাবার! কোন একজনের পক্ষে এত খাওয়া একবারে সম্ভব নয়—কলকাতার কোন লেখাপড়া জানা মেয়ের পক্ষে তো নয়ই।

রাত্রের খাবার ওরটা সুদ্ধ অর্ডার দিল সেই দীর্ঘকেশ ছেলেটিই। সে দেখি এর মধ্যে বেশ জমিয়েও নিয়েছে মেয়েটির সঙ্গে। সেটাই স্বাভাবিক হয়ত—তবে আমরা ওর গায়ে পড়া অন্তরঙ্গতায় মনে মনে একটু বিরক্তই হয়ে উঠলুম, অন্তত আমি। সেটাও স্বাভাবিক, কারণ মেয়েটির শুধু বয়স অল্পই নয়, দেখতেও মোটামুটি সুশ্রী।

ছেলেটি কিন্তু (সেও স্বাভাবিক) আমাদের অর্থাৎ অপেক্ষাকৃত বয়স্ক পুরুষদের এই গোপন ঈর্ষাতুর 'ইনডিগনেশ্যানে' ভ্রূক্ষেপও করল না। মেয়েটির বার্থে বসেই কাটাল সেদিনের বেশির ভাগ সময়টা, খাবার আনিয়ে এক সঙ্গেই সামনাসামনি বসে খেল। মেয়েটির ব্যাকুল আপত্তি উড়িয়ে দিল কাটাকাটা কথায়—ইঙ্গিতে, কৃত্রিম ঠাট্টায়।

মেয়েটি অবশ্য খুবই সঙ্কুচিত হয়ে পড়েছিল। সক্রিয় কোন বাধা দিতে না পেরে একটা কাগজ চেয়ে নিয়ে আমাদের ঠিকানাগুলো লিখে নিল, কৌশলে একবার জেনেও নিল ব্রেকফাস্ট ও রাত্রের চিকেনকারী রাইসের দাম কত। তবে সেটা যে কোন অচির ভবিষ্যতে আমাদের গছানো সম্ভব হবে না তা অনুমান ক'রে নিয়েই হয়ত—সমস্ত সময়টা লজ্জিত ও বিমর্ষ হয়ে রইল—ছেলেটির হাসি-তামাসায় মধ্যে মধ্যে উজ্জ্বল হয়ে উঠলেও, তাতে পুরোপুরি সাড়া দিতে, উচ্ছল হয়ে উঠতে পারল না।

পরের দিন ভোরে ওঠা। সাড়ে পাঁচটায় গাড়ি দিল্লী পৌঁছবার কথা। দৈবাৎ সেদিন যাচ্ছেও ঠিক সময়ে—সুতরাং সাড়ে চারটের আগে থেকেই সাজ সাজ রব পড়ে গেছে, সকলে প্রস্তুত হচ্ছেন।

আমরাও উঠেছি। সামনের মেয়েটি দেখলুম বিছানায় নেই। বাথরুমে গেছে নিশ্চয়ই। ওখানে যা লম্বা কিউ পড়েছে সহজে কিছু হবে না।

কিন্তু অনেকক্ষণ কেটে গেলেও যখন ফিরল না—তখন একটু কৌতূহল হ'ল (সেই সঙ্গে যেন একটু চাপা রাগও), সেই ছোকরার সঙ্গে আবছা অন্ধকারে কোথাও জমাচ্ছে না তো ? অকারণেই উত্তোগী হয়ে এদিক ওদিক, বাথরুমের ধার দেখে এলুম, কোথাও দেখতে পেলুম না। বিছানাটা পাতা আছে, সীটের নিচে স্যুটকেসও—মেয়েটা গেল কোথায় ?

গাজিয়াবাদ এল—চলে গেল। এবার চূড়ান্ত বাঁধাছাঁদার পালা—মারোয়াড়ি ভদ্রলোকটির ভাষায় 'ফাইন্যাল' করে ফেলা—তখন আবিষ্কার করলুম নিচে থেকে টেনে বার করে 'গিনতি' করতে—মেয়েটার মাল আছে বটে, আমাদের কিছু কিছু নেই। আমার একটি এবং মারোয়াড়ী ভদ্রলোকের ছুটি স্যুটকেস নেই। আমার ব্যাগে ছিল শ'পাঁচেক, ওঁর ছুই স্যুটকেস মিলিয়ে শুনলুম প্রায় চার হাজার টাকা—উধাও।

আরও আবিষ্কার করলুম, সে ছোকরাটিও নেই। তার সঙ্গে নাকি কোন মালই ছিল না, আধুনিক ধরনের একটা চ্যাপটা চৌকো ব্রীফ কেস ছাড়া—তাই থেকেই চাদর বার করে পেতে ঐ ব্রীফ কেস মাথায় দিয়ে শুয়েছে ছু' রাত্তির।

মেয়েটার স্যুটকেস খুলে দেখা গেল পরিপাটি ইস্ত্রী করা কয়েকটি পুরনো শত ছিন্ন শাড়ি ও ছেঁড়া হ্যাকড়া ছাড়া কিছু নেই—কাগজপত্র, টাকাকড়ি বা কোন কসমেটিক—কিছুই না—স্যুটকেসটাও বহু পুরাতন, সেটা বেচে যে বিশেষ কিছু পাওয়া যাবে, সে সম্ভাবনাও নেই।

ব্রহ্মের তিন রূপ

সকালবেলা ডাক্তারবাবু চেম্বারে বসেন একটু দেরিতে, ওখান থেকে সেরে আপিসে হাজিরা দেওয়া প্রায় অসম্ভব ব্যাপার। আমার আপিসে অত কড়াকড়ি নেই, তাই রক্ষে। তবু আমার তো একটা বিবেচনা আছে। সুতরাং একটু উদ্বিগ্ন হয়েই গিয়েছিলুম সেদিন। ছেলেটার জ্বর বাঁকা পথ ধরছে বলে আমার

ধারণা, ওঁর একবার অবশ্যই যাওয়া দরকার। গিয়ে যদি দেখি উনি তখনও নামেন নি, কি আগে থেকে অনেক রুগী এসে স্লিপ পাঠিয়ে দিয়ে বসে আছে তবেই তো বিপদ।

কিন্তু পৌঁছে দেখলাম, বিপদটা সম্পূর্ণ অন্য পথ ধরে দেখা দিয়েছে। বাইরের ঘরে রুগী তখনও কেউ আসে নি, ডাক্তারবাবু আজ আগে নেমেছেন—অন্য এক ঝামেলা দেখা দিয়েছে। চেম্বারের মধ্যে একটি ভদ্রলোক মহাতম্বি শুরু করেছেন। সে তম্বিটা ডাক্তারের ওপরই।

এটা একেবারে অভাবনীয় ব্যাপার। তম্বি কিছুদিন যাবৎ দেখছি বরং ডাক্তারবাবুই করেন, রোগী বা তার আত্মীয়রা চুপ ক'রে শোনে। ডাক্তারের বয়সও যেমন বাড়ছে, সেই সঙ্গে রুগীও, ওঁর পক্ষে এত খাটুনী সম্ভব নয়। অথচ তারাও ছাড়ে না, গালিগালাজ, দাঁত খিঁচুনি সহ্য ক'রেও বসে থাকে, হাত জোড় ক'রে। ভাল ডাক্তারের এমন ঝাঁজ সহ্য করতেই হয়—এটা তারা মেনে নিয়েছে।

আজ যে লোকটি এসেছেন এঁকে দেখে একটু চমকে উঠলুম। লেনিনকে স্বচক্ষে দেখি নি, তবে ছবি দেখেছি, মূর্তি দেখেছি অজস্র, ইনি যেন চেহারাটাকে সেই রকম ক'রে তুলতেই চেয়েছেন। অবশ্য একটু বেঁটে, রঙটাও হলদেটে—তবু দাড়িতে, মাথা ও মুখের গঠনে ঘরে ঢুকে মনে হ'ল বুঝি সেই মহান মানুষটিই জন্মান্তর নিয়ে লুঙ্গির ওপর পাঞ্জাবি চড়িয়ে ডাক্তারবাবুকে শাসন করতে এসেছেন। তেমন টাকা থাকলে তো কথাই ছিল না। আর দৃষ্টির সে তীক্ষ্ণতা কোথায় পাবেন।

ভদ্রলোক খুবই উত্তেজিত হয়ে উঠেছেন, গাড়ির চাবিটা হাতে ছিল—সেই গোছাটাই ডাক্তারবাবুর মুখের সামনে ঘুষির মতো উচিয়ে উচিয়ে ধরে বলছেন, 'অফ কোর্স, আলবৎ আপনি আমার মিসেসকে অপমান করেছেন। আপনি ডাক্তার, আপনার ডিউটি হ'ল পেশেণ্ট ডাকতে এলেই যাওয়া। আপনি আমার মিসেসকে হুকুম করলেন, একটা রিক্শা ক'রে ছেলেকে নিয়ে আসতে। ইজ নী এ লোফার। আমার গাড়ি আছে, ঐ জানলা দিয়ে উঁকি মেরে দেখুন—অস্টিন গাড়ি। আর গাড়িই হোক, কি রিক্শাই হোক—তিনি আসবেন এই—এই না বলে হরেক রকম লোয়ার ক্লাস পেশেণ্টদের মধ্যে বসে অপেক্ষা

করতে, কখন আপনি সুইট উইল আর প্লেজার হলে ডাকবেন। হাউ ক্যান ইউ ইমাজিন। তিনি এম. এ. পাস, দু'বছর রিসার্চ করেছিলেন ডক্টরেটের জন্যে, সী'জ এ প্যারাগন অফ বিউটি—তিনি কি—কী বলে একটা হেঁজিপেঁজি সাধারণ মেয়ে!'

ডাক্তারবাবু এতক্ষণ কিছু বলার অবসরই পান নি। বোধ করি একটু নিঃশ্বেস নিতেই থামতে হ'ল এবার ভদ্রলোককে, সেই ফাঁকে বললেন, 'আমার ঘরে তখন দশ-বারোজন পেশেন্ট বসে, তাঁরা অনেকক্ষণ ধরে এসে বসে আছেন, তাঁদের ফেলে রেখে তখনই দৌড়ব—এমন কেস আপনার ছেলের নয়। আগের দিন রাত থেকে একটু জ্বর এসেছে—অনায়াসে তাকে নিয়ে আসা যেত!'

'কী বলছেন আপনি, আমার মিসেস এসে এখানে অপেক্ষা করবেন! আমার মিসেস—'

ডাক্তারবাবু এবার উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'জানি না আপনার স্ত্রী কি, তিনি প্যারাগন অব বিউটি হতে পারেন—কিংবা খুব ধনীর কন্যাও—কিন্তু আমার কাছে সব রোগীই সমান। যেমন আসবেন, তেমনি অর্ডারে আমি তাঁদের ডাকব। সকল কমিউনিটির কাছেই আমি দায়িত্ব বদ্ধ এখানে অনেক ডাক্তার আছেন, এই মাত্র আপনিই তো বললেন, তাঁদের কারুর কাছে গেলেই হয়। আপনি বৃথা আর আমার সময় নষ্ট করবেন না—প্লীজ, ইনি এসেছেন, এঁর আপিসের সময়, এঁর কাজটা করতে দিন!'

ভদ্রলোকের দুটো চোখ দেখতে দেখতে জবাফুলের মতো লাল হয়ে উঠল, উনি বললেন, 'আপনি দাঁড়ালেন যে! হোয়াট ডু ইউ মীন, আমাকে মারবেন নাকি, য়্যাঁ! কী মনে করেছেন? নাকি ঘাড় ধাক্কা দিয়ে বার ক'রে দেবেন। য়্যাঁ! আপনি মনে করেন আপনার মতো বড় ডাক্তার আর কেউ নেই। তাই যা খুশি তাই ব্যবহার করবেন!'

ডাক্তারবাবু বললেন, 'ভদ্রলোককে বিদায় দেবার সময় দাঁড়িয়ে উঠে বিদায় দিতে হয় এই তো জানি। এর মধ্যে ঘাড় ধাক্কা দেবার প্রশ্ন উঠছে কেন?'

আরও কি বলতে যাচ্ছিলেন ভদ্রলোক, আমিই এবার দু হাত জোড় ক'রে বললুম, 'দেখুন সত্যিই আমি বড় বিপন্ন, আপনি যদি দয়া ক'রে ও ঘরে

অপেক্ষা করেন আমি মিনিট পাঁচেকে কাজটা সেরে নিই। আমি ধনী নই, আপিসে রোজ রোজ দেরি হলে চাকরি যাবে, খেতে পাবো না।'

ভদ্রলোক বার দুই হাত দুটো মুঠো করলেন আর খুললেন, বোধ হয় দুজনের সঙ্গে একা পেরে উঠবেন না বুঝলেন, তারপর উঠে দাঁড়িয়ে 'আচ্ছা, আমিও ছাড়ব না। আপনাকে কোর্টে দাঁড় করাব তবে আমার নাম—' বলে স-পদদাপে সবেগে বেরিয়ে গেলেন।

২

ওঁর কথা ভুলেই গিছলুম। এমন অদ্ভুত ধরনের লোক এ শহরে তো কতই আছে, মনে ক'রে রাখবই বা কেন। কিন্তু ভদ্রলোক যেন জোর ক'রে আমার স্মৃতির মধ্যে প্রবেশ করলেন—কনুইয়ের গোঁত্তা দিয়ে বিস্মৃতিকে সরিয়ে।

দীর্ঘদিন লেক-এ আসি নি, বেশ ক'বছর হ'ল। সেদিন সাদার্ন এভিনিউতে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকেও যখন রিক্‌শা পেলাম না, রাত দশটা বাজে—কোন ট্যাক্সি তো যেতেই চাইবে না—তখন সোজা হণ্টন দেওয়াই মনস্থ করলাম। আর, যদি হাঁটতেই হয়, একটু লেকের মধ্যে দিয়েই যাই না কেন।

খানিকটা গিয়েছি—দু'দিকের লেকে জল টলটল করছে, নানারকম ফুলের সুগন্ধ ভেসে আসছে—মনটা বেশ একটু কবি-কবি ভাবে স্নিগ্ধ হয়ে উঠেছে, দেখি এক জায়গায় একটা গাড়িকে কেন্দ্র করে মহা হইচই লেগে গিয়েছে।

এটা অবশ্য নতুন নয়। এখানে এত রাত্রে—নির্জনে গাড়ি আসা মানেই তো প্রণয়লীলা—রতিলীলা বলাই বোধহয় উচিত হবে—এ সেই জলাশয়টির জন্মলগ্ন থেকেই চলে আসছে। তখন মজা দেখত, মার্কিন সৈন্যদের পাশবিক ব্যাপারে উঁকি মেরে দেখতে গিয়ে ধমক খেত—এখন কোন কোন বেকার ছোকরা ব্ল্যাকমেল ক'রে দু টাকা দশ টাকা আদায় করে।

কিন্তু আজকের ব্যাপার একটু ভিন্ন ধরনের। এত লোক নিয়ে ব্ল্যাকমেল চলে না, তা ছাড়া একটা চটাস চটাস মারবার আওয়াজ হচ্ছে না? সেই সঙ্গে নারীকণ্ঠের একটু কান্নাকান্না কথার শব্দ?

কৌতূহল স্বাভাবিক। যতদূর সম্ভব ভিড় ঠেলে সামনে গেলাম।

হ্যাঁ, মারধোরই চলছে, তাতে কোন সন্দেহ নেই। ইংরেজিতে যাকে বলে 'ফ্রি ফর অল'—যে পারছে সেই দু'এক ঘা লাগিয়ে দিচ্ছে। কিন্তু মানুষটা কে ? কোন্ শ্রেণীর মানুষ ? ভিড়ের মধ্যে, যদিও আলো আছে আজ—দৈবাৎ, ভগবানের ইচ্ছেয়—ভিড়েই চাপা পড়ে যাচ্ছে মুখখানা। তাছাড়া ঘুষিতে দাঁত ভাঙবার চেষ্টা চারিদিকে, লোকটি মুখ ঢাকবার চেষ্টা করবে বৈকি।

পাশের এক একটু বয়স্ক লোককে জিজ্ঞাসা করলাম, 'ব্যাপারটা কি মশাই ?'

'আর কইবেন না। হে লোকটা নাকি কোন্ বড় আপিসে কাম করে, হেকানকার একটা ছুরীরে লইয়া আইছে ছিনেমা ছাখাইবার নাম কইরা, হ্যাও ছাখাইছে—অহনে লেকে আইছে বাকী যা কাম করণের—বোঝেন তো! ছেমরীটা আগে হয়ত অত বোঝে নাই, শ্যাষ-ম্যাষ চ্যাঁচাইয়া উঠছে, হ্যাতেই এহানকার বেবাক লোক ছুইট্যা না আইস্যা গাড়ির থন বাইর কইরা ধোলাই দেবার লাগছে। আর কি! ব্যাশ অইছে, যেমন কম্ম তেমন ফল!'

ইতিমধ্যে কানে গেল, মেয়েটির চাপা আর্তকণ্ঠ, 'আর মারবেন না আর মারবেন না, দোহাই আপনাদের—আমার ওপরওলা মনিব। এই নিয়ে জানা-জানি কেলেঙ্কারি হলে আমার চাকরি চলে যাবে। দয়া ক'রে আমাকে ছেড়ে দিন। আমি বাড়ি চলে যাই। ওঁকেও আর মারবেন না, বরং কেউ দয়া ক'রে একটু বাড়িতে রেখে আসুন। দোহাই আপনাদের—এ চাকরি চলে গেলে সাতটি প্রাণী আমরা উপোস ক'রে মরব।'

এবার, অবিরাম মার ,খেতে খেতে, লোকটি পড়ে গেল। সত্যিই বুঝি খুন হয় দেখে আমি গম্ভীর কণ্ঠে বললাম, 'কি হয়েছে কি ? আপনারা এত মার-ধোর করছেন কেন ? এই তো জাস্ট রেলিংটার ওপারেই পুলিস দাঁড়িয়ে আছে। ডেকে হ্যাণ্ডওভার করুন না। না ডাকতে পারেন আমিই ডাকছি। অমনভাবে মারবেন না। পরশু তালতলায় ঐ ভাবে একটা লোককে মেরে সাত সাতটা ছেলে হাজতে বাস করছে, আমার নিজের ভাইপোও তার মধ্যে একজন!'

'পুলিস' শব্দটায় বুঝি এখনও কিছু জাদু আছে। মেয়েটা তো হাউমাউ করে কেঁদে উঠল, 'না না, আপনাদের পায়ে পড়ি—এর মধ্যে পুলিস আনবেন

না, আমাকে তাহলে আত্মহত্যা করতে হবে—' ইত্যাদি বলে। ভিড়ও দেখতে দেখতে পাতলা হয়ে গেল অনেকখানি।

এবার সুবিধা মতো এগিয়ে গিয়ে টর্চ ফেলে দেখি—একি, এ যে সেই সে-দিনের পরম খ্রীভক্ত সাহেবটি, যিনি ডাক্তারবাবুকে এসে শাসাচ্ছিলেন। সেই লেনিনের মতো উদ্ধত দাড়ি, সেই মাথার গঠন, যদিও মুখের মসৃণতা ঘুষি-চড়ের কালশিটেয় প্রায় ঢেকে এসেছে। ঠোঁট কেটেছে কি দাঁত ভেঙেছে জানি না, মুখে রক্ত।

মেয়েটাকেও দেখা গেল এবার ভাল ক'রে। শ্যামবর্ণ পাকসিটে গোছের চেহারা, যৌবন-লক্ষণ প্রায় নেই বললেই হয়, একান্ত শ্রীহীন। বয়স যে কত চেহারা দেখে বোঝার উপায় নেই। তবে যতদূর মনে হয়—কমই।

আমি কঠোর কণ্ঠে বললুম, 'যান—এই বেলা বেরিয়ে যান এখান থেকে। পুলিস এসে গেলে আপনাকেও লকআপে যেতে হবে। যদি এতই জাত বাঁচাবার ভয়—এসেছিলেন কেন মরতে? এই সব ওপরওলারা যখন সিনেমা দেখাতে নিয়ে যায় কোন নিঃসঙ্গ মেয়েকে, তখন তাদের যে টিকিটের কি দাম দিতে হয় জানেন না? নাকি কারও মুখে কখনও শোনেন নি? ওপরওলাকে খুশী রাখবেন আবার চরিত্রও বাঁচাবেন—তা তো হয় না। নেকা মেয়েছেলে কোথাকার।'

মেয়েটা সুযোগ পেয়ে ঘাড় নীচু ক'রে এক রকম ছুটেই পালিয়ে গেল। এবার পলায়নাবশিষ্ট জনতার দিকে ফিরে পকেট থেকে নিজের ডায়েরীটা বার ক'রে বললুম, 'হ্যাঁ, এবার আপনাদের নাম-ঠিকানাগুলো দিন তো। কে কি চোখে দেখেছেন—সেটাও বলুন। আপনারা কি এঁকে রেপ করতে দেখেছেন য়্যাকচুয়ালি?'

'আ-আপনি কে মশাই, নাম ঠিকানা দেব আপনাকে?' ওরই মধ্যে একটি ছোকরা কিছু সাহস সঞ্চয় ক'রে প্রশ্ন করল, যদিও গলার আওয়াজে খুব একটা জোর ফুটল না।

'আমি কে? কেন প্লেন ক্লোদ্‌স্ পুলিসের কথা শোনেন নি নাকি? আর তাতেই বা দরকার কি, ঐ বাইরের তো পুলিসের গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে, ডাকুন না। তাদেরই জিজ্ঞাসা করুন—আমি কে? জবাব পেয়ে যাবেন।'

এবার অনেকেরই মুখ শুকিয়ে উঠল। কেউ আর রাস্তায় সত্যিই পুলিসের গাড়ি আছে কিনা খোঁজও করল না। বরং আর একটি ছোকরা এবার আগের ছেলেটাকে এক ধমক দিয়ে বলল, 'এই, চুপ কর্ দিকি। ভদ্রলোকের সঙ্গে কথা বলতে জানিস না। না স্যার, আমরা ঐ যা বললেন—ইয়ে—কিছু চোখে দেখি নি। মেয়েটা চেঁচাচ্ছে আর গাড়ি থেকে নেমে যাবার চেষ্টা করছে দেখেই—'

আমি বাধা দিয়ে বললুম, 'কিছু প্রত্যক্ষ প্রমাণ না পেয়েই এমনভাবে তবে যে মারধোর করলেন—তার কারণটা কি দেখাবেন, এ ভদ্রলোক যদি পুলিসে যান? মেয়েটাই যে ফ্রড নয়—কি ক'রে জানলেন? এমন কেস তো হামেশাই হচ্ছে, রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে থেকে বলে আমাকে একটা লিফ্‌ট্ দেবেন কাইণ্ডলি? বড় বিপদে পড়েছি। তারপর গাড়িতে উঠেই বলে আমাকে এত টাকা দিন নইলে চেঁচিয়ে লোক জড়ো করব—বলব আপনি বদ মতলবে ভুলিয়ে গাড়িতে তুলেছেন। অত বড় সুশীল ডাক্তারের কাছ থেকেই দু'হাজার টাকা আদায় করেছে সেদিন একটা মেয়ে! না, কাজটা আপনাদের খুবই খারাপ হয়েছে!'

কথাটা বোধহয় শেষও হয় নি—প্রায় সব লোক 'হাওয়া' হয়ে গেল। এবার ঝুঁকে পড়ে লোকটির ওপর একটা হাত চেপে ধরে বললুম, 'কি, উঠতে পারবেন না, না য়্যাম্বুলেন্স ডাকতে হবে?'

কি একটা বলবার চেষ্টায় খানিকটা যেন গোঁ গোঁ শব্দ ক'রে ভদ্রলোক বার, কতকের চেষ্টায় উঠে বসলেন। এবার আমি তাঁর পিছন থেকে দুই বগলে হাত দিয়ে কোনমতে দাঁড় করিয়ে তুললাম। কোনমতে তার কারণ—খান দান ভাল, বেশ ওজন লোকটির। গাড়ির দিকের দরজাটা খোলাই ছিল, তাই সেই অবস্থাতেই ভেতর দিকে ঠেলে দিতে খুব অসুবিধাও হ'ল না।

এর পর প্রশ্ন—গাড়ি চালাবে কে?

প্রশ্নটা তাঁকেই করলুম, 'আপনি কি নিজে এখন চালাতে পারবেন?'

কোনমতে উত্তর দিলেন ভদ্রলোক, 'না। যদি আপনি দয়া ক'রে—'

আমি বললুম, 'না। ওটা জানি না, শেখার দরকার হয় নি। আপনি তো দেখছি অটোমোবাইল য়্যাসোসিয়েশনের মেম্বার—আমি ঐ পেট্রোল পাম্প

থেকে বরং একটা ফোন ক'রে দিচ্ছি। আর দেখছি যদি কোন স্পেয়ার ড্রাইভার থাকে ওদের—'

ভদ্রলোক যেন ককিয়ে উঠলেন, 'আমাকে ফেলে যাবেন না, যদি ওরা আবার আসে। আপনি পুলিসের লোক, এটা আপনার ডিউটি—।'

এবার আর রাগ সামলাতে পারলুম না, 'দেখুন, ডিউটি শব্দটা আর যারই হোক, আপনার মুখে শোভা পায় না। আমি পুলিসের লোক নই—পুলিসের লোক হ'লে আমার ডিউটি হ'ত আপনাকে এখনই লকআপে নিয়ে যাওয়া। এটুকু মিথ্যা না বললে আপনি খুন হয়ে যেতেন বলেই বলেছি।'

আমি আর বাদানুবাদে না গিয়ে দ্রুত পেট্রোল পাম্পের দিকে এগিয়ে গেলুম।

৩

এর প্রায় বছর খানেক পরের কথা। আমার বন্ধু যদুবাবু খবর পাঠালেন, তাঁর গুরুদেব দয়া ক'রে একদিন পায়ের ধুলো দেবেন তাঁর বাড়ি—সে উপলক্ষে যজ্ঞাদি হবে, কীর্তনও সেই সঙ্গে। আমি যদি ইচ্ছা করি তাহলে সেদিন যেন সকালেই তাঁর ওখানে চলে যাই। অপরাহ্নে প্রসাদের ব্যবস্থাও আছে, সেজন্যে কোন চিন্তা নেই।

এ গুরুদেবের কথা বহুদিন থেকেই শুনছি, ছবি দেখেছি, দূর থেকে চোখেও দেখেছি—কিন্তু সান্নিধ্যলাভের সৌভাগ্য হয় নি। পৃথিবী জোড়া প্রায় এঁর তপস্যার খ্যাতি। দেশবিদেশে মিলিয়ে বোধহয় লক্ষাধিক শিষ্য। উনি যেদিন কোন শিষ্যের বাড়ি পদার্পণ করেন সেদিন সেখানে মেলা বসে যায়।

সুতরাং আমি সেদিন যে ক্যাজুয়াল লিভ নিয়ে আপিসে যাওয়া বন্ধ করব —এ তো স্বাভাবিক। ভোরেই স্নান ইত্যাদি সেরে ফুলের মালা নিয়ে চলে গেলুম যদুবাবুর বাড়ি। আটটায় গুরুদেব আসবেন, আমি গেছি তখন সাতটা —তখনই শ'তিনেক ভক্ত শিষ্য এসে গেছেন।

যথারীতি তিনি এলেন। প্রণাম দর্শন হ'ল। নিজে যজ্ঞ করলেন—প্রাণ ভরে দেখলাম। তারপর শুরু হল তাঁর সুললিত কণ্ঠের কীর্তন। কীর্তন বলতে অবশ্য আমরা যা বুঝি এ তা নয়। বিভিন্ন ধর্মসঙ্গীত গেয়ে যান উনি—একটার

পর একটা—তার মধ্যে প্রাচীন গানও যেমন আছে তেমনি রবীন্দ্রনাথ, কান্ত-কবি, অতুলপ্রসাদও আছেন।

খুবই ভাল লাগছে বলা বাহুল্য—হঠাৎ কানে এল কে যেন খুনখুন ক'রে কাঁদছে। ঘাড় ঘুরিয়ে চেয়ে দেখি, আমার থেকে একটু দূরে বসে আছেন সেই ভদ্রলোকটি। কপালে মহারাজের দেওয়া ফোঁটা, গলায় প্রসাদী মালা, নিমীলিত দুটি চোখ থেকে জল যতটা না গড়িয়ে পড়ছে, কান্নার শব্দটা উঠছে তার চেয়ে অনেক বেশি। 'উহুঁ, উহুঁ,' 'ওঃ', 'আহা', 'হে ভগবান, দাসকে দয়া করো' ইত্যাদিও বলে উঠছেন মধ্যে মধ্যে।

অনেকেই বিরক্ত হচ্ছেন এই ব্যাঘাতে—কিন্তু তিনি নির্বিকার। আর চোখই খুলছেন না, তা বিরক্তি লক্ষ্য করবেন কি ক'রে? তাঁকে ঠেলে 'চুপ করুন মশাই' বলতে গেলে হয়ত হিতে বিপরীত হবে। আরও চেঁচামেচি হ'তে পারে। তাই আশপাশের লোক কোনমতে সহ্য ক'রেই যাচ্ছেন।

গান শেষ হ'তে বেলা চারটে বাজল। তারপর প্রসাদ পাবার পালা। সেখানে গিয়ে দেখি—যদিচ যদুবাবু আমাকে আগেই ডেকে নিয়ে গেছেন ভাল জায়গায় বসাবেন বলে—তারও আগে সেই লোকটি এসে জাঁকিয়ে বসেছেন। যদুবাবু প্রশ্ন করলেন, 'কে ভাই, এ ভদ্রলোক? ভক্তির ঠ্যালায় যে আমরা অস্থির হয়ে গেলাম।'

'আমি তো চিনি না। আপনাকেই জিজ্ঞেস করব ভাবছিলুম। তবে এ পাড়াতেই বোধহয় থাকেন, ডাক্তার ঘোষালের চেম্বারে দেখেছি একদিন।'

আহারাদির পর বেরিয়ে আসছি, দেখি তিনি এক বেশ বয়স্ক ভদ্রলোককে জ্ঞান দিচ্ছেন, 'এত সহজে তাঁকে পাবার যো নেই, বুঝলেন! মনন চিন্তন—এগুলো চাই। সেই সঙ্গে চাই অধ্যয়ন। শাস্ত্রগ্রন্থ পাঠ করতে হবে। ব্রহ্ম কি এত সহজলভ্য? শঙ্কর কি বলেছেন মনে নেই—"জ্ঞানবিহীনে সর্বমনেন মুক্তির্ন-ভবতি জন্ম শতেন!" এই যে সব দল বেঁধে এসেছে মূর্খের দল, এরা কি পেল? কী পাবেই বা? পড়া নেই, শুনো নেই, তপস্যা নেই—শুধু মহাপুরুষকে দেখলেই তাঁকে পাবে, ছোঃ!'

এই বলে তিনি যেন একবার রবীন্দ্রনাথের সেই 'ভাইবংশসম্ভূত ভেঁয়ের' মতো আমাদের অর্থাৎ ক্ষুদ্র পিপীলিকাদের দিকে সগর্বে তাকিয়ে নিলেন।

আন্‌কোরা

খুব এক বড় ডাক্তারের বাড়ি ভাইকে দেখাতে নিয়ে গিয়েছিলুম। মস্ত বড় ডাক্তার, চৌষট্টি টাকা ভিজিট বাড়িতেই। রোগীর বাড়ি এলে একশো আটাশ। তাও বহু সাধ্য-সাধনায় তাঁর দর্শন মেলে—অত দর্শনী সত্ত্বেও।

দরজার সামনে যে চলন, সেখানে মিটমিটে একটি আলো, সামনে একটা শো-কেসের মতো পদার্থর ওপর বসে আছে একটি কালোপানা পনেরো যোল বছরের ছেলে, এ আলোতে তার অস্তিত্ব বোঝা যায়—দেখা যায় না।

তাকে এক রকম অবজ্ঞা করেই, ডান হাতি একটা ঘরে চেয়ার ইত্যাদি পাতা আছে দেখে সেটাই অপেক্ষা করার ঘর বুঝে সেইদিকে এগিয়ে গেলুম। আমাদের অনুমানই ঠিক, একটা বিবর্ণ গোল টেবিলের ধারে চারখানা চেয়ার—আর কোন ফার্ণিচারের বালাই নেই, তবে একটা বড় পর্দার আড়ালে কতকগুলো সোফাকৌচ ইত্যাদি ডাঁই করা আছে, তা পর্দার ওপর দিয়েই কতকটা দেখা যায়। এ টেবিলের ওপর কতকগুলো বছর-কুড়ি আগেকার সাপ্তাহিক কাগজ, তাও পড়া যায় না। কারণ যদিচ এখানের আলো কিছুটা উজ্জ্বলতর—তবু, ফ্লোরোসেণ্ট ল্যাম্প হলেও, কুঁড়ে বাতির আলোর আর কত দীপ্তি সম্ভব?

আমরা তো এসে বসলাম। দেখা গেল, আমরা যে ছেলেটিকে উপেক্ষা করে এসেছি সে আদৌ অবজ্ঞার পাত্র নয়। পরনে হাফ-প্যাণ্ট আর একটি গেঞ্জি, বুদ্ধদেববাবুর ভাষায়—যাকে শতছিন্ন বললে বর্ণনা মাত্র হয়, ব্যঞ্জনা হয় না, সহস্র ছিদ্র বললেই ঠিক বলা হয়, এমন 'গোটা' গেঞ্জি ইতিপূর্বে কোন ভিখিরী বা পাগলকেও পরতে দেখি নি—এসে গম্ভীরভাবে শুধোল, 'তোমরা কি রাইপোর্ট করতে এসেছ, না কেস দেখাবে?'

আমরা তখনও তার পদবীটা অর্থাৎ এখানে কি করে, ঠাওর পাচ্ছি না, বললুম 'দেখাবো'।

'নতুন কেস? তাহলে বাপু একটু বসতে হবে। কখন টাইম দেওয়া ছিল তোমার? এখানে এক মিনিট এদিক ওদিক যাবার উপায় নেই।'

যাইহোক, যথাসময়ে ডাক পড়ল, রোগী দেখিয়ে বেরিয়ে এলুম। ততক্ষণে অন্য রোগী এসে গিয়েছে, বসবার জায়গার অপ্রতুল, বাইরে বেশ বৃষ্টি নেমেছে —অগত্যা গিয়ে প্রায়ান্ধকার সেই চলনে, দাঁড়ালুম।

সে ছেলেটি যেন ছায়া থেকে মূর্তি আহরণ করে এসে দাঁড়াল, 'কৈ তোমরা বাড়ি যাবে না?' বললুম, 'গাড়ি আসবার কথা, তাই অপেক্ষা করছি।'

'তোমরা এয়েছ কিসে? গাড়িতে? তা সে গাড়ি ছাড়লে কেন বোকার মতো?'

'না, সে গাড়িতে অন্য লোক ছিল, তাদের বালিগঞ্জে পৌঁছে ফিরে আসবে, এই কথা।'

'আর এয়েছে। এই ঝড় বৃষ্টিতে। ছাখো গে, ড্রাইবার কোথায় বসে ঘুমুচ্ছে।'

ভেতর থেকে ডাক পড়তে তাকে চলে যেতে হ'ল। নামটা ইতিমধ্যে সংগ্রহ করেছি—ভরত। একটু পরেই নতুন একদল রোগীকে ভেতরে পৌঁছে দিয়ে ফিরে এসে তুহাতের বিচিত্র ভঙ্গী করে বললে, 'কই, তোমাদের গাড়ি এল কই? তোমরা ঠিক গাড়িতে ক'রেই এসেছিলে তো? আমি তো বাবু দেখি নি।'

ভাই রাগ করে কি বলতে যাচ্ছিল, তাকে হাতের চাপ দিয়ে থামিয়ে দিয়ে বললুম, 'আর একটু থামো না, নিজের চোখেই দেখতে পাবে।'

তারপর বললুম, 'এখানে কোন বাথরুম আছে? একটু ইয়ে মানে—'

কথা শেষ করতে না দিয়েই বলল, 'বাথরুম টুম নেই বাবু। এই পাশ দিয়ে চলে যাও না, ভেতর উঠোন অন্ধকার, তায় জল পড়ছে, কাজ সেরে এসো না, কে দেখছে।'

ভাই চলে গেল কাজ সারতে। আমি শুধোলুম, 'তুমি কতদিন এখানে কাজ করছ?'

'কলকাতায় এয়েছি ঢের দিন, ধরো পাঁচ বছর তো হবেই।...যে বাড়ি ছিলুম, বাড়িটা ভাল, বৌদিটা খুব ভালবাসত। তা দেশে যাই নি অনেকদিন, যেতে তো হবে, বলি মা বাপ আছে ত?...তা বৌদি বলে, ভাই ভরত, আমার

কি হবে ? তুই একটা কাউকে দে।···ভাবলুম, সত্যি, মানুষটা এত ভাল, বিপদে পড়বে—তা দিলুম দেশের আর একটা ছেলেকে। ওমা, ভাল মনিব, সে বাড়ি কি কেউ ছাড়ে—ছোঁড়া আর ছাড়তে চাইল না। আমি আর ঝগড়া-ঝাঁটি করলুম না, বলি মরুক গে, আমার ঢের কাজ জুটবে। তাই এই এখানে এয়েচি। এখানে ধরো এখনও দুমাস পুরো হয় নি।'

'এরা কেমন ?' জিজ্ঞেস করি।

'লোক মন্দ না। বৌদির একটু মেজাজ, আর একটু কিপটে। তা সব সুখ কি সব জায়গায় হয়—তুমিই বলো ? এ ডাক্তার কিন্তু খুব ভাল, এখানে কোন রুগীকে দুবার আসতে হয় না '

বললুম 'কেন, একেবারের ওষুধেই অক্কা পেয়ে যায় ?'

সে এ তামাশার ধার দিয়ে গেল না। বললে, 'হ্যাঁ গো, বিশ্বাস করো। দুবার আসতেই হয় না, ভাল হয়ে যায় ঐ একবার দেখালেই, তবে রাইপোর্ট থাকলে আর একদিন আসে—পেচ্ছাপ বলো, বেলাড্ বলো, বুকের ছবি বলো—নইলে এই একটি দিন, তিন কুড়ি চার টাকা ছাড়ো—সেলাম বাজিয়ে চলে যাও।'

তারপরই আবার সেই প্রশ্ন, 'কই, তোমাদের গাড়ি কই ? সে আর এয়েছে।'

আমার ভাই বললে, 'কেন, আমরা এখানে আছি, তোমার কি খুব অসুবিধে হচ্ছে ?

'ওমা তা কেন, থাকো না রাত আটটা পর্যন্ত। ডাক্তার সাতটায় ওপরে উঠবে তারপর এক ঘণ্টা, আটটা বাজলেই দোর বন্ধ করতে হবে। বৌদি দাদা আসে বেল টিপবে ভর্‌র্ ভোঁ—দরজা খুলে দোব।···তোমাদের কষ্ট হচ্ছে। ঘরে গিয়ে ঐ চেয়ারে বসো না কেন, গাড়ি এলে সাড়া দেবে তো।'

বললুম, 'না বেশ আছি, ও ঘরে যা ভ্যাপসা গন্ধ।'

'তা যা, বলেছো—'

আরও কি বলতে যাচ্ছিল, আমাদের গাড়ি এসে গেল। আমরা গিয়ে গাড়িতে উঠে বসেছি, গাড়ি ছাড়বে—হঠাৎ 'দাঁড়াও, দাঁড়াও, একটা কথা' বলতে বলতে ভরত ছুটে এল।

‘কী হয়েছে ?’ শুধোই।

এদিক ওদিক চেয়ে গলাটা খুব নামিয়ে বললে, ‘তিন দিন আগে ঐ রুগীদের বসার ঘরে একটা পাঁচ টাকার নোট কুড়িয়ে পেয়েছিলুম, সেটা রেখে দিইচি, বাবুদের জানাই নি। তা সেটা নিলে কি আমার চুরি করা হবে ? নাকি বাবুদের দিয়ে দোব ? তোমরা তো অনেক নেকাপড়া শিখেছো তোমরা কি বলো ?’

আমি গলায় জোর দিয়ে বললুম, ‘না, না, চুরি করা হবে কেন ? ও টাকা ভগবান তোমাকে দিয়েছেন। বরং ঐ টাকায় একটা গেঞ্জি কিনে ফেল।’

ভরত টাকরায় একটা আপসোসের শব্দ করে বলল, ‘তোমরা এত বোকা কেন ? এখনও এ বাড়ি থেকে এ মাসের মাইনে পাই নি, ধার ক’রে এইচি, হাতে এক পয়সাও নেই, তা ওরা জানে—দুম করে হঠাৎ গেঞ্জি কিনে বসি আর ওরা চেপে ধরুক, টাকা কোথা পেলি। নিশ্চয়ই চুরি করেছিস। সে কাজে আমি নেই।’

বলে সে যেমন এসেছিল, তেমনই আবার লাফাতে লাফাতে চলে গেল ভেতর।